বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোড় হাত।
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ।।

নামহট্ট ডাইরেক্টরেট্
ইস্কন, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

গৌর-কৃষ্ণ-জগন্নাথ
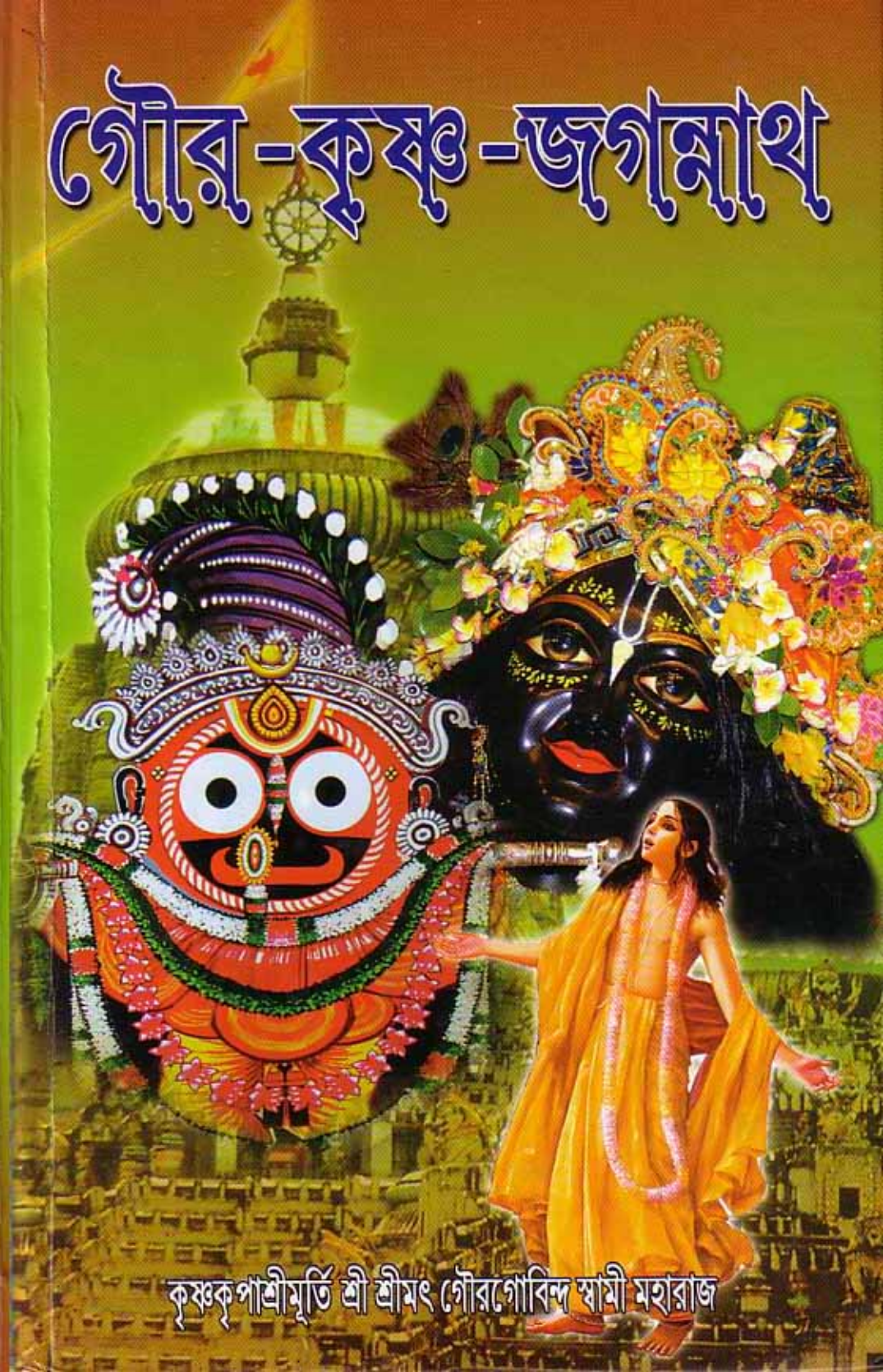
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রী শ্রীমৎ গৌরগোবিন্দ স্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌর-কৃষ্ণ-জগন্নাথ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের

প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের

কৃপাধন্য

শ্রী শ্রীমৎ গৌরগোবিন্দ স্বামী মহারাজ

কর্তৃক সম্পাদকীয় প্রবন্ধাবলী

অনুবাদক ঃ আদিপুরুষ দাস

শ্রীশ্রী হরেকৃষ্ণ নামহট্ট

ইস্‌কন, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

প্রকাশক ঃ

শ্রীশ্রী হরেকৃষ্ণ নামহট্টের পক্ষে
শ্রীগৌরচন্দ্র দাস
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন ঃ (০৩৪৭২) ২৪৫২৯৪, ২৪৫৩০৫
মোঃ ০৯৭৩৪৬১৫৯১৮, ০৯২৩৩৩৭০৬৯৯

প্রথম সংস্করণ ঃ

রাসযাত্রা ২০০৮' ৩০০০ কপি

মুদ্রণে ঃ শ্রীকৃষ্ণ প্রেস এণ্ড ডিটিপি সেন্টার
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া-৭৪১৩১৩
মোবাইল ঃ ৯৭৩৩৫৪২৬৭৮, ৯৯৩২৩৬৩১৮৪

উৎসর্গ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের
প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের
অন্যতম কৃপাধন্য আমাদের পরমারাধ্যতম গুরুদেব
শ্রী শ্রীমৎ গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজের শ্রীকরকমলে
"গৌর-কৃষ্ণ-জগন্নাথ"
গ্রন্থখানি উৎসর্গ করা হইলো।

ইস্‌কন, শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরের সেবিত বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধামাধব

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

***

মুখবন্ধ

আমরা আমাদের পরমারাধ্যতম গুরুদেব শ্রী শ্রীমৎ গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজের সাক্ষাৎ বপু সঙ্গহারা হয়ে তাঁর শ্রীমুখবিগলিত মহা অমৃতময়ী ভাগবত বাণীর সেবা হতে বঞ্চিত হয়েছি। ফলতঃ হৃদয়ে সর্বদা হা-হুতাশ-জনিত বিরহবেদনা-রূপ অগ্নিতাপে সন্তপ্ত হয়ে মহৎ ভাগবত বাণী শ্রবণের নিদারুণ অভাববোধে অস্থির হয়ে পড়েছি। এ অবস্থায় তাঁর শ্রীমুখবিগলিত মহা-অমৃতময়ী বাণী অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করে তাঁর গভীর অনুভূতিপূর্ণ বাণী সংগ্রহ করে 'গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার' ন্যায় গুরু পূজার অর্ঘ্য সাজাবার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করেছি মাত্র। তাঁর শ্রীমুখবিগলিত বাণী শাশ্বত বেদবাণী চিরন্তনী ভাগবতী বাণী। এই বাণী উড়িয়া 'ভগবৎ দর্শন'-নামক সংখ্যাগুলিতে সম্পাদকীয় কলমে প্রবন্ধাবলী আকারে প্রকাশিত ছিল। তার মধ্যে নির্বাচিত প্রবন্ধগুলির অবলম্বনে এই 'গৌর-কৃষ্ণ-জগন্নাথ' গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণের রাস পূর্ণিমা তিথিতে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হলো। এই গ্রন্থখানি পড়ে আমরা আমাদের অনুচেতন জীবাত্মা ভজন পথের নব নব ভাবে উদ্দীপন লাভ-পূর্ব্বক শুদ্ধ ভক্তিতে পরিপ্লাবিত হয়ে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চরণ সরোজে উপনীত হতে পারবো বলে এই ভরসা রাখি। এটাই আমাদের সুদৃঢ়তম বিশ্বাস।

অবশেষে পাঠক শ্রীভক্তবৃন্দের শ্রীচরণে বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন এই গ্রন্থের ভাষান্তর-জনিত ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর চোখে দর্শন করে যদি সারনির্যাস আস্বাদন করেন, তা হলে পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে আমরা ধন্যাতিধন্য হবো।

নিবেদন ইতি—
শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপারেণুপ্রার্থী
আদিপুরুষ দাস

বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে নন্দালয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

মঙ্গলাচরণ

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

অজ্ঞতার গভীরতম অন্ধকারে আমার জন্ম হয়েছিল এবং আমার গুরুদেব জ্ঞানের আলোকবর্তিকা দিয়ে আমার চক্ষু উন্মীলিত করেছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্।।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ, যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আমি তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ কবে করতে পারব?

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ।।

আমি আমার গুরুদেবের পাদপদ্মে ও সমস্ত বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীরূপ গোস্বামী, তাঁর অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীল জীব গোস্বামীর চরণকমলে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর, শ্রীবাস ও অন্যান্য পার্ষদবৃন্দের পাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীমতী ললিতা ও বিশাখা সহ শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে।।

হে আমার প্রিয় কৃষ্ণ! তুমি করুণার সিন্ধু, তুমি দীনের বন্ধু, তুমি সমস্ত জগতের পতি, তুমি গোপীদের ঈশ্বর এবং শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমাস্পদ। আমি তোমার পাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে।।

শ্রীমতী রাধারাণী, যাঁর অঙ্গকান্তি তপ্তকাঞ্চনের মতো, যিনি বৃন্দাবনের ঈশ্বরী, যিনি মহারাজ বৃষভানুর দুহিতা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, তাঁর চরণকমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

সমস্ত বৈষ্ণব-ভক্তবৃন্দ, যাঁরা বাঞ্ছাকল্পতরুর মতো সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন, যাঁরা কৃপার সাগর ও পতিতপাবন, তাঁদের চরণকমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।

হে মহাবদান্য অবতার! আপনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনি শ্রীমতী রাধারাণীর অঙ্গকান্তি গ্রহণ করেছেন। আপনি ব্যাপকভাবে শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করছেন। আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।।

উপনিষদে যাঁকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তা তাঁর (এই

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অঙ্গকান্তি। যোগশাস্ত্রে যোগীরা যে পুরুষকে অন্তর্যামী পরমাত্মা বলেন, তিনিও তাঁরই (এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অংশ বৈভব। তত্ত্ববিচারে যাঁকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান্ বলা হয়, তিনিও স্বয়ং এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরই অভিন্ন স্বরূপ। এই জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য থেকে ভিন্ন পরতত্ত্ব আর কিছু নেই।

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।।

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার-স্বরূপা; সুতরাং শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। এজন্য তাঁরা (শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ) একাত্মা। কিন্তু একাত্মা হলেও তাঁরা অনাদিকাল থেকে গোলোকে পৃথক দেহ ধারণ করে আছেন। এখন (কলিযুগে) সেই দুই দেহ পুনরায় একত্রে যুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে প্রকট হয়েছেন। শ্রীমতী রাধারাণীর এই ভাব ও কান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি।

চিরাদদত্তং নিজ-গুপ্তবিত্তং
স্বপ্রেম-নামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে।।

—(চৈ. চ. ম. ২৩/১)

তাঁর প্রেম-নাম-অমৃত-রূপ গুপ্ত বিত্ত, যা এর আগে আর কাউকে দেওয়া হয়নি, তাই অতি উদার স্বভাব যে গৌরসুন্দর সবচাইতে নিম্নস্তরের মানুষদের পর্যন্ত বিতরণ করেছিলেন, তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

গৌরঃ সচ্চরিতামৃতামৃতনিধিঃ গৌরং সদৈব-স্তবে,
গৌরেণ প্রথিতং রহস্য-ভজনং গৌরায় সর্বং দদে।
গৌরাদস্তি কৃপালু-রত্র ন পরো গৌরস্য ভৃত্যো ভবং,
গৌরে গৌরবমাচরামি ভগবন্ গৌর-প্রভো রক্ষ মাং।।

গৌর, সচ্চরিতামৃত সমুদ্র। আমি সর্বদাই গৌরের স্তব করি। গৌর কর্তৃক

গোপী আনুগত্যের রহস্য ভজন বিস্তারিত হয়েছে। গৌরকেই আমি সর্বস্ব দান করব। ধরণীতে গৌর ব্যতীত অধিকতর কৃপালু আর কেউ নেই। আমি গৌরের ভৃত্য হব, গৌরের গৌরব ভক্তি বিধান করব। হে চিরসুন্দর প্রভো গৌর! আমাকে সেবা দান করে, রক্ষা করুন।

মাধুর্য্যৈঃ-মধুভি সুগন্ধি-ভজন স্বর্ণাম্বুজানাং বনম্
কারুণ্যামৃত নির্ঝরৈ-রূপচিতঃ সৎ-প্রেম হেমাচলঃ।
ভক্তাম্ভোধর-ধরণী বিজয়নী নিস্কম্প সম্পাবলী
দৈবো ন কুল দৈবতাম্ বিজয়তাং চৈতন্য-কৃষ্ণ-হরিঃ।।

শ্রবণ-কমল বনে মাধুর্য্যমণ্ডিত সুগভীর ভজন মধুরিমা-দ্বারা প্রস্ফুটিত, সৎপ্রেম বিভূষিত রূপরাশি বিকচিত অত্যুঙ্গ হেমশিখর হতে কারুণ্যামৃতরূপ নির্ঝরধারা প্রবাহিত করে, ভক্তগণ-কণ্ঠোচ্চারিত জয়ধ্বনিতে চরাচর ধরণীতে অবিচলিত প্রেমসম্পদাবলী-সহিত যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি সর্বদেবারাধ্য শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, কলিকল্মষ-হরণকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হরি পরিপূর্ণরূপে জয়যুক্ত হোন্।

আজানুলম্বিত-ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্তনৈক-পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ
বন্দে জগৎ প্রিয়করৌ করুণাবতারৌ।।

—(চৈতন্য ভাগবত-১/১)

যাঁদের বাহুদ্বয় হাঁটু পর্যন্ত প্রসারিত, দেহ স্বর্ণাভ উজ্জ্বল জ্যোতি বিকীরণকারী, চক্ষু পদ্মফুলের পাপড়ির মতোই বিস্তৃত, যাঁরা ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, যুগধর্মের পালক, বিশ্বের মহান ভরণপোষণকারী, ভগবানের মহাবদান্য পরম করুণাময় অবতার ও যাঁরা হরিনাম সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তক—সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি বন্দনা করি।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।

হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।।

—(চৈ. চ. আ. ১/৪, বিদগ্ধ মাধব-১/২)

পূর্বে যা অর্পিত হয়নি, উন্নত ও উজ্জ্বল রসময়ী নিজের সেই ভক্তি-সম্পদ দান করার জন্য যিনি করুণাবশত কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন, স্বর্ণ থেকেও সুন্দর দ্যুতিসমূহ দ্বারা সমুদ্ভাসিত সেই শচীনন্দন শ্রীহরি সর্বদা তোমাদের হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিত হোন্।

নিম্নলিখিত তিনটি পদ শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের "শ্রীশ্রীপ্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকা"য় অন্তর্গত ১০ম গীতের ১২-১৪ নং স্তবক।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, রতি-মতি ভাবে ভজ
প্রেম-কল্পতরু-বরদাতা।
শ্রীব্রজরাজনন্দন, রাধিকা-জীবনধন,
অপরূপ এই সব কথা।।

ওহে ভাই, সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণে রতি মতি রেখে তাঁর ভজন কর। তিনি স্বয়ং প্রেমকল্পতরু এবং স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিতে সেই প্রেম-কল্পতরুর মালী হয়ে প্রেমফল প্রদান করছেন। তিনি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীরাধার প্রাণনাথ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই। এ সব অতি অদ্ভুত কথা।

নবদ্বীপে অবতরি', রাধাভাব অঙ্গীকরি',
তাঁর কান্তি অঙ্গের ভূষণ।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষী', শচীগর্ভে পরকাশি',
সঙ্গে লঞা পারিষদগণ।।

শ্রীরাধিকার প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করে এবং তাঁর ভাবকান্তিকে অঙ্গের ভূষণ করে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনটি বিষয়ে লোভবশতঃ শ্রীরাধার ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি যখন এ ভাবে আবির্ভূত হলেন তখন তাঁর পার্ষদেরাও তাঁকে অনুসরণ করে এ ধরনীতে আবির্ভূত হলেন।

গৌরহরি অবতরি', প্রেমের বাদর করি',
সাধিলা মনের তিন কাজ।
রাধিকার প্রাণপতি, কিবা ভাবে কাঁদে নিতি,
ইহা বুঝে ভকত-সমাজ।।

স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীরাধার গৌরকান্তি ধারণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হয়ে বিশ্বের আকাশে প্রেমের বাদল উদয় করিয়ে প্রেমধারা তথা প্রেমবন্যায় বিশ্বের সকলকে নিমজ্জিত করেছেন। তৎপরে তিনি তাঁর মনের তিনটি কামনা পূর্ণ করেন। সেই আনন্দঘন বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করে শ্রীরাধার প্রাণপতি হয়েও শ্রীরাধার ভাবে কিভাবে অহর্নিশি রোদন করেছেন, তা কেবল রসিক ভক্তগণই যথামতি অনুভব করে থাকেন।

উত্তম-অধম, কিছু না বাছিল, যাচিয়া দিলেক কোল।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গ, হৃদয়ে ধরিয়া বোল।।
ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সেই হয় আমার প্রাণ রে।।

কে উত্তম আর কে অধম, কে যোগ্য আর কে অযোগ্য ব্যক্তি—এসব বিচার না করে মহাবদান্য অবতার শচীনন্দন গৌরহরি সবাইকে কোলে ধারণ-পূর্বক প্রেমালিঙ্গন করে কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, "আমার বক্ষে এস, আমার বক্ষে এস"। বৈষ্ণব কবি শ্রীল প্রেমানন্দ দাস ঠাকুর অনুনয় করে বলছেন, আপনারা সবাই শচীনন্দন গৌরহরিকে হৃদয়-কন্দরে ধারণ-পূর্বক সতত মধুর কৃষ্ণনাম কীর্তন করুন।

গৌরাঙ্গ ভজন কর! গৌরাঙ্গের কথা বল! দয়া করে গৌর-নাম লও! যিনি গৌরাঙ্গের ভজন করেন তিনি আমার জীবন-সর্বস্ব।

যস্যৈব পাদাম্বুজ-ভক্তিলভ্যঃ
প্রেমাভিধানঃ পরমঃ পুমর্থঃ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গল-মঙ্গলায়
চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে।।
—(শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত—৯)

একমাত্র যাঁর পাদসরোজে অনন্যভক্তি হতেই পরম-পুরুষার্থ প্রেম লাভ হয়, তুমি সেই জগন্মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ চৈতন্যচন্দ্র, তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

আনন্দ-লীলাময়-বিগ্রহায়
হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেম-রসপ্রদায়
চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে।।
—(শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত-১১)

সেই আনন্দ-লীলা-রসময়-মূর্তি, কনক-নিভ কমনীয় দিব্যকান্তি, অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বল-প্রেমরস প্রদানকারী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

যন্নাপ্তং কর্মনিষ্ঠৈর্ন চ সমধিগতং যত্তপোধ্যানযোগৈ-
র্বৈরাগ্যৈস্ত্যাগতত্ত্বস্তুতিভিরপি ন যত্তর্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ।
গোবিন্দপ্রেমভাজামপি ন চ কলিতং যদ্রহস্যং স্বয়ং তন্-
নাম্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নৌমি গৌরম্।।
—(শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত-৩)

কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যা লাভ করতে পারেন না; তপস্যা, ধ্যান ও অষ্টাঙ্গ-যোগের প্রভাবে যা কেউ জ্ঞাত হতে পারেন না; বৈরাগ্য, কর্মত্যাগ, তত্ত্বজ্ঞান ও স্তবপাঠ প্রভৃতি দ্বারাও যা কেউ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন না, অধিক কি শ্রীগোবিন্দ-প্রেম সেবাপরায়ণ ভক্তগণেরও যা অলভ্য (অর্থাৎ পরকীয় রসবিচারচাতুর্য-হীন, স্বকীয়-প্রেমসেবারত নিম্বার্ক সম্প্রদায়ী ভক্তগণেরও যা অলভ্য), সেই গূঢ়প্রেম যাঁর আবির্ভাবে নামকীর্তন দ্বারাই স্বয়ং প্রকাশিত হয়েছিল, সেই গৌরসুন্দরকে আমি স্তব করি।

লীলা পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

কৃষ্ণ কৃপাশ্রীমূর্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীমৎ
গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ
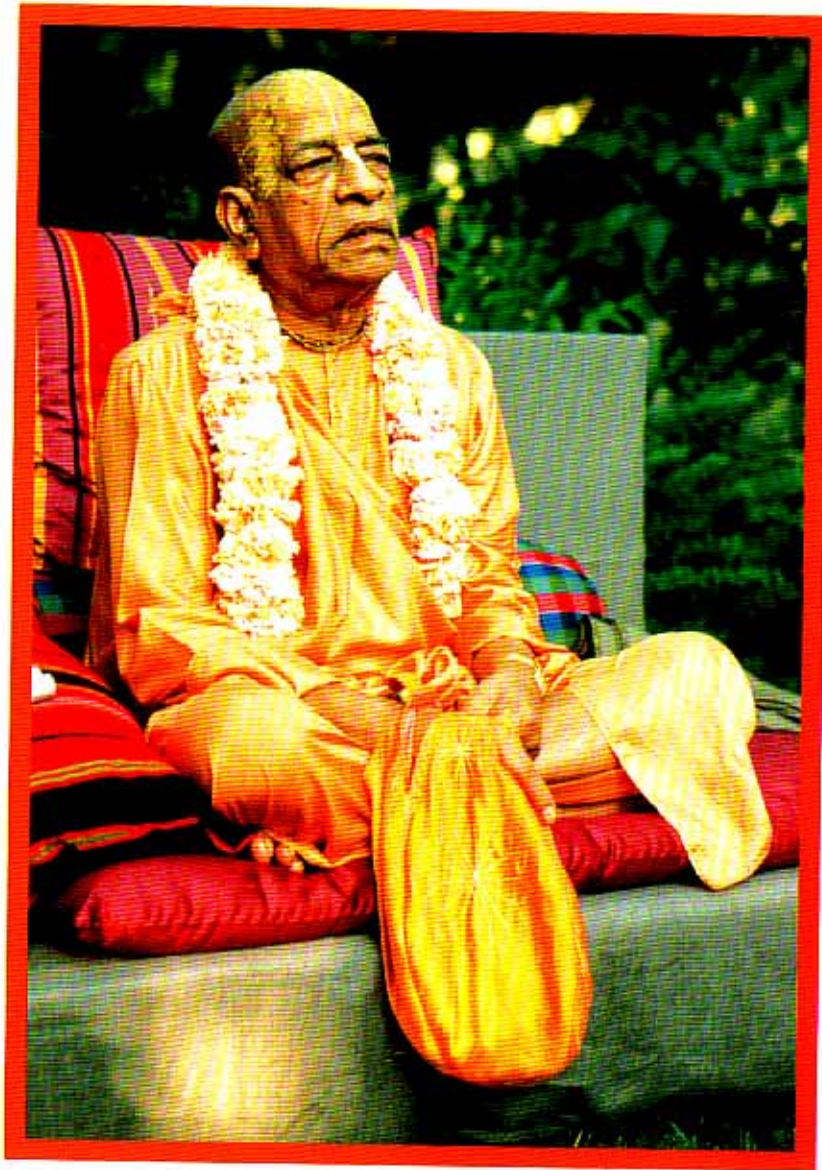
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্তস্বামী প্রভুপাদ
প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম মহোৎসব

শ্রীমতী রাধারাণী স্বপ্নে এক অপূর্ব সুন্দর দিব্য কিশোর দ্বিজমণি
গৌরকান্তি যুক্ত গৌরাঙ্গ বিগ্রহ এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রেম সমুদ্রে বিহার
করছে তা দেখলেন এবং সেই দিব্য স্বপ্নের কথা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন।

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি।।

একদা শ্যামসুন্দর তাঁর সখা মধুমঙ্গল সহ নববৃন্দাবনে প্রবেশমাত্রই নিজের এক সুন্দর বিগ্রহ দেখতে পেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে সত্যভামারূপী শ্রীরাধা সেই নববৃন্দাবনস্থশ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহকে পূজা করতে দেখলেন।
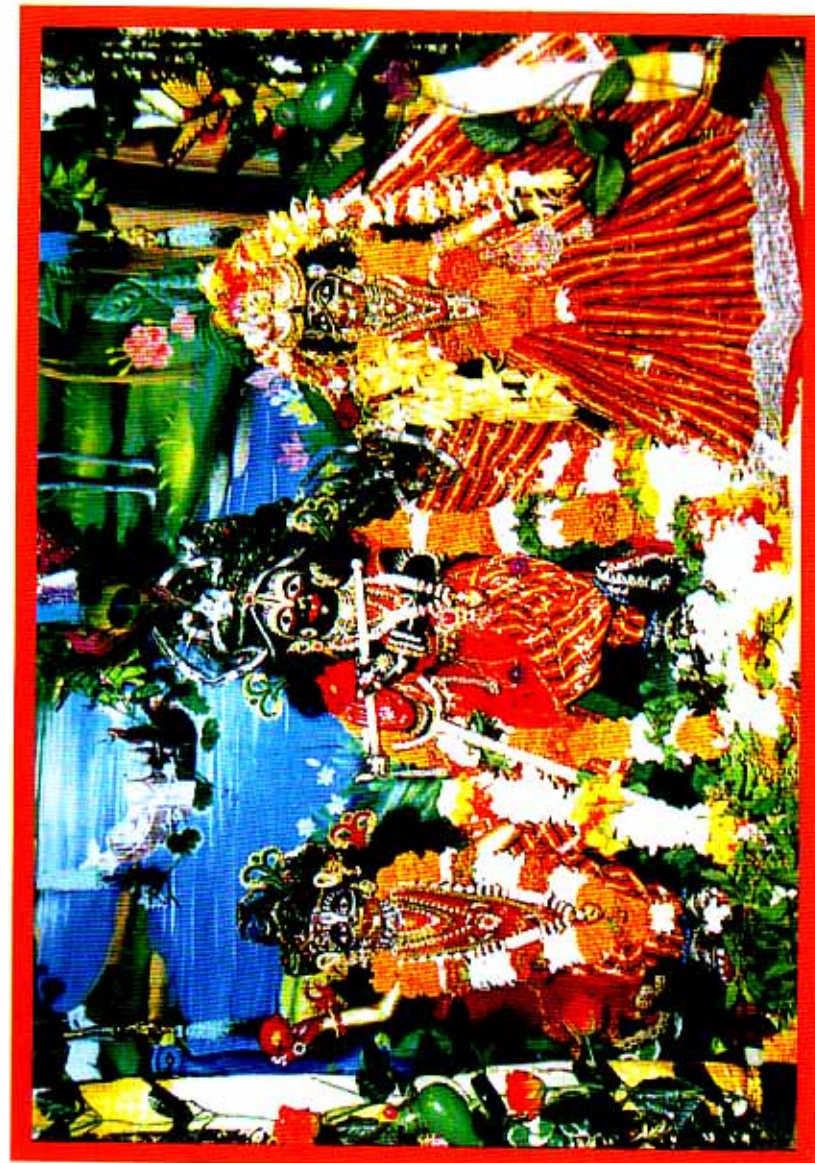
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ জীউ
ইস্‌কন, ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা

শ্রীশ্রীরাধাগোপাল জীউ, গদেই গিরি,উড়িষ্যা

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

গত ৩১শে আগষ্ট ১৯৯৩ সালে প্রায় সর্বত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব পালন করা হয়েছিল। এই উৎসব উপলক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বহু লেখা সব খবরের কাগজে বার হয়েছিল। উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত 'সমাজ' নামক খবরের কাগজে এক 'বেদ-গবেষণা-অনুষ্ঠানে'র একজন সদস্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন তার কিছু অংশ এখানে ব্যক্ত করা হলো। উক্ত খবরের কাগজে তিনি লিখেছিলেন, কৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম সম্বন্ধে যে-সব কথা শাস্ত্রে লেখা আছে তা-সব কল্পনা-প্রসূত, বাস্তব সত্য নয় ইত্যাদি। আহা! আধ্যক্ষিকদের কি বিচার।

এ সব লেখা দেখে বাস্তবিকপক্ষে খুব দুঃখ লাগে। শ্রীমদ্-ভাগবতাদি শাস্ত্রগুলিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম (বা লীলা) সম্বন্ধে যা-সব লেখা আছে, তা-সব বিশুদ্ধ সত্য। তাতে কিছু ভুলভ্রান্তি নেই। তা-সব বিশুদ্ধ প্রমাণমূলক লেখা, তা কল্পনাপ্রসূত নয়। কিন্তু মূর্খ ব্যক্তি বা অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা সেই সব কথা বুঝতে পারে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর লীলা বোঝাটা এতো সহজ কথা নয়। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।।

—(গী. ৭/২৫)

অর্থাৎ—"আমি নির্বোধ ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদের কাছে কখনও প্রকাশিত হই না। তাদের কাছে আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকি। তাই, তাঁরা আমার জন্ম-মৃত্যুরহিত অব্যয় স্বরূপকে জানতে পারে না।" আবার শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।।

— (গী. ৯/১১)

অর্থাৎ—"আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হই, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং তারা আমাকে সর্বভূতের মহেশ্বর বলে জানে না।"

মূর্খ ব্যক্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে তার মতো একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে থাকে। পূর্ব-জন্মের পুণ্যকর্মের ফল-স্বরূপ এ জন্মে সেই ব্যক্তি অর্থাৎ বেদ গবেষণাকারী পণ্ডিত অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করতে পারেন, কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তার ধারণা স্বল্প জ্ঞানের পরিচায়ক। এজন্য ভগবান কৃষ্ণ তাকে মূঢ় বলে অভিহিত করেছেন, কারণ মূর্খরাই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে থাকে। তারা একথা জানে না যে, শ্রীকৃষ্ণের শরীর পূর্ণজ্ঞান ও আনন্দের প্রতীক, তিনি সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মালিক এবং তিনি সকলকে মুক্তি প্রদান করতে পারেন। উপরন্তু তারা একথাও জানে না যে, পরম পুরুষ ভগবানের আবির্ভাব এ ভৌতিক জগতে কেবল তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির পরিপ্রকাশ। তিনি হচ্ছেন ভৌতিক শক্তির প্রভু। মূর্খরা একথাও বুঝতে পারে না যে, পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে কেমন করে একটি ক্ষুদ্র অণু থেকে আরম্ভ করে বিরাট বিশ্বরূপের নিয়ন্ত্রণকারী হতে পারেন। সর্ববৃহৎ ও সর্বক্ষুদ্রের ধারণা মূর্খদের ধারণার বহির্ভূত।

শ্রীকৃষ্ণ যখন এ ধরাধামেতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি যে সকল আশ্চর্যজনক কার্যকলাপ প্রদর্শন করেছিলেন, তা কোনও মানবের পক্ষে প্রদর্শন করা কখনই সম্ভব নয়। যখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতামাতা বসুদেব ও দেবকীর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু পিতামাতার প্রার্থনা শোনার পর তিনি নিজেকে একজন সাধারণ শিশুরূপে পরিবর্তন করেছিলেন। এটা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব কি ? যেহেতু সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয়, তাই আধ্যক্ষিক (বা মূঢ়)-রা বলে থাকে এটা কল্পনাপ্রসূত। তারা ভগবান্ ও তাঁর লীলা বুঝতে পারে না। ভগবান্ ও তাঁর লীলা কেমন করে তত্ত্ব-বিচারানুসারে বুঝতে হয়, তা আমরা আলোচনা করবো। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলেছেন—

> জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
> ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।। —(গী. ৪/৯)

অর্থাৎ—"হে অর্জুন, যিনি আমার জন্ম (আবির্ভাব) ও কর্মের বিশুদ্ধভাব যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর এ শরীর ত্যাগ করার পর পুনরায় এ ভৌতিক জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার দিব্য শাশ্বতধাম প্রাপ্ত হন।"

যিনি পরম পুরুষ ভগবানের আবির্ভাব তত্ত্ব বুঝতে পারেন তিনি ভৌতিক বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যান। বেদে বর্ণিত হয়েছে **"তম্ এব বিদিত্বাদি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"** কেবল পরমপুরুষ ভগবানকে জানতে পারলেই ব্যক্তি জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে মুক্ত হয়ে যান এবং মুক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উপস্থিত হন। এ ছাড়া আর অন্য কোনও পন্থা নেই।

যে ব্যক্তি কৃষ্ণকে পরম পুরুষ ভগবান হিসাবে জানে না সে নিশ্চিতভাবে তমোগুণাচ্ছন্ন হয়েছে বলে বুঝতে হবে। যার ফলে সে মুক্তিলাভ করতে পারবে না। মধুর বোতলের বাইরে চাটা যা, পার্থিব পণ্ডিতদের অর্থাৎ তথাকথিত বেদবাদীদের ভগবান সম্বন্ধে বাগাড়ম্বর-যুক্ত কথা বলা তা। এ প্রকার পার্থিব পণ্ডিতগণ বা দার্শনিকগণ ভৌতিক জগতে খুব খ্যাতি সম্পন্ন হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা মুক্তির অধিকারী হতে পারেন না। কারণ তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতে পারেন নি। এ প্রকাব পার্থিব পণ্ডিত বা তথাকথিত বেদবাদীগণ ভগবানের এক শুদ্ধ ভক্তের কৃপালাভ করতে না পারলে কখনই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতে সক্ষম হবেন না কি মুক্তিলাভ করতে পারবেন না। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৪/৯) শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যিনি আমার জন্ম ও কর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানতে পারেন কেবল তিনিই আমাকে বুঝতে পারেন ও মুক্তিলাভ করতে পারেন। তবে প্রশ্ন হতে পারে ভগবৎ তত্ত্ব জানার বা ভগবানকে জানার উপায়টা কি? আবার পার্থিব পণ্ডিতগণ বা আধ্যক্ষিকগণ কেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন না?

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে বলা হয়েছে—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বে শ্রীবলদেব প্রথমে দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

> বাসুদেব কলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্।
> অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।।
> —(ভা. ১০/১/২৪)

অর্থাৎ—"ভগবান্ বাসুদেবের প্রথম অংশ (প্রকাশ বিগ্রহ) শ্রীসঙ্কর্ষণ, দেশকাল ও সীমাদিরহিত বলে 'অনন্ত' নামে কীর্তিত; নানা অবতারসমূহের প্রকটকারী বলে যিনি অংশে শেষাখ্য সহস্রবদন, সেই স্বতঃপ্রকাশ স্বয়ং মূলসঙ্কর্ষণ বলদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবনেচ্ছায় আগেই আবির্ভূত হন্।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হবেন বলে শ্রীবলদেব প্রথমে দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়ে শয্যাসনরূপ নিজের অংশ শেষকে সেখানে স্থাপন করে স্বয়ং নিজের মাতা রোহিণীর গর্ভে প্রবিষ্ট হলেন।

উক্ত বিষয় হতে জানা গেল যে, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কথা বুঝতে হলে প্রথমে শ্রীবলদেবকে জানতে হবে। শ্রীবলদেব মর্যাদা মার্গের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ সন্ধিনী-শক্তির ঈশ্বর। শ্রীবলদেবের কৃপা ব্যতীত কেউ শ্রীরাধাগোবিন্দের কৃপা লাভ করতে পারে না, কিংবা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কথা বুঝতে পারে না। জীবের হৃদয়ে শ্রীবলদেবের আবির্ভাব ব্যতীত কখনো শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হতে পারে না।

শ্রীরোহিণীনন্দন বলদেবই সাক্ষাৎ শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু। আর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অভিন্ন প্রকাশ বিগ্রহ হচ্ছেন শ্রীগুরুদেব। সেই গুরু-কৃপা ব্যতীত হৃদয় কখনই নির্মল বা অন্যাভিলাষ কর্ম-জ্ঞান-যোগাদির মলিনতারহিত হতে পারে না। নির্মল হৃদয় বা বিশুদ্ধ সত্ত্ব ব্যতীত অন্য কোনও ক্ষেত্রে কৃষ্ণাবির্ভাব উপলব্ধির বিষয় হয় না।

শ্রীবলদেবই সন্ধিনী শক্তির ঈশ্বর রূপে জীবকে কৃষ্ণ-পাদপদ্মের সন্ধান প্রদান করেন। শ্রীবলদেবের কৃপাবল ব্যতীত জীব নিজের বলে বা শক্তিতে কখনই 'দূরত্যয়া' মায়াকে জয় করে মায়াধীশ কৃষ্ণের পাদপদ্ম স্পর্শ করতে পারে না, এমনকি কৃষ্ণ-পাদপদ্মের কোনও সন্ধান পেতে পারে না।

অতএব কৃষ্ণাবির্ভাব বিষয়ে শ্রীবলদেবের কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল। শ্রীবলদেবের অভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবই হচ্ছেন সেই বলদেবকৃপা প্রদাতা। আধ্যক্ষিক জ্ঞান প্রয়াস সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে শ্রীবলদেবের অভিন্ন প্রকাশ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাপন্ন না হলে প্রাকৃত অস্মিতা (অন্যভাবনা)-র অভিমান দূর হবে না। এজন্য প্রাকৃত পণ্ডিতেরা বা আধ্যক্ষিকেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। তাই কোনও প্রকার

আধ্যক্ষিকদেরকে বা প্রাকৃত পণ্ডিতদেরকে বা তথাকথিত বেদবাদীদেরকে (যারা বেদরূপী মৌ বোতলের বাইরে চাটে) কৃষ্ণ-জন্ম-মহোৎসবে যোগদান করতে দেবেন না।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন অখিল রসামৃত মূর্তি। তাঁর অপ্রাকৃত সেবারসের আশ্রয় বিগ্রহগণের (অর্থাৎ প্রেমিক ভক্ত বা শ্রীগুরুদেবের) আনুগত্য ব্যতীত কেউ কৃষ্ণ-পাদপদ্মের প্রকটোৎসবে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করতে পারে না। সুতরাং তাই আশ্রয় বিগ্রহের কৃপা (অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের কৃপা) আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়। এ হচ্ছে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জানবার একমাত্র উপায়। শ্রীবলদেবের কৃপাবল অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের কৃপালাভ করতে না পারলে আধ্যক্ষিক পণ্ডিতেরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতে পারবে না। আধ্যক্ষিকগণ যে-পর্যন্ত এটা লাভ না করছে, সে-পর্যন্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাদের পক্ষে কল্পনার বস্তু হয়ে থাকবে।

(হরিবোল)

শ্রীবলদেবের বল

প্রতিবছরের মতো এ বছরেও আমরা শ্রীশ্রীবলদেবজীর পবিত্র আবির্ভাব তিথি উৎসাহের সঙ্গে পালন করছি। পবিত্র শ্রাবণ পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীবলদেবজীর আবির্ভাব। এই শ্রীবলদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এক অবতার। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বর্ণনানুসারে যখন ধর্মের গ্লানি দেখা যায় তখন অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন সাধু বা ভক্তদেরকে উদ্ধার তথা আনন্দ দেওয়ার জন্য ও দুষ্ট প্রকৃতি বিশিষ্ট অসুরদেরকে বিনাশ করার জন্য তথা ধর্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে ভগবান নিজেই এই ধরাধামেতে আবির্ভূত হন। কখনো কখনো তিনি নিজেই আসেন, আবার কখনো কখনো তাঁর অংশ বা কলাস্বরূপ অবতারদেরকেও প্রেরণ করেন। যদিও ভগবানের এই নিত্যলীলা সর্বদাই চলছে, তথাপি এই ভূলোকে গত দ্বাপর যুগে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্ব-স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন তাঁর অভিন্ন অংশ শ্রীবলদেবজী (শ্রীবলরামজী)-ও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এ কথাও শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে শ্রীবলরাম আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই বলদেবের মহিমা অপার। তাঁর চিৎ বলে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও সংহার হচ্ছে। তাঁর কৃপাবল না মিললে সবকিছু স্থাণু-জড়তে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। আজকে আমরা সেই বলদেবের বল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। এই বলদেব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্।
অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।।

—(ভা. ১০/১/২৪)

অর্থাৎ—"যিনি ভগবান্ বাসুদেবের প্রথম অংশ (প্রকাশ বিগ্রহ) শ্রীসঙ্কর্ষণ, দেশ-কাল ও সীমাদি রহিত বলে যিনি—'অনন্ত' নামে কীর্তিত, নানা অবতার সমূহের প্রকটকারী বলে যিনি অংশে শেষাখ্য সহস্রবদন, সেই স্বতঃপ্রকাশ স্বয়ং মূলসঙ্কর্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবনেচ্ছায় অগ্রেই আবির্ভূত হন্।"

শ্রীবলদেবের নিকটে মহাপুরুষের যাবতীয় চিহ্ন শোভা পেয়েছিল। তাঁর আবির্ভাবে সারা আকাশ-মণ্ডল আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সম্পদ-সুখে গোপগোপীরা পরিপূর্ণ হলেন। এই শ্রীবলদেব সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ লীলার সহায়ক। শ্রীবলদেব স্বয়ং মূল সঙ্কর্ষণরূপে সর্বক্ষণ মথুরা ও দ্বারকাতে কৃষ্ণের সেবা করেন। আবার সেই বলদেব 'শেষ' নামেও অভিহিত। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্দে যোগমায়ার প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ—

দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয়।।

—(ভা. ১০/২/৮)

—"দেবকীর উদরে আমার দ্বিতীয় স্বরূপ বা আশ্রয় সঙ্কর্ষণ, যিনি (অংশে) শেষ সংজ্ঞায় সজ্ঞিত হন তাঁকে অক্লেশে আকর্ষণ করে অন্যের অলক্ষ্যে রোহিণীর উদরে সংস্থাপন কর।"

এটাও স্বয়ং ভগবান দ্বারা স্বীকৃত যে, তাঁর অংশ হচ্ছেন বলদেব। তিনিই শেষ নামে অভিহিত। এই শেষ নিজের অংশদ্বারা পৃথিবী ধারণ করেন। তাঁর বল অপার। গুণত্রয়রহিত বলে অনন্ত নামে অভিহিত এই শেষ বা অনন্তদেবের সহস্র ফণারূপ স্বীয় ধামেতে এক অংশে একটি সর্ষের ন্যায় সমগ্র বিস্তৃত ভূমণ্ডল অবস্থিত। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি চিত্রকেতুর স্তবোক্তিতে দেখতে পাওয়া যায়—

ভূমণ্ডলং সর্ষপায়তি যস্য মূর্ধ্নি
তস্মৈ নমো ভগবতেঽস্তু সহস্রমূর্ধ্নে।।

—(ভা. ৬/১৬/৪৮)

অর্থাৎ—"যাঁর শিরোদেশে বিস্তৃত ভূমণ্ডল সর্ষপের ন্যায় বিরাজমান, সেই সহস্র-শীর্ষ ভগবান্ অনন্তদেবকে প্রণাম। এই ভূমণ্ডলের আকার পঞ্চাশ কোটি যোজন হলেও এটা মহাবিক্রমশালী, বলবান অনন্তদেবের শিরের ওপর একটি সর্ষের ন্যায় অবস্থান করে। সেই অনন্তদেবের অপরিমিত বলবিক্রম কেই-বা কল্পনা করতে পারে ?

সেই বলরাম বা বলদেব মূল সঙ্কর্ষণরূপে কৃষ্ণসেবায় তৎপর। শেষ বা

অনন্তরূপ মূর্তিতে নিরন্তর অনন্ত বদনে কৃষ্ণগুণগান করেন ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-সকল শিরেতে ধারণ করে থাকেন। আবার তিন পুরুষাবতার-রূপে তিনি বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহারাদি করেন। প্রথম পুরুষাবতার কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণু হচ্ছেন প্রকৃতির অন্তর্যামী পুরুষ। ভৌতিক সৃষ্টির ইচ্ছা জাগ্রত হওয়ার মাত্রেই এই মহাবিষ্ণু কারণ সাগরে শয়ন করা অবস্থায় তাঁর লোমকূপ হতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়। তাঁর চিৎ- বলের আশ্রয়েই মহাবিষ্ণু এই ব্রহ্মাণ্ডগুলি সৃজন করার সামর্থ্য লাভ করে থাকেন। কেবল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করা নয়, ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডগুলির মধ্যে সমস্ত জীবজগত সৃষ্টি করেন তাঁর দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী রূপে যাঁর নাভিপদ্ম হতে সৃষ্টিকর্ত্তা বা বিধাতা ব্রহ্মার সৃষ্টি। এ সব কেবল তাঁর কৃপাশক্তির রূপান্তর মাত্র। শূন্য ব্রহ্মাণ্ডগুলি জীবজগতে পূর্ণ হলেও সেই মূল সঙ্কর্ষণের অন্য এক বিস্তার যিনি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হতে প্রকাশিত হন তিনিই হচ্ছেন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। এই ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু ক্ষীর সমুদ্রে অবস্থান করেন এবং তিনিই হচ্ছেন সকল জীবের অন্তর্যামী, পরমাত্মা পুরুষ। এই ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণু পরমাত্মারূপে সমগ্র সৃষ্ট জগতের অণু, পরমাণুর মধ্যে অবস্থান করে তাদেরকে ক্রিয়াশীল করান। এভাবে এই তিন পুরুষাবতার প্রকৃতি সহ বিলাস করেন। যদিও তিন পরুষাবতার প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ, তথাপি প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের কোন স্পর্শ গন্ধ নেই। মহা সঙ্কর্ষণই সমস্ত জীব শক্তির আশ্রয়।

'জীব'- নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।
মহাসঙ্কর্ষণ—সব জীবের আশ্রয়।।

—(চৈ.চ. আদি ৫/৪৫)

এই মহাসঙ্কর্ষণ বা বলদেবের অমিত (অপরিমিত) বল-বিক্রমের প্রমাণ শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধে প্রদত্ত হয়েছে—

গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোকরমণাদ্বলভদ্রং বলোচ্ছ্রয়াৎ।।

—(ভাঃ ১০/২/১৩)

অর্থাৎ—" গর্ভ-সঙ্কর্ষণ কারণে রোহিণীনন্দন এই ভূতলে 'সঙ্কর্ষণ' নামে অভিহিত হবেন। আবার গোকুলবাসী লোকসমূহের আনন্দবিধান করার জন্য

'রাম' নামে এবং বলাধিক্যের জন্য সন্ধিনী শক্তির শক্তিমদ্ বিগ্রহত্ব নিবন্ধন 'বলভদ্র' নামে কীর্তিত হবেন।"

অতএব এই বলরাম যেমন সৃষ্টি কার্যে মহাপুরুষের অবতার সম্পাদন করেন, তেমনি আদি চতুর্ব্যূহ দ্বারকা ও মথুরায় মূলসঙ্কর্ষণ স্বরূপে এবং দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ পরব্যোম বৈকুণ্ঠে এই মহাশয় মহাসঙ্কর্ষণ-রূপে শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায়তা করেন।

এই বলদেব বা মূল সঙ্কর্ষণ বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ এবং পাতালে সঙ্কর্ষণাবেশাবতার—তিনি সাধারণতঃ সঙ্কর্ষণ নামে খ্যাত। এই শেষোক্ত সঙ্কর্ষণ বা শ্রীশেষই তাঁর সহস্র ফণা-বিশিষ্ট মস্তকের এক অংশে একটি সর্ষের মতো পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন। এটির বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। তবে বলার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, এই সঙ্কর্ষণাবতার শেষ মহাবাগ্মী। সনকাদি মুনিগণ তাঁর শ্রীমুখ থেকে ভাগবত শ্রবণ করেন। এটা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, হরি কীর্তনকারিগণের বাগ্মিতার মূল কারণ এই মহাবাগ্মী শেষ প্রভু। আবার কৃষ্ণেতর বিষয় যে বাগ্মিতা এ জগতে বিদ্যমান, তাও শ্রী শেষ প্রভুর বাগ্মিতা শক্তির হেয় প্রতিফলন মাত্র। কি চিৎ কি অচিৎ সমগ্র সৃষ্টির মূল কারণ হলেন এই বলদেব। তাঁর কৃপাবলেই সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে।

মানুষের হৃদয়-দৌর্বল্য-রূপ অনর্থের বিনাশপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রতি উৎপাদন করেন বলে মূল সঙ্কর্ষণ প্রভু 'বলরাম' নামে খ্যাত। সাধু, শাস্ত্র ও গুরু বাক্যের সিদ্ধান্ত এই যে, মর্যাদা মার্গের মূল আশ্রয় বিগ্রহ সন্ধিনী শক্তির প্রভু শ্রীবলরামের কৃপা ব্যতীত জীবের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রতি রতি উৎপাদিত হওয়া অসম্ভব। এজন্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গেয়েছেন—

"হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাই পায়।।"

শ্রীবলরাম সন্ধিনী শক্তির ঈশ্বর সূত্রে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান দেন। এ কারণে এটা জেনে রাখতে হবে যে জীব নিজের বলে কখনো শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পেতে পারবে না। নিজের বল প্রয়োগের দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তির যে অবৈধ চেষ্টা তার নাম "আরোহবাদ"। কিন্তু এ জ্ঞান কেবল অবরোহবাদ পন্থায় গুরু-শিষ্য পরম্পরা ক্রমে অবতরণ করে থাকে। আরোহবাদ মূলেতে ব্রহ্মানুসন্ধান জীবকে

অন্ধকার রাজ্যে বা নির্বিশেষ রাজ্যে পতিত করায়। কিন্তু মর্যাদা মার্গের মূল আশ্রয় বিগ্রহ বা ভগবান কৃষ্ণের প্রথম বিস্তৃতাংশ শ্রীবলদেব প্রভুর আনুগত্যে যে আশ্রয়াবলম্বন শুদ্ধ জীবাত্মার মূল বিষয় বিগ্রহের অনুশীলন, তাই প্রকৃত পক্ষে আমাদেরকে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষের সন্ধান প্রদান করতে পারেন। শ্রীবলদেবজীর মতো মহাবলী আর কেউ নেই। পূর্বে শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধের শ্লোক উদ্ধার করে আমরা বলেছি বলাধিক্যবশতঃ তাঁর নাম বলভদ্র। তিনি নিখিল চিৎবলের মূল কারণ। তবে আমরা এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করে দেখতে পাই যে তাঁর অংশের অংশ কলা, কলার কলা জগতে যে বলের আদর্শ প্রদর্শন করেছেন , তা কোনও মর্ত্যলোকের জীব এমনকি অতি মর্ত্য পুরুষগণও ধারণা করতে পারবেন না। শ্রীবলদেবের বল বিষয়ে আমরা একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে জানতে পারব যে, তাঁর অংশ বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ, মহাসঙ্কর্ষণ হতে কারণার্ণবশায়ী, কারণার্ণবশায়ী হতে সমষ্টি বিষ্ণু দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী ও গর্ভোদকশায়ী হতে রাম, নৃসিংহ, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, হয়শীর্ষ, পরশুরাম, প্রলম্বারি বলরাম, কল্কি প্রভৃতি যে সমস্ত লীলাবতার বা কল্পাবতার আবির্ভূত হন, তাঁদের বল সম্পর্কে কল্পনা করতে কেউ সক্ষম নন। ত্রিলোকে এমন কোন পুরুষ নেই যিনি কি মহাসঙ্কর্ষণ হতে আগত এই অংশ বা কলা বা কলার কলা-র শক্তি বা চিৎ বলের ইয়ত্তা অর্থাৎ পরিমাপ করতে সক্ষম হবেন।

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের কথা বিচার করলে আমরা জানতে পারি যে, শ্রীমৎস্যদেব এই মন্বন্তরে মহাবলশালী হয়গ্রীব নামক দৈত্যকে বিনাশ করেছিলেন। কারণ এই দৈত্য বেদ অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। এই কারণে বেদের স্রষ্টা স্বয়ং মহাসঙ্কর্ষণের মাধ্যমে এই মৎস্যাবতারে অপরিমিত বল প্রদর্শন করে অসুরটাকে বিনাশ করেছিলেন ও বেদকে রক্ষা করেছিলেন। এজন্য এই মৎস্যাবতার সাধারণ মৎস্য ছিলেন না। তিনি এই অবতারে অমিত বল, বিক্রম প্রদর্শন করে নিজের চিৎ-বলের সঙ্কেত প্রদান করেছেন। আবার সেই ভগবান সঙ্কর্ষণ দেবতা ও অসুরদেব দ্বারা সমুদ্র মথন করার মসয় মন্দর পর্বতটি মথনদণ্ড রূপে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু এত বড় পর্বতটা সমুদ্রের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় মথনদণ্ডরূপে ব্যবহার করা দুরুহ ব্যাপার ছিল। তাই সে সময় স্বয়ং ভগবান সঙ্কর্ষণ বা অনন্তদেব শ্রীকূর্ম অবতার গ্রহণ করে অনায়াসে নিজের পিঠে

মন্দরাচল ধারণ করে তিনি মহাবলের পরিচয় প্রদান করেছেন। এটা কোনও সাধারণ প্রাণীর পক্ষে সম্ভবপর নয়। এটা সেই বলদেবের অদ্ভুত চিৎ-বলের প্রকাশ মাত্র।

আবার প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে শ্রীবরাহদেব রূপে স্বয়ং মহাসঙ্কর্ষণ বা অনন্তদেব রসাতলগামিনী পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন। কেবল তাই নয় ষষ্ঠ-চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রলয়ার্ণবের মধ্যে আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষ যেকি নিজের ভৌতিক বলবীর্যের বশবতী হয়ে এই পৃথিবীটাকে রসাতলগামী করেছিল, তাকে শ্রীবরাহরূপে স্বীয় দন্তাগ্রে বিদারণ করেছিলেন। একারণে এটা স্পষ্ট অনুমেয় যে, ভৌতিক জগতে যে যতই বলশালী হোক না কেন, সে শ্রীবলদেবের চিৎবলকে নিজের বিদ্যা-বুদ্ধিবলে কল্পনা করতে পারবে না, এটা স্বয়ং মহাবলী বলদেবের চিৎবল। সেই সঙ্কর্ষণ বলদেব, যদি তাঁর কৃপাবল আকর্ষণ করে নেবেন তাহলে আধ্যক্ষিক জ্ঞান বলদৃপ্ত মিথ্যা বিদ্যা, ধন, কুলের দ্বারা মদান্বিত ব্যক্তিদের সকল অহঙ্কার মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যাবে। তখন ব্যক্তি একটি ক্ষুদ্র তৃণটাকেও স্থানচ্যুত করতে পারবে না।

তারপর আমরা দেখতে পাই যে, ত্রেতাযুগে তিনি শ্রীরাম অবতারে নিজের সমস্ত মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে বলশালী দেবতাবৃন্দের জয়ী দশানন (রাবণ)-কে বধ করেন। সেই রাবণ নিজের মন-কল্পিত রথেতে বসে কতই না যোজনা করছিল। সমস্ত অসুরদেরকে স্বর্গ-গমণের জন্য স্বর্গে সিঁড়ি বাঁধার যোজনাও করেছিল। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার সেই দম্ভ, দর্প, অভিমানের প্রতীক জড় শরীরটি শ্রীরামের বাণে ভূলুণ্ঠিত হল। তাই মহাবলী বলদেবের এ হচ্ছে এক চিৎবলের প্রকাশ।

অন্য একটি ঘটনা যা শ্রীমদ্ ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে তা অনুধ্যান করলে আমরা জানতে পারি যে, ত্রিপুর বিজয়ী হিরণ্যকশিপু সমগ্র জগতটাকে নিজের ক্রীড়াভূমি মনে করে তার প্রধান হরি-ভক্তিপরায়ণ পুত্র পাঁচ বছরের বালক ভক্ত প্রহ্লাদকে কতই না কায়ক্লেশ প্রদান করেছিল। কিন্তু বলদেবের অংশাংশ রূপে শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হয়ে স্বীয় অমিত বল প্রকাশ করে সেই পরাক্রমশালী অসুর হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন।

হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছ থেকে এই বর লাভ করেছিল যে, সে রাত্রে বা

দিনে মরবে না, ঘরে বা বাইরে, অস্ত্র বা শস্ত্রে, ভূমিতে বা আকাশে, দেবতা বা মানবের দ্বারা কিংবা কোনও পশুদ্বারা কোনও রকমে মরবে না। মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য কতই সুচিন্তিত উপায় সে করেছিল। কিন্তু ব্রহ্মার সমস্ত প্রকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে স্বয়ং বলদেবের অংশাংশ রূপে শ্রীনৃসিংহদেব এক অদ্ভুত রূপ অর্থাৎ অর্দ্ধমানব ও অর্দ্ধসিংহরূপে আবির্ভূত হয়ে অত্যদ্ভুত বল প্রকাশ করে হিরণ্যকশিপুকে অনায়াসে বধ করলেন এবং নিজভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করে নিজের কৃপাবলের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করেছিলেন।

অনুরূপ হয়শীর্ষ অবতারে মধুকৈটভ নামক প্রচুর বলশালী দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করে বেদ উদ্ধার করেন। কেবল তাই নয় পরশুরাম অবতারে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী অশেষ বলশালী ক্ষত্রিয়বর্গকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে বিনাশ করে পৃথিবীতে একুশ বার ক্ষত্রিয়-শূন্য করেছিলেন। এভাবে বলদেবের চিৎবলের অদ্ভুত প্রকাশের কথা সর্বশাস্ত্রে বিঘোষিত হয়েছে।

আবার বৃন্দাবন লীলায় কৃষ্ণের বড় ভাই হিসাব বনের মধ্যে গোপবালক ও গোবৎসদের সঙ্গে ক্রীড়ারত সখাদেরকে আনন্দ প্রদান করার জন্য নিজ-বিক্রম প্রদর্শন পূর্বক প্রলম্বারি বলরাম রূপে তিনি অনুকরণকারী প্রাকৃত সহজিয়ার আদর্শ প্রলম্বাসুরকে বধ করেন ও কল্কী অবতারে দস্যুপ্রকৃতিবিশিষ্ট পাশবিক বলদৃপ্ত নৃপতিদেরকে বিনাশ করে থাকেন।

তবে এই সকল অবতারণা করার তাৎপর্য এই যে, সেই বলদেবের কলা-বিকলার দ্বারা এরূপ মহাবলের আদর্শ জগতে প্রচারিত হয়েছে, সেই মহাবলশালী বলদেব যে নিখিল বলের মূলপুরুষ সে বিষয়ে সন্দেহ করার আর কিছু নেই। অধিকন্তু বলদেবের বিকলা স্বরূপ যেই গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার তাঁর অংশ যিনি তৃতীয় পুরুষাবতার অনিরুদ্ধ বিষ্ণু তিনিই হচ্ছেন ব্যষ্টি জগতের অন্তর্য্যামী। সেই পরমাত্মা- রূপী মহাবিষ্ণু যদি জগতের বলদৃপ্ত ব্যক্তিদের দেহে অবস্থান না করেন, তবে তাদের সেই বলটিও আর থাকবে না।

বলদেবের বাল্যলীলায় অসুর-মারণাদির কার্য অংশী বলদেবের ভিতরে প্রবিষ্ট অংশের দ্বারাই সাধিত হয়েছিল। দ্বাপর যুগে কৃষ্ণলীলায় শ্রীবলদেব প্রভু কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপালের বন্ধু রুক্মীকে দ্যূতক্রীড়ায় পাশাঘাতে বিনাশ করে বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষী তথা তাদের সহচরগণ কিভাবে তাঁর দ্বারা বঞ্চিত হয়, সেই

আদর্শ লীলা প্রচার করেন।

তাঁর তীর্থ পর্য্যটন লীলায় শ্রীবলদেব প্রভু নৈমিষ্যারণ্য ক্ষেত্রে রোমহর্ষণসূতকে বধ করে গুরু-বৈষ্ণব পূজা বিমুখ ধর্মধ্বজী দাম্ভিক বিষ্ণু পূজকগণের আদর্শ চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছেন। অতএব সেই বলদেব প্রভুই কৃষ্ণের সন্ধান প্রদাতা, দশ দেহে অর্থাৎ মর্যাদা মার্গে সর্বদা কৃষ্ণের সেবক গুরুদেব। সেই বলদেব প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-গুণ কীর্ত্তন করার জন্য অনন্তবদন হয়েছেন। আবার তিনি হচ্ছেন চিৎ-জগতের সত্তা বিধায়িনী শক্তির শক্তিধর। সেই বলদেবের পূজা নিখিল বিশ্বের প্রত্যেক জীবের যে একান্ত ধর্ম তাতে কিছুই সন্দেহ নেই। হে মানবগণ! নিরন্তর কৃষ্ণ কীর্ত্তনকারী মহাবীর্য প্রভাবশালী ধরণীধর শ্রীসঙ্কর্ষণের আরাধনা শিক্ষা করে অদ্ভুত চিৎবল সংগ্রহ করুন। তাহলে আপনারা প্রকৃত নিত্যবলে বলীয়ান হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান প্রাপ্ত হতে পারবেন ও মানব জীবনের লক্ষ্য সাধন করতে পারবেন। পক্ষান্তরে এটাই বলা যেতে পারে যে, মানব জীবনের চরম লক্ষ্য সাধনের জন্য শ্রীবলদেবের কৃপাবলের একান্ত আবশ্যকতা আছে।

(হরিবোল)

ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ ও গুণের বর্ণনা

শ্রীল গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রী শ্রীমদ্ গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজের ভুবনেশ্বর শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলরাম মন্দিরে ১৫ই জুলাই ১৯৮৫ সালের শ্রীমদ্ ভাগবতের ৬/৪/৩৫-৩৯ শ্লোকের উপর আধারিত একটি বক্তৃতা অবলম্বনে 'ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ ও গুণের বর্ণনা'।

শ্রীশুক উবাচ

ইতি স্তুতঃ সংস্তুবতঃ স তস্মিন্নঘমর্ষণে।
প্রাদুরাসীৎ কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।।
কৃতপাদঃ সুপর্ণাংসে প্রলম্বাষ্টমহাভুজঃ।
চক্রশঙ্খাসিচর্মেষুধনুঃপাসগদাধরঃ।।
পীতবাসা ঘনশ্যামঃ প্রসন্নবদনেক্ষণঃ।
বনমালানিবীতাঙ্গো লসচ্ছ্রীবৎসকৌস্তুভঃ।।
মহাকিরীটকটকঃ স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ।
কাঞ্চ্যঙ্গুলীয়বলয়নূপুরাঙ্গদভূষিতঃ।।
ত্রৈলোক্যমোহনং রূপং বিভ্রৎ ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
বৃতো নারদনন্দাদ্যৈঃ পার্ষদৈঃ সুরযূথপৈঃ।
স্তূয়মানোঽনুগায়দ্ভিঃ সিদ্ধগন্ধর্বচারণৈঃ।।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ, দক্ষের প্রার্থনায় ভক্তবৎসল ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং অঘমর্ষণ নামক পবিত্র স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর শ্রীপাদপদ্ম তাঁর বাহন গুরুড়ের স্কন্ধে বিন্যস্ত এবং তাঁর অষ্ট মহাভুজ আজানুলম্বিত। সেই আট হাতে তাঁর শঙ্খ, চক্র, অসি, চর্ম, বাণ, ধনুক, পাশ এবং গদা—এই আটটি অস্ত্র উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছিল। তাঁর পরণে ছিল পীত বসন এবং অঙ্গকান্তি ঘনশ্যাম। তাঁর নয়ন ও বদন অত্যন্ত প্রসন্ন এবং তাঁর কণ্ঠে আপাদ-বিলম্বিত বনমালা। তাঁর বক্ষ কৌস্তুভ মণি এবং শ্রীবৎস চিহ্নের দ্বারা অলঙ্কৃত। তাঁর মস্তকে মহা উজ্জ্বল কিরীটমণ্ডল

এবং তাঁর কর্ণযুগল মকর-কুণ্ডলের দ্বারা অলঙ্কৃত। এই সমস্ত অলঙ্কার অলৌকিক সৌন্দর্য সমন্বিত ছিল। তাঁর কটিদেশে ছিল স্বর্ণমেখলা, মণিবন্ধে বলয়, বাহুতে অঙ্গদ, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় এবং চরণযুগলে নূপুর। এইভাবে অলঙ্কারে বিভূষিত অখিল জগতের প্রভু শ্রীহরি ত্রিলোক বিমোহনকারী পুরুষোত্তমরূপে নারদ ও নন্দ আদি পার্ষদসমূহ ইন্দ্র আদি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁর উভয় পার্শ্বে ও পশ্চাতে থেকে স্তব পাঠ এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করছিলেন।" এখানে ভগবানের রূপের বর্ণনা, ভূষণাদির বর্ণনা ঘোষিত হয়েছে। ভগবান কি রকম, তাঁর রূপ কি রকম, তা এই শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। যিনি চক্ষুষ্মান তিনি সূর্যকে দেখছেন, কিন্তু জন্মান্ধ সূর্যকে দেখতে পারে না। সে বলে, "তুমি কি সূর্যের কথা বলছ?" যখন চক্ষুষ্মান সূর্যের কথা ইঙ্গিত করে বললেন সকাল হয়েছে উঠ! তখন সেই জন্মান্ধ বলছে, "তোমার সূর্য কোথা হতে এল হে? সূর্য, সূর্য বলে আমার ভাবধারাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছ কেন? সে জন্মান্ধ বলে দেখতে অক্ষম কিভাবে সূর্য উদয় ও অস্ত হচ্ছেন। সে বলে, "কি সব-সময় সূর্য সূর্য হচ্ছ, কৈ আমি তো সূর্যকে দেখতে পাচ্ছি না।" এটা হচ্ছে জন্মান্ধের কথা। পক্ষান্তরে ভগবানকে দেখার চক্ষু যাঁর আছে তিনি দেখছেন এবং বলছেন ভগবানের রূপটি এই রকম। আবার যার ভগবানকে দেখার চক্ষু নেই, সে বলছে "ভগবান কোথায়? কোথায় সেই ভগবান? কৈ তুমি দেখিয়ে দিতে পারবে?" ভগবান তো সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ কথা হংসগুহ্য স্তুতিতে বহুবার বলা হয়েছে—তিনি দুর্বিজ্ঞেয়। শ্রীমদ্-ভগবদ্-গীতায় ভগবান বলেছেন—

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।।

—(গীঃ ৭/২৫)

"আমি যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত হয়ে থাকি। তাই সাধারণ মূর্খ লোক আমাকে দেখতে পারে না। সে জানতে পারে না, ভগবান্ কিভাবে শুদ্ধ ভক্তের কাছে প্রকাশিত হন। তাই ভগবানের কৃপা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে তাঁকে কেউ জানতে পারে না।"

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণ কর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।
—(ভাঃ ২/৯/৩২)

অর্থাৎ—"আমার সবকিছু, যথা আমার নিত্যরূপ এবং আমার চিন্ময় অস্তিত্ব, বর্ণ, গুণাবলী এবং কার্যকলাপ, আমার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে বাস্তব উপলব্ধির মাধ্যমে তোমার অন্তরে প্রকাশিত হোক।"

ভৌতিক জগত সৃষ্টি করে সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু প্রবেশ করেছেন। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে জাত পদ্ম হতে ব্রহ্মা সৃষ্টি হয়েছেন। তখন ব্রহ্মাণ্ডগুলিতে কিছুই সৃষ্টি হয়নি। সব শূন্য, কেবল প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা ছিলেন। তাই তাঁকে ভগবান আদেশ করেছিলেন, 'সৃষ্টি কর'। এই সৃষ্টি রহস্য ব্রহ্মা জানতে না পেরে চিন্তিত হয়েছিলেন। তারপর তাঁকে তিনবার 'তপঃ, তপঃ, তপঃ' আদেশ হয়েছিল। ব্রহ্মা এক হাজার দিব্য বর্ষ ধরে কঠিন তপস্যা করার পর ভগবান্ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দিব্য জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। ভগবানের কৃপায় তিনি ভগবানকে দর্শন করেছিলেন এবং বেদজ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাই সুদুর্লভ মানব যোনিতে তপস্যা করতে হবে। তা কেবল এই যোনিতে সম্ভব অন্য কোন যোনিতে সম্ভব নয়। তাই মানব যোনির একমাত্র লক্ষ্য পরমার্থ লাভ।

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ ।।
—(ভা.১১/৯/২৯)

অর্থাৎ—"বহু জন্ম- মৃত্যুর পর জীব এই মনুষ্যদেহ লাভ করে, যা অনিত্য হওয়া সত্ত্বেও জীবকে পূর্ণসিদ্ধি লাভের সুযোগ প্রদান করে। অতএব ধীর ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে অবিলম্বে এই পূর্ণসিদ্ধি লাভের জন্য প্রযত্ন করা এবং কখনই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হওয়া উচিত নয়। ইন্দ্রিয় ভোগের বিষয় তো জঘন্যতম প্রজাতিদের মধ্যেও সুলভ , পক্ষান্তরে কৃষ্ণভাবনামৃত শুধু মানব জীবনেই লাভ করা সম্ভব।"

বহু যোনি ভ্রমণের পর এই সুদুর্লভ মানব যোনি মিলেছে। তাই এ যোনির লক্ষ্য কি এবং এ যোনিতে কি করতে হবে? এ যোনিতে তপস্যা করতে হবে। যাদের দেহাত্ম বুদ্ধি প্রবল, শরীর ধারণা প্রবল, তাদের জন্য ঋষভ দেবের উপদেশ ৫ম স্কন্ধ ভাগবতে দেওয়া হয়েছে।

নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম
যদিন্দ্রিয়প্রীতয় আপৃণোতি।
ন সাধু মন্যে যত আত্মনোঽয়-
মসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ ।। —(ভাঃ ৫/৫/৪)

যারা উন্মাদের মতো শরীর সুখে মেতেছে, তাদেরকে তপস্যা করার জন্য সাধুসন্তরা উপদেশ দিয়েছেন। তা ঋষভ দেব তথা সমস্ত সাধুসন্তদের উপদেশ। তপস্যা না করলে হৃদয় বিশুদ্ধ হবে না কি ভগবানকে জানা যাবে না। তপস্যা দ্বারা তা সম্ভব । অঘমর্ষণ নামক পবিত্র স্থানে দক্ষ প্রজাপতি গিয়ে তপস্যা করেছিলেন এবং তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঠিক তেমনই ব্রহ্মাজী তপস্যা করেছিলেন, যার ফলে ভগবান্ খুশি হয়ে তাঁকে বেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন। সমস্ত বেদ বেদান্তের লক্ষ্য হল এই জ্ঞান লাভ করে ভগবানকে জানা। ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন—

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ।। –(গীঃ ১৫/ ১৫)

তাই সমস্ত বেদে ভগবানই একমাত্র বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্য। জ্ঞানালোক লাভ করলে ভগবানকে জানা যায়। সমস্ত বেদ-বেদান্তের প্রণেতা হলেন কৃষ্ণ। সমস্ত বেদ-বেদান্তের লক্ষ্য হল তাঁকে জানা। ব্রহ্মাও এ জ্ঞান লাভ না করে অজ্ঞান অন্ধকারে অবস্থান করে কিছু জানতে পারেন নি। তাই তিনি যখন জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হলেন, তখন সব কিছু জানতে পারলেন।

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।। —(ভাঃ২/৯/৩২)

ভগবান্ ব্রহ্মাকে বললেন, "হে ব্রহ্মা। সেই ভাগবতের পরম গুহ্যতম কথা, সেই সৃষ্টির রহস্যময় কথা আমি বলছি, তুমি শ্রবণ কর। যা বদ্ধজীব নিজের

জ্ঞানগরিমার সাহায্যে জানতে পারে না।" কৃষ্ণ কৃপা না করলে কেউ তাঁকে জানতে পারে না। তাই ব্রহ্মাকে বললেন, "আমি কেমন, আমার গুণ কি, আমার রূপ কি রকম— এ সব কথা আমার অনুগ্রহে জানতে চেষ্টা কর।" ভগবানের অনুগ্রহ বা কৃপা না হলে কেউ তাঁকে জানতে পারে না। একজন খুব ভৌতিক পাণ্ডিত্য লাভ করতে পারে, কিংবা তার খুব শক্তিসামর্থ্য থাকতে পারে অথবা খুব ঐশ্বর্যশালী হতে পারে, কিন্তু এসব থাকা সত্ত্বেও সে ভগবানকে জানতে পারবে না। একমাত্র অহৈতুকী কৃপা প্রাপ্ত ভক্তের কাছে তিনি প্রকাশিত হন। সেই শুদ্ধভক্তরা সর্বদাই তাঁকে দর্শন করছেন।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।
—(শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা–শ্লোক ৩৮)

ব্রহ্ম সংহিতা হচ্ছে বৈদিক সাহিত্য। তাতে ব্রহ্মা স্তুতি করে বলেছেন, "প্রেমাঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্য-গুণ-বিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" এ রকম ভগবদ্ চক্ষু যিনি লাভ করেছেন তিনি সর্বদা সেই শ্যামসুন্দররূপ দর্শন করছেন। সেই সাধু সর্বত্র অন্তর্বহিঃ সর্বদা শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করছেন। তিনি ভিতরে ও বাইরে দর্শন করছেন। সেই ভক্তি চক্ষু যিনি লাভ করেছেন, সেই তত্ত্বদৃষ্টি যিনি লাভ করছেন, সেই শুদ্ধভক্ত সর্বদা ভগবানকে দর্শন করছেন। ভগবান্ কি রকম তথা হস্ত, পদ, কেশ কি রকম, চরণ হতে নাসিকা পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। এটা হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের কথা।

'শাস্ত্র-গুরু-আত্মা'— রূপে আপনারে জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান।।
—(চৈঃ চঃ মঃ ২০/১২৩)

শাস্ত্রের মাধ্যমে, গুরু রূপে এবং পরমাত্মা রূপে কৃষ্ণ নিজেকে জানান। তা না হলে কৃষ্ণ আমার প্রভু এবং ত্রাতা এই জ্ঞান বদ্ধজীবের হবে না। গুরুদেব

শাস্ত্র পরিবেশন করেন, তাঁর মাধ্যমে ভগবান্ নিজেকে জানান। তাই ভগবান সম্বন্ধে জানার এটাই হচ্ছে প্রকৃত পথ। দক্ষ প্রজাপতির সম্মুখে ভগবান যেভাবে উপস্থিত হয়েছিলেন, তার বর্ণনা শুকদেব গোস্বামী এখানে দিয়েছেন। তা গ্রহণ করতে হবে। যে এই দৃষ্টি বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেনি, সে ভগবানকে জানতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদ মহারাজের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রহ্লাদ মহারাজ বাল্যকালে এই উপদেশ দিয়েছিলেন।

"একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্ ।।"
—(ভাঃ ৭/৭/৫৫)

গোবিন্দে একান্ত ভক্তি হলে, ভক্তিচক্ষু খুললে (এই তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করলে) সর্বত্র সে ভগবান্ গোবিন্দকে দর্শন করতে পারবে।

স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্তি।।
—(চৈঃ চঃ মঃ ৮/২৭৪)

সাধারণ জীব সাধারণ দৃষ্টির সাহায্যে পাহাড়, পর্বত, বৃক্ষ, লতা দেখে থাকে কিন্তু একজন শুদ্ধভক্ত সর্বত্র ভগবানকে দেখে থাকেন। ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন—

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।।
—(গীঃ ৬/৩০)

"যিনি সর্বত্র আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতেই সমস্ত বস্তু দর্শন করেন, তিনি কখনো আমার দৃষ্টির আগোচর হন্ না এবং আমিও তাঁর দৃষ্টির অগোচর হই না।" এটা হচ্ছে গীতার কথা। "তিনি আমার দৃষ্টির অন্তরালে থাকেন না এবং আমিও তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে থাকি না।" প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা হিরণ্যকশিপু ত্রিপুর বিজয়ী এবং মহাপরাক্রমশালী ছিল। 'হিরণ্য' অর্থাৎ সোনা, সমুদায় পৃথিবীর সোনা তার কাছে ছিল। 'কশিপু' অর্থাৎ কোমল শয্যা। সমস্ত উপভোগের সামগ্রী তার কাছে ছিল, তথাপি সে ভগবানকে দর্শন করতে পারেনি। প্রহ্লাদ মহারাজ (তার পুত্র) যখন ভগবানের কথা বলছিলেন, তখন

সে (হিরণ্যকশিপু) বলেছিল "তোর ভগবান কোথায়?" ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন,—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।" —(গীঃ ৭/৭)

"হে ধনঞ্জয় (অর্জুন), আমার থেকে বড় (শ্রেষ্ঠ) আর কেউ নেই।" কিন্তু সেই অসুর (হিরণ্যকশিপু) মনে করেছিল—

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্।।
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।।
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ।।
—(গীঃ ১৬/১৩-১৫)

অসুর-স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিরা মনে করে—"আজ আমার এত ধন আছে এবং আমার যোজনা অনুযায়ী আরো অধিক পাব। এখন আমার এত আছে এবং ভবিষ্যতে এটা আরও বৃদ্ধি পাবে। সে আমার শত্রু, আমি তাকে নাশ করেছি এবং আমার অন্যান্য শত্রুদেরকেও আমি নাশ করব। আমিই সকলের ঈশ্বর, আমিই ভোক্তা, আমিই সিদ্ধ, বলবান এবং সুখী।" আমি সবচেয়ে ধনবান এবং অভিজাত আত্মীয়স্বজন পরিবৃত। আমার মতো আর কেউ নেই। আমি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করব, দান করব এবং আনন্দ করব। এভাবেই অসুর-স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিরা অজ্ঞানের দ্বারা বিমোহিত হয়।

তাই হিরণ্যকশিপু বলল,"তোর ভগবান কি সর্বত্র আছেন এবং তিনি কি সর্বব্যাপক? ঐ স্তম্ভের মধ্যে কি আছেন?" প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করছিলেন। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, ভগবান ঐ স্তম্ভের মধ্যে আছেন।"

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।।
—(ভাঃ ৯/৪/৬৩)

ভগবান নিজেই এই কথা দুর্বাসা মুনিকে বলেছিলেন। ভগবান ভক্তকে

নিজের থেকে উচ্চ আসন দেন। তিনি যখন এ ধরাধামে লীলা প্রদর্শন করেছিলেন, তখন তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে তিনি অর্জুনের রথ টেনে পার্থসারথী হয়েছিলেন। তিনি নন্দ, যশোদার মতো ভক্তদের সঙ্গে লীলা করেছেন। নন্দ, যশোদার পুত্র রূপে বাল্যলীলা করেছেন। সুদামা বিপ্রের পদ ধৌত করেছেন। যাঁরা কৃষ্ণ-চরণারবিন্দে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করেছেন, যাঁরা সমস্ত ভৌতিক সুখ ত্যাগ পূর্বক বর্ণাশ্রম ধর্মের নিয়ম লঙ্ঘন করে ভগবৎ ভক্তি লাভের জন্য পরীক্ষা দিয়েছেন, তাঁদের কাছে স্বর্গ, নরক সব সমান। তিনি ভক্তবৎসল, তাই ভক্তের কথা রক্ষা করেন। গীতায় ভগবান বলেছেন—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।"—(গীঃ ১৮/৫৫)

"কেবল ভক্তি যোগেই ব্যক্তি পরমপুরুষ ভগবানকে জানতে পারেন।" আবার নবম অধ্যায়ে বলেছেন—

"যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।।" —(গীঃ ৯/২৯)

"যিনি ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, তিনি স্বভাবতই আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও স্বভাবতই তাঁর হৃদয়ে বাস করি।।"

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।"—(গীঃ ১১/৫৫)

"হে প্রিয় অর্জুন! কেবল অনন্য ভক্তির দ্বারাই ভক্ত আমার প্রকৃত স্বরূপ জানতে সমর্থ হন।"

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।। —(শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা)

সেই পরমপুরুষ ভগবান কৃষ্ণের রূপ শাশ্বতময়, জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। দক্ষ প্রজাপতি ভগবানের সেই বিলাস মূর্তি অষ্টভুজধারী বিষ্ণুরূপ দর্শন করেছিলেন। ব্যাসদেব ভাগবত মহাপুরাণে ভিন্ন ভিন্ন অবতারের বর্ণনা দিয়েছেন এবং শেষে বলেছেন—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।। —(ভাগবত)

অবতারগণ কৃষ্ণের অংশ ও কলা এবং পরিশেষে লিখলেন কৃষ্ণই হচ্ছেন

স্বযং ভগবান। সেই কৃষ্ণ দ্বিভুজ। তাঁর রূপের বর্ণনা ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে—

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।
—(ব্রঃ সংঃ ৫/৩০)

"মুরলীগান-তৎপর, কমলদলের ন্যায় প্রফুল্লচক্ষু, ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা শিরোভূষিত, নীলমেঘবর্ণ সুন্দর শরীর, কোটি কন্দর্প মোহন বিশেষ শোভা-বিশিষ্ট সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

কন্দর্প এই ভৌতিক জগতে অতি সুন্দর পুরুষ। কোটি কন্দর্পের রূপকে ধিক্কার করে কৃষ্ণের রূপ। আমাদের এই ভৌতিক জগতের আকর্ষণটা স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণের উপর আধারিত। তাই যিনি শ্রীকৃষ্ণ রূপের প্রতি আকর্ষিত তিনি কখনো এই ভৌতিক জগতের কোন সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হন না। নচেৎ যত বড় মুনি, ঋষি, দেবতা হোন না কেন সবাই ভৌতিক সৌন্দর্যের প্রতি (স্ত্রীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি স্ত্রী) আকর্ষিত। হাজার হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেও বিশ্বামিত্র মুনি মেনকার রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শিবজী যিনি কন্দর্পকে দগ্ধ করেছিলেন তিনি ভগবানের মোহিনী রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর পশ্চাতে ধাবিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা যিনি ধাতা, বিধাতা সৃষ্টি কার্যে নিযুক্ত আছেন তিনি নিজ কন্যার পশ্চাতে ধাবিত হয়েছিলেন। যিনি কোটি কন্দর্প-ধিক্কারকারী সেই অপ্রাকৃত মদন (কৃষ্ণ)-এর প্রতি আকৃষ্ট হন, কেবল তিনিই কামবেগকে সহ্য করতে পারেন।

আলোলচন্দ্রক লসদ্বনমাল্যবংশী-
রত্নাঙ্গদং প্রণয়কেলিকলাবিলাসম্।
শ্যামং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়তপ্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।
—(ব্রঃ সংঃ ৫/৩১)

"দোলায়িত চন্দ্রক-শোভিতা বনমালা যাঁর গলদেশে, বংশী ও রত্নাঙ্গদ যাঁর

করদ্বয়ে শোভিত, সেই কৃষ্ণ সর্বদা প্রণয় কেলিকলা-বিলাস যুক্ত, ললিত ত্রিভঙ্গ শ্যাম সুন্দর রূপই যাঁর নিত্য প্রকাশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" তিনি আমাদের মতো নন্। সেই জন্য ভগবান নিজেই গীতায় বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম।। —(গীঃ ৯/১১)

"আমি যখন মানব রূপ ধারণ করে এই ধরাধামেতে অবতীর্ণ হই, তখন মূর্খেরা আমাকে উপহাস করে। তারা আমার পরম (দিব্য) প্রকৃতি এবং সবার উপর আমার যে পরম অধিকার আছে তা জানে না।"

সেই মূর্খেরা আমাকে একজন সাধারণ মানব বলে মনে করে থাকে। সেই ভগবান এক অদ্বিতীয়, তাই তিনি অপ্রাকৃত রূপ প্রকাশ করে দেখিয়ে দিয়েছেন, তিনি কিরূপে গোপীজন বল্লভ ও গিরিবরধারী। আবার তিনি যে কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে কোন ক্রিয়া করতে পারেন।

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। —(ব্র. সং. ৫/৩২)

"সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। তাঁর বিগ্রহ-আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়, সুতরাং পরমোজ্জ্বল। সেই বিগ্রহগত অঙ্গসকল প্রত্যেকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট এবং চিদচিৎ অনন্ত জগৎসমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন এবং কলন করেন।" তাই তিনি কেবল ঈক্ষণ দ্বারা ভূত প্রকৃতিকে গর্ভবতী করান।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
—(শ্রীল শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী)

আবার ব্রহ্মসংহিতার বর্ণনানুযায়ী—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ।

বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। —(ব্র. সং. ৫/৩৩)

সেই গোবিন্দ অনন্তরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। সেই কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে অন্য কোথায় যান না। শাস্ত্রে তা বর্ণিত হয়েছে। তাঁব পার্ষদ, নিত্য লীলা সঙ্গী ভক্তরা তা জানেন।

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ।।
—(ব্র. সং. ৫/৫৬)

সেই বৃন্দাবনে ব্রজলক্ষ্মী গোপিগণ কান্তারূপা, পরমপুরুষ কৃষ্ণই একমাত্র কান্ত, বৃক্ষমাত্রই চিদ্‌গত-কল্পতরু, ভূমিমাত্রই চিন্তামণি অর্থাৎ চিন্ময় মণিবিশেষ, জল মাত্রই অমৃত, কথা মাত্রই গান, গমন মাত্রই নাট্য, বংশী—প্রিয়সখী, এবং জ্যোতি—চিদানন্দময় অনুভূত। অতএব শ্রীবৃন্দাবনই পরমারাধ্য। কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে লীলা প্রদর্শন করেছিলেন, তখন তিনি কিশোর কৃষ্ণ, দ্বারকাতে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ এবং মথুরাতে তিনি মথুরেশ কৃষ্ণ। সেই গোকুলেশ কৃষ্ণ, ব্রজেশ-তনয় কৃষ্ণ, যশোদানন্দন কৃষ্ণ নব নীরদ কান্তি বিশিষ্ট। সেই অপ্রাকৃত মদন, সেই কিশোর কৃষ্ণ (গোকুলেশ কৃষ্ণ)-কে যিনি দর্শন করবেন তিনি কখনই প্রাকৃত কাম দ্বারা ক্ষুব্ধ হবেন না। সেই কিশোর কৃষ্ণের নিকটে ৬৪টি গুণসমূহের বর্ণনা অন্যতম প্রধান বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল রূপ গোস্বামী "ভক্তি রসামৃত সিন্ধু"-তে বর্ণনা করেছেন। তা নিম্নে বর্ণিত হ'ল।

এই নায়ক কৃষ্ণ (১) সুরম্যাঙ্গ (তাঁর সমস্ত শরীর অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত), (২) সমস্ত শুভলক্ষণযুক্ত, (৩) অত্যন্ত মনোরম, (৪) মহাতেজা (জ্যোতির্ময়), (৫) বলবান্, (৬) কিশোর বয়স যুক্ত (নিত্য নবযৌবন সম্পন্ন), (৭) সমস্ত ভাষায় পারদর্শী , (৮) সত্যবাদী, (৯) প্রিয়ভাষী, (১০) বাক্‌পটু, (১১) পরম পণ্ডিত, (১২) পরম বুদ্ধিমান্, (১৩) অপূর্ব প্রতিভাশালী, (১৪) বিদগ্ধ (শিল্পকলায় পারদর্শী বা রসিক), (১৫) অত্যন্ত চতুর, (১৬) পরম দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, (১৯) দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ (স্থান, কাল এবং পাত্র সম্বন্ধে বিচার করতে অত্যন্ত সুদক্ষ) (২০) শাস্ত্রদৃষ্টি-যুক্ত (বৈষ্ণব তত্ত্বজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে দর্শন করতে এবং উপদেশ দিতে অত্যন্ত পারদর্শী), (২১) শুচি (পবিত্র), (২২) বশী (সংযত), (২৩) অবিচলিত (স্থির), (২৪) দান্ত, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান্ (আত্মতৃপ্ত), (২৮) সমদৃষ্টি সম্পন্ন, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্মিক, (৩১) শূর (বীর), (৩২) করুণ (কৃপাময়), (৩৩) মানদ (শ্রদ্ধাবান), (৩৪) দক্ষিত (সরল, উদার), (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জাবান, (৩৭) শরণাগত জীবের রক্ষক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তদের হিতৈষী, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্বমঙ্গলময়, (৪২) প্রতাপী (সবচাইতে শক্তিশালী), (৪৩) কীর্ত্তিমান (পরম যশস্বী), (৪৪) জনপ্রিয়, (৪৫) সজ্জন পক্ষাশ্রিত (ভক্তবৎসল), (৪৬) নারীগণ মনোহারী (সমস্ত স্ত্রীলোকেদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়), (৪৭) সকলের আরাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্ (সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী), (৪৯) শ্রেষ্ঠ (সকলের মাননীয়), (৫০) ঐশ্বর্যযুক্ত (পরম নিয়ন্তা), (৫১) অপরিবর্তনশীল, (৫২) সর্বজ্ঞ, (৫৩) চির নবীন, (৫৪) সৎ, চিৎ, আনন্দময় (নিত্য আনন্দময় রূপ বিশিষ্ট), (৫৫) সব রকম যোগসিদ্ধির অধিকারী, (৫৬) অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন, (৫৭) শ্রীকৃষ্ণের দেহ থেকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়, (৫৮) সমস্ত অবতারগণের আদি উৎস, (৫৯) তাঁর দ্বারা হত শত্রুদের তিনি মুক্তিদান করেন, (৬০) মুক্ত পুরুষদের আকর্ষণকারী, (৬১) বিস্ময়কর লীলাবিলাস পরায়ণ, (৬২) শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণীয় বেণুমাধুরী (৬৩) অপূর্ব ভগবৎ-প্রেম মণ্ডিত ভক্ত পরিবৃত, (৬৪) শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব রূপমাধুরী।

(হরিবোল)
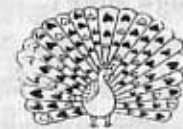
মাধুর্য্যৈক নিলয় শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁকে পাওয়ার উপায়

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে—

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

—(শ্লোক - ৫/৩০)

এই ভৌতিক জগতে কন্দর্পই হচ্ছেন সৌন্দর্যবান পুরুষ। এখানে সকলেই কন্দর্পের কাম বাণে আক্রান্ত। কিন্তু কোটি কন্দর্পের সৌন্দর্যকে ধিক্কার করছেন মাধুর্য্যৈক নিলয় শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য। সেই কৃষ্ণই হচ্ছেন অবতারী পুরুষ স্বয়ং ভগবান; কারণ অপূর্ব মাধুর্য চতুষ্টয়ের সমাহার তিনি ছাড়া অন্য কারোর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। এক অপূর্ব রূপ মাধুরী, বেণু মাধুরী, রতি মাধুরী ও লীলা মাধুরী কেবল কৃষ্ণের মধ্যেই নিহিত আছে। এই জন্যই তিনি সর্বজন চিত্ত আকর্ষণকারী পূর্ণব্রহ্ম, সর্বাংশী, সর্বাবতারী, সর্বশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্।

শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যের কথা ভক্তদের চিত্তে লালসা জাগ্রত করায় সত্য, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের কথা চিত্তে যে লালসা জাত করায়, তা অস্বীকার করি কেমন করে? যাঁর মাধুরীর কথা বর্ণিত হয়, তিনি যে তা নিজে আস্বাদন করতে পারেন না—তাও সত্য। সেই কৃষ্ণ নিজেই সেই মাধুর্য রস আস্বাদনের জন্য স্বয়ং লালসান্বিত হয়েছেন। ভক্তের মুখে বর্ণিত নিজের মাধুর্যের কথা শ্রবণ লালসায় মাধুর্য্যৈক নিলয়, রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুব্ধ হয়ে স্বয়ং সেই স্থানেতে গমন করেন। "মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।" এটা তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত কথা। রসরাজের কেবল কি নিজের কথা শ্রবণেতে আগ্রহ, নিজের রূপ দর্শনেতেও লোলুপতা অপরিসীম। রসরাজ নিজের গুণে নিজেই প্রলুব্ধ। এটা এক অভিনব বিস্ময়াবহ সংবাদ। কৃষ্ণের অতুলনীয় রূপ মাধুর্য কিরূপ তা শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

কৃষ্ণমাধুর্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণআদি নরনারী করয়ে চঞ্চল।।
শ্রবণে, দর্শনে আকর্ষয়ে সর্বমন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন।।
এ মাধুর্যামৃত সদা যেই পান করে।
তৃষ্ণাশান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে।।

—(চৈ. চ. আদি ৪/১৪৭-১৪৯)

স্বয়ং রূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রসরাজ, পূর্ণব্রহ্ম, অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ সর্বাবতারী, সর্বাংশী সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন যে রূপ পরিগ্রহ করেন, তা জগত মোহিতকর, তথাপি তাঁর নিজের রূপ-লাবণ্যের মাধুর্য ও সৌন্দর্য বিশ্বে অতুলনীয়। তা তাঁর অন্য কোনও স্বাংশ কিংবা অংশাবতারেতে নেই কি থাকতে পারে না। পূর্ণের রূপ-লাবণ্যাদি সংসার জীবের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাঁর তদেকাত্ম, স্বাংশাদি রূপে বিশ্ব-সংসার বিমুগ্ধ। নিজের গোপবেশ, বেণুকর, নব কিশোর, নটবর, উজ্জ্বল নীলমণী, ব্রজগোপাল বেশে নিজেই বিমুগ্ধ। নিজের রূপ, মাধুর্য ও সৌন্দর্য তাঁকে বিমোহিত করে থাকে। শ্যামরূপ আত্ম-পর্য্যন্ত সর্ব চিত্তহর হয়। তাঁর সৌন্দর্য-ছটা পুরুষ বা যোষিৎ, স্থাবর, জঙ্গম সকলের চিত্ত আকর্ষণ করে। অধিকন্তু নিজের চিত্ত রসাবেশে বিমোহিত করে থাকে। কৃষ্ণ মাধুর্য, "কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল।" এই আত্মরূপে আত্ম চপলতাই একটি নিরূপম সৌন্দর্য। কৃষ্ণের যে নবনবায়মান রূপশ্রী তা আস্বাদন করার জন্য কৃষ্ণ নিজেই লালসান্বিত। এটির একটি বিচিত্র সমাচার রহস্য উদ্‌ঘাটন করে শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর ললিত মাধব নাটকে লিখেছেন—

অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সবভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব।।

—(ললিত মাধব - ৮/৩৪, চ. চ. আদি ৪/১৪৬)

"এক অনাস্বাদিত মাধুর্য যা প্রতিটি মানুষকেই চমৎকৃত করে, তা আমার থেকে অধিক কে প্রকাশ করে ? এই মাধুরিমা অবলোকন করে আমার চেতনা

প্রলুব্ধ হয়, এবং শ্রীমতী রাধারাণীর মতো আমি সেই রূপমাধুরী আস্বাদন করতে বাসনা করি।"

অতএব উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, কৃষ্ণ নিজেই নিজেকে চিন্‌তে পারেননি। স্ব-নিরূপম মাধুর্যে নিজে বিমুগ্ধ হয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। দ্বারকায় লীলা বিলাসকালে একদিন কৃষ্ণ মণিময় স্তম্ভে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন। সেইস্থানে তিনি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হয়ে রইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করলেন, এই প্রগাঢ় মাধুর্য চমৎকারকারী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটি কে? পরম বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গম্ভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। "এমন চিত্ত চমৎকারী মূর্তি যিনি আমার পুরোভাগে দণ্ডায়মান হয়ে আছেন, এ ব্যক্তিটি কে ?" অহো! এত রূপ-লাবণ্য। কারোর অঙ্গে কখনো এমন দেখা যায়নি। এঁর অসামান্য মধুরিমা মানস কল্পনাকে পরাজিত করছে। এই বিস্ময়কারী রূপটি কাঁর ? তাঁর পরিচয় জানা একান্ত প্রয়োজন আছে। তিনি নিজেই বিস্মিত হয়ে পড়লেন। কৃষ্ণ তারপর নিজের কাছে উপস্থিত সখাদের দিকে যখন মুখ ফিরলেন তখন প্রতিবিম্বটিও অনুরূপ কার্য করল। যখন দেখলেন এটা তাঁর নিজের প্রতিবিম্ব তখন ভ্রান্তি দূর হয়ে গেল এবং স্মিতহাস্য-সহকারে বলতে লাগলেন— "অহো, এ যে আমি নিজে। আমার এই রূপ-প্রবাহ এরকমভাবে প্রবাহমান। এত বিস্ময়াবহ, এত মাধুর্য যে আমার মধ্যে আছে তা তো আমি জানতাম না, কি জানতে পারিনি? এই রূপ আমার চিত্তকে প্রলুব্ধ করছে। কেমন ভাবে? এই নিজের রূপ-মাধুরী আস্বাদন করার তীব্র লালসা আমার মধ্যে জাত হচ্ছে। হায়! এই প্রতিবিম্বটাকে নিজের বক্ষে জড়িয়ে ধরার জন্য ইচ্ছা করছি, কিন্তু জড়িয়ে ধরতে পারছি না। আমি আমার নিজের বক্ষে জড়িয়ে ধরে তাঁর বদন-মধু আস্বাদন করতে পারছি না। নিখিল বিশ্বের মধ্যে কেবল মাত্র একজনই তা বক্ষে ধারণ করে বদন-মধু অস্বাদন করতে পারছেন— তিনি হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী। আমার আকুল হৃদয়ে আগ্রহ জাত হচ্ছে। তাঁর মতো হয়ে আমি কেমন করে এই রসাস্বাদন করবো।" "কাময়ে রাধিকেব।" কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

দর্পণাদ্যে দেখি' যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ, আস্বাদিতে নারি।।

বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়।
রাধিকাস্বরূপ হইতে তবে মন ধায়।।

—(চৈ. চ. ৪/১৪৪, ১৪৫)

এইভাবে তাঁর মনেতে কামনা জাত হ'ল। যেমন—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা -
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।

—(চৈ. চ. আদি ১/৬)

এই লোভ, এই আকাঙ্খা, এই আস্বাদনের আকাঙ্খা যখন কৃষ্ণের মনে উদয় হলো তখন তিনি শচী গর্ভ সিন্ধু হতে নিষ্কলঙ্ক গৌরচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হলেন। কি কামনা? না, "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা"—'শ্রীরাধার প্রণয়মহিমাটা কি রকম?' "স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা"—(আমার যে মধুরিমা অর্থাৎ নিজের মধুরিমায়, নিজের মাধুর্যে নিজেই চমৎকৃত হয়েছি; যে মধুরিমা 'একমাত্র রাধিকা আস্বাদে সকলি।') যে মাধুর্য একমাত্র রাধিকা পূর্ণভাবে আস্বাদন করেন, সেই মধুরিমাটা কি রকম ? নিজের মাধুর্য নিজে আস্বাদন করতে পারেননি। 'কাময়ে রাধিকেব'। শ্রীমতী রাধিকা এটাকে আস্বাদন করে যে সুখ পান সেই সুখটাই বা কি রকম ? এই ত্রিবিধ বাঞ্ছা জাত হ'ল। ত্রিবিধ বাঞ্ছার মধ্যে দ্বিতীয় বাঞ্ছাটি হ'ল তাঁর মধুরিমার আস্বাদন 'স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা।' নিজের মধুরিমাটা কি রকম ? এতে দ্বিতীয় বাঞ্ছার বীজটি অন্তর্নিহিত আছে। এই দ্বিতীয় বাঞ্ছার 'স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।' এ স্থলে একটি সুগুপ্ত রহস্য রয়েছে। রসিক শেখরের যে লোভ তা যে কেবল নিজের মাধুর্যের প্রতি রয়েছে তা নয়, রাধা কর্তৃক আস্বাদ্য নিজের মাধুর্যের যে লালসা সেই মাধুর্যের পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি তাঁর সেই আস্বাদনেতে। সেই স্বাদ গ্রহণ করার জন্য, সেই স্বাদ চরিতার্থ করার জন্য রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ হলেন প্রেম পুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গ, যাঁর কাছে দেদীপ্যমান রয়েছে বিপ্রলম্ভের তরঙ্গ-রঙ্গ অর্থাৎ প্রেম পুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গ।

'গৌরাঙ্গ' বলিতে হ'বে পুলক শরীর।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর।।
—(প্রার্থনা-নরোত্তম দাস)

গৌরাঙ্গ বল্লে শরীর পুলকিত হবে, কারণ তিনি নিজেই 'হরি হরি' বলে অশ্রু বর্ষণ করছেন।

কৃষ্ণ যদি নিজে না বলবেন, তিনি যদি নিজে কৃপা করে নিজেকে প্রকাশ না করবেন, তাহলে আমরা তাঁকে জানতে পারব না কি কৃষ্ণকে বুঝতে পারব না। এই জন্য নিজে রাধার ভাব আর দ্যুতি (কান্তি) অঙ্গীকার করে রাধাভাবে ভাবিত হয়ে আকুল ভাবে আপন ভজন প্রণালী শিক্ষা দিলেন, অর্থাৎ ভজনীয় বস্তুকে কেমন করে ভজন করতে হয় তা শিক্ষা দিলেন। রাধারাণী বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রসে ভাবিত হয়ে মধুর বিরহে যেমন আকুল স্বরে আকুল হৃদয়ে গেয়েছেন ঠিক সেই ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ গাইলেন "হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র"।

গৌরাঙ্গ স্বরূপে রাধাভাব যদিও প্রবল, তথাপি তিনি নিজে কৃষ্ণ; কিন্তু তিনি নিজে কৃষ্ণ হলেও 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' বলছেন; 'হরি' , 'হরি' বলে কাঁদছেন অর্থাৎ কেমন করে কৃষ্ণকে পেতে হয়, কেমন করে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করতে হয়, কেমন করে রূপশ্রী মাধুর্য আস্বাদন করতে হয় অর্থাৎ যাঁকে পেলে, যাঁকে অন্বেষণ করলে, যা আস্বাদন করলে ত্রিজগতের সমস্ত ক্ষুধা পরিসমাপ্তি হবে, তা কৃষ্ণ নিজেই প্রতিপাদন করেছেন, জীবের চরিত্রগত করিয়েছেন গৌরাঙ্গ স্বরূপে। তাই তিনি গৌরাঙ্গ স্বরূপে অপার বদান্য, অপার কারুণিক ও অপার উদার। যাঁরা ব্রজলীলাতে সখী সমাজ ছিলেন, অর্থাৎ ললিতা, বিশাখা আদি সখী তাঁরা গৌর লীলাতে পুরুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। যেমন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী ছিলেন ললিতা সখী, এবং রায় রামানন্দ ছিলেন বিশাখা সখী। প্রেম-পুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গ রাধার ভাবে বিভাবিত হয়ে রামানন্দের গলা জড়িয়ে ধরে রোদন করেছিলেন, যেমন ভাবে রাধারাণী রোদন করেছিলেন। "হরি হরি বলিতে নয়নে ববে নীর।" স্বরূপ দামোদর গোস্বামীকে যখন দেখতে পেলেন সম্মুখে (যিনি হচ্ছেন ললিতা সখী), সখী জ্ঞানে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দ্রমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি-
র্নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্বিধিম্।।
—(ললিত মাধব ৩।২৫ /চৈ. চ. অন্ত্য ১৯/৩৫)

শ্রীমতী রাধারাণী এইভাবে ক্রন্দন করেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও সেইভাবে ক্রন্দন করে বলতে লাগলেন—"হে সখি! সেই নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়? সেই ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা অলংকৃত কৃষ্ণই বা কোথায়? সেই মন্দমুরলীধ্বনিকারী কৃষ্ণই বা কোথায়? সেই ইন্দ্রনীলমনিদ্যুতিমান্ কৃষ্ণ কোথায়? রাস-রসে নর্তনকারী সেই শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়? আমার জীবন রক্ষার ঔষধিস্বরূপ সেই শ্যামই বা কোথায়? আমার সেই সুহৃত্তম নিধিই বা কোথায়? হায়! হায়! বিধাতাকে ধিক্।" এইভাবে তিনি বিধাতাকে ধিক্কার দিয়ে ক্রন্দন করেছিলেন।

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎসর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।।
—(শিক্ষাষ্টকম্ - ৭)

শিক্ষাষ্টকেও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেই একই কথা। সেই ভাবে বিভাবিত। গোবিন্দের বিরহে নিমেষটা যুগবৎ মনে হচ্ছিল। সমস্ত জগৎটা শূন্যায়িতং চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্—বর্ষার বারি ধারার ন্যায় নয়নদ্বয় হ'তে অশ্রুধারা পড়ছিল। নিজে কৃষ্ণ হয়েও তিনি এই ভাবে প্রলাপ করছিলেন। 'হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর।' সেই গৌরাঙ্গ, যিনি নিজেই হরি,—'হরি হরি' বলে ক্রন্দন করছিলেন।

পুরীতে কাশী মিশ্রের ছোট একটি ঘরকে 'গম্ভীরা' বলা হয়। বর্তমানে তা রাধাকান্ত মঠ নামে পরিচিত। সেই কুঠরীও বর্তমান আছে। তিনি সেখানে প্রলাপ করেছিলেন। অর্দ্ধরাত্র হয়ে গেছে দেখে মহাপ্রভুকে শয়ন করিয়ে স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ শয়ন করলেন। প্রেমের আতিশয্যে, বিরহের আতিশয্যে মহাপ্রভুর মন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। গম্ভীরা হতে বাইরে আসার জন্য অন্ধকারের মধ্যে দরজা খুঁজতে লাগলেন। দরজা খুঁজতে খুঁজতে দেওয়ালেতে

মুখ, নাক ঘষে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্ত বার হতে লাগল। ভাবাবেশে গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগলেন। তা শ্রবণ করে স্বরূপ গোস্বামী গোবিন্দকে ওঠালেন। দীপ জ্বালিয়ে দেখলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সর্বাঙ্গে বিশেষ করে মুখ, নাক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্ত বার হতে লাগল। তা দেখে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তখন মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরকে বললেন, "উদ্বেগের ফলে ঘর হতে বাইরে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু দরজা খুঁজে না পেয়ে দেওয়ালেতে ঘষে নাক মুখ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল।" সেই দিন হ'তে মহাপ্রভুর শয়ন কক্ষে শঙ্কর পণ্ডিতকে শয়ন করানো হতো। শঙ্কর পণ্ডিত মহাপ্রভুর পাদ-সম্বাহন করে শয়ন করাতেন।

শ্রীমান্ মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করে দেখিয়ে দিলেন কিভাবে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করতে হয়। কিভাবে ভাবিত হয়ে ভজন করতে হয়।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

রাধারাণী বলতেন—'হে হরি, হে কৃষ্ণ, হে রাম।' তাই গোলোকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্ত্তন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে হরিনাম এনেছিলেন তা এ জগতের বস্তু নয়। তা গোলোকের প্রেমধন বস্তু। গোলোকের গুপ্ত বিত্ত। কৃপা করে তিনি তা এ প্রপঞ্চে এনে জীবের চরিতগত করালেন।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

আবার তিনি কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন—

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলিসদৃশং বিচিন্তয়।।" —(শিক্ষা-৫)

এ হচ্ছে বদ্ধজীবের প্রার্থনা। হে নন্দতনুজ কৃষ্ণ! আমি তোমার কিঙ্কর। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।' তাই স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছি। "আমি আপনার নিত্য সেবক, নিত্য কিঙ্কর। এই বিষম ভবাম্বুধিতে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। হে কৃষ্ণ! কৃপা করে আপনার পাদপদ্মের ধূলি-সদৃশ আমাকে মনে করুন।"

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

এ হচ্ছে বদ্ধ জীবের প্রার্থনা—আকুল ভাবের প্রার্থনা। হে হরে অর্থাৎ এখানে 'হরা' শব্দ সম্বোধনে 'হরে' অর্থাৎ শ্রীমতী রাধারাণীকে বুঝাচ্ছে। বদ্ধজীব যে ডাকছে হে রাধে, হে কৃষ্ণ, হে হরে, হে কৃষ্ণ, হে হরে, হে রাধারাণী। যে রাধারাণীর একমাত্র সম্পত্তি হচ্ছেন কৃষ্ণ, সেই রাধারাণীর কৃপা লাভ না হলে আমরা কৃষ্ণকে লাভ করতে পারব না। হে হরে (হে রাধারাণী) হে কৃষ্ণ আমাকে কৃপা করে আপনাদের পাদপদ্মের সেবায় নিযুক্ত করুন। এ হচ্ছে প্রার্থনা। এইভাবে গৌরাঙ্গের প্রিয়জন, গৌরাঙ্গের প্রামাণিক ধারাতে আগত প্রেমিক ভক্ত, বৈষ্ণব, আচার্য্য, নামতত্ত্ববিদ্‌গণ সেই ভাবে ভজন করেন ও সকলকে সেইভাবে ভজন করার জন্য শিক্ষা দেন। এই হরিনাম দীক্ষা নিয়ে সেইভাবে ভজন করতে হবে। সেইভাবে ভজন করলে "চেতোদর্পণ মার্জন" অর্থাৎ চিত্তরূপ দর্পণ মার্জিত হবে, স্বচ্ছ হবে। কারণ যতই চিত্তরূপ দর্পণ মার্জিত হবে, যতই স্বচ্ছ, স্বচ্ছতর ও স্বচ্ছতম হবে ততই কৃষ্ণের প্রকাশ স্বচ্ছ, স্বচ্ছতর ও স্বচ্ছতম হবে।

ভক্তদের মার্জিত চিত্ত-রূপ দর্পণেই কৃষ্ণ প্রতিবিম্বিত হন। সেখানে প্রতিভাত হন। তিনি সেখানে নিজেকে প্রকাশ করেন। "চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং।" এই ভৌতিক জগতে সকলে মহাদাবাগ্নিতে তাপিত হচ্ছেন—ত্রিতাপেতে দগ্ধীভূত হচ্ছেন। দাবাগ্নি শান্ত হবে কৃপাবারি বর্ষিত হলে। আবার নামই 'বিদ্যাবধূজীবনম্', সমস্ত বেদবিদ্যা, পরাবিদ্যা স্বতঃ পরিস্ফুট হবে। যে গৌর প্রিয়জনের আনুগত্যে ভজন করছে না সে কখনই বেদ তত্ত্ব বুঝতে পারবে না। বেদের অন্তিম প্রতিপাদ্য বিষয় যে কৃষ্ণ তাঁকে সে বুঝতে পারবে না, তাঁকে লাভ করতে পারবে না। তাই ভজনহীন দুরাচার কখনই তাঁকে লাভ করতে পারবে না। "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং"। তারপর আসবে দিব্য আনন্দ সমুদ্রের বর্দ্ধন। "প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং" প্রতি পদক্ষেপে অমৃত আস্বাদন হবে। "সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্।" অর্থাৎ এহ সংকীর্তন ধর্ম সংকীর্ণ নয়। এতে সমস্ত আত্মার স্নিগ্ধতা সম্পাদিত হয়। এ হচ্ছে সার্বজনীন ভাগবত ধর্ম। তারপর,—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।।

কতই করুণা করেছেন সেই ভগবান। তাঁর নামেতে সমস্ত শক্তি সঞ্চার করেছেন। নাম স্মরণ, নাম ভজন, নাম কীর্তন করার জন্য কোনও রকম কাল, নিয়ম তিনি রাখেননি। স্থানাস্থান, কালাকাল, শৌচাশৌচের বিচার নেই। প্রতিক্ষণ, প্রতিমুহূর্তে সর্বাবস্থায় সর্বত্র 'হরিনাম' করা যেতে পারে। কতই না করুণা করেছেন। কিন্তু "আমার কি 'দুর্দৈব'। আমার এই নামের প্রতি অনুরাগ জাত হল না।" তিনি নামের মাধ্যমে নামের মুখ্য ফল প্রদান করেছেন—'প্রেম'। যে প্রেমে কৃষ্ণ নিজেই বন্ধন প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণ এসেছেন নিজেকে দেওয়ার জন্য। তাতে "আমার অনুরাগ জাত হচ্ছে না।" সেইজন্য—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।

এই ভাবে নাম করতে হবে। তা গুরুদেব শিক্ষা দেন। গৌর প্রিয়জন শিক্ষা দেন।

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম।।
—(চৈ. চ. অন্ত্য ২০/২২)

যিনি এইভাবে আচরণ করে থাকেন তিনিই সর্বোত্তম। নাম গানকারীর নিকটে গর্ব, দম্ভ, অহঙ্কার, ঔদ্ধত্যর স্থান নেই। বৃক্ষের মত সহিষ্ণুতা আচরণ করতে হবে। দুই রকম সহিষ্ণুতা বৃক্ষ আচরণ করে।

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয়।।
—(চৈ. চ. অন্ত্য ২০/২৩)

"শুকিয়ে শুকিয়ে মরে গেলেও বৃক্ষ কারোর কাছে জল চায় না। বৃক্ষকে কেটে টুকরো টুকরো করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দিলেও প্রতিরোধ করে না।"

"যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন।
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ।।"
—(চৈ. চ. অন্ত্য ২০/২৪)

"সূর্য্যের প্রখর তাপ সহ্য করছে, বর্ষার প্রবল বারিধারা সহ্য করছে, শীতের প্রচুর ঠাণ্ডা সহ্য করছে, ইট-পাথরের টুকরোর আঘাত সহ্য করছে তথাপি নিজের সুশীতল ছায়া প্রদানের জন্য কুণ্ঠিত হয় না। এমনকি নিজের সব ধনও উজাড় করে দিয়েছে।"

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ' অধিষ্ঠান।।
—(চৈ. চ. অন্ত্য ২০/২৫)

"উত্তম হয়েও বৈষ্ণব নিরভিমান হবেন। কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জেনে, অর্থাৎ কৃষ্ণ সকলের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে আছেন এ কথা জেনে অপরকে সম্মান করবেন। অমানিনা মানদেন। অর্থাৎ নিজের জন্য সম্মানের দাবী করবেন না।"

এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয়।।
—(চৈ. চ. অন্ত্য ২০/২৬)

অন্য অভিলাষ তার কিছু নেই। একমাত্র তাঁর প্রার্থনা—'ভগবৎ ভক্তি'।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।

"হে জগদীশ, হে জগন্নাথ ! আমি ধন কামনা করি না, জন কামনা করি না, সুন্দরী স্ত্রী, কবিতা সুন্দরী কামনা করি না, এমনকি মুক্তিও কামনা করি না।"

"শুদ্ধভক্তি'দেহ মোরে, কৃষ্ণ, কৃপা করি।"
—(চৈ. চ. অন্ত্য ২০/৩০)

নিজকর্ম-গুণ দোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম গুণ গাই।।
—(গীতাবলী-ভক্তিবিনোদ)

এ হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের প্রার্থনা, শুদ্ধভক্তির কামনা। এরকম যখন হবেন তখন

সাধকের স্ব স্বরূপে চিৎ-বিলাস কৃষ্ণের নিকটে স্ব-কৃপা ভিক্ষা তিনি করবেন।

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়।।
"তোমার নিত্যদাস মুই, তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা।।
কৃপা করি' কর মোরে পদধূলী-সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন।।
পুনঃ অতি-উৎকণ্ঠা, দৈন্য হইল উদ্গম।
কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগে প্রেম-নামসংকীর্তন।।
—(চৈ. চ. অন্ত্য ২০/৩২-৩৫)

তাই প্রেম নাম-সংকীর্তন ভিক্ষাই কামনা করি—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

আমি আপনার নিত্য দাস। আপনাকে ভুলে ভবসমুদ্রে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। মায়াবদ্ধ হয়েছি। কৃপা করে আমাকে আপনার পদধূলি সদৃশ সমান মনে করুন। হে হরে, হে কৃষ্ণ, কৃপা করুন। হে রাধারাণী, হে কৃষ্ণ কৃপা করে আমাকে আপনার পদ সেবায় নিযুক্ত করুন। এ ভাবে যখন কৃষ্ণের কৃপায়, গৌরপ্রিয়জনের আনুগত্যে নিরপরাধ নাম হবে তখন যে কেবল মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হবে তা নয়, সাধ্যবস্তু কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে পারবে। নামাভাসেই মুক্তি। নামাভাসের স্থিতি লাভ করতে পারলে মুক্তি লাভ করতে পারবে। তখন বদ্ধাবস্থা স্থিতি দূরীভূত হয়ে যাবে। তারপর যখন শুদ্ধনামের উদয় হবে তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রেম লাভ করতে পারবে। সেই সময় যে হরেকৃষ্ণ উচ্চারণ তা হবে রাধারাণীর বিপ্রলম্ভ ভাবিত ভাব। তা হচ্ছে শ্রীমান্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মুখোদ্গীর্ণ নাম।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

হে হরি, হে রাম, হে কৃষ্ণ। শ্রীমতী রাধারাণী ডাকতেন—হে হরি, হে রাম, হে কৃষ্ণ। যখন সেই ভাবটা আসবে তখন আসবে প্রেম। "নিরপরাধে নাম

লৈলে পায় প্রেমধন। মুখ্য পথে জীব পায় কৃষ্ণ প্রেম ধন।।" প্রেমের লক্ষণ প্রকাশ পাবে, যেটা কি স্বয়ং মহাপ্রভু প্রকাশ করেছিলেন। এ হল সাধ্য-সাধন। আর এই নামই হচ্ছে সাধ্য-সাধন। এই যে শুদ্ধ কৃষ্ণনাম—কীর্তনাখ্য ভক্তি হচ্ছে সাধন, গৌরাঙ্গের আনুগত্যে গৌর প্রিয়জনের আনুগত্যে নাম করলে তা হবে সাধ্য তথা কৃষ্ণ প্রেম মিলবে। তখন প্রেমর বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ পাবে।

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদ-রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি।।

একথা আসবে। "তব নাম-গ্রহণে"। হে নাথ, আপনার নাম গ্রহণে কখন আমার "নয়নং গলদশ্রু ধারয়া" হবে, অর্থাৎ আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হবে ? বর্ষার বারি ধারার ন্যায় অশ্রু বিগলিত হবে ? "গদ্গদ-রুদ্ধয়া গিরা" অর্থাৎ বাক্য নিঃসরণ-সময়ে বদনে গদ্গদ স্বর বার হবে ? "পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ"—আমার সমস্ত শরীর পুলকাঞ্চিত হবে ? এরূপ বাহ্য লক্ষণ আপনার নাম গ্রহণেতে কবে প্রকাশ পাবে ?

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
'দাস' করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন।।"
—(চৈ. চ. অন্ত্য ২০/৩৭)

এই প্রার্থনা হবে। সেই যে প্রেমধন, যে ধনেতে ধনী হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী। এই ধন কৃষ্ণের ছিল না, সেইজন্য রাধারাণীর প্রেমধনের ভাণ্ডার হতে চুরি করে এনে কৃষ্ণ ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাই প্রার্থনা করছেন—"'দাস' করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন।" এর পর প্রেম-ভক্তির অন্তর্লক্ষণ প্রকাশ পাবে।

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে।।

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের বিরহে নিমেষটা 'যুগ'বৎ বোধ হবে। 'যুগায়িতং নিমেষেণ।' 'চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।' তখন চক্ষুদ্বয় হতে বর্ষার ধারার ন্যায় জল প্রবাহিত হবে। 'শূন্যায়িতং জগৎ' অর্থাৎ গোবিন্দের বিরহে ত্রিজগৎ শূন্য-বোধ হবে। এই বিরহটা হচ্ছে শেষ পর্যায়ের শেষ কথা। 'হরি হরি বলিতে নয়নে

ববে নীর।' সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন নিজে হরি, কিন্তু হরি হরি বলে ক্রন্দন করছেন, অশ্রুধারা বর্ষণ করে কাঁদছেন। আর ঐ ভাবেই ভজন করতে হবে, তবেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি হবে।

উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ'-সম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন।
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন।।

—(চৈ. চ. অন্ত্য ২০/৪০, ৪১)

কৃষ্ণ বিরহের উদ্বেগে শ্রীগৌরাঙ্গ রাত্রে আর না শুয়ে দেওয়ালেতে মুখ-নাক ঘষতে লাগলেন ; যার ফলে মুখ-নাক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরে পড়তে লাগল। অর্দ্ধ রাত্রি হয়েছিল। প্রলাপ করছিলেন। সেই ভাবটা হচ্ছে "উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ'-সম।" ক্ষণটা যুগবৎ মনে হচ্ছে। কি ভাব ?—"বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়নে।" এ হচ্ছে কৃষ্ণ বিরহের অবস্থা। শ্রীমতী রাধারাণীর অবস্থা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভিতরে প্রদর্শিত হয়েছিল। কারণ তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে ভাবিত হয়েছিলেন বলে। তা না হলে 'মাধুর্য্যৈক নিলয় কৃষ্ণ'-কে লাভ করা যাবে না।

এতেক চিন্তিতে রাধার নির্মল হৃদয়।
স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদয়।।
এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইলা।
সখীগণ-আগে পৌঢ়ি শ্লোক যে পড়িলা।।

—(চৈ. চ. অন্ত্য ২০/৪৩, ৪৫)

যখন সখীরা শ্রীমতী রাধারাণীকে বললেন—'তুমি কৃষ্ণকে উপেক্ষা কর', তখন শ্রীমতী রাধারাণীর নির্মল হৃদয়ে স্বাভাবিক প্রেমের স্বভাব উদিত হল। তাই তাঁর মন অস্থির হল। তাই সখীদের কাছে তিনি যে পৌঢ়ি শ্লোকটি আবৃত্তি করেছিলেন, সেই পৌঢ়ি শ্লোকটি শ্রীমন্ মহাপ্রভু উচ্চারণ করে বলতে লাগলেন—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎ প্রাণনাথস্তু স এব না পরঃ।।"

—(শিক্ষাষ্টকম্ - ৮ শ্লোক)

অর্থাৎ—যখন সখীরা বললেন—হে রাধে, তুমি কৃষ্ণকে ত্যাগ কর। তখন প্রত্যুত্তরে শ্রীমতী রাধারাণী বললেন,—"না, আমি কৃষ্ণকে উপেক্ষা করতে পারব না। সেই কৃষ্ণ এই চরণ সেবিকা দাসীকে গাঢ় আলিঙ্গন করুন বা পাদরে পেষণ করুন, অথবা 'অদর্শনান্মর্মহতাং করোতু'—দর্শন না দিয়ে মর্মাহত করে মারুক, 'যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো'—তিনি লম্পট পুরুষ, আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করুন না কেন, তিনি অন্য কেউ নন, আমারই প্রাণনাথ। তাই তাঁকে আমি উপেক্ষা কিংবা ত্যাগ করতে পারব না।" এ হচ্ছে শেষ কথা।

অদ্ভুত, অনন্ত, পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা।।
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্যামৃত আস্বাদে সকলি।।

—(চৈ. চ. আদি ৪/১৩৮-১৩৯)

এ হচ্ছে সেই স্বয়ং মাধুর্য্যৈক-নিলয় কৃষ্ণের স্বগতোক্তি ও ভাবনা। বলা হয়েছে—

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের, অপূর্ব্ব তার বল।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল।।
কৃষ্ণের মাধুর্যে কৃষ্ণে উপজয় লোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে, মনে রহে ক্ষোভ।।

—(চৈ. চ. আদি ৪/১৫৭-১৫৮)

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের স্বগত ভাবনা। "অপূর্ব মাধুরী কৃষ্ণের, অপূর্ব তার বল। যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল।" স্ব-মাধুর্য শ্রবণেই মন টলমল হয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণের মাধুর্যে কৃষ্ণে উপজয় লোভ।' কৃষ্ণের মাধুর্যে কৃষ্ণ নিজেই লোভান্বিত হন। 'সম্যক আস্বাদিতে নারে, মনে রহে ক্ষোভ।' কিন্তু নিজের মাধুর্য নিজে আস্বাদন করবেনই বা কেমন করে? নিজের মাধুর্য তো নিজে আস্বাদন করতে পারলেন না। তাই সেজন্য মনেতে ক্ষোভ থেকে গেল। এই অভাব পূর্ণ হল

না। এই হেতু তিনি গৌরাবতার হলেন। 'হরি হরি বলিতে নয়নে ঝরে নীর।' নিজে হরি, কিন্তু 'হরি হরি', 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে ক্রন্দন করছিলেন। নিজের মাধুর্য আস্বাদন করার যে বাঞ্ছা অপূর্ণ ছিল, তা গৌরলীলায় পরিপূর্ণ হল। তাই শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যেরূপ ভজন প্রণালী শিক্ষা দিয়েছেন সেইরূপ ভজন করলে 'মাধুর্য্যৈক নিলয় কৃষ্ণ'কে লাভ করা যাবে।

(হরিবোল)

প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণ

কোন এক সময় মাঘমাসে তীর্থশ্রেষ্ঠ প্রয়াগে মুনিশ্রেষ্ঠগণ প্রাতঃস্নান সমাপনান্তে শ্রীমাধবের সম্মুখে উপবেশনপূর্বক আনন্দাবেশে নিজেদেরকে কৃতার্থ মনে করে একজন আর একজনকে প্রশংসা করে বলতে লাগলেন, 'তুমি কৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত', 'তুমি কৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত'। এমন সময় সেখানে এক ভক্ত বিপ্র ব্রাহ্মণ-ভোজন করাবার জন্য দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট উপস্থিত হলেন। বিপ্র সপরিবার সহ স্নানাদিক্রিয়া সমাপন করে একটি সিংহাসন নির্মাণ-পূর্বক তাকে গোময় দ্বারা লেপন করলেন। সেই সিংহাসনোপর শালগ্রাম শিলারূপী শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ স্থাপন করে আনন্দচিত্তে যথাবিধিপূর্বক ভক্তি সহকারে অন্ন বস্ত্রাদি বিবিধ উপচার সামগ্রী সমর্পণ পূর্বক প্রভুর অর্চ্চন করলেন এবং তারপর বৈষ্ণবদের পদধৌত করে জল পান করলেন ও ভগবানের মত পূজা করে তাঁদেরকে ভোজন করালেন। তারপর তিনি দরিদ্র, ক্ষুধার্ত, কুকুর, শৃগাল, পক্ষী, কীট ও পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীদেরকেও যথাযোগ্যভাবে ভোজন করিয়ে পরিতৃপ্ত করলেন। বিপ্র ভগবানকে প্রণাম করে নিজগৃহে গমনোদ্যত হলে শ্রীনারদ মুনি ঠিক সেই সময়ে তাঁর নিকটে এসে পৌছলেন এবং বিপ্রকে এতাদৃশ ভক্তি দেখে বললেন—

''ভবান্ বিপ্রেন্দ্র কৃষ্ণস্য মহানুগ্রহভাজনম্।
যস্যেদৃশং ধনং দ্রব্যমৌদার্য্যং বৈভবং তথা।।''

—(শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত - ১/১/২৮)

হে বিপ্রবর! আপনি শ্রীকৃষ্ণের মহানুগ্রহ পাত্র, কারণ এই তীর্থরাজ প্রয়াগে আপনার এরূপ ধন, দ্রব্য, ঔদার্য ও বৈভব দর্শন করলাম। শ্রীনারদ মুনির এই কথা শ্রবণ করে বিপ্রবর বললেন—হে স্বামিন ! আপনি আমাতে কৃষ্ণের কৃপার লক্ষণ কি দেখলেন ? আপনি যা বললেন আমি কিন্তু সেরূপ ভক্তির পাত্র নই। আমার কি-ই বা ভক্তি আছে ? তারপর বিপ্র বললেন—

কিন্তু দক্ষিণদেশে যো মহারাজো বিরাজতে।
স হি কৃষ্ণকৃপাপাত্রং যস্য দেশে সুরালয়াঃ।। —(ঐ ১/১/২৯)

কিন্তু হে মুনিবর দক্ষিণ দেশে যে মহারাজ অবস্থান করছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র, তাঁর রাজ্যে অসংখ্য দেবালয় রয়েছে। সেই রাজ্যে সর্বত্র ভিক্ষুক, অভ্যাগত ব্যক্তিরা শ্রীকৃষ্ণার্পিত অন্ন অর্থাৎ মহাপ্রসাদ আদি ভোজন করে সর্বদা পরম সুখে ভ্রমণ করছেন। তাঁর রাজধানীতে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান্ করুণাবশতঃ স্থিরবিগ্রহরূপে অবস্থান করছেন। সেখানে বহু মহোৎসব হচ্ছে। সেখানে পুণ্ডরীকাক্ষকে দর্শন করার জন্য বহু সাধু-সন্ত সমাগত। সেই অচ্যুতপ্রিয় রাজা নিরহঙ্কার এবং সর্বদা ভগবান্ শ্রীঅচ্যুতের অর্চ্চনেতে নিযুক্ত রয়েছেন। তিনিই হচ্ছেন ভগবানের অতি প্রিয় ভক্ত।

তারপর নারদ মুনি সেই মহারাজকে দর্শন করবার জন্য তাঁর রাজধানীতে প্রবেশ করলেন এবং সেই মহারাজের সকল গুণরাশি বিস্তারপূর্বক বর্ণনা করতে লাগলেন এবং তাঁকে বার বার আলিঙ্গন করে বহু প্রশংসা করলেন। তারপর রাজা বললেন, হে দেবর্ষি! আপনি এই অধম মানুষটাকে কেন শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র বলে মনে করছেন। আমি মানব, আমার আয়ু অল্প, অতি অল্প ঐশ্বর্যবান্, কর্ম-পরাধীন, ত্রিতাপে পীড়িত। সুতরাং আমি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র হিসাবে অযোগ্য। মহারাজ তারপর কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, হে মুনিবর!

দেবা এব দয়াপাত্রং বিষ্ণোর্ভগবতঃ কিল।
পূজ্যমানা নরৈর্নিত্যং তেজোময়শরীরিণঃ।
নিষ্পাপাঃ সাত্ত্বিকা দুঃখরহিতাঃ সুখিনঃ সদা।
স্বচ্ছন্দাচারগতয়ো ভক্তেচ্ছাবরদায়কাঃ ।। —(ঐ ১/১/৪৬)

প্রকৃতপক্ষে দেবতারাই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর দয়ার পাত্র, কারণ তাঁরা মানুষদের দ্বারা নিত্য পূজিত হন। তাঁরা সর্বদা সুখী, তাঁদের শরীর তেজময়, তাঁরা নিষ্পাপ, সাত্ত্বিকপ্রকৃতি, দুঃখরহিত। এই ভারতবর্ষে বহু পুণ্য কর্ম করলে, সেই পুণ্যের ফল স্বরূপ স্বর্গলোকে সুদীর্ঘকাল বাস করেন। হে মুনি! সেই স্বর্গের দেবতাদের মধ্যে পুরন্দর নামক ইন্দ্রই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। তিনি ত্রিলোকের ঈশ্বর। তাঁর পরম সৌভাগ্যের কথা আর কি বলব? ভগবান্ স্বয়ং বামনদেব তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্ব অঙ্গীকার করে আজ্ঞাধীন হয়ে রয়েছেন।

তারপর নারদমুনি তা শ্রবণ করে স্বর্গে গমন করলেন এবং দেব সভার মধ্যে সুশোভিত শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করলেন। দেববৃন্দ পুষ্প, ভূষণ, বসন দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করছেন। সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ বিবিধ স্তব করছেন। দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীভগবানের পার্শ্বে অবস্থিত হয়ে বারংবার মাহাত্ম্য কীর্তন করে মহা আনন্দেতে নয়ন হতে অশ্রুধারা বর্ষণ করছেন। তারপর ভগবান নিজালয়ে গমন করলেন। নারদ মুনি দেবরাজকে আলিঙ্গন করে তাঁর মহাসৌভাগ্যের কথা বর্ণনা করতে লাগলেন। তারপর ইন্দ্র লজ্জাবশত ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন,—হে দেবর্ষি! আপনি কি আমাকে উপহাস করছেন? আপনি কি স্বর্গ রাজ্যের সংবাদ জানেন না? যদিও প্রভু আমাদের সেবা গ্রহণ করছেন তথাপি তিনি আমাদেরকে বলেছেন,—"যদি আমি কখন না আসি তবে তোমরা ব্রহ্মা অথবা শিবের পূজা করবে।" অতএব এই শাস্ত্র বচনানুসারে আমাদের পিতামহ ব্রহ্মা শ্রীহরির কৃপাপাত্র বলে জানবে, কারণ তিনি লক্ষ্মীকান্তের পুত্র। শ্রীনারদ মুনি ইন্দ্রের সকল কথা শ্রবণ করে সত্বর ব্রহ্মালোকে গমন করলেন।

সেখানে ব্রহ্মর্ষিগণ নিরন্তর ভক্তিসহকারে যে সমস্ত মহাযজ্ঞ বিস্তৃতভাবে অনুষ্ঠান করছেন, তার সুমহৎ শব্দ তিনি দূর হ'তে শ্রবণ করতে লাগলেন। তারপর সেই যজ্ঞস্থলে পরমেশ্বর প্রসন্ন বদনে লক্ষ্মীসহ আবির্ভূত হলেন। পরে মহাপুরুষ পদ্মযোনি ব্রহ্মার সন্তোষ বিধানের জন্য নিবেদিত দ্রব্য-সমূহ নিজ সহস্র হস্ত দ্বারা সহস্র বদনে ভোজন করলেন এবং যজমানদেরকে অভিলাষিত বর দান করে শয়নগৃহে গমন করলেন। তারপর শ্রীব্রহ্মা নিজের আসনে সুখে উপবেশন করে নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে রত হ'লে তাঁর অষ্টনয়ন থেকে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। পিতার এরকম অবস্থা দেখে শ্রীনারদমুনি সম্মুখে গমনপূর্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করে বলতে লাগলেন—

ভবানেব কৃপাপাত্রং ধ্রুবং ভগবতো হরেঃ।
প্রজাপতিপতির্যো বৈ সর্বলোকপিতামহঃ।।
একঃ সৃজতি পাত্যত্তি ভুবনানি চতুর্দশ।
ব্রহ্মাণ্ডস্যেশ্বরো নিত্যং স্বয়ম্ভুর্যশ্চ কথ্যতে।। —(ঐ ১/২/২৭)

হে প্রভু! আপনিই ভগবান্ শ্রীহরির একমাত্র কৃপাপাত্র। যেহেতু আপনি

প্রজাপতিদের পতি, সকল লোকের পিতামহ এবং আপনি একাই এই চতুর্দশ ভুবনের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। তাই আপনি নিত্যকাল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ও স্বয়ম্ভু নামে অভিহিত। আপনার চতুর্মুখ হতে বেদ প্রকাশিত হয় এবং পুরাণ সকল আপনার সভাতে মূর্ত্তিমান হয়ে বিরাজ করেন। মদ, মাৎসর্য রহিত সাধুরা বিশুদ্ধভাবে শতজন্ম নিজ নিজ বর্ণাশ্রমধর্ম আচরণের ফলরূপে আপনার এই ব্রহ্মালোক প্রাপ্ত হন। অতএব সত্যই আপনি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়পাত্র। তারপর শ্রীনারদমুনির মুখে এরূপ বাণী শ্রবণ করে শ্রীব্রহ্মাজী বলতে লাগলেন—

শৃণ্বন্নেব স তদ্বাক্যং দাসোঽস্মীতি মুহুর্বদন্।
চতুর্বক্ত্রোঽষ্টকর্ণানাং পিধানে ব্যগ্রতাং গতঃ।।
অশ্রব্যশ্রবণাজ্জাতং কোপং যত্নেন ধারয়ন্।
স্বপুত্রং নারদং প্রাহ সাক্ষেপং চতুরাননঃ।। —(ঐ ১/২/৩৫)

'আমি তাঁর দাস' এই কথা বার বার বলতে বলতে হস্তদ্বারা নিজের অষ্টকর্ণ আচ্ছাদন করলেন। তিনি এরকম অশ্রোতব্য-বাক্য শ্রবণ-জনিত ক্রোধকে বহু যত্নে সম্বরণপূর্বক নিজপুত্র নারদকে আক্ষেপ (তিরস্কার) সহকারে বলতে লাগলেন,—হে বৎস নারদ! 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই কথা আমি কি তোমাকে তোমার বাল্যকাল হতে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা সর্বদা সর্বতোভাবে জ্ঞাত করাইনি। সেই শ্রীকৃষ্ণের শক্তি—মহামায়া; তিনিই (মহামায়াই) তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) দৃষ্টিপথে অবস্থান করে দাসীর মতো নিজ ত্রিগুণ (রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ) দ্বারা যথাক্রমে এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করছেন।

তস্যা এব বয়ং সর্বেঽপ্যধীনা মোহিতাস্তয়া।
তন্ন কৃষ্ণকৃপালেশস্যাপি পাত্রমবেহি মাম্।। —(ঐ ১/২/৩৮)

আমরা সকলেই সেই মায়ার দ্বারা মোহিত ও তাঁর অধীন। অতএব আমাকে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র বলে মনে করবে না। বিশেষ করে আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের আবশ্যকীয় দ্রব্য পূরণ করার জন্য সদা বিহ্বল হয়ে নিজ লোকের বিনাশ চিন্তায় অভিভূত হয়ে সর্বদা সর্ব সংহারকারী মহাকালের ভয়ে ভীত হয়ে কেবল মুক্তিই কামনা করছি। এই মুক্তির জন্যই আমি ভগবানের পূজা করছি এবং অন্য সকলকে তা-ই করাচ্ছি। দুষ্ট হিরণ্যকশিপু আমার কাছ থেকে বরপ্রাপ্ত হয়ে সকল লোককে কষ্ট দিল। প্রভু শ্রীনৃসিংহদেব রূপে প্রকটিত হয়ে এরকম বর না দেওয়ার জন্য আমাকে উপদেশ দিলেন; কিন্তু তথাপি আমি রাবণাদি দুষ্টদেরকে বর প্রদান করেছি। আমার প্রদত্ত অধিকারে ইন্দ্র আদি দেবতারা মদমত্ত হয়ে স্বয়ং ভগবানের কাছে অপরাধ করেছে।

ইন্দ্র গোবর্ধন-পূজাকালে মহাবৃষ্টি করেছে, বরুণ নন্দরাজকে অপহরণ করেছে, যমরাজ প্রভুর গুরুপুত্রকে অনুচিৎরূপে সংহার করেছে এবং কুবেরও নিজের অনুচর দুরাচার শঙ্খচূড় দ্বারা গোপীহরণাদি-রূপ দুষ্কর্মদ্বারা প্রভুর প্রতি অপরাধ করেছে। এই সমস্ত অপরাধের জন্য দায়ী আমি। আমি নিজে প্রভুর গোবৎস হরণ করেছি, কারণ আমি অতি ধৃষ্ট। অতএব—

অথ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যেঽস্মিন্ তাদৃঙ্নেক্ষে কৃপাস্পদং।
বিষ্ণোঃ কিন্তু মহাদেব এব খ্যাতঃ সখেতি যঃ।।
—(ঐ ১/২/৫০)

কিন্তু মহাদেবই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর একমাত্র কৃপাপাত্র। অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তাঁর মত কৃপাপাত্র আর কাউকে দেখি না। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের মকরন্দ পান করে সদা উন্মত্ত হয়ে ধর্মাদি পুরুষার্থবর্গ ও পরম ঐশ্বর্যাদি ভোগ ঘৃণার সঙ্গে পরিত্যাগ করেছেন। দিগম্বর বেশে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মসম্ভূতা শ্রীগঙ্গাকে নিজের মস্তকে ধারণপূর্বক হর্ষভরে নৃত্য করতে করতে ব্রহ্মাণ্ডকেই কম্পিত করছেন। শিবলোকনিবাসী সকলেই মুক্ত। শ্রীভগবান্ নিজের প্রতি কৃত জীবের অপরাধ ক্ষমা করেন, কিন্তু শ্রীশিবের প্রতি কৃত অপরাধ ক্ষমা করেন না। অমৃত মন্থনকালে শ্রীকৃষ্ণ নিজে সাক্ষাৎ উপস্থিত থেকেও প্রজাপতিদের দ্বারা আরাধনা করিয়ে গৌরীপ্রাণবল্লভ শ্রীশিবকে সেখানে আনয়নপূর্বক তাঁকে কালকূট বিষ পান করিয়ে জগতে 'নীলকণ্ঠ'-নামে বিভূষিত ও অভিষিক্ত করেছেন। তাই শ্রীশিবজীর প্রতি শ্রীহরি পরম দয়ালু। শ্রীনারদ মুনি এই কথা শ্রবণ মাত্রেই শিবলোকে গমন করলেন। তারপর দেবর্ষি শিবলোকে উপস্থিত হয়ে দূর হতে দেখলেন শ্রীশিবজী শ্রীহরির ভাবে (প্রেমে) আবিষ্ট হয়ে শ্রীসঙ্কর্ষণের আরাধনা করছেন এবং কখনও কখনও নৃত্যগীত করছেন তো কখনও কখনও প্রেমে শ্রীহরির জয়ধ্বনি দিচ্ছেন। এই প্রকার লীলা দর্শন করে শ্রীনারদ অতিশয় আনন্দিত হলেন এবং প্রণাম করে বীণাবাদন করতে

লাগলেন। তারপর শ্রীনারদ শ্রীশিবজীর পাদপদ্ম-রাগ স্পর্শ করবার কামনায় তাঁর সমীপে আগমন করে তাঁর বহু গুণগান করতে লাগলেন। শ্রীনারদ বললেন,—আপনি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সুতরাং প্রভুর প্রতি আপনার অপরাধের কোনও অবকাশ নেই। বৈষ্ণবদ্রোহী গার্গ্য অর্থাৎ গর্গতনয় প্রভৃতি অতি কষ্টসাধ্য তপস্যাদির দ্বারা আপনার আরাধনা করেছিল। আপনি তাদেরকে নিশ্ছিদ্র বর প্রদান করেননি। কিন্তু চিত্রকেতু প্রভৃতি ব্যক্তিরা আপনার নিন্দা করলেও আপনি তাদের প্রতি কোন ক্রোধ প্রকাশ করেননি।

অহো ব্রহ্মাদিদুষ্প্রাপে ঐশ্বর্যে সত্যপীদৃশে।
তৎ সর্বং সুখমপ্যাত্মমনাদৃত্যাবধূতবৎ।।
ভাববিষ্টঃ সদা বিজ্ঞোর্মহোন্মাদগৃহীতবৎ।
কোঽন্যঃ পত্ন্যা সমং নৃত্যেদ্গণৈরপি দিগম্বরঃ।।
দৃষ্টোঽদ্য ভগবদ্ভক্তিলাম্পট্যমহিমাদ্ভুতঃ।
তদ্ভবানেব কৃষ্ণস্য নিত্যং পরমবল্লভঃ ।। —(ঐ ১/৩/২১)

"অহো! আপনার কাছে ব্রহ্মাদির দুষ্প্রাপ্য ঐশ্বর্য থাকলেও আপনি সমস্ত ঐশ্বর্য সুখ অনাদর করে অবধূতের মত দিগম্বর অবস্থায় থাকছেন। আপনার মত অপর কোন ব্যক্তি নিজের পত্নীর সঙ্গে নিজগণসহ পরিবৃত হয়ে বিষ্ণুভক্তিতে আবিষ্ট হয়ে মহা উন্মাদগ্রস্ত ব্যাক্তির মতো ভাবাবেশে নৃত্য করতে পারে? আমি আজ আপনার এই অদ্ভুত ভগবদ্ভক্তি-রসিকতার মহিমা সাক্ষাৎ ভাবে অনুভব করলাম। অতএব আপনি নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরম প্রিয় পাত্র।" শ্রীনারদ মুনির এই কথা শ্রবণ করে শ্রীশিবজী কর্ণদ্বয় হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করে নিম্নলিখিতভাবে বলতে লাগলেন—

ময়ি নারদ বর্তেত কৃপালেশোঽপি চেদ্ধরেঃ।
তদা কিং পারিজাতোষাহরণাদৌ ময়া রণঃ।।
কিং মামারাধয়েদ্দাসং কিমেতচ্চাদিশেৎ প্রভুঃ।
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।। —(ঐ ১/৩/২৮)

"হে নারদ মুনি! যদি আমার প্রতি শ্রীহরির লেশমাত্র কৃপা থাকত, তাহলে কি পারিজাত ও ঊষাহরণকালে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতাম? তিনি কি দাস আমাকে আরাধনা করতেন? অথবা প্রভু কি আমাকে এই আদেশ করতেন,—

"হে শিব! তুমি স্বকল্পিত আগমশাস্ত্র প্রণয়ন করে মানুষদেরকে আমার প্রতি বিমুখ কর?" অতএব তুমি কিরূপে আমাকে প্রশংসা করছ ? এই প্রশংসা কর্ণপীড়াদায়ক।

তৎ কৃষ্ণপার্ষদশ্রেষ্ঠ মা মাং তস্য দয়াস্পদম্।
বিদ্ধি কিন্তু কৃপাসারভাজো বৈকুণ্ঠবাসিনঃ।। —(ঐ ১/৩/৩০)

"অতএব হে শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ শ্রেষ্ঠ নারদ! আমাকে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পাত্র বলে মনে কর না। বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তরাই প্রভুর কৃপা সারভাজন। যাঁরা সকল আশা পরিত্যাগ করে ভক্তিসহকারে প্রিয় শ্রীহরির আরাধনা করেন এবং যাঁরা সকল অভিমান পরিত্যাগ করে সমস্ত ভয় বর্জিত গুণাতিত, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠ পদপ্রাপ্ত হয়েছেন, অহো! বৈকুণ্ঠলোকের অধিবাসীদের প্রতি যেমন কারুণ্য মহিমা নিরন্তর বিরাজ করে, তেমনি কারুণ্য কি অন্য কোন স্থানে দেখতে পাওয়া যায়? সেই বৈকুণ্ঠে মহানন্দে নিরন্তর প্রভুর নাম সংকীর্তনরূপ প্রেমামৃত বহনশীল। বিবিধ ভজন ছাড়া অন্য কোন চেষ্টা নেই। অতএব বৈকুণ্ঠবাসীরা প্রভুর অতি প্রিয়। তারপর পার্বতী দেবী বললেন—

তত্রাপি শ্রীর্বিশেষেণ প্রসিদ্ধা শ্রীহরিপ্রিয়া।
তাদৃগ্বৈকুণ্ঠ-বৈকুণ্ঠবাসিনামীশ্বরী হি যা।। —(ঐ ১/৩/৪৮)

"হে নারদ! শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে শ্রীমহালক্ষ্মী শ্রীহরির অতি প্রিয়। যেহেতু তিনি ঐ প্রকার বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠবাসীদের ঈশ্বরী, যাঁর কৃপাকটাক্ষে ইন্দ্রাদি লোকপালেরা বিভূতি প্রাপ্ত হন এবং তাঁর অনুগ্রহে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি সিদ্ধ হয়ে থাকে। এই মহালক্ষ্মী শ্রীভগবানের রম্য বক্ষঃস্থলে নিত্য অবস্থান করেন।" এইভাবে পার্বতী বর্ণিত মহালক্ষ্মীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করে শ্রীনারদ মুনি বৈকুণ্ঠবাসী, বৈকুণ্ঠেশ্বরীর জয়ধ্বনি দিয়ে বৈকুণ্ঠ লোকে গমনোদ্যত হওয়ার সময় শ্রীশিবজী তাঁর হস্তধারণ করে বললেন, হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জনের অবলোকনার্থ উৎকণ্ঠায় তোমার কি স্মৃতি শক্তি লোপ পেল? তোমার কি স্মরণ হচ্ছে না যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান পৃথিবীর অন্তর্বর্তী দ্বারকাপুরীতে বাস করছেন। মনে রাখ দ্বারকা পুরীতে শ্রীরুক্মিণীদেবীকেই স্বয়ং মহালক্ষ্মী বলে জানবে।

অতএব হে ব্রহ্মণ (নারদ)! এই স্থানে উপবেশন কর। আমি ধীরে ধীরে গোপনে তোমার কর্ণে একটি পরম রহস্য কথা বলছি তুমি পরম শ্রদ্ধা-

সহকারে তা শ্রবণ কর।

তত্তাততো মদ্‌গরুড়াদিতশ্চ
শ্রিয়োঽপি কারুণ্যবিশেষপাত্রম্।
প্রহ্লাদ এব প্রথিতো জগত্যাং
কৃষ্ণস্য ভক্তো নিতরাং প্রিয়শ্চ।। —(ঐ ১/৩/৫৮)

হে নারদ! তোমার জনক ব্রহ্মা, আমি (শিব), গরুড়াদি এবং লক্ষ্মীদেবী হতেও প্রহ্লাদই শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ অর্থাৎ অধিক কৃপাপাত্র বলে জগতে প্রসিদ্ধ। অতএব প্রহ্লাদই শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠভক্ত। তুমি কি ভগবানের বাক্যসকল বিস্মৃত হয়েছ?

"নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীঞ্চাপি যেষাং গতিরহং পরা।।"—(ঐ ১/৩/৫৯)

অর্থাৎ (ভগবান দুর্বাসাকে বলেছিলেন)—হে ব্রাহ্মণবর! "আমিই যাঁদের একমাত্র আশ্রয় এবং পরমগতি, সেই সাধুদের ছাড়া আমি নিজের শ্রীমূর্ত্তিকে এবং অত্যন্ত প্রিয়লক্ষ্মীকেও অভিলাষ করি না।" সেই সকল ভক্তদের মধ্যে প্রহ্লাদের ভাগ্য তর্কের অগোচর। অতএব হে নারদ! তুমি শীঘ্র সুতললোকে গমন কর। এই কথা শ্রবণ মাত্রেই শ্রীনারদ মুনি অতিশয় আশ্চর্য্য হয়ে শ্রীপ্রহ্লাদের দর্শনের জন্য সুতললোকে গমন করলেন।

বৈষ্ণব অগ্রগণ্য প্রহ্লাদ সেই সময় নির্জন স্থানে ভগবৎ পদাম্বুজ প্রেমে উল্লসিত হয়ে ধ্যানেতে নিমগ্ন ছিলেন। নারদ মুনির আগমনের কথা জেনে দণ্ডায়মান হলেন এবং তাঁকে প্রণাম করলেন। শ্রীপ্রহ্লাদ যত্ন সহকারে শ্রীনারদ মুনিকে আসনেতে বসালেন ও পূজা করলেন। তারপর শ্রীনারদ মুনি তাঁকে (প্রহ্লাদকে) বারংবার আলিঙ্গন করে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করে বলতে লাগলেন—

দৃষ্টশ্চিরাৎ কৃষ্ণকৃপাভরস্য পাত্রং ভবান্মে সফলঃ শ্রমোঽভূৎ।
আবাল্যতো যস্য হি কৃষ্ণভক্তির্জাতা বিশুদ্ধা ন কুতোঽপি যাসীৎ।।
—(ঐ ১/৪/২)

শ্রীনারদ বললেন— "হে বৎস প্রহ্লাদ! বহুকাল পরে আমি কৃষ্ণকৃপাপাত্র তোমার দর্শন পেলাম। আজ আমার শ্রম সফল হল। বাল্যকাল হতেই তোমাতে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি জাত হয়েছে। এরূপ ভক্তি আর কোথাও দেখা

যায়নি। তুমি শ্রীকৃষ্ণাবিষ্ট হয়ে আত্ম-বিস্মৃতিবশতঃ উন্মত্তের ন্যায় কখনও কখনও নৃত্য, কখনও কখনও গীত, কখনও কখনও ভজন করে সংসার ক্লেশ-সমূহ হতে সকল ব্যক্তিকে উদ্ধার এবং বিষ্ণুভক্তি বিস্তারপূর্বক তাদেরকে সুখী করেছ। তুমি এক সময়ে পীতবাস শ্রীনারায়ণের দর্শনার্থ নৈমিষারণ্যে গমনকালে পথে ছদ্মবেশী শ্রীনারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলে। সেই যুদ্ধে প্রীত হয়ে তিনি বলেছিলেন,—"প্রহ্লাদ আমি সর্বদাই তোমার কাছে পরাজিত।" হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ! তুমি ভগবান্ শ্রীমুকুন্দকে জয় করেছ, এ অপেক্ষা অধিক আর কি বলব? দৈত্যগণাধিপতি তোমার পৌত্র বলি তোমার প্রসাদে শ্রীভগবানকে বশীভূত করে নিজ দ্বার দেশে দ্বারপাল করে রেখেছে।

এই সমস্ত কথা শ্রবণ করে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বললেন,— হে শ্রীগুরুদেব, আপনি স্বয়ং সকল বিষয় বিচার করে দেখুন বাল্যকালে কৃষ্ণভক্তির জ্ঞান পরিস্ফুট হয় না। অধিকন্তু মহৎগণ যাকে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ বলে থাকেন তা এরূপ বিঘ্নদ্বারা পরাভব প্রভৃতি হওয়ার অনুমান করা যায় না। যাকে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ বলা হয় তা কেবল সেই তাঁদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে।

হনুমদাদিবত্তস্য কাপি সেবা কৃতাস্তি ন।
পরং বিঘ্নাকুলে চিত্তে স্মরণং ক্রিয়তে ময়া।। —(ঐ ১/৪/১৫)

অর্থাৎ হনুমান প্রভৃতি যে ভাবে প্রভুর সেবা করেছেন, আমি সেভাবে কোন সেবা করিনি, পরন্তু বিঘ্নাকুলচিত্তে তাঁকে কেবল স্মরণ করেছি। আর যখন প্রভু আমাকে রাজ্য প্রদান করলেন তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার প্রতি প্রভুর লেশমাত্র কৃপা নেই। শ্রীভগবানের কৃপা হলে রাজ্য-সম্পত্তি দূর হয়ে যায়, কিন্তু আমার তো সে সব রয়েছে। আমার অসুর প্রবৃত্তিও রয়েছে। প্রভু যদি আমার দ্বারদেশে থাকতেন, তাহলে তাঁর দর্শনের জন্য কি আমি নৈমিষারণ্যে যেতাম। হে নিরুপাধি কৃপার্দ্রচিত্ত আমার বহু দুর্ভাগ্যের কথা কি আর বর্ণনা করব? তাতে আপনার দুঃখ হবে। এ কথা শ্রবণ মাত্রে শ্রীনারদ মুনি আকাশমার্গে কিম্পুরুষ লোকে গমন করলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন শ্রীহনুমান বিচিত্র বন্যদ্রব্যসমূহ দ্বারা যেন সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মদ্বয়ের সেবা করছেন। গন্ধর্বরা রামায়ণ পাঠ করছেন। হনুমান তা শ্রবণ করে কম্প পুলকাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত আনন্দাশ্রু মোচন করছেন। তদ্দর্শনে শ্রীনারদ হৃদয়ে

আনন্দ অনুভব করে বললেন—"জয় শ্রীরঘুনাথ, জয় শ্রীজানকীকান্ত, জয় শ্রীলক্ষ্মণাগ্রজ। শ্রীহনুমান নিজের ইষ্ট প্রভুর (শ্রীরামচন্দ্রের) নাম-কীর্তন শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হয়ে দূর হতে উর্দ্ধে লম্ফ প্রদানপূর্বক শ্রীনারদের কণ্ঠদেশ ধারণ করে আলিঙ্গন প্রদান করলেন। তারপর শ্রীনারদ বললেন,—

শ্রীমন্ ভগবতঃ সত্যং ত্বমেব পরমপ্রিয়ঃ।
অহঞ্চ তৎপ্রিয়োঽভূবমদ্য যত্ত্বাং ব্যলোকয়ম্।। —(ঐ ১/৪/৪২)

অর্থাৎ—"হে শ্রীমন্! তুমি সত্যই শ্রীভগবানের পরম প্রিয় এবং আমিও আজ তোমাকে দর্শন করে প্রভুর প্রিয় হলাম।" তুমি শ্রীরঘুনাথের একাধারে দাস, সখা, আসন, ধ্বজা, বাহন সবকিছু। তুমি সর্বোতভাবে প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রভুর প্রিয় পাত্র হয়েছ। এ কথা শুনে শ্রীহনুমান বললেন, হে মুনিবর! "আমি অতি দীন, শ্রীরঘুনাথের পদাম্বুজ হতে বঞ্চিত, আপনি কেন আমাকে বিরহ স্মরণ করিয়ে রোদন করাচ্ছেন। আমি যদি তাঁর সেবক হতাম, তা হলে কি প্রভু আমাকে হঠাৎ পরিত্যাগ করে যেতেন? আমি অত্যন্ত অধম। অতএব—

সোঽধুনা মথুরাপুর্যামবতীর্ণেন তেন হি।
প্রাদুষ্কৃতনিজৈশ্বর্যপরাকাষ্ঠাবিভূতিনা।।
কৃতস্যানুগ্রহস্যাংশং পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
তুলয়ার্হতি নো গন্তুং সুমেরুং মৃদণুর্যথা।। —(ঐ ১/৪/৪৯)

"মহাপ্রভু বর্তমান মথুরাপুরীতে অবতীর্ণ হয়ে স্বীয় ঐশ্বর্য পরাকাষ্ঠা রূপ বিভূতি সকল প্রকাশ করেছেন। মহাত্মা পাণ্ডবদের প্রতি মহাপ্রভু যে অনুগ্রহ বিস্তার করেছেন, তাঁর তুলনায় আমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ধূলিকণা সদৃশ। তাই আপনি পাণ্ডবদের নিকটে গমন করুন। তারপর নারদমুনি পাণ্ডবদের রাজ্যে গমন করলেন। রাজধানীতে আগমনের সাথে সাথে শ্রীনারদ মুনিকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রণাম করলেন ও তাঁর পূজা আরাধনা করলেন। তারপর শ্রীনারদ বললেন—

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
যেষাং প্রিয়োঽসৌ জগদীশ্বরেশঃ।
দেবোগুরুর্বন্ধুষু মাতুলেয়ো
দূতঃ সুহৃৎ সারথিরুক্তিতন্ত্রঃ।। —(ঐ ১/৫/৫)

এই নরলোকে আপনারাই মহাভাগ্যবান্, কারণ জগদীশ্বর কৃষ্ণ আপনাদের প্রিয় ইষ্টদেবতা, গুরু, বন্ধুদের মধ্যে মাতুলেয়, দূত, সুহৃৎ, সারথি এবং এমনকি আজ্ঞাবহ সেবক। এইভাবে শ্রীনারদমুনির বহু প্রশংসা বাক্য শ্রবণ করে শ্রীযুধিষ্ঠির ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনপূর্বক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতে করতে মাতা, ভ্রাতা ও পত্নীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বললেন,—হে মুনিবর! আমাদের দশা দর্শন করে সাধারণ জনগণের শ্রীকৃষ্ণ ভজনের প্রবৃত্তি ও বিশ্বাস যেন হ্রাসই পাচ্ছে বলে বোধ হয়। অন্ন ছাড়া যেমন প্রাণীরা এবং জল ছাড়া যেমন মাছেরা বাঁচতে পারে না, ঠিক তেমনই আমরা কৃষ্ণ ছাড়া জীবন ধারণ করতে পারব না, কারণ কৃষ্ণ হচ্ছেন আমাদের প্রাণ; কিন্তু তিনি বর্তমান আমাদের বিপক্ষ সকল কৃষ্ণভক্তদেরকে বিনাশ করে আমাদেরকে রাজ্য প্রদান করে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর শোকে নিমজ্জিত করেছেন। আমাদের এই রাজ্য প্রাপ্তির জন্য দ্রোণ ভীষ্মাদি গুরুবর্গ, অভিমন্যু প্রমুখ পুত্রগণ এবং অন্যান্য বহু কৃষ্ণভক্ত সাধু মৃত্যু বরণ করেছেন; কিন্তু বর্তমান সাধুসঙ্গ তথা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে এই সংসারে ক্ষণকালের জন্য আমরা কিছু মাত্র সুখ লাভ করতে পাচ্ছি না। তাই আমরা কেমন করে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র? পরন্তু—

যাদবানেব সদ্বন্ধূন্দ্বারকায়ামসৌ বসন্।
সদা পরমসদ্ভাগ্যবতো রময়তি প্রিয়ান্।। —(ঐ ১/৫/৪৬)

বর্তমান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করে তাঁর পরম বন্ধু ও পরম সৌভাগ্যশালী প্রিয়তম যাদবদের সর্বদা সুখ প্রদান করছেন। অতএব আপনি সেই যাদবদের নিকট গমন করুন। এই কথা শুনে শ্রীনারদ মুনি অতিশীঘ্র দ্বারকাতে গমন করলেন।

দ্বারকায় শ্রীসুধর্মা নামক দেবসভাতে শ্রীযাদবগণ শ্রীউগ্রসেনকে বেষ্টন করে শোভা পাচ্ছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষা করছেন। তারপর শ্রীনারদ মুনি যাদবদের সৌভাগ্যের কথা বর্ণনা করতে লাগলেন। মহারাজাধিরাজ উগ্রসেনকে দর্শন করে শ্রীনারদ মুনি বললেন,"আপনি জগতে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাস্পদ রূপে প্রসিদ্ধ। আপনার এই সৌভাগ্যের মহিমা কে বর্ণনা করতে পারে? এই কথা শুনে শ্রীউগ্রসেন বললেন, হে মুনিবর। এ কথা সত্য, কিন্তু আমাদের মধ্যে শ্রীমন্ উদ্ধব শ্রেষ্ঠ, তিনি তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) মন্ত্রী, শিষ্য, ভৃত্য ও পরমপ্রিয়। উদ্ধবকে

ছেড়ে কখনই তিনি কোথায় যান না। ভগবান যদি কোথাও না যান, তাহলে তিনি উদ্ধবকে নিজের গমন যোগ্য স্থানেতে প্রেরণ করেন। শ্রী উদ্ধবের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলব? তিনি শৈশব কাল থেকে প্রভুর পাদপদ্ম সেবায় আবিষ্ট। অতএব আপনি উদ্ধবের নিকট গমন করুন। তারপর শ্রীনারদ উদ্ধবকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। সেইদিন কোন কারণবশতঃ বিমনা হয়ে শ্রীমন্ উদ্ধব অন্তঃপ্রকোষ্ঠে নিদ্রিত প্রভুর পার্শ্ব পরিত্যাগ করে অদূরে দ্বার দেশে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীবলদেব, শ্রীদেবকী শ্রীরোহিণী, শ্রীরুক্মিণী, শ্রীসত্যভামা প্রভৃতি মহিষীগণ, কংসমাতা পদ্মাবতী এবং অন্যান্য দাসীগণও উপবিষ্ট ছিলেন।

দেবর্ষি নারদ অশ্রুধারায় মুদ্রিত নয়নযুগল সযত্নে উন্মীলন করে উদ্ধবাদি সকলকে নমস্কার করে রোমাঞ্চ ও কম্পান্বিত দেহে গদ্‌গদ-স্বরে বলতে লাগলেন—

পূর্বে পরে চ তনয়াঃ কমলাসনাদ্যাঃ
সঙ্কর্ষণাদিসহজাঃ সুহৃদঃ শিবাদ্যাঃ।
ভার্যা রমাদয় উতানুপমা স্বমূর্তি-
র্ন স্যুঃ প্রভোঃ প্রিয়তমা যদপেক্ষয়াহো।। —(ঐ ১/৬/৯)

অহো! শ্রীকৃষ্ণের পূর্ববর্তী কমলাসনাদি ও পরবর্তী প্রদ্যুম্নাদি পুত্রগণ, সঙ্কর্ষণাদি ভ্রাতৃগণ, শিবাদি সখাগণ, রমাদি ভার্যাগণ, এমনকি অতি মনোরম নিজের বিগ্রহও উদ্ধব অপেক্ষা প্রিয়তম নন্। এ কথা শ্রবণ করে শ্রীমান উদ্ধব বল্লেন, হে সর্বজ্ঞ সত্যবাদী শ্রেষ্ঠ মহামুনিবর প্রভো! আপনি আমার মহাসৌভাগ্যের কথা শুনুন।

ইদানীং যদ্‌ব্রজে গত্বা কিমপ্যন্বভবং ততঃ।
মহাসৌভাগ্যমানো মে স সদ্যশ্চূর্ণতাং গতঃ।। —(ঐ ১/৬/১৬)

অর্থাৎ সম্প্রতি আমি ব্রজে গমন করে যে অনির্বচনীয় প্রেমের বিষয় অনুভব করেছি, তার ফলে আমার মহাসৌভাগ্য গর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে। ব্রজজনের কৃষ্ণানুরাগের বৃত্তান্ত একবার শ্রবণ করুন। শ্রীরোহিণী দেবী বললেন, হে হরিদাস উদ্ধব! তুমি ক্ষান্ত হও। আমি যাঁদের চিন্তা পরিত্যাগ করে একটু সুখী হয়েছি, সেই সৌভাগ্য গন্ধরহিত, দৈন্য সাগরে নিমগ্ন, ভীষণ বিরহ বিষে

জর্জরিত ব্রজবাসীদের কথা স্মৃতিপথে আনয়ন কর না। শ্রীযশোদার রোদনে কঠিন পাষাণও রোদন করছিল। সু-রমণীয় ব্রজমণ্ডল আজ বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আজ গোপীরা জীবিত কি মৃত, তাঁদের কথা কে বা মুখে বর্ণনা করতে পারবে।

মোহিতা ইব কৃষ্ণস্য মঙ্গলাং তত্র তত্র হি।
ইচ্ছন্তি সর্বদা স্বীয়ং নাপেক্ষন্তে চ কর্হিচিৎ।। —(ঐ ১/৬/২৭)

ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যে মোহিত হয়ে কেবল তাঁরই মঙ্গল কামনা করতেন, কখনই নিজেদের মঙ্গল চিন্তা করতেন না। সেই সব কথা শ্রবণ করে কংসের মাতা পদ্মাবতী মাথা কাঁপাতে কাঁপাতে বলতে লাগলেন, রোহিণী তুমি সেই ব্রজবাসীদেরকে প্রশংসা করছ। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকাল থেকে কণ্টকারণ্যে গোপদের গোসকল পালন করেছে। সেই কণ্টকারণ্যে গোচারণকালেও তারা শ্রীকৃষ্ণকে পাদুকা প্রদান করেনি, বরং যদি সে কখনও ক্ষুধাতুর হয়ে কিঞ্চিৎ গোরস অর্থাৎ দুধ পান করত, তাহলে তখনই তাদের স্ত্রী-সকল বহু সময় ধরে এই শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করে রাখত। ব্রজবাসীদের প্রীতির পাত্রী শ্রীরোহিণী দেবী পদ্মাবতীর বাক্য গ্রাহ্য না করে আবার বলতে লাগলেন, উদ্ধব। তোমার প্রভু শত্রুদের বিনাশ করে যাদবদের রাজধানী মথুরা প্রাপ্ত হয়ে রাজরাজেশ্বর হয়েছে এবং বর্তমান দ্বারকাতে এসে সুখে বিশ্রাম করছে। তার কি আর ব্রজবাসীদের কথা মনে আছে? শ্রীরোহিণী দেবীর বাক্য সহ্য করতে না পেরে শ্রীরুক্মিণী দেবী বললেন, হে মাতঃ! আপনি নবনীত অপেক্ষাও অত্যন্ত কোমল প্রভুর হৃদয়ের ভাব কিছুমাত্র না জেনেই কেন এরূপ কথা বলছেন?

কদাচিন্মাতর্মে বিতর নবনীতন্ত্বিতি বদেৎ।
কদাচিচ্ছ্রীরাধে ললিত ইতি সম্বোধয়িত মাম্।।
কদাপীদং চন্দ্রাবলি কিমিতি মে কর্ষতি পটম্।
কদাপ্যস্রাসারৈর্মৃদুলয়তি তূলীং শয়নতঃ।। —(ঐ ১/৬/৩৯)

শ্রীরুক্মিণী দেবী বললেন,—কখনও কখনও বলেন, 'হে মাতঃ! আমাকে নবনী দাও'। আবার কখনও কখনও আমাকে হে রাধে! হে ললিতে! বলে সম্বোধন করেন। কখনও কখনও বলেন, হে চন্দ্রাবলী! 'তোমার এ কিরূপ আচরণ' এই কথা বলে আমার বস্ত্রাঞ্চল ধরে আকর্ষণ করেন। কখনও কখনও তিনি নিদ্রিতাবস্থায় নয়নাশ্রুধারায় শয়নের বালিশ আর্দ্র করে থাকেন। কখনও

কখনও তিনি নিদ্রা হতে উঠে হঠাৎ আর্তস্বরে রোদন করতে থাকেন। আজকেও তিনি রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে কি যেন দেখে শোকে ক্রন্দন করছিলেন এবং দিবসেও সেই শোকে অন্যমনস্কতাবশতঃ আকুল হয়ে নিজের উত্তরীয় (চাদর) দিয়ে বদনকমল আবৃত করে নিদ্রিতের মত পালঙ্কে শয়ন করে আছেন। এ কথা শুনে সত্যভামা বললেন, হে দিদি! প্রভু নিদ্রিতাবস্থায় যে এ রকম আচরণ করেন কেবল তাই নয়, জাগ্রতাবস্থায়ও তিনি কোন কোন বিষয় নিজের অন্তরে বারংবার চিন্তা করে নিদ্রিতের মতো সেই সেই রকম আচরণ করে থাকেন। আমরা নামে মাত্রই তাঁর পত্নী রয়েছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই সমস্ত গোপ-স্ত্রীদের দাসীরাও আমাদের অপেক্ষা তাঁর অধিক প্রিয়।

রুক্মিণী সত্যভামাদির বাক্য সহ্য করতে না পেরে বলদেব ক্রোধের সঙ্গে বললেন,—হে বধূগণ! শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার স্বপ্ন চরিতাদি কপট চাতুরী, কেবল আমাদেরকে বঞ্চনা করার জন্য। নচেৎ সে ব্রজের এরূপ অবস্থায় ব্রজেতে গমন না করে কেবল মুখে বলে থাকে—'আমি যাব' 'আমি যাব'। এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রীকৃষ্ণ শয্যাবস্থায় শয়নাভিনয় করে শ্রবণ করছিলেন। হঠাৎ শয্যা থেকে উঠে প্রিয়জনদের প্রেমাধীনবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে করতে শয়নগৃহ হতে বাইরে এলেন এবং গদ্‌গদ স্বরে বলতে লাগলেন—

সত্যমের মহাবজ্রসারেণ ঘটিতং মম।
ইদং হৃদয়মদ্যাপি দ্বিধা যন্ন বিদীর্যতে।। —(ঐ ১/৬/৫২)

"সত্যই আমার হৃদয় মহাবজ্রসারের দ্বারা নির্মিত হয়েছে, যেহেতু আজও আমার হৃদয় দুই ভাগে বিদীর্ণ হচ্ছে না।" ব্রজবাসীদের কাছে আমি ঋণী। হে উদ্ধব! তুমি সর্বজ্ঞ, এখন বল—এ অবস্থায় আমার কি করা কর্তব্য? এই কথা শুনে পদ্মাবতী বললেন,—"হে কৃষ্ণ! তুমি কেন অনুতাপ করছ? তোমরা দুই ভাই শ্রীনন্দগোপের গৃহে যে একাদশ বর্ষকাল ভোজন করেছ তা তাঁর (নন্দগোপের) পাপ্য রয়েছে। তবে তোমরা যে তাঁর (নন্দের) গোপালন করেছ, সেজন্য তোমাদেরও তাঁর কাছে বেতনরূপে কিছু প্রাপ্য আছে। তিনি তা দিন, বা না দিন, (সেজন্য আমাদের কোন আগ্রহ নেই;) আমি তাঁর (নন্দগোপের) সমস্ত প্রাপ্য গর্গ ঋষির হাতে কণানুকণা পর্যন্ত গণনা করিয়ে তার দ্বিগুণ করে আমার স্বামীর দ্বারা তাঁকে দেওয়াব। এজন্য আমি নিজে শপথ করছি।" কিন্তু

পদ্মাবতীর এই সব কথা কৃষ্ণ শুনেও যেন না শোনার মত উদ্ধবকে তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। উদ্ধব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—

ন রাজরাজেশ্বরতা বিভূতীর্ন দিব্যবস্তূনি চ তে ভবন্তঃ।
ন কাময়ন্তেঽন্যদপীহ কিঞ্চিদমুত্র চ প্রাপ্যমৃতে ভবন্তম্।।
—(ঐ ১/৬/৬৩)

"হে প্রভু! ব্রজবাসীরা কেবল আপনাকে চান, তাঁরা রাজরাজেশ্বর কিংবা বিভূতি সকল কিংবা স্বর্গীয় সম্পদ, এমনকি ইহলোকের সম্পদাদি অন্য কোন বস্তু প্রাপ্ত হতে চান না।" কোমলহৃদয় শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, তাঁর নিজের ব্রজগমনজনিত বিচ্ছেদ-রূপ মহাদুঃখের আশঙ্কায় দেবকী ও রুক্মিণী প্রভৃতির মুখ মলিন ও নিম্নে অবনত হয়েছে এবং অশ্রুধারা পতিত হচ্ছে; তখন তিনি সস্নেহে তাঁদের মুখ অবলোকন করে ব্যগ্রভাবে সঙ্কেতে মসী ও ভূজপত্র প্রভৃতি (কালি, কলম ও কাগজ) প্রার্থনা করলেন। কিন্তু উদ্ধাব বললেন,— হে প্রভো! ব্রজে আপনার এই পাদপদ্ম-যুগলের শুভ গমন ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারে ব্রজবাসীদের প্রাণ রক্ষা হবে না। তাঁরা এই প্রেমপত্রাদিও ইচ্ছা করেন না। উদ্ধবের এই বাক্য শ্রবণ করে পদ্মা দেবকীকে বললেন, এই উদ্ধব ব্রজে বহুদিন ছিল, ধূর্ত নন্দাদি গোপেরা দুগ্ধ তক্রাদি প্রদানদ্বারা একে বশীভূত করেছে। এখন এই উদ্ধবের সাহায্যে তোমার পুত্রকে পুনরায় ব্রজে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা করেছে।

বৃদ্ধা পদ্মাবতীর কথা শুনে মদনগোপাল অতি শঙ্কাকুল হয়ে শ্রীবলদেবের মুখের দিকে সজলনয়নে চাইলেন। তখন শ্রীবলদেব বললেন, গোসকল তোমার অতিশয় প্রিয়। বন্য মৃগ, বিহঙ্গ, ভাণ্ডীর অর্থাৎ বট-কদম্বাদি বৃক্ষসকল, লতা ও নিকুঞ্জসমূহ এবং হরিদ্বর্ণ তৃণ-সকল তোমাতেই জীবন সমর্পণ করেছে। সরোজ (পদ্ম) শুষ্ক হয়ে গেছে, পর্বতাদি দিনের পর দিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। তাই ব্রজের কথা আর কি বলব?"

তত্রত্য যমুনা স্বল্পজলা শুষ্কেব সাঽজনি।
গোবর্ধনোঽভূন্নীচোঽসৌ স্বঃ প্রাপ্তো যো ধৃতস্ত্বয়া।।
—(ঐ ১/৬/৯৫)

যমুনা নদী শুষ্কপ্রায় অল্পজলবিশিষ্ট হয়েছে এবং তোমার হস্তধৃত যে

গোবর্ধন পর্বত স্বর্গ স্পর্শ করেছিল, সেই অতি উচ্চ গিরিরাজ আজ নীচতা প্রাপ্ত হয়ে ভূতলগত হয়েছে। শ্রীবলদেবের এই সব কথা শ্রবণ করে পরদুঃখকাতর ও কোমলস্বভাব শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবের কণ্ঠদেশ ধারণপূর্বক মহাদুঃখিতের ন্যায় উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং তারপর দুই ভাই ক্ষণকালমধ্যে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। এ অবস্থা দেখে রোহিণী, উদ্ধব, দেবকী, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি সমস্ত অন্তঃপুরবাসীরা বিহ্বল হয়ে বারংবার রোদন করতে লাগলেন। সেই রোদন ক্ষণকালমধ্যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া মহোৎপাত-সমূহ উপস্থিত হল। তা শ্রবণ করে ব্রহ্মা সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে প্রভুর এপ্রকার অপূর্ব মোহদশা দেখে ক্ষণকাল রোদন করলেন। বিনতা নন্দন গরুড়ও উচ্চস্বরে রোদন করছিলেন। শ্রীব্রহ্মাজী তাঁকে যত্নের সহ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত করিয়ে বলতে লাগলেন, "হে বিনতা নন্দন! লবণ সমুদ্র ও রৈবত পর্বতের মধ্যে বিশ্বকর্মা নির্মিত শ্রীনন্দ, যশোদা এবং গোপ-গোপীদের প্রতিমূর্তি দ্বারা সু-অলঙ্কিত নব-বৃন্দাবন শোভা পাচ্ছে। তা মথুরা মণ্ডলে অন্তর্গত সাক্ষাৎ বৃন্দাবন সদৃশ। সেখানে তুমি অগ্রজ বলদেব সহ এই শ্রীকৃষ্ণকে মোহগ্রস্তাবস্থায়ই ধীরে ধীরে নিয়ে যাও।"

সেখানে একমাত্র এই রোহিণী দেবী গমন করুন, অন্য কেউ যাবেন না। খগপতি গরুড় যত্নসহকারে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে ধীরে ধীরে নিজপৃষ্ঠদেশে স্থাপন করলেন। শ্রীবসুদেব, দেবকী ও যাদবেরা ব্রহ্মার দ্বারা প্রবোধিত হয়ে নিজ নিজ স্থানে গমন করলেন। গরুড় দুই ভাইকে নববৃন্দাবনে বহন করে নিয়ে যাওযার সময় শ্রীবলরাম কতকটা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হলেন। সেই বিশ্বকর্মা রচিত নব বৃন্দাবনের যেখানে সাক্ষাৎ গোপ-গোপীদের মত সেই সকল গোপ-গোপীর প্রতিমা বিরাজ করছেন, গরুড় সেইস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে ধীরে ধীরে স্থাপন করলেন। দেবকী, রুক্মিণী, সত্যভামা, পদ্মাবতী প্রভৃতি সেইরূপ মোহদশা প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে সহজে পরিত্যাগ করতে অসমর্থ হওয়ায় উদ্ধবের সঙ্গে সেখানে এসে ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে দৃষ্টিপথে লুক্কায়িতভাবে কিছুদূরে অবস্থান করে ঘটনাবলী অবলোকন করতে লাগলেন। নারদ কিন্তু নিজেকে অপরাধকারীর মত মনে করে দেবতা ও যাদবদের সঙ্গে সেখানে গমন না করে কৌতূহলবশতঃ শ্রীভগবানের লীলা মাধুর্য অনুভবের জন্য আকাশে অন্তর্হিত হয়ে এক যোগপট্ট বন্ধন করে উপবেশন করে রইলেন। শ্রীবলদেব ক্ষণকালমধ্যে সংজ্ঞালাভ করে শ্রীব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে নিজের মুখমণ্ডল প্রক্ষালন করলেন এবং পরে অনুজের বদন কমল মার্জিত করলেন। তারপর ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের উদরের বস্ত্রের মধ্যে বংশী, উভয় কক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্র, কণ্ঠে কদম্বমালা, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া এবং কর্ণদ্বয়ে নবগুঞ্জার আভরণ অর্পণ করলেন। এইভাবে বিশ্বকর্মা-কল্পিত সামগ্রী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বন্যবেশ রচনা করলেন। তারপর বলপূর্বক শয্যা থেকে উঠিয়ে উচ্চস্বরে বললেন,—হে কৃষ্ণ! হে ভ্রাতঃ! উঠ উঠ, জাগো। দেখ, আজ বেলা অধিক হয়েছে। ধেনুগণ বনে প্রবেশ করছে। শ্রীদামাদি বয়স্যরাও তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। মাতাপিতা স্নেহবশতঃ তোমাকে কিছু বলতে পাচ্ছেন না। আর দেখ, এই সব গোপীরা তোমার মুখকমল দর্শন করে পরস্পর কানাকানি করে নিশ্চয়ই তোমাকে উপহাস করছে। এইভাবে বহুক্ষণ পর শ্রীকৃষ্ণ শয্যা থেকে উঠে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ নয়ন কমলদ্বয় উন্মীলন করে চারদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঈষৎ হাস্য করলেন এবং সম্মুখে পিতা নন্দকে দেখে লজ্জিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। পাশে মাতা যশোদা (বিগ্রহ)-কে আনন্দে হাসতে হাসতে বললেন,—"হে মাতঃ, আজ প্রভাতে বহু বিচিত্র স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্ন দ্বারা বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় আমি যথাসময়ে শয্যা থেকে উঠতে পারিনি। এখন আমি বনে যাব, আমাকে কিছু খেতে দাও—এই কথা বলে হস্ত প্রসার করলেন।" তখন রোহিণীদেবী বললেন,—"হে বৎস! আজ তোমার জননী তোমার অধিক নিদ্রার জন্য চিন্তিতা হয়ে অত্যন্ত দুঃখিতার ন্যায় আছেন, কারণ তুমিই তাঁর একমাত্র পুত্র। অতএব এখন আর বেশী কথার প্রয়োজন নেই। আগে গোসকল ও গোপবালকেরা গমন করেছে, অতএব তুমি শীঘ্র তাদের অনুসরণ কর।" তারপর শ্রীকৃষ্ণ প্রতিমারূপী শ্রীযশোদা মাতার হাত থেকে নবনী (মাখন) চুরি করে নিয়ে হাসতে হাসতে বলদেবকে আলিঙ্গন করলেন ও কিছু দূরে প্রতিমারূপী রাধাকে দেখে বললেন, "হে প্রাণেশ্বরি শ্রীরাধে! আমি তোমার একান্ত ভক্ত, আজ আমাকে নির্জনে পেয়েও কেন তুমি আমার সঙ্গে কোন কথা বলছ না? তবে কি তুমি মানিনী হয়েছ? আমি কি তোমার কাছে কোন অপরাধ করেছি?" এইভাবে নানা কথা বলে তাঁর (শ্রীরাধিকার) গাত্রে পুষ্প নিক্ষেপ করে তারপর তিনি তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন।

যখন দেবকী শ্রীকৃষ্ণের সেই অদৃষ্টপূর্ব, অদ্ভুত, অতিশয় মনোহর ও

মুরলীবাদনযুক্ত গোপবেশ সাক্ষাৎ দর্শন করলেন, তখন তিনি বৃদ্ধা হলেও তাঁর স্তন হতে দুগ্ধ ক্ষরণ হতে লাগল। শ্রীরুক্মিণী, শ্রীজাম্ববতী প্রভৃতি মহিষীরা শ্রীকৃষ্ণের এই বন্যবেশ দর্শন করে এক অভূত-পূর্ব মহাপ্রেমে মোহপ্রাপ্ত হয়ে মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পতিত হলেন। সত্যভামার সঙ্গে বৃদ্ধা পদ্মাবতীও কামবেগে উন্মত্ত হয়ে বারংবার বাহু প্রসারণ করে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন চুম্বন করার জন্য ধাবিত হলেন। সূর্যতনয়া কালিন্দী তাঁদেরকে অর্থাৎ সত্যভামা ও পদ্মবতীকে শ্রীউদ্ধবের সাহায্যে বলপূর্বক পথরোধ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করতে করতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে লবণ সমুদ্র নিরীক্ষণ করে তাকে যমুনা বলে মনে করে আনন্দিত হয়ে জলবিহারের জন্য সখাদেরকে আহ্বান করতে লাগলেন। হে শ্রীদাম! হে সুবল! হে অর্জুন! তোমরা সবাই শীঘ্র এখানে আগমন কর। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ গাভীদের সহ মহাতরঙ্গশ্রেণীদ্বারা কলকল শব্দযুক্ত সমুদ্রের নিকটবর্তী উপস্থিত হলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সর্বদিক্ নিরীক্ষণ করে সেই সমুদ্রের অপর তীরে প্রকাশমান নিজের মহাপুরী (দ্বারকা) অবলোকন করে বিস্মিত হয়ে বলতে লাগলেন—"এ কি? আমি কোথায় আছি? আমি কে?" এইরূপ বলতে বলতে শ্রীকৃষ্ণ বার বার মহাসমুদ্র ও দ্বারকাপুরী অবলোকন করতে লাগলেন। তখন শ্রীবলদেব তাঁকে বললেন, হে আমার প্রভু তুমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজচক্রবর্তী পদে অধিষ্ঠিত করেছিলে বটে, কিন্তু এক্ষণে তিনি অনুশাল্ব প্রভৃতি দুষ্টদের মহাবিক্রম দেখে ভয়ভীত হচ্ছেন। অতএব যাদবদের সঙ্গে সেখানে গমন কর। যুধিষ্ঠিরকে উৎপীড়ন থেকে মুক্ত কর। এই প্রকার রসান্তর বাক্য শ্রবণ করে শ্রীকৃষ্ণের ভাবান্তর প্রাপ্ত হল। শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গক্রমে নিজের প্রেম নিমগ্ন মুগ্ধভাব পরিত্যাগ করলেন এবং চতুর্দ্দিক অবলোকন করে নিজেকে দ্বারকাধীশ্বর ও যদুপতি বলে জানতে পারলেন। তারপর বলদেবের সঙ্গে সলজ্জ বদনে দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করলেন। তারপর শ্রীনারদ জানতে পারলেন যে ব্রজভাবই শ্রেষ্ঠ, ব্রজের ভক্তই শ্রেষ্ঠ এবং এ থেকে অনুমান করা যায় যে, দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণ কত ধৈর্য্য সহকারে কেবল কর্তব্যবোধে আছেন। প্রভু এইভাবে ব্রজভাবে বিভাবিত হয়ে এইরূপে বহুবার মূৰ্চ্ছিত হন।

(হরেকৃষ্ণ)

সমস্ত প্রেমময়ী সেবার উৎস

ইতিপূর্বে আমরা ঈশ তত্ত্ব, গৌর তত্ত্ব, জীবতত্ত্বাদি বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি। তবে চিৎকণ জীব হিসাবে আমরা হচ্ছি পরমেশ্বর ভগবানের অংশ বিশেষ। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কথা অনুসারে "জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্য দাস'।" তাই নিত্য দাস বা সেবক হিসাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত হওয়াই জীবের (মানবের) একমাত্র কর্তব্য। তবে সেই প্রেমময়ী সেবার উৎস কে এবং কিভাবে সেই সেবায় নিযুক্ত হবে সে-সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু অলোচনা করতে প্রয়াসী হয়েছি। আমাদের একথাও জেনে রাখা উচিত যে, ভগবানের প্রতি এই প্রেমময়ী সেবা অর্পণের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে অদ্বয় সত্য ভগবান কৃষ্ণকে তত্ত্বতঃ জেনে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়া। ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানলেই আমরা তাঁর কাছে অতি সহজে ফিরে যেতে পারব। শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ প্রদান করে বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।। —(গীঃ ৪/৯)

অর্থাৎ—"হে অর্জুন! যিনি আমার জন্ম (অর্থাৎ অবির্ভাব) ও কর্মের বিশুদ্ধ ভাব জানেন, তিনি এই শরীর ত্যাগ করার পর এই ভৌতিক জগতে আর জন্ম নেন না, তিনি আমার দিব্য শাশ্বাত ধাম প্রাপ্ত হন।"

এটা ভগবান্ কৃষ্ণের স্ব-মুখ নিঃসৃত বাণী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানাই হচ্ছে দুর্লভ মানব জন্মের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু শ্রবণ বিনা বা পরম্পরাগত তত্ত্ববেত্তা সাধু-গুরু-মহাজনের পাদাশ্রয় বিনা কৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানা সম্ভবপর নয়। সেজন্য গীতায় উপদেশ সূত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।। —(গীঃ ৪/৩৪)

তাই তত্ত্ববেতা সাধুর নিকট গমন অবশ্য কর্তব্য। সেই সাধু, মহাজন অদ্বয়

তত্ত্ব বস্তু ভগবান্ কৃষ্ণকে দর্শন করেছেন। তিনি তাঁকে যথাযথভাবে অনুভবও করেছেন। তাই সেই সাধুর কাছে যেতে হবে। মুণ্ডক উপনিষদেও এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিং শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।। —(মুণ্ডক ১/২/১২)

তাই বিবেকী পুরুষের গম্ভীরতা-সহ বিবেচনা করা উচিত যে, দুর্লভ মানব যোনিতে সদ্‌গুরু গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য। কারণ তিনি হচ্ছেন তত্ত্বজ্ঞানী ও তত্ত্বদ্রষ্টা। সেই তত্ত্বাচার্য গুরু হচ্ছেন একজন প্রেমিক ভক্ত। তিনি ভগবান্ কৃষ্ণের অতি প্রিয়। তিনি কৃষ্ণের অতি অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত। সেই ভক্ত মহাজনের মুখ থেকে শ্রবণ করলেই এই তত্ত্বজ্ঞান পরিস্ফুট হবে এবং ব্যক্তি কৃষ্ণকে জানতে পারবে। অন্যথা এটি সম্ভবপর নয়। এইজন্য সেই সাধু-মহাত্মাগণ এ ধরাধামেতে আগমন করেন। এখানে তাঁদের কিছু করার নেই। একমাত্র কর্তব্য কৃষ্ণ বিস্মৃত জীবকে ভগবৎ জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) প্রদান করা। এই ভগবৎ জ্ঞানের অন্য এক নাম হল বেদ। যেহেতু এটা শ্রৌত পারম্পর্যায় গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে লাভ হয়, তাই এটির অপর নাম হ'ল শ্রুতি। গীতায়ও ভগবান্ কৃষ্ণ এ বিষয়ে বলেছেন—"বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো।" "সকল বেদ-বেদান্তের একমাত্র লক্ষ্য আমাকে (ভগবানকে) জানা।"—(গী - ১৫/১৫)। এই বেদ জ্ঞান এই প্রকার প্রামাণিক গুরুর মাধ্যমে এ জগতে এসেছে। ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁর এই দিব্যজ্ঞান তাঁর অতি প্রিয় ভক্তের কাছে রেখে দেন। আর সেই গুরুদেব হচ্ছেন কৃষ্ণ কৃপার মূর্তিমন্ত প্রতীক। এই জন্য তাঁকে কৃষ্ণ-কৃপা-শ্রীমূর্তি বলা হয়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর রচিত গুর্বষ্টকের ৭ম শ্লোকে বলা হয়েছে যে, সেই গুরুদেব হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভগবান্ হরি। কারণ দিবা-রাত্রি চব্বিশ ঘন্টা তিনি ভগবান্ হরির প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত থাকেন। তাঁকে সেবক ভগবানও বলা হয়ে থাকে। তিনি সেব্য ভগবান্ কৃষ্ণের সেবায় সতত নিযুক্ত। তিনিই হচ্ছেন গুরুদেব। সেই প্রকার সাধুর কাছে গমন না করলে কেউ কৃষ্ণকে জানতে পারবে না বা সেই তত্ত্বজ্ঞান আহরণ করতে পারবে না। অতএব সেই সাধুর কাছে গিয়ে শরণাগতি আচরণ-পূর্বক বিনয় সহকারে তাঁর কাছ থেকে শ্রবণ করতে হবে। কারণ তত্ত্ব শ্রবণ দ্বারাই জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হয়ে থাকে। তাই

শ্রবণ দ্বারা দর্শন লাভ হয়ে থাকে। শ্রীমদ্ ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বলা হয়েছে—এই গুরু-শিষ্য পরম্পরার কথা হচ্ছে "শ্রুতেক্ষিত পথঃ।" শ্রুত-ঈক্ষিত অর্থাৎ প্রথমে শ্রবণ ও তারপর দর্শন। তবে একটি কথার প্রতি সর্বদা সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সাধু-মহাজনের কাছ থেকে পূর্ণ শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস এবং একাগ্রতা সহকারে শ্রবণ করতে হবে। তারপর তোমার দিব্যচক্ষুর উন্মীলন ঘটবে। জড় চক্ষু মায়া-অন্ধকারকে নির্দেশ করে। কিন্তু দিব্যজ্ঞান যুক্ত চক্ষুর উন্মীলন দ্বারা দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়ে থাকে। তাই প্রামাণিক কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা গুরুর কাছ থেকে শ্রবণ করতে হবে, তা আবার শ্রদ্ধা সহকারে, তা না হলে দিব্য চক্ষুর উন্মীলন হবে না।

পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভগবান্ কৃষ্ণ এ ধরাধামেতে নিজ স্বরূপে অবতীর্ণ হয়ে এই দিব্য জ্ঞান ভগবদ্গীতা আকারে প্রদান করেছিলেন। তাই পরমেশ্বর ভগবান্ এই দিব্য জ্ঞান কৃপাপূর্বক প্রদান করেন এবং এটি তিনি তাঁর অতি প্রিয় ভক্তের কাছে রেখে দেন। তাই এমনকি দেবতারাও ভগবানকে প্রার্থনা করে বলে থাকেন—হে ভগবান আপনি "সদনুগ্রহায় ভবান্।" (ভা. ৩/৯/১১)। অর্থাৎ সাধুর কৃপালাভ বিনা কেউ আপনাকে জানতে পারবে না।

এখানে ব্যবহৃত অনুগ্রহ শব্দটি বড় অর্থপূর্ণ। এটির অর্থ কৃপা। কৃষ্ণের অতি প্রিয় ভক্ত সাধু মহাজনের কৃপা লাভ করতে হবে। কারণ ভগবান্ কৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তি জাগ্রতকারী সেই প্রেমিক ভক্ত সাধুর কাছে কৃষ্ণ তাঁর নিজের দিব্য জ্ঞান রেখে দেন। তিনি তাঁর এই জ্ঞান কর্মী, জ্ঞানী বা যোগীর কাছে কখনই রাখেন না। কৃষ্ণ এটি তাঁর প্রিয়ভক্ত, মহাভাগবতদের কাছে রেখে দেন। তাই দ্বাদশ মহাজন আছেন এবং এই দিব্য জ্ঞান তাঁদের কাছ থেকে এসেছে।

একথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, যাঁরা জ্ঞানানুশীলন করে ব্রহ্মকে ধ্যান করেন অর্থাৎ যাঁরা ব্রহ্মানন্দী তাঁরা মুক্তি লাভ করেন। যে মুক্তির অর্থ হচ্ছে 'আত্যন্তিক দুঃখদজাত' অর্থাৎ যন্ত্রনা থেকে মুক্তি। তাই ব্রহ্মানন্দীগণ এবং পরমাত্মা ধ্যানকারী ব্যক্তিগণ মুক্তি লাভ করেন বটে কিন্তু সেই মুক্তি স্থিতিতে প্রেম-সুখ নেই যে প্রেম সুখই হচ্ছে অন্তিম সুখ।

ভগবান্ কৃষ্ণ হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তাঁর রূপ শাশ্বতময়, জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। তাই কৃষ্ণের প্রতি প্রেমভাব জাগ্রত না করলে ব্যক্তি প্রকৃত সুখ,

প্রেমসুখ লাভ করতে পারবে না। তবে আনন্দ দুই প্রকার। তা হল স্বসুখ এবং প্রেমসুখ। ব্যক্তি নিজে আস্বাদনকারী আনন্দকে স্বসুখ এবং ভগবদ্ প্রেম থেকে আস্বাদিত আনন্দকে প্রেমসুখ বলা হয়ে থাকে। যখন ভগবান্ কৃষ্ণ এখানে তাঁর দিব্য লীলা প্রদর্শন করেছিলেন, তখন তিনি তা তাঁর স্বরূপ শক্তির (অন্তরঙ্গা শক্তি) দ্বারা করেছিলেন। কিন্তু এই দিব্য লীলা তত্ত্ব কে জানেন? একে কেবল সেই প্রেমিক ভক্তগণ যাঁরা কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করেছেন, তাঁরা এই দিব্য লীলা-তত্ত্ব প্রেমলীলা তত্ত্ব জানেন। সেইজন্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

> রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
> প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস।।

রাধা এবং কৃষ্ণের দিব্য প্রেম লীলা হচ্ছে অতি গূঢ় ও গোপনীয়। "আমি কিরূপে সেই গভীর ও গোপনীয় তত্ত্ব জানতে পারব ? উত্তর—যে পর্যন্ত আমি রূপ এবং রঘুনাথের কৃপা লাভ না করছি।" তাঁরা যেহেতু প্রেমিক ভক্ত, তাই তাঁরা এটি জানেন। ভগবান্ কৃষ্ণের সেই প্রকার অতিপ্রিয় অন্তরঙ্গ ভক্তদের কৃপা বিনা এটি কেউ বুঝতে পারবে না। এইভাবে কৃষ্ণ এই সমস্ত তত্ত্ব তাঁর প্রিয় ভক্তদের কাছে রেখে দেন এবং তারাই হচ্ছেন গুরু। যে পর্যন্ত ব্যক্তি সেই প্রকার এক গুরুর সাক্ষাৎ না করছে, তাঁর কাছে গমন না করছে, সে পর্যন্ত সে কখনও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারবে না বা সে রাধা এবং কৃষ্ণের গুপ্ত লীলা-তত্ত্ব জানতে পারবে না। সেই প্রকার জীব ভাগবত কথা শ্রবণের প্রতি রুচি জাগ্রত করতে পারবে না। সে সেই প্রেম ধনও লাভ করতে পারবে না।

> "প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
> 'দাস' করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন।।"
>
> —(চৈ. চ. অন্ত ২০/৩৭)

প্রকৃতপক্ষে আমি হচ্ছি দরিদ্র, কারণ আমি সেই প্রেমধন হতে বঞ্চিত। হে ভগবান, আমি আপনার নিত্য দাস। তাই কৃপাপূর্বক আমাকে আপনার দাস করে নিন। আপনার প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত হওয়ার জন্য অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে একটি সুযোগ প্রদান করুন। আমি দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা আপনার প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত থাকব। আমাকে কেবল প্রেমধনই বেতন-স্বরূপ প্রদান করুন। শ্রীল রূপ গোস্বামীর স্ব-রচিত 'ভক্তি রসামৃত সিন্ধু' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা

হয়েছে—

> অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
> আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।
>
> —(ভ. র. সি. পূর্বলহরী ১১/৯)

"ভৌতিক উপভোগ (ভুক্তি) বা মুক্তি কামনা নেই। কর্মীর ভুক্তি কামনা বা জ্ঞানীর মুক্তি কামনা নেই। অন্য অভিলাষ শূন্য হয়ে কেবল অনুকূলভাবে কৃষ্ণের সেবা করতে হবে।"

তাই যাঁরা এই উভয় রকম কামনা থেকে মুক্ত হয়েছেন, কেবল তাঁরাই এই প্রেমধন লাভ করতে পারবেন। অন্যথা অন্য কেউ এটি লাভ করতে পারবে না। সেই রকম এক প্রেমিকভক্ত স্ব-সুখ কামনা থেকে মুক্ত, এমনকি তিনি মুক্তিও কামনা করেন না। তিনি সদাসর্বদা ভগবান্ কৃষ্ণের সমস্ত সুখ ও আনন্দ কামনা করেন। এই ভাবে তিনি দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত থাকেন। যেহেতু ভগবান্ কৃষ্ণ হচ্ছেন প্রেমময়, দিব্য আনন্দময় এবং রসময়; তাই সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের ভক্ত হচ্ছেন প্রেমিক গুরু। তিনিই তোমাকে প্রেম প্রদান করতে পারবেন। সেই ভক্তের কৃপায় এবং তাঁর সঙ্গলাভের ফলে তুমি সেই প্রেম জিনিসটা যে কি তা অনুভব করতে পারবে। সেই প্রেমিক ভক্ত হচ্ছেন কৃষ্ণের কৃপার মূর্তিমন্ত প্রতীক। তাঁকে কৃষ্ণকৃপা শ্রীমূর্তি বলা হয়ে থাকে। সেই রকম গুরু বা সাধুর কৃপা না হলে কেউ ভগবানের সেই প্রেমরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারবে না। ভগবানের প্রিয় ভক্তগণ ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস, শুকাদির কৃপায় এই কৃষ্ণকথা, ভাগবত কথা আমাদের কাছে এসেছে। অনুরূপভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রেমিক ভক্তগণ শ্রীরূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, স্বরূপ দামোদর গোস্বামী আদি এই ভাগবত কথা বা কৃষ্ণকথা যা প্রেম-রাজ্যের কথা তা সব এ জগতে এনেছেন। তাঁরা অত্যন্ত দয়ালু, তা না হলে এইসব দিব্য কৃষ্ণ কথা, ভাগবত কথা কেমন করে এই ভৌতিক জগতে পাওয়া যেতো।

এই কৃষ্ণ-কথা বা ভাগবত কথা যা শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত আছে, তা শ্রীব্যাসদেব তাঁর গুরু নারদ মুনির কৃপায় লিখতে সমর্থ হয়েছিলেন, যিনি হচ্ছেন একজন প্রেমিক ভক্ত। তিনি তীব্র ভক্তি সমাধিতে উপবেশন করে

ভগবান্ কৃষ্ণকে দর্শন করতে পেরেছিলেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে (১/৭/৪) শ্লোকে বলা হয়েছে 'অপশ্যৎ পুরুষং পূর্বং'। ব্যাসদেব পূর্ণ পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি সমাধিতে মায়াকেও দেখতে পেরেছিলেন। এই ভাবে ব্যাসদেবের কৃপায় এবং তারপর শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কৃপায় এটা প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল। এবং তারপর শ্রীল সূতগোস্বামী পুনরায় নৈমিষারণ্যে শৌনকের নেতৃত্বে উপস্থিত একত্রিত ঋষিদের কাছে তা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের কৃপায় এটি আমাদের কাছে এসেছে। এইপ্রকার প্রেমিক ভক্তদের কৃপায় এই রসময় কৃষ্ণ কথা (ভাগবত কথা) আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। এই রসময় কৃষ্ণ কথায় যে স্বরূপ শক্তির কথা বলা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি। স্বরূপ থেকেই অন্তরঙ্গা শক্তির আগমন এবং তিনি স্বরূপ থেকে ভিন্ন নন্। সেই শক্তি সন্ধিনী, সম্বিত এবং হ্লাদিনী নামে তিন ভাগে বিভক্ত।

আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি' মানি।।
—(চৈ. চ. আ. ৪/৬২)

ভগবান্ কৃষ্ণ হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ (সৎ, চিৎ, আনন্দ)-ময় বিগ্রহ। সৎ হতে সন্দিনী, চিৎ হতে সম্বিৎ এবং আনন্দ হতে হ্লাদিনী শক্তি এসেছে। সন্ধিনীর অর্থ নিত্যতা। তবে একে আরও বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, 'সন্ধিন্যা কৃতবিসব তদ্ধাম নিচয়ে।' সন্ধিনীশক্তির কার্য কি?—এ বিষয়ে প্রশ্ন হলে স্বতঃ শ্রীবলদেবের কথা আসবে। কারণ শ্রীবলদেব হচ্ছেন সন্ধিনী শক্তির প্রভু। শ্রীবলদেবের প্রকাশ বিগ্রহ হচ্ছেন শ্রীগুরু পাদ-পদ্ম।

সন্ধিনী শব্দের অর্থ যিনি কৃষ্ণ প্রাপ্তির সন্ধান দিতে পারেন। শ্রীবলদেবজী সন্ধিনী শক্তির প্রভু হওয়ায় কিভাবে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হতে হয়, তা'র সূচনা তিনি প্রদান করেন। তাই সেই বলদেবজী হচ্ছেন, 'সন্ধিনী শক্তিমৎ বিগ্রহ'। শ্রীবলদেবের প্রকাশ শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের কৃপা প্রাপ্ত না হলে কেউ কৃষ্ণের সন্ধান পেতে পারে না। তাই বলা হয়েছে—'সন্ধিন্যা কৃতবিসব তদ্-ধাম'। সন্ধিনী শক্তি নিজেকে এ জগতে ভগবানের ধামরূপে প্রকাশ করেন, যা হচ্ছে বিশুদ্ধ সত্ত্বময়। এ জগতে আমরা যা কিছু দেখছি, সেসব হচ্ছে মিশ্র সত্ত্বময়। কিন্তু ভগবানের ধাম বিশুদ্ধ সত্ত্ব এবং সন্ধিনী শক্তি তা প্রকাশ করেন। আমাদের এটা

মনে রাখা উচিত যে, ধামে সবকিছু হচ্ছে বিশুদ্ধ সত্ত্বময়। তারপর কথা হল সম্বিৎ বা জ্ঞান অর্থাৎ এ জ্ঞান হল সম্বন্ধ জ্ঞান। কিভাবে সকলে এবং সব কিছু কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধীয়। গুরু দীক্ষা দেওয়ার সময়ে এই সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রদান করেন।

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাং কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।"

দীক্ষা গুরু সম্বন্ধ জ্ঞান প্রদান করেন এবং তা-ই হচ্ছে সম্বিৎ শক্তি। তাই গুরু হচ্ছেন সেই স্বরূপ শক্তির প্রকাশ, যা সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী নামে তিন ভাগে বিভক্ত এবং এইভাবে সবকিছু গুরুর মধ্যে অবস্থিত। দীক্ষাগুরু সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রদান করেন এবং তারপর ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি সন্ধিনী ও সম্বিৎকে পুষ্ট করেন। অন্যথা তারা হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা পোষিত না হলে প্রীতি বা আনন্দ বা বিশুদ্ধ প্রেম লাভ করতে পারবে না।

আবার এটাও বলা হয়েছে যে সম্বিৎ শক্তি প্রকটিত 'রহভাব' রসিত। এই রহভাবের অর্থ প্রেমময়ী সম্বন্ধ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ, তা বিশুদ্ধ প্রেমের উপর আধারিত পূর্ণ, শাশ্বত, চিরন্তন সম্বন্ধ। এটা হচ্ছে স্বরূপ সম্বন্ধ। যা পূর্বে বলা হয়েছে, জীবের স্বরূপ স্থিতি হল—সে কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের সঙ্গে এই সম্বন্ধ পূর্ণ, শাশ্বত, প্রীতি পরা সম্বন্ধ। ভগবান কৃষ্ণ হচ্ছেন প্রীতির বিষয় এবং জীবেরা হচ্ছে প্রীতির আশ্রয়। তাই প্রীতির বিষয় পূর্ণ রসময় ভগবান্ কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধীয় না হলে জীব কিভাবে পরমানন্দ লাভ করবে? এ সম্বন্ধে সেই কৃষ্ণকৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল গুরুদেব এবং বলদেবের প্রকাশ বিগ্রহ শ্রীগুরু পাদ-পদ্মের কৃপায় সম্ভব। সেই গুরুদেব সতত কৃষ্ণসেবায় রত। কৃষ্ণের প্রতি সমস্ত প্রেমময়ী সেবার উৎস হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী। "রাধা বিনা তিঁহ কার নয়"। কৃষ্ণ একমাত্র শ্রীমতী রাধারাণীর। তিনি অন্য কারোর নন্। তিনি সম্পূর্ণভাবে তাঁর। তাই শ্রীমতী রাধারাণীই হচ্ছেন কৃষ্ণের প্রতি সমস্ত প্রেমময়ী সেবার উৎস। তাই তিনিই হচ্ছেন মৌলিক গুরুতত্ত্ব। রাধারাণীই কেবল কৃষ্ণ সেবার সুযোগ প্রদান করতে পারেন। রাধারাণীর কৃপা বিনা কৃষ্ণ সেবার কোন সুযোগ পাওয়া যায় না। তাই রাধারাণীই গুরু পদের সর্বোত্তম স্থিতিতে অবস্থিত। তাঁর কায়-বৃহ বিস্তার সখিগণ এবং মঞ্জরীগণও হচ্ছেন গুরু। তাঁরা হচ্ছেন কৃষ্ণের অতি অন্তরঙ্গ এবং প্রিয়। তাঁরা হচ্ছেন কৃষ্ণের নিজ জন। তাই যিনি বার্ষভানবী শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে সম্বন্ধিত না হচ্ছেন তিনি গুরু হতে পারেন না। যে কোন ব্যক্তি মায়া-তত্ত্ব, ইতর-তত্ত্বের গুরু হতে পারেন। কিন্তু

কেউ কৃষ্ণ তত্ত্ববিৎ গুরু হতে পারেন না, যে পর্যন্ত তিনি রাধারাণীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ স্থাপন না করছেন, কারণ কৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে রাধারাণীর দ্বারা বশীভূত। 'রাধা বিনা আর কেহ নয়'। কৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে রাধার—এ হ'ল গুরু তত্ত্ব।

কৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ তত্ত্ব, এবং রাধারাণী সেই পূর্ণ কৃষ্ণের সেবাধিকার প্রদান করেন। রাধারাণী এবং তাঁর বিস্তৃতাংশ সখী, মঞ্জরীগণ এই সুযোগ দেওয়ার জন্য পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত। তাই তাঁর কৃপা বিনা এবং রাধারাণীর পাদাশ্রয় বিনা কেউ কৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবার সুযোগ লাভ করতে পারে না। তাই যাঁরা কৃষ্ণকে সেব্য-তত্ত্ব রূপে গ্রহণ করেন তাঁরা রাধারাণীকে গুরুরূপে গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ হচ্ছেন একমাত্র সেব্য এবং অন্য সকলে সেবক। রাধারাণীকে গুরুরূপে গ্রহণ না করলে কেউ ভগবান্ কৃষ্ণকে সেব্য-তত্ত্বরূপে জানতে পারবে না। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য—এই সমস্ত রসে কৃষ্ণ হচ্ছেন বিষয় এবং তাঁর সেবকেরা (যাঁরা তাঁর সেবা করেন) হচ্ছেন আশ্রয়। তাই কৃষ্ণকে সমস্ত রসের বিষয় হিসাবে যাঁরা গ্রহণ করেন, বার্ষভাবনী রাধারাণী হচ্ছেন তাঁদের সেই সমস্ত রসের গুরু।

তাই রাধারাণীর কৃপা এবং নির্দেশ প্রাপ্ত না হলে কেউ কৃষ্ণের সেবা করতে পারে না। যারা অত্যন্ত কামাসক্ত, যারা নিজেদের আনন্দ ও উপভোগের জন্য সর্বদাই উন্মত্ত তারা কৃষ্ণের সেবা করতে পারেনা, কারণ তারা রাধারাণীর কৃপা এবং নির্দেশ লাভ করতে পারে না। কিন্তু বৃন্দাবনের অধিবাসীগণ এই কৌশলটি জানেন যে রাধারাণীর কৃপা বিনা কেউ কৃষ্ণ সেবার সুযোগ লাভ করতে পারে না।

আমরা জানি যে বেদে ত্রিতত্ত্ব—সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। 'সম্বন্ধ তত্ত্ব' হল কৃষ্ণ-পাদপদ্মে সম্বন্ধ, 'অভিধেয় তত্ত্ব' ভক্তি এবং 'প্রয়োজন তত্ত্ব' প্রেম। তাই যখন প্রয়োজন তত্ত্বের কথা আসে তখন স্বতঃ 'কৃষ্ণ-প্রেম'-এর কথা এসে থাকে। কেবল একজন প্রেমিক ভক্তের কৃপায় অর্থাৎ যিনি হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণীর অতি প্রিয় তাঁর কৃপায় জীব কৃষ্ণ-প্রেম লাভ করে থাকে। তাই যে সাধক-জীব গুরুতত্ত্ব জানে না কিংবা গুরুর স্বরূপ দর্শন করতে পারে না, সে কিভাবে ভজন পথ প্রাপ্ত হবে? তাকে কে এই পথের নির্দেশ দেবেন? তাই সেই সাধ্য-তত্ত্ব কৃষ্ণপ্রেম যা একমাত্র লক্ষ্য তা গুরু-কৃপা বিনা কেউ জানতে পারবে না। তাই গুরু-তত্ত্বের কথা এলে রাধারাণী এবং

তাঁর সখীমঞ্জরী-দল, তাঁর বিস্তৃতাংশ বা গুরুর কথা স্বতঃ আসবে। সাধ্যতত্ত্ব হচ্ছেন—রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ। এসম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কৃত গুর্বাষ্টকের ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হয়েছে—

নিকুঞ্জযুনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ-
র্যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরো শ্রীচরণারবিন্দম্।।

উক্ত শ্লোকে গুরুদেবকে রাধাপ্রিয় সখী বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাই গুরু সেবাই শ্রীমতীর সেবা। গুরুর সেবা করার অর্থ রাধারাণীর সেবা করা, কারণ তিনি হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণীর অতি প্রিয় (রাধা-প্রিয় সখী)। রাধারাণীর সেবা করার অর্থ গুরুদেবের সেবা করা এবং গুরুদেবের সেবা করার অর্থ রাধারাণীর সেবা করা। গুরুদেবের সেবক হওয়ার অর্থ রাধারাণীর সেবক হওয়া এবং এই ভাবে কৃষ্ণের সেবক হওয়া। এটাই হচ্ছে তত্ত্ব। যাঁরা এই সমস্ত তত্ত্ব জানেন, এবং যাঁরা এই সমস্ত তত্ত্বে স্থির হয়েছেন কেবল তাঁরাই কৃষ্ণের সেবা করতে পারেন। যে-পর্যন্ত ব্যক্তি এই সমস্ত তত্ত্ব অবগত না হয়েছে, সে-পর্যন্ত সে ভক্তি যোগের পথে বা ভজন পথে আসতে পারবে না। কিন্তু যিনি গুরু-তত্ত্ব ভালভাবে জানেন তিনি জানেন যে, গুরুদেব হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণীর অতি প্রিয় ভক্ত, এবং তিনি শ্রীমতী রাধারাণী থেকে ভিন্ন নন্। তিনি হচ্ছেন তাঁর বিস্তৃতাংশ। তিনি সম্পূর্ণভাবে দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা কৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত, এবং তিনিই হচ্ছেন গুরু। সেই গুরুদেবই হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণীর অত্যন্ত প্রিয় এবং অন্তরঙ্গ। আমাদের গুরু পরম্পরায় কৃষ্ণ সর্বোচ্চ স্থানেতে আছেন। কিন্তু কৃষ্ণ বলেছেন—

রাধিকা প্রেমগুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট।।

—(চৈ. চ. আ. ৪/১২৪)

"প্রেমের ব্যাপারে শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন আমার গুরু। তাই তিনি সদাসর্বদা তাঁর নির্দেশানুসারে আমাকে নাচাচ্ছেন।"

তাই শ্রীমতী রাধারাণীই গুরুপদবীর সর্বোচ্চ স্থিতিতে আছেন। যদিও

আমাদের গুরু-পরম্পরাতে কৃষ্ণই সর্বোচ্চ স্থান অলঙ্কৃত করেছেন, তথাপি তিনি বলেছেন, "প্রেমের ব্যাপারে শ্রীমতী রাধারাণীই হচ্ছেন আমার গুরু এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে তিনি আমাকে নাচাচ্ছেন।" কৃষ্ণ বললেন, "আমি শিষ্য নট"। আমি তাঁর শিষ্য এবং নট (নৃত্যকারী)। ঠিক তেমনই গুরুও শিষ্যকে বিভিন্ন কার্যে (সেবা)-তে নিযুক্ত করেন এবং বিভিন্ন স্থানেতে প্রেরণ করে থাকেন। গুরু এইভাবে শিষ্যকেও নাচিয়ে থাকেন।

গুরু পরম্পরায় শ্রীমতী রাধারাণী হলেন সর্বশ্রেষ্ঠা। তাই যাঁরা ব্রজসেবা-অধিকার অর্থাৎ ব্রজভূমিতে কৃষ্ণের সেবা অধিকার প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা হলেন রাধানাথের সেবক বা দাস। আবার গৌরসুন্দর হলেন—রাধা-ভাব-দ্যুতি সুবলিতং। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুতে রাধাভাব প্রভাব বিস্তার করেছে।

গৌর অঙ্গ নহে, মোর—রাধাঙ্গস্পর্শন।
গোপেন্দ্র সুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন।।
—(চৈ. চ. ম. ৮/২৮৬)

এটি গৌর অঙ্গ নয়, এটি হচ্ছে রাধা অঙ্গ। কেবল ব্রজেন্দ্র সুত কৃষ্ণ এটি স্পর্শ করতে পারেন। অন্য কেউ এই শরীর স্পর্শ করতে পারেন না। গৌরাঙ্গতে রাধাভাব প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের গুরু পরম্পরায় যখন গৌর আসেন তখন রাধাও আসেন। যে গুরু পরম্পরাতে গৌর আসেন, তা-ও রাধা-পরম্পরা। এটাই হচ্ছে গুরুতত্ত্ব। কারণ গৌর সুন্দরতে রাধাভাব পরিস্ফুট। তাই যাঁরা গৌরানুগ, তাঁরাও রাধানুগ; কারণ গৌরসুন্দরতে রাধাভাব প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এটাই হচ্ছে গৌড়ীয় গুরু ধারা।

অতএব উপসংহারেতে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, ভগবান্ কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবা অর্পণ করতে হ'লে রাধাপ্রিয় সখী মঞ্জরী গুরু-পাদ-পদ্মতে আত্মনিবেদন করে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। তাঁর আনুগত্যে সাধন ভজন করতে হবে। ভজনের প্রভাবে অনর্থ দূর হলে সাধকজীব ক্রমশ প্রেমের স্তরে আসবেন। দুর্লভ মানব জন্ম কেবল এইজন্য উদ্দিষ্ট। তাই নিরপরাধভাবে নামকীর্তন করে এই চরম ও পরম বস্তু লাভ করার জন্য মানব মাত্রেই প্রয়াসী হওয়া উচিত।

(হরিবোল)

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধানের নামই প্রেম

মানব জন্মটাকে দুর্লভ জন্ম বলা হয়। কারণ এই জন্মেই পরমার্থ লাভ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। সমস্ত প্রামাণিক তথা বৈদিক শাস্ত্রের এই এক মত। এই ভক্তি অবলম্বনে ব্যক্তি তার জীবনের অন্তিম লক্ষ্য কৃষ্ণ-প্রেম প্রাপ্ত হয়। ভক্তি যাজনই পূর্ণ 'কৃষ্ণৈক শরণত্ব' দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে। শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভু এ সম্বন্ধে বলেছেন—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" অর্থাৎ নিত্য কৃষ্ণ দাসত্বই জীবের প্রকৃত পরিচয়। এই দাস বা সেবকভাব অবলম্বনে মানব কৃষ্ণভক্তি আচরণ করে। তবে এই কৃষ্ণভক্তি বা ভগবদ্‌ভক্তি সম্বন্ধে সম্যক্ সূচনা দিয়ে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে "সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য...." শ্লোকের অবতারণা করেছেন। যার অর্থ হল ভগবৎ-ভক্তি তথা কৃষ্ণ-ভক্তি পূর্ণ 'কৃষ্ণৈক শরণত্ব' দ্বারাই সম্ভব হয়ে থাকে। এইজন্য সমস্ত প্রকার দেহ-ধর্ম, জাতি-ধর্ম, দেশ-ধর্ম ইত্যাদি সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায়, কেবল যে সমস্ত প্রকার ত্যাগের মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় তা নয়, এটির সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্তে সদা সর্বদা কৃষ্ণানুকুল সেবা বা কৃষ্ণের প্রীতিমূলক সেবার মাধ্যমে লীলা পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করাই চরম ও পরম লক্ষ্য। তাই কৃষ্ণভজনের জন্যেই এই দুর্লভ মানব জন্ম উদ্দিষ্ট। মহাজনগণ এইজন্য বহুবার তাঁদের রচিত ভক্তি-রসাত্মক সঙ্গীতের মাধ্যমে গান গেয়েছেন—

"দুর্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু,—দুঃখ কহিব কাহারে ?"

অর্থাৎ—কৃষ্ণ ভজনই হচ্ছে দুর্লভ মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই কৃষ্ণভজন বা কৃষ্ণভক্তি যাজন দ্বারাই ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করে থাকে। ভগবৎ পদারবিন্দে পূর্ণ শরণাগতি আচরণ করে তাঁর প্রীতি বিধানার্থে সমস্ত প্রকার চেষ্টা (কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টিতম্)-কেই ভগবদ্‌ভক্তি বলা হয়। আমাদের এটাও জেনে রাখা উচিৎ, যে-ভক্তি অবলম্বনে আমরা যে-

সেবা করব, তা প্রীতিপূর্ণ সেবা হওয়া উচিত। তা'র দ্বারাই আমরা কৃষ্ণ-প্রেম লাভ করতে পারব ও আমাদের মানব জন্ম সফল করতে পারব। তবে এই 'ভক্তি' বা কৃষ্ণের প্রীতিপূর্ণ সেবা'তে মানুষ কিভাবে নিযুক্ত হতে পারবে ও সদাসর্বদা এটির অনুসন্ধান করবে, সেটাই হচ্ছে আমাদের আলোচনার বিষয়। সে সম্বন্ধে আমরা নিম্নে কিছু আলোচনা করতে প্রয়াস করেছি।

আমরা জানি যে, শ্রীমদ্ ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের একত্রিশ শ্লোকে বর্ণনা আছে—

ন তে বিদুঃ স্বর্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধাঃ যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।। —(ভা. ৭/৫/৩১)

অর্থাৎ—"যাদের চিত্ত বিষয় ভোগ-বাসনার দ্বারা দুষ্ট হয়েছে এবং বহির্বিষয়াসক্ত কর্মীদেরকে গুরুরূপে বরণ করেছে, তারা পরমপুরুষার্থলিপ্সু লোকেদের একমাত্র গতি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর মহিমা জানে না। সুতরাং অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্ধরা যেমন প্রকৃত পথের সন্ধান না জেনে অন্ধকূপে পতিত হয়, ঠিক তেমনই বিষয়াসক্ত লোকেরা অন্য বিষয়াসক্ত লোকদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সকাম কর্মরূপ অত্যন্ত দৃঢ়-রজ্জুর বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সংসার-চক্রে বার বার আবর্তিত হয়ে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করতে থাকে।"

শ্রীকৃষ্ণের সুখ চিন্তা করলে জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল লাভ হয়। কৃষ্ণ সেবাই মানব জীবনের একমাত্র কর্তব্য। কৃষ্ণ সেবাই পরম মঙ্গল পরম স্বার্থ। কৃষ্ণের সেবা করলে জীবের উচ্চতর স্বার্থ সাধিত হয়। তথাকথিত জড় বিদ্যা, ধন, প্রতিষ্ঠাদি অর্জন দ্বারা জীবের নিম্নতর স্বার্থও সাধিত হয় না। এই যে সত্য বা অন্তিম সিদ্ধান্ত এটা বুঝতে অনেকেই ইচ্ছা করে না। এর কারণ কি? এর একমাত্র কারণ হচ্ছে যাদের হৃদয়ে দুর্বাসনা, সংসার বাসনা খুব বদ্ধমূল হয়ে আছে, তারা এ সিদ্ধান্ত বুঝতে পারে না। সংসারের বোঝা যার ওপর অধিক বা সংসার সুখে যে অধিক নিমজ্জিত, সে স্ত্রী-পুত্র, মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের সুখ বা স্বার্থ বিধানে অত্যন্ত ব্যপ্ত। কর্তব্য বুদ্ধি ও আত্মীয় স্বজনদের প্রতি দায়িত্ব বোধকেই তারা জীবনের স্বার্থ বলে মনে করে থাকে। তারা

তথাকথিত কর্তব্য পালনকে ধর্ম বলে জ্ঞান করে। সংসার-রূপক ভূত যাদের ওপর খুব চেপে বসেছে, তারা আত্মীয়-স্বজনদের স্বার্থটাকেই কেবল দেখতে পায়। কৃষ্ণসেবাই যে জীবনের প্রকৃত স্বার্থ এ কথাটা তারা বুঝতে পারে না। এর একমাত্র কারণ—দুর্বাসনা তাদের চিত্তকে গ্রাস করেছে। "দুরাশয়া" কথাটির অর্থ হ'ল যাদের চিত্ত বিষয় ভোগেতে উন্মত্ত। তারা জড় বিষয় বস্তুকে জীবনের একমাত্র প্রয়োজন বলে মনে করে। কৃষ্ণ সেবা-বিমুখ জনগণই জড় বিষয়ে প্রমত্ত হয়। তবে এটা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, "কৃষ্ণ সেবা দ্বারা জীবের পরম মঙ্গল লাভ হয়" এ কথাটা বুঝতে হ'লে ভাগ্য থাকা দরকার। শ্রীহরি সেবা বা শ্রীহরি-সংকীর্তন করলে জীবের সমস্ত প্রকার সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। শ্রীহরি সেবায় যারা নিমগ্ন থাকেন তাঁদের কোন সমস্যা নেই। যাঁরা হরিসেবা নিয়ে আছেন, তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের অসুবিধা হয়ে যাবে, তা কখনই সম্ভব নয়। কৃষ্ণসেবা বা হরিসেবা করলে যাবতীয় অসুবিধা, সকল অভাব দূরীভূত হয়ে যায়। তাই হরিসেবায় নিযুক্ত হওয়ার দ্বারা মানব অন্যের দুঃখের কারণ হবে, তা কখনই হতে পারে না। মানব ভগবদ্-ভক্তি আচরণ করে হরি বা কৃষ্ণের ভজন করার দ্বারা আত্মীয় স্বজনদের দুঃখের কারণ হবে—তা প্রকৃত কথা নয়। কৃষ্ণই হচ্ছেন জীবের স্বার্থগতি। কৃষ্ণ সেবায় সবার স্বার্থসিদ্ধি হয়ে যায়। "যস্মিন্ তুষ্টে জগত তুষ্টঃ"। আমরা জানি যে ভগবান্ কৃষ্ণ হচ্ছেন সচ্চিদানন্দময়। যেহেতু তিনি হচ্ছেন পূর্ণ, নিত্য ও আনন্দময়, তাই তাঁর সান্নিধ্য হলে সকল অসুবিধা, সকল অশান্তি ও সকল জ্বালাযন্ত্রণার অবসান হয়। যারা এই ভজন রাজ্যে আসতে চায়, তাদের ভজনোপযোগী আবশ্যকীয় বস্তু স্বতঃ এসে যায়। তাদের খাদ্য, পেয়, বসনাদির কথা চিন্তা করতে হয় না। এটির জ্বলন্ত উদাহরণ শ্রীগোপাল দেব। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য দুগ্ধ পাত্র নিয়ে তাঁর কাছে দৌড়ে আসেন শ্রীগোপাল দেব। যাঁরা কৃষ্ণ ব্যতিরেক অন্য কিছু জানেন না, তাঁদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বয়ং কৃষ্ণ গ্রহণ করেন। যেহেতু অনন্য শরণাগতি আচরণকারী ভক্ত মহাজন কৃষ্ণ-সুখ-তৎপর হয়ে কায়-মন-বাক্যে তাঁর সেবায় সতত নিযুক্ত, সেহেতু তাঁর শরীর ধারণের জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকু তিনি ব্যবস্থা করে দেন। হরি ভজনোপযোগী অন্ন-বস্ত্র-অর্থাদি জুটবে না—তা কখনই হতে পারে না। হরিভোজনোপযোগী অর্থাদি না জুটলে ভগবান্ ও ভগবানের বাণী মিথ্যা হয়ে

যাবে। যাঁরা একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁদের জন্য তিনি নিজেই 'যোগ' ও 'ক্ষেম' বহন করেন।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।

—(গী. ৯/২২)

অর্থাৎ—"যাঁরা আমার দিব্যরূপের ধ্যান করে ভক্তি-সহকারে আমাকে পূজা করেন, আমি তাঁদের সমস্ত আবশ্যকতা বহন করি, তাঁদের যা-সব অভাব আছে, সেসব আমি পূরণ করি এবং তাঁরা যে-সমস্ত বস্তু প্রাপ্ত হয়েছেন সে-সমস্ত বস্তু রক্ষা করি।" যদিও উপরোক্ত শ্লোকের মাধ্যমে ভগবান্ নির্ভয়বাণী প্রদান করেছেন, তথাপি আমরা যদি আমাদের বিচারধারা যোগ করে এটি নির্ণয় করি যে "যোগক্ষেম" এসে গেলে হরি ভজন করব, তা ঠিক কথা নয়। হরি-ভজন করলে স্বতঃ এসব এসে যাবে। তাই এজন্যে চিন্তিত হওয়ার আদৌ আবশ্যকতা নেই।

বরং শ্রীকৃষ্ণের স্বার্থ দেখা, তাঁর সেবা করাই হ'ল জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করাই হ'ল চরম নির্বোধতা। শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই সর্বোত্তম লক্ষ্য—এই সত্য যাঁরা বুঝতে ইচ্ছা করে না, তাদের মধ্যে দুর্বাসনা নিশ্চয় আছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। যাদের অন্যাভিলাষ, ইতরাভিলাষ আছে, বড় হওয়ার ইচ্ছা আছে, তাদের হৃদয়ে এ সিদ্ধান্ত প্রবেশ করবে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যারা সংসারের কর্তব্যরূপে কর্মে আবদ্ধ হয়ে যায়, তাদেরকে জড়-মায়া গ্রাস করে। কিন্তু যাঁরা পূর্ণ 'কৃষ্ণৈক শরণত্ব' আচরণ করেন, তাঁদেরকে মায়া গ্রাস করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে প্রপন্ন হওয়া ব্যক্তিই পূর্ণভাবে সুরক্ষা প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণ সেই প্রকার ব্যক্তিকে মহান্ করে দেন। "কৃষ্ণ সাম্য হৈতে হয় বড় ভক্ত পদ।" কৃষ্ণের ঐকান্তিক শরণাগত ভক্ত হলে তিনি তোমাকে বড় করে দেবেন। তাঁর ইচ্ছায় সব হয়। তিনি হচ্ছেন স্বভিজ্ঞ, স্বরাট পুরুষ। তিনি হচ্ছেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় পুরুষ। কেউ কেউ তাদের কর্মোন্মুখী সুকৃতি নিয়ে আজ কিছু বড় পদবীতে অধিকারী হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু পরে তা থেকে অধোপতিত হয়।

কথিত আছে, এক সময় দেবগুরু বৃহস্পতিকে অসম্মান করার ফলে স্বর্গের

রাজা ইন্দ্র শূকর যোনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যদিও তিনি দেবরাজ ইন্দ্র ছিলেন ও অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন, তথাপি পদ ও প্রতিষ্ঠাদির ঔদ্ধত্যের জন্য কার্যাকার্য বিচারে অক্ষম হয়ে গুরু পদারবিন্দে অপরাধ অর্জন করে সমস্ত প্রকার শ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে শূকর যোনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই এই জড়ীয় পদ-পদবী ক্ষণস্থায়ী। কর্মোন্মুখী সুকৃতিবশতঃ আজ যা লব্ধ হয়েছে, তা ক্ষয় হয়ে গেলে পুনর্বার নিম্নস্থিতিতে পতিত হবে। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় বর্ণিত আছে "এবং ত্রয়ীধর্ম অনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে।" অর্থাৎ—"যখন তারা এইভাবে স্বর্গ সুখ-ভোগ করে সারে তখন তারা আবার এই মৃত্যুময় সংসারে ফিরে আসে। এইভাবে বৈদিক নীতি অনুসারে তারা কেবল অস্থায়ী (চপল) সুখই প্রাপ্ত হয়।" পুণ্যকর্মাদির ফল শেষ হওয়ার পর মানব আবার এই মর্ত্যজগতে পতিত হয়।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অভয় চরণারবিন্দে যারা আত্মসমর্পণ করেছেন তাঁরা কোনও অবস্থাকে খাতির করেন না। তাদের যা আছে তা'র দ্বারা তাঁরা কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করেন। কৃষ্ণ প্রীতির জন্য তাদের অন্য কোন বস্তু সংগ্রহের আবশ্যকতা নেই। কর্তৃত্বাভিমান নিয়ে নতুন করে যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজনও নেই। কৃষ্ণের চরণ কমলে শরণ গ্রহণ করার ফলে তাঁরা সব সময় গভীর মনোনিবেশ সহকারে সেবাতে আত্মনিয়োগ করার দ্বারাই তাঁদের সুখ হয়। তাঁর (কৃষ্ণের) সুখ বিধানের চেষ্টা করার নামই ভক্তি। নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণ সুখানুসন্ধানের নাম প্রীতি বা প্রেম। তাই যাঁরা শরণাগতি আচরণ করে না বা পক্ষান্তরে আত্মনিবেদন করে না, তারা ভাবে কিছু যোগ্যতা অর্জন করে তারপর সেবা করব। যোগ্যতা অর্জন করে তারপর সেবা করব—এই প্রকার চিন্তা যাদের মনে আছে তারা সমর্পিত আত্মা নয়।

অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন করে তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন-পূর্বক সেবা করলে মৃত্যুও সেবকের সেবার পথে বাধা দিতে পারবে না। সম্বন্ধ বোধ অর্থাৎ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে জড়িত হলে ভক্তি-স্বার্থ থেকে কোন দিন বিচ্যুত হবে না। যমরাজও তাঁকে কিছু করতে পারবেন না।

শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন ধামে, শহরে ও গ্রামে শ্রীবিগ্রহরূপে বসে জীবদেরকে

আকর্ষণ করছেন। শ্রীবিগ্রহদেরকে ভালো খাদ্য প্রস্তুত করে অর্পণ করতে হবে, উত্তম বস্ত্র তৈরী করে পরিধান করাতে হবে, তাহলে হরিতোষণ হবে। শ্রীহরি তোষণ না হলে সবকিছু কর্মকাণ্ড হয়ে যাবে। ভক্তির প্রাণ হ'ল শ্রীহরির সুখ-বিধান। এই ভক্তি পথ থেকে বিচ্যুত হলেই জীব হরিসুখ তৎপর না হয়ে নিজ ইন্দ্রিয়সুখ-পরায়ণ হয়।

তবে সেই লীলা পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ প্রেমময়ী সেবা করতে হয়, তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণ গৌর-স্বরূপে সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তক হিসাবে এ ধরাধামেতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভক্তাবতার হয়ে শ্রীগৌরসুন্দর হরি-সংকীর্তন প্রচার করলেন। প্রেম-নাম সংকীর্তনের জনক তিনি। হরিনাম কীর্তনই তাঁর প্রাণ-স্বরূপ। এই হরিনাম সংকীর্তনেই তাঁকে আনন্দ বিধান করা যায়। যে স্থানে তাঁর সুখের জন্য নৃত্য-কীর্তন, সংকীর্তনাদি হয়, সেখানে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হন। নৃত্যকীর্তনে ভক্তিরস, প্রেমরস উদ্বেলিত হয়ে থাকে। শ্রীশ্রীগৌরহরির প্রবর্তিত কীর্তন করলে সংসারের কর্তব্যবোধ শিথিল হয়ে যায়। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর অবতার মানে কীর্তনের অবতার, সংকীর্তনের অবতার। সেই প্রেমের অবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভু ধ্রুব প্রভৃতি তপস্যাদি করে যে প্রেম লাভ করতে পারেন নি, এক মুহূর্তে সংকীর্তনের মাধ্যমে সেই প্রেম প্রদান করেছেন। নাম-সংকীর্তন দ্বারা অনায়াসে প্রেমভক্তির উদ্বোধন হয়। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কাউকে ছাড়েন নি, তিনি দ্বারে দ্বারে নাম-সংকীর্তন করে ঘুরে বেড়ালেন। তিনি যখন নদীয়ার পথে পথে কীর্তন করে ঘুরে বেড়ালেন, তখন কেউ আর গৃহের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারল না। শ্যামের মধুর বাঁশী বাজছে, সংকীর্তনের সুমধুর ধ্বনি কানে প্রবেশ করছে। সেই ধ্বনি শোনা মাত্রেই স্ত্রী-পুত্রাদির আকর্ষণ তুচ্ছ করে সবাই কীর্তনের পিছনে ছুটল। শ্রীগৌরসুন্দর কীর্তনের ভিতর দিয়ে প্রেমকে অকাতরে বিতরণ করে দিলেন।

এই সংকীর্তন ধ্বনি হচ্ছে অতি দিব্য, পবিত্র ও মনপ্রাণে গভীর উন্মাদনা সৃষ্টিকারী দিব্য ধ্বনিতরঙ্গ। প্রাণ ছুটে আসে এই কীর্তনের ধ্বনি শ্রবণ করার জন্য। কীর্তন আরম্ভ হয়েছে— শ্যামের বাঁশরীর সুমধুর ধ্বনি কানেতে প্রবেশ করছে, সুদুর্লভ প্রেম লাভের সুযোগ এসেছে। তা এরূপ হৃদয়গ্রাহী, প্রাণস্পর্শী যে, এই বাঁশরীর রব একবার যার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করেছে—গৌরাঙ্গের

কীর্তন ধ্বনি যার কর্ণে একবার মাত্র প্রবেশ করেছে, তার শুভদিন উদয় হয়েছে বলে বুঝতে হবে। কীর্তন-ধ্বনি কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করার ফলে ঘর-সংসার, স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়ে আর কেউ থাকতে পারল না।

কৃষ্ণ হচ্ছেন প্রেমের ঠাকুর। প্রেম ছাড়া তাঁর ভজন বা সেবা হয় না। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ামাত্র হয়। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ও পরিচর্যাদি শুদ্ধ-ভক্ত্যাঙ্গ সাধন করতে হলে তাঁর প্রতি আদর আবশ্যক, প্রীতি আবশ্যক। প্রীতিই জীবকে তাঁর পাদ-পদ্মে আকর্ষণ করে নেবে। কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা মনোভাব যদি উদয় হবে, তাহলে তাঁর সেবা করার জন্য হৃদয়ে অস্থিরতা জাগবে। প্রীতিতেই কেবল প্রকৃতপক্ষে উন্মাদ হয়, অন্য কোনতেই হয় না।

তাই এই প্রীতি-পরা সেবায় নিযুক্ত থেকে কৃষ্ণকে আনন্দ দেওয়ার জন্য সকলের যত্নবান্ হওয়া উচিত। এটাই হচ্ছে মানব জীবনের অন্তিম লক্ষ্য।

(হরিবোল)

ভগবান কৃষ্ণের প্রেম বিবর্ধন পরায়ণতা

আমরা জানি ভগবান কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমপুরুষ ভগবান। বিশেষকরে চারটি মাধুর্য একমাত্র তাঁরই নিকটে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। চারটি মাধুর্য—অপূর্ব রূপ মাধুরী, বেণু মাধুরী, রতি মাধুরী এবং লীলা মাধুরী কেবল কৃষ্ণের নিকটে বিদ্যমান। এজন্য তিনি হচ্ছেন সর্বজন চিত্ত আকর্ষণকারী। শ্রীকৃষ্ণের এই মাধুর্যের কথা ভক্তজনের চিত্তে লালসা জাগ্রত করায়। রসবিচার অনুসারে ভক্তগণ নিজের যোগ্যতানুসারে অনুরূপ স্থিতিতে অবস্থান করে উক্ত মাধুর্যামৃত আস্বাদন করে থাকেন। রসের ক্রম-বিচারে শান্ত, দাস্য, শখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য—এইভাবে রসের স্তরভেদ আছে। কৃষ্ণের সঙ্গে শান্তরসের সম্বন্ধীয় জীবগণ হলেন বৃন্দাবনের বৃক্ষলতা-গুল্মাদি। দাস্যভাবের ভক্তগণ সতত কৃষ্ণ সেবায় রত। 'দাস্যে কপিপতি'—কপিপতি হনুমানজী হচ্ছেন দাস্যরসের সর্বোত্তম ভক্ত। তিনি প্রভু রামচন্দ্রের পদারবিন্দে পূর্ণ শরণাগত ভক্ত। তাঁর একমাত্র ঐকান্তিকতা মর্যাদা-পুরুষোত্তম রঘুবীর শ্রীরামচন্দ্রের পাদ-পদ্মে পূর্ণ আনুগত্য। এই কারণে দাস্যভাবে কেউ শ্রীহনুমানজীর থেকে শ্রেষ্ঠ নন। এর পরবর্তী স্তরটি হল সখ্যভাব বা সখ্যরসের স্তর। এই স্তরে ভক্ত ভগবানের সঙ্গে সখ্যভাবে বন্ধুতা স্থাপন করেন। অর্জুন ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে সখ্যভাবে সম্বন্ধীয়। পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জুন হচ্ছেন কৃষ্ণের অতি প্রিয়তম সখা। তবে অর্জুনের সখ্যভাব ঐশ্বর্য-মিশ্রা অর্থাৎ তাতে সম্ভ্রমতা আছে। যার ফলে ভগবান কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জুন নিজেকে ধিক্কার করেছিলেন এবং ভগবানের নিকট জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে যে সব বিভিন্ন সম্বোধন করেছিলেন তার জন্য অনুতাপও করেছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবনে ভগবান কৃষ্ণ গোপ বালকদের সঙ্গে যেসব বাল্যলীলা করেছিলেন সেসব অনুধ্যান করলে আমরা জানতে পারি যে, কৃষ্ণের গোপবালক সখা সুদাম, সুবলাদির নিকটে সেই সখ্য ভাবের কোনও সম্ভ্রমতা নেই। সেখানে তাঁরা কেউ কৃষ্ণকে ভগবান বলে মনে করেন নি। বরং তাঁরা তাঁকে তাঁদের মত একজন সমান স্কন্ধ-সখা বলে জ্ঞান করেছিলেন। বনের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার খেলা খেলেছিলেন এবং তাতে বাজি অর্থাৎ পণ রেখে

খেলেছিলেন। দুই দলের মধ্যে যে দল বিজয়ী হবেন সেই দল অপর দলের খেলোয়াড়দের কাঁধেতে বসে বাহিত হবেন। খেলার সময় কখনও কখনও কৃষ্ণের পক্ষ যখন হেরে যেতেন তখন তাঁরা অপর পক্ষের বিজেতা দলের খেলোয়াড়দেরকে কাঁধেতে বসিয়ে বহন করতেন। আবার কখনও কখনও যখন অপর পক্ষ হেরে যেতেন তখন তাঁরা কৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে কাঁধেতে বসিয়ে বহন করতেন। সেক্ষেত্রে মাধুর্যাতিশয্যের জন্য পরস্পর পরস্পরকে নিজের সখা মনে করতেন। অনুরূপ সম্বন্ধও বাৎসল্যে ও মাধুর্যে পরিলক্ষিত হয়। রসের পরিপক্কতা অনুসারে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে মাধুর্য স্তরেতে উপনীত হয়। সেই মাধুর্যরস বা কান্তা ভাবে সম্বন্ধিত হয়ে ব্রজগোপিগণ প্রেমের যে চরম ও পরম উৎকর্ষতা প্রতিপাদন করেছিলেন তা আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব। তবে আলোচ্য বিষয়বস্তুতে কৃষ্ণের দিব্য বাল্যলীলাতে বাৎসল্যরসের সম্বন্ধিত ভক্ত নন্দ-যশোদার দিব্য ভাবাদি সম্পর্কে এক্ষেত্রে কিছু আলোচনা করা শ্রেয়স্কর মনে করি।

মথুরায় কংসের বন্দীশালাতে দেবকীর অষ্টম গর্ভ হতে কৃষ্ণ আবির্ভূত হওয়ার পর কংসের ভয়ে পিতা বসুদেব বাসুদেব কৃষ্ণকে নন্দগোকুলে বসবাসকারী তাঁর বন্ধু নন্দ মহারাজ ও যশোদা মাতার কাছে রেখে এলেন। নন্দ মহারাজ ও যশোদা মাতার স্নেহাতিশয্যে কৃষ্ণ গোকুলে নির্ভয়ে বাড়তে লাগলেন। গোকুলে তিনি একজন চপলমতি শিশু হিসাবে বহু দিব্যলীলা সব করেছিলেন। কৃষ্ণের যখন মাত্র দুই বছর বয়স হয়েছিল তখন তিনি বৃন্দাবনে গোপীদের ঘরে ঘরে গিয়ে ননী চুরি করে খেতেন। গোপীরা এসে মাতা যশোদার কাছে সেই বিষয়ে অভিযোগ করতেন। যশোদা মাতা সেকথা শুনে ক্রোধ প্রকাশ করে গোপালকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি মাখন চুরি করে খেয়েছ?" প্রত্যুত্তরে গোপাল বললেন, "মা, আমি মাখন খাইনি।" গোপালের মুখে মাখন লেগে থাকা দেখে মা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মুখে মাখন লেগে আছে, তুমি আবার মিছে কথা বলছ?" গোপাল বললেন, "তারা আমার মুখে মাখন লাগিয়ে দিয়েছে।" গোপাল মিথ্যা কথা বলেন না, তিনি সত্য কথাই বলেন। বাক্‌পটু গোপালের কথা বলার কৌশলটা কেউ ধরতে পারতেন না। এটাই ভ্রম যে, যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণীদেরকে আহার যোগাচ্ছেন, যিনি সংসারের প্রতিটি বিষয়ে থাকলেও তিনি সবকিছুতেই

অনাসক্ত, আবার সকল বস্তু যাঁর সম্পদ তিনি কোথায় গিয়ে কার ঘর হতে মাখন চুরি করে খাবেন? গোপাল বাচ্ছা ছেলে, তিনি গোপীদের ঘরে গেলে গোপীরা আদর করে তাঁকে মাখন খাইয়ে দিতেন। একারণে গোপালের মাখন খাওয়া ও মুখেতে মাখন লেগে থাকা বিশেষ কিছু একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। গোপালের কালো শ্রীমুখে মাখন লেগে থাকা দেখে গোপীরা অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। সুযোগ পেলে গোপাল মাখন চুরি করে খেতেন। গোপাল হচ্ছেন অবোধ শিশু। তিনি তো দুষ্টামি করবেন। মায়ের ভয়ে ও মায়ের দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে গোপাল যদি কিছুদিন গোপীদের গৃহে না যেতেন, তা হলে গোপীরা কৃষ্ণ অদর্শনে অধৈর্য হয়ে যশোদার গৃহে খুঁজতে আসতেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করতেন "গোপাল কেন তাঁদের ঘরে আসে না। গোপাল কুশলে আছে তো? ইত্যাদি ইত্যাদি।" তবে মা যশোদা সেই প্রশ্নগুলি শ্রবণ করে গোপালকে বানরদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখে বললেন, "গোপাল! তোমার বুদ্ধি, খেলা, কার্য সবকিছু বানরদের মতো। তুমি একা এত বানরদের সঙ্গে থাকছ, সত্যিই তোমার কি কোন ভয় লাগে না?" গোপাল বললেন, মা বহু দিন পূর্বে লঙ্কা হতে সীতাকে উদ্ধার করার জন্য এই বানরেরা কতই চেষ্টা করেছিল। সে সময় বনচারী রামচন্দ্রের কাছে এরা কিছু ভালো খাদ্য খেতে পায়নি। এরা একটি গাছ হতে অন্য একটি গাছে লম্ফ দিয়ে যদি কিছু ফল পেতো তাহলে তা খেয়ে উদরসাৎ করত, আর কিছু না পেলে চুপ্চাপ হয়ে থাকত। দেখ দেখ মা এই বানরেরা মাখন পেয়ে কি আনন্দে খাচ্ছে। পুনর্বার আরো অধিক খাওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে চাচ্ছে। ভগবান তাঁর অদ্ভুত মাধুর্য লীলার দ্বারা ভক্তদেরকে আনন্দ সাগরে ডুবিয়ে রেখেছেন। স্নেহাধিক্যে বিহ্বলা মাতা যশোদা দুশ্চিন্তাতে বিবশ। নন্দ মহারাজের গৃহেতে কোনও জিনিষের অভাব নেই। তবে পুত্রের চুরি করার অভ্যাসটা কেমন করে হলো? এই কথা চিন্তা করে করে মা তার কিছু আদি অন্ত্য পাচ্ছেন না। তিনি মা, তিনিই কেবল পুত্রের মঙ্গল চিন্তাই করেন। চুরি করাটা গোপালের স্বভাব। তিনি বাল্যকালে মাখন চুরি করেছেন, পৌগণ্ড কালে গোপীদের বস্ত্রহরণ করেছেন, কৈশোর বয়সে ব্রজাঙ্গনাদের মন হরণ করেছেন। ঈশ্বররূপে তিনি ভক্তদের পাপ-তাপও হরণ করেন। গোপাল যতই বড় হচ্ছেন তাঁর চপলতা ততই বেড়ে যাচ্ছে। পুত্রের এভাবে চুরি করার অপবাদ যশোদা মাতা আর সহ্য করতে

পাচ্ছেন না। তিনি খুব চিন্তা করে পুত্রের মাখন চুরির কারণ আবিষ্কার করলেন। পরিচারিকাদের হাতে তৈরী সর, মাখন সুস্বাদু না হওয়ার জন্য গোপাল তা খেতে আদৌ পছন্দ করছেন না। এজন্য তিনি স্থির করলেন যে, তিনি নিজেই সব চাইতে ভালো গাইকে স্বহস্তে দোহন করবেন। সেই দুধের তৈরী দধি মন্থন করে ননী, মাখন ইত্যাদি প্রস্তুত করে গোপালের জন্য রাখবেন। এরূপ চিন্তা করে একদিন তিনি অতি প্রত্যুষে দধি মন্থন করছিলেন ও সেই সঙ্গে কৃষ্ণের গুনগানও করছিলেন। তাঁর হাতের চুড়িগুলি ঝুম্‌ঝুম্ শব্দ হচ্ছিল। এমন সময় গোপালের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি শয্যা থেকে উঠে মাকে দেখতে না পেয়ে কাঁদ্‌দে লাগলেন। যশোদা মাতা স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন, "গোপাল আমি তোমার জন্য দধি মন্থন করছি। তুমি এখানে এস।" গোপাল সেখানে গিয়ে মার কোলেতে উঠে স্তন্যপান করতে লাগলেন। সেই সময়ে কিছু দূরে অবস্থিত উনুনের উপরে দুধের পাত্রটির দুধ উছলে উঠল ও দুধ সব মাটিতে পড়তে লাগল। মা শীঘ্র গোপালকে নিজের কোল হতে উলিয়ে ভূমির ওপরে বসিয়ে দিয়ে উনুনের কাছে দৌড়ে গেলেন। স্তন্যপানে অতৃপ্ত গোপাল রাগেতে অধীর হয়ে একটি পাথরের টুকরো নিয়ে মাটির তৈরী মন্থন পাত্রটিকে ভেঙে দিলেন এবং কাঁদ্‌দে কাঁদ্‌দে অন্য একটি ঘরের ভিতর প্রবেশ করে মাখন চুরি করে খেতে লাগলেন। যশোদা মাতা কায়-মনো-বাক্যে কৃষ্ণের সেবাতে ব্যস্ত। তাঁর অন্য চিন্তা বলতে আর কিছু ছিল না। কায় (শরীর) দধি মন্থনে রত, বাক্যে অর্থাৎ মুখেতে কৃষ্ণ গুণগান এবং মনেতে কৃষ্ণের স্মরণ। বাৎসল্য প্রেমের পরাকাষ্ঠা, নিখিল বিশ্বের মাতৃস্বরূপা মাতা যশোদা পুত্ররূপী ভগবানের প্রীতিবিধানেতে উন্মুখ চিত্ত। কিন্তু উনুনের ওপরে অবস্থিত দুধের পাত্রটির দুধ রক্ষা করতে গিয়ে যশোদা মাতা যে কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করে চলে গেলেন, তা কি তাঁর পক্ষে কৃষ্ণের প্রতি নিদারুণ অবহেলা নয়? না, এক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। কৃষ্ণ সেব্য এবং যশোদা সেবিকা। যশোদার সর্বদা কৃষ্ণের প্রতি সেবানুরাগ ও সেবার চেষ্টা। মাতা যশোদার স্নেহেতে বা প্রীতিতে সর্বদা রয়েছে পুত্রের মঙ্গল ও তাঁর সুখ এবং তাঁর আনন্দের চিন্তা। সেবকের এই সেবা চেষ্টা বা সেবা প্রবৃত্তি সেবার মর্যাদা রক্ষার জন্য মাঝে মাঝে সেব্যকে অতিক্রম করে যায়। সেব্যের প্রতি সেবকের এই নিষ্ঠাকে অবহেলা বলা যায় না। সেব্যের সুখের জন্য সেবকের এই চেষ্টা। সেব্য ও সেবকের এই ভাবের আদান-প্রদানেতে সৃষ্টি

হয় দিব্য প্রেমানন্দ। এই ভাবের মধ্যে রয়েছে ভগবানের লীলানন্দ ও ভক্তের প্রেমানন্দ। এই দুই আনন্দ মিলিত হয়ে একাকার হলে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে উদিত হয় অপূর্ব পরমানন্দ। সেই পরমানন্দে নিমজ্জিত হয়ে উভয়ে অনির্বচনীয় রসের আস্বাদন করেন। কৃষ্ণকে "রসো বৈ সঃ" বলে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনিই রস, তিনিই রসিক। তিনিই আস্বাদ, তিনিই আস্বাদক, তিনিই আস্বাদ্য। তিনিই ভক্তদেরকে রসাস্বাদন করান।

যশোদা দুধের পাত্রটি নীচে নামিয়ে রেখে ফিরে এসে দেখলেন মাটির মন্থন পাত্রটি ভেঙে চুরমার্ হয়ে গেছে। গোপাল অদৃশ্য হয়ে গেছে। মাটিতে গোপালের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে মা একটি দরজার কাছে এসে দেখলেন গোপাল একটি উদুখলের ওপর দাঁড়িয়ে সিকে (hanging rope-shelf) হতে মাখন বার করে ঘরভর্তি বানরদেরকে দিচ্ছেন ও তারা মহা আনন্দেতে খাচ্ছে। গোপালের কাছ থেকে মাখন পেয়ে বানরগুলি পরস্পরের মধ্যে কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে ও তাদের হাত থেকে মাখন মেঝের ওপর পড়ে সারা ঘরটা শুভ্রবর্ণ ধারণ করেছে। মা যশোদা একটি বেত হাতে নিয়ে নিঃশব্দে ঘরের ভিতরে এসে গোপালের পিছনে দাঁড়ালেন। বেত হাতে মাতা যশোদাকে দেখে বানরগুলি দরজা ডিঙিয়ে বাইরে পালিয়ে গেল। গোপালও পিছন ফিরে মাকে দেখে ভয়েতে বানরদের মতো উদুখল হতে লাফিয়ে পড়ে ঘরের বাইরে পালিয়ে এলেন। গোপালের এরকম দৌরাত্ম্য মা যশোদা আর সহ্য করবেন না। আজ তাঁকে নিশ্চিতভাবে তিনি বেঁধে রাখবেন। সর্ব অন্তর্যামী ভগবান জানেন কি ঘটবে। তিনি ইচ্ছা করলেন তাঁর ঐশ্বর্য প্রকাশ করে মা'কে ধরা দেবেন না। মা গোপালকে ধরার জন্য তাঁর পিছনে পিছনে দৌড়ালেন, কিন্তু স্থূলকায় যশোদা দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হতে লাগল। চুলের খোপা হতে করবী মালা খসে মাটিতে পড়তে লাগল। কেশরাশি তাঁর অবিন্যস্ত। মুখেতে ক্লান্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। গোপাল এঁকে বেঁকে ছুটছেন। মা তাঁকে ধরার জন্য গোপালের পিছনে পিছনে দৌড়াচ্ছেন। মা যশোদার হঠাৎ পুত্রের ছোট ছোট রাতুল চরণদ্বয়ে দৃষ্টি পড়ে গেল। আহা! গোপালের কোমল পায়ে কত কষ্ট হচ্ছে। পায়েতে কাঁটা ফুটে গেলে গোপালের ভীষণ কষ্ট হবে। মা যশোদা তা চিন্তা করে বড় বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। ভক্তের ভগবৎ চরণেতে দৃষ্টি পড়ে গেল এবং ভগবানও সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের কাছে ধরা

দেওয়ার জন্য মন স্থির করলেন। মা যশোদা গোপালকে ধরে ফেল্লেন। তিনি আজ প্রকৃতপক্ষে রুষ্ট। গোপাল যশোদাকে খুব উদ্বেগ দিয়েছেন। চুরির অপবাদ আছে, আবার গোপালের ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে দধি মন্থনের হাঁড়ি ভাঙ্গা, পরিশ্রম-সাধ্য ননী-মাখন বানরদেরকে খেতে দেওয়া, কেবল তাই নয়, তাঁর পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে যশোদা আজ ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। যশোদা ডান হাতে ছড়ি ধরেছেন এবং বাম হাতে গোপালকে ধরে তিরস্কার করতে লাগলেন। মায়ের এরকম ভয়ঙ্কর ক্রোধান্বিত রূপ দেখে গোপাল ভয়েতে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদ্‌তে লাগলেন। গোপালের কানের কুণ্ডল দু'টি আন্দোলিত হচ্ছে, ছাতি উঠ্‌ছে ও পড়ছে। তিনি তাঁর দু'খানি পদ্মহস্ত দ্বারা নেত্রদ্বয় মার্জন করছেন। নেত্রদ্বয়ের কাজল মুখমণ্ডলে লেপিত হয়ে এক অপরূপ দৃশ্য হয়েছে। শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকে শ্রীমৎ সত্যব্রত মুনি গেয়েছেন—

"রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্।"

ইতিমধ্যে গোপালের এরকম করুণ দৃশ্য দেখার জন্য বহু গোপ-গোপী-সখাগণ এসে সেখানে সমবেত হয়েছেন। গোপবালিকাগণ যশোদার দুরাবস্থা দেখে পরস্পরের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি (exchange of looks) হয়ে মুখ লুকিয়ে হাসছেন। বয়স্কা গোপিকাগণ ছোট ছেলে গোপালকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছেন। সখাগণও গোপালের এরকম অবস্থা দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। যশোদার সেই কোপাবিষ্ট রূপ দেখে কেউ সাহস করে গোপালের জন্য কিছু বলতে পাচ্ছেন না। অনুরোধ করলেও যশোদা আজ কারোর কথা শুনবেন না। গোপাল কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বললেন, "মা' ছড়িটা ফেলে দাও।" মা' একটু হাসলেন। যশোদা তো গোপলকে বন্ধন করবেন, ছড়িটার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি তৎক্ষণাৎ হাতের ছড়িটাকে ছুড়ে ফেলে দিলেন। যে ভগবান কৃষ্ণ "ভয়ানাং ভয়ঙ্কর" তিনি আজ মায়ের হাতে যষ্টি দেখে ভয় করছেন। যশোদা হাতের যষ্টিটা যখন ছুড়ে ফেলে দিলেন তখন গোপাল ফিক্ করে হেসে উঠলেন। যশোদা গোপালকে তিরস্কার করে বললেন, মনে হচ্ছে তুমি ভয় পেয়ে খুব কাঁদ্‌ছ। গোপাল হাসিটাকে গোপন রাখলেন। সেই সময়ে মা যশোদা রজ্জু এনে গোপালকে বন্ধন করলেন ও রজ্জুর অপর দিকটা খুব দৃঢ়ভাবে উদুখলেতে বাঁধলেন। তারপর তিনি পুনর্বার নিজের গৃহকর্মেতে ব্যস্ত

রইলেন। চপলমতি শিশু গোপাল এবার অন্য কিছু একটা উদ্ঘাটন করার জন্য ইচ্ছা করলেন। তাঁর কোমরে অর্থাৎ কটিদেশে বন্ধনাবস্থায় উদুখল-সহ হামাগুড়ি (crawling) দিতে দিতে এসে উঠানের (courtyard) মধ্যে দণ্ডায়মান অর্জুন বৃক্ষ দু'টির কাছে এলেন। তিনি যখন বৃক্ষ দু'টির মধ্যে প্রবেশ করলেন তখন উদুখলটি বৃক্ষ দু'টিতে আটকে গেল। বল প্রয়োগ করে গোপাল যখন উদুখলটি টানলেন তখন অর্জুন বৃক্ষ দু'টি ভয়ঙ্কর শব্দ করে সেখানে উপড়ে পড়ল। গোপাল উৎপাটিত বৃক্ষদু'টির আড়ালে অবস্থান করে সখাদের সঙ্গে হাসাহাসি করছেন। এদিকে মা যশোদা গোপালকে না পেয়ে কাঁদছেন। নন্দ মহারাজ "গোপাল কোথায়, গোপাল কোথায়" বলে আস্তব্যস্ত হয়ে সেস্থানে দৌড়ে এলেন। গোপালের সেরকম অবস্থা দেখে তিনি তাঁর বন্ধন খুলে দিলেন। মাতা পুত্রকে বন্ধন করেছিলেন পিতা তাঁকে বন্ধন মুক্ত করে দিলেন। যশোদা আস্তব্যস্ত হয়ে গোপালকে কোলেতে তুলে নিলেন এবং ঘরের ভিতরে নিয়ে স্তন্যপান করালেন। ভগবান মাধুর্য লীলার মধ্যেও মাঝে মাঝে নিজের ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন ও তা'কে গোপন করে রাখেন। স্তন্যপান করার সময় গোপাল মাকে জিজ্ঞাসা করলেন "মা' তোমার কি হয়েছে? ভোর বেলা তুমি আমাকে কাঁদিয়ে চলে গেছ এবং এখন নিজেই কত কাঁদছ"। আমি তখন তোমার অবস্থা দেখে হাসছিলাম।" সেই ভোরবেলা স্তন্যপানের অতৃপ্ত গোপাল বর্তমান মাতার কোলে শুয়ে পড়ে পরম তৃপ্তিতে স্তন্যপান করতে করতে মা যশোদার চোখে ও মুখেতে হাত বুলাতে বুলাতে মাকে যেভাবে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, অর্থাৎ বাৎসল্যরসেতে বন্দনপ্রাপ্ত ভগবান যেভাবে ভক্তকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, তাতে যশোদার চোখে প্রেমাশ্রু! আহা—অসহায় গোপালকে কেন বন্ধন করলাম ? মা যশোদা এইভাবে কৃষ্ণকে নিজের পুত্র বলে মনে করে সতত কৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য তৎপর। সর্বকারণের কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা ভগবান হরিকে তিনি তাঁর অতি আদরের পুত্র জ্ঞান করেছেন। মাধুর্য প্রধান এই বাৎসল্য ভাবেতে মা যশোদা কৃষ্ণের সেবা করে চলেছেন। এই বাৎসল্য ভাবের উর্দ্ধে আছে কান্তা-ভাবপূর্ণ মাধুর্য-রস, যেটা সমস্ত প্রকার রস-সম্বন্ধের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত। সেই মাধুর্য স্তরে কিভাবে সর্বোচ্চ সুখ আস্বাদন করা যায় ও সেই স্তরে প্রেম কিভাবে উন্নতভাবে ও অধিক পরিমাণে আস্বাদিত হয় এবং পরিশেষে মহাভাবে রূপান্তরিত হয়, যা একমাত্র ব্রজ ললনাগণ তথা

রাধারাণীর কাছে একমাত্র অনুভূত হয়। বাৎসল্য রসের উর্দ্ধে অবস্থিত ও রসবিচারে সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত মাধুর্য রস যেটাকি কান্তাভাবে কৃষ্ণের সেবা-রূপে খ্যাত ও ব্রজললনাগণ তথা রাধারাণী যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সে-সম্বন্ধে এক্ষেত্রে কিছু আলোচনা করতে প্রয়াসী হয়েছি।

ভগবান কৃষ্ণের বাল্যলীলা অতি সুমধুর। বাল্যকালে নন্দভবনে বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া-কৌতুকাদি করে তিনি গোকুলবাসীদেরকে অশেষ আনন্দ প্রদান করেছিলেন। সেই সময়ে তিনি গোকুল বৃন্দাবনের অধিবাসীদের ওপরে বিভিন্ন সময়ে অত্যাচারকারী বহু অসুরদেরকেও বিনাশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সেই অসুরগুলি ছিল কংসের বন্ধু। তাদের বিনাশে কংস অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে সুচতুরভাবে দুইভাই কৃষ্ণ ও বলরামকে বিনাশ করার জন্য মথুরাতে এক মল্লযুদ্ধের আয়োজন করল। সেই মল্লযুদ্ধতে ভাগ নেওয়ার জন্য সে দুইভাইকে নিমন্ত্রণ করে মথুরাতে আনার জন্য একটি সুসজ্জিত রথে অক্রূরকে প্রেরণ করল। অক্রূরের কাছ থেকে মথুরাযাত্রার সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে দুইভাই কৃষ্ণ ও বলরাম আনন্দের সঙ্গে তা স্বাগত করলেন। তাঁরা বিভিন্ন রকমের অতি মূল্যবান বস্ত্র, অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে অক্রূরের সঙ্গে মথুরা অভিমুখে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এদিকে কিন্তু কৃষ্ণের মথুরা গমনের কথা শুনে যশোদা সহ সকল গোপী সেই সংবাদে গভীর ভাবে দুঃখাভিভূত হয়ে পরলেন। তাঁরা দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে লাগলেন। কেউ কেউও কৃষ্ণ বিচ্ছেদের আশঙ্কায় মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন। তাঁরা কৃষ্ণের বৃন্দাবনের বিভিন্ন লীলাসব স্মরণ করতে করতে হৃদয়েতে গভীর ব্যথা অনুভব করার সাথে সাথে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। এইভাবে সারারাত ধরে ক্রন্দন করার পর সকল গোপী কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে অক্রূর রথেতে আরোহণ করে মথুরা যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে বড় বড় মাটির পাত্রে কৃষ্ণ ও বলরামের জন্য দুগ্ধ, দধি, ঘৃতাদি ভর্তি করে ও সেসব বলদগাড়িগুলিতে আরোহণকারী নন্দ মহারাজ ও গোপাল বালকদের হাতে দিলেন। তাঁরা সেগুলি হাতেতে ধরে কৃষ্ণ ও বলরামের রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলতে লাগলেন। গোপিগণ রথের চারি দিকে ঘিরে গেলেন। কৃষ্ণ তাঁদেরকে পথরোধ না করার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু তাঁরা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কৃষ্ণকে কেবল দেখতে লাগলেন। গোপিগণের এই রকম দুঃখপূর্ণ অবস্থা দেখে কৃষ্ণ খুব দুঃখিত হলেন কিন্তু তিনি কি করবেন? কংসদ্বারা প্রেরিত অক্রূরের সঙ্গে

মল্লযুদ্ধাদি দেখাব অভিলাষে তাঁরা মথুরাযাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রথেতে আরোহণ করে বসলেন। কংসরাজার সেই নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করা সমীচীন হবে না মনে করেও এদিকে গোপিগণের কৃষ্ণ বিরহদশা অনুভব করে কৃষ্ণ গোপিদেরকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। দুঃখিত না হওয়ার জন্য তিনি তাঁদেরকে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন যে, তিনি তাঁর কার্য সমাপন করে খুব শীঘ্র বৃন্দাবনে ফিরে আসবেন। আবার তাঁদেরকে অভয়বাণী শুনিয়ে বললেন যে, তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অতি নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। তাতে বিচ্ছেদের কোন আশঙ্কা নেই। এইহেতু তোমরা ধৈর্য ধরে থাক। কার্য সমাপনান্তে আমি অবিলম্বে প্রত্যাবর্তন করব। যদিও কৃষ্ণ গোপিদেরকে এই রকম সান্ত্বনাবাণী শুনিয়েছিলেন, তথাপি তিনি তাঁর কথা রক্ষা করতে পারলেন না। তিনি মথুরাতে কংসকে বধ করার পর দ্বারকাধীশ হয়ে দ্বারকাতে ষোল হাজার রাণীদের সঙ্গে রাজকীয় ঐশ্বর্যের মধ্যে সময় অতিবাহিত করতে লাগলেন। এদিকে কৃষ্ণ বিরহতাপে জর্জরিত গোপিগণ কৃষ্ণের আসা'র পথ চেয়ে বসে আছেন। কৃষ্ণের দিব্যলীলাদি স্মরণ করে করে তাঁরা কিছুটা সান্ত্বনা পেয়ে সময় অতিবাহিত করছেন। কিন্তু তাঁদের বিরহতাপ প্রবল হতে প্রবলতর হচ্ছে।

কৃষ্ণের বিরহতাপে তাঁরা (গোপিগণ) দগ্ধীভূত হচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ বক্তৃতার দ্বারা তাঁদেরকে বলেছিলেন তোমাদের সঙ্গে আমার বিয়োগ নেই। বিচার অপেক্ষা অনুভবের মূল্য সহস্রগুণ অধিক। অন্তরভরা বিরহ বেদনার অনুভূতি। বিরহের স্ফূর্তিতে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার হল বলে মনে হয়। এটা কিন্তু বাচনিক কথার বিষয় নয়। গোপিগণ তীব্র বিরহ তাপে ব্যথিত হয়ে আকুলভরা কণ্ঠে প্রার্থনা করেছেন, হে জীবিত বল্লভ! তুমি দূরে আছ। ঠিক দূরদেশে আছ। এইজন্য ত বেদনা। কেন দূরে আছ, কবে আসবে, তা আমরা জানতে চাই। তাঁর উত্তরে কৃষ্ণ বলেছেন—

"যত্ত্বহং ভব-তানাং বৈদূরে বর্ত্তে প্রিয়ো।
দৃশাং মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যান কাম্যয়া।।"

অর্থাৎ—আমি দূরে আছি। সত্যি কথা দূরে আছি। কেন আছি তা বলছি, কংসকে বধ করব ; বসুদেব, দেবকী ও উগ্রসেনকে মুক্তি দেওয়াই ছিল অবশ্য কর্তব্য। এ কর্তব্যবোধ ব্রজ হতে আমাকে মথুরাতে এনেছে। কংস বধের পর অনেকগুলি দায়িত্ব এসেছে। তথাপি এগুলি পরিত্যাগ করে কিছু দিনের জন্য

সেই ব্রজে যেতে পারব, তাও সম্ভবপর নয়। তবে তোমাদের নয়ন পথ হতে যে দূরেতে আছি তা'র কারণ, আমার সেটা স্বভাব। সেই স্বভাবটি কি, তা তোমরা জান। তা হল স্বজন-প্রেম-বিবর্ধন পরায়ণতা। প্রেম বর্ধিত হওয়ার স্বভাবটি আমাকে দুঃখ দেয়। আমার নিজজনদেরকেও দুঃখ দেয়। এই দৈহিক বিরহ তা'র কারণ।

তারপর কৃষ্ণ বহু আশ্বাসন বাণী শুনিয়ে তাঁদেরকে বলেছেন, আমি মথুরাতে নামমাত্র আছি। চিত্তে যে আমার সুখ আছে তা নয় (কেবলং বর্ত্তেন তু সুখে নাস্মীতি)। ব্রজে থাকার সময়ে তোমরা যখন তোমাদের নির্মল দেহ, মনাদি আমাকে অর্পণ কর তখন আমার অসীম সুখ হয়। আবার ভীষণ লজ্জাও হয় (চেতসি সদৈব লজ্জা জায়ত ইতি)। কারণ তোমাদের দেহ ও মনেতে বিন্দুমাত্র স্ব-সুখ বাঞ্ছা নেই। কিন্তু আমার দেহেতে তা পূর্ণমাত্রায় আছে। তোমাদের দেহ, মন আমাতে একনিষ্ঠ। আমার দেহ, মন তোমাদের মতো বহুজনের নিকটে বহুনিষ্ঠ। তোমাদের প্রীতি অব্যভিচারী কিন্তু আমার প্রীতি ব্যভিচারী। সুতরাং মিলনকালে তোমাদের দিকে চাহিলে আমার তীব্র লজ্জার উদয় হয়। আমার অদর্শনে তোমাদের প্রতিটি মুহূর্ত শত যুগ বলে মনে হয়। তা প্রত্যক্ষভাবে দেখে আমার মনেতে লালসা জাগ্রত হয়। আমি মনে মনে চিন্তা করি, সেরকম আকুলতাভরা গাঢ় আবেগপূর্ণ অনুরাগ তোমাদের প্রতি আমার কিভাবে লাভ হতে পারে।

নিজের হৃদ্‌গত ভাব প্রকাশ করে কৃষ্ণ গোপীদেরকে বলছেন, বৃন্দাবনে অবস্থানকালে সেরকম ধ্যানের সুযোগ-সুবিধা আমার কিছু হয়নি। তোমাদের সঙ্গে যখন মিলন হয়, তখন আমি থাকি মিলনানন্দে। যখন বিরহ হয়, তখন আমি সখাদের বা জননীদের সখ্য-বাৎসল্য রসের সাগরে ডুবে থাকি। এ কারণে তোমাদেরকে ধ্যান করার সময় হয়নি এবং স্থানও পায়নি।

ভগবান কৃষ্ণ বলছেন, "বর্তমান আমি দেহ নিয়ে দূরদেশে অর্থাৎ মথুরাতে এসেছি। বর্তমান প্রচুর সময় ও স্থান মিলেছে তোমাদেরকে ধ্যান করার জন্য। কেবল তোমাদের প্রতি আমার প্রেম বৃদ্ধির কামনাতেই আমি মথুরাতে রয়েছি। দেহের নিকটবর্তিতা না থাকার জন্য মনের সন্নিকর্ষ লাভ হয়েছে।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয় এই প্রসঙ্গে বলেছেন—"দৃক্‌সমীপবর্ত্তিত্বে

মনোদূরবর্ত্তিত্বংমনঃ সমীপবর্ত্তেত্বে দৃগ্‌দূরবর্ত্তিত্বং আসক্তি বিষয়ী ভূতস্য বস্তুনে ভবতি।"

মথুরাতে তোমাদের নিরন্তর অনুধ্যান-কামনা পূর্ণ হয়েছে। মথুরাবাসী ভক্তগণ আমাকে ভালবাসেন। কিন্তু তাঁদের ভালবাসাটা ঐশ্বর্যমিশ্রিত হওয়ার জন্য মনেতে পূর্ণ আবেগ নেই। সুতরাং অনাসক্ত মন নিয়ে তোমাদেরকে ধ্যান করার সুবিধা হয়েছে।

ভগবান কৃষ্ণ এভাবে প্রবোধনা দিয়ে পণ্ডিতগণের উক্তি উদ্ধার করে বলেছেন—"ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্রুতে।" অর্থাৎ বিরহ বিনা সম্ভোগ-রস পুষ্টি লাভ করতে পারে না।

যখন প্রিয়'র নিকটে থাক, তখন চক্ষু কর্ণাদি সহ তাঁর রূপ ও শব্দাদির সান্নিধ্য ঘটে সত্য, কিন্তু মনের সান্নিধ্য ঘটে না। রূপের নিকটে চক্ষু থাকে, কিন্তু মন থাকে চক্ষুর আড়ালে। সুতরাং রূপের সঙ্গে চক্ষুরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটে, মনেতে ঘটে পরোক্ষ সম্বন্ধ। পক্ষান্তরে, প্রিয় যখন দূরে থাকেন, তখন চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির বিরহ ঘটে। মনের সঙ্গে রূপাদির খুব নিকট প্রগাঢ় সম্বন্ধ ঘটে। এইজন্য "মনসঃ সন্নিকটর্ষার্থম" আমি নিজে ইচ্ছাপূর্বক তোমাদের সান্নিধ্য ছেড়ে মথুরাতে রয়েছি। এ স্থানেতে আমি অবিরাম তোমাদের ধ্যান সাধনাতে আবিষ্ট রয়েছি। 'মদনুধ্যান কাম্যয়া' আমা কর্তৃক তোমাদের অনুধ্যান নিগূঢ় কামনাই মথুরাতে সার্থকতা লাভ করেছি।

তবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এরকম উত্তরে গোপিকাগণ এটা বলতে পারেন যে, আমাদের প্রতি আপনার অনুরাগ বর্ধিত হয়েছে। তাতে আমাদের কি লাভ? (ভবতুনাম ভবতো ভাব সিদ্ধিস্তত্রাস্মাকং কিম্)। আমরা আপনার ভালবাসার কামনা করে আপনাকে ভালবাসিনি। আপনাকে প্রীতি করে আমরা সুখী। তার বিনিময়ে আমরা প্রীতি কখনো কামনা করিনি। এইহেতু আমাদের প্রতি আপনার অনুরাগ বিবর্ধিত হলেও আমাদের কোন লাভ নেই। অতএব আপনার বিরহ দুঃখে আমরা যে দগ্ধীভূত হচ্ছি, তা'র কোনও প্রতিকারমূলক নির্দেশ আপনার এত কথার মধ্যে মেলে নি। গোপিগণের নিকট হতে এরকম উত্তরের আশঙ্কায় শ্যামসুন্দর বলছেন—

যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ত্ততে।
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চেতঃ সন্নিকৃষ্টেঽক্ষিগোচরে।।

—(ভা. ১০/৪৭/৩৫)

এই বিরহ দ্বারা তোমাদেরও আমা প্রতি প্রেমের আধিক্য ঘটবে। প্রিয়জন দূরবর্তী হলে স্ত্রীলোকের মন যেরূপ তার মধ্যে আবিষ্ট হয়, চক্ষুর গোচরে থাকলে সেরূপ হয় না। যখন সাধারণ জাগতিক রমণী সম্বন্ধে এরূপ কথা, তখন তোমাদের মতো মহাভাবময়ীদের সম্বন্ধে যে তা কত গভীর সত্য, তা আর বলবার নয়। সুতরাং পরস্পর প্রেম বিবর্ধন পরায়ণতা-রূপ আমার যে অত্যাগ্রহবিশিষ্ট-স্বভাব তা-ই এই তীব্র বিরহের মূলীভূত কারণ। কৃষ্ণ গোপীদেরকে অনুরোধপূর্বক বলছেন, এই স্বভাব তোমরা সহ্য করে আমাকে ক্ষমা করবে।

আবার কৃষ্ণ চিন্তা করছেন যে, গোপিগণ যদি বলেন ক্ষমা চাচ্ছি, তবে ক্ষত স্থানেতে ক্ষার নিক্ষেপ করার কি দরকার, কি করলে আমাদের, এই বিরহ বেদনা দূর হবে তা বলুন, আমরা তা শুনতে চাই। সে-কথার উত্তর দিয়ে ভগবান কৃষ্ণ বলছেন—

ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ।।

—(ভা. ১০/৪৭/৩৬)

অর্থাৎ প্রেমবৃদ্ধি করা আমার যে অতি আগ্রহ, তা কেবল তোমাদের আমাকে পাওয়ার আগ্রহের প্রবলতাতে দূর হতে পারে। গোপিগণের আগ্রহের প্রবলতা আর কিরূপভাবে প্রকটিত হতে পারে তা ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন। কৃষ্ণ বললেন, "তোমাদের মনটাকে অশেষ বিষয় বৃত্তি হতে নিরুদ্ধ-পূর্বক আমাতে নিবিষ্ট করে নিরন্তর আমাকে স্মরণ কর। অচিরাৎ তোমরা আমাকে প্রাপ্ত হতে পারবে। আমাতে অর্থাৎ আমার নিত্যরূপের প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট করবে। তিনি পুনর্বার বললেন, আমার এই তমাল শ্যামলকান্তি ব্রজসুন্দর যশোদানন্দন স্বরূপেই চিত্ত নিবেশ করবে। আমা ছাড়া চিত্তে আর যত প্রকারের বৃত্তি আছে, সেসব অবিলম্বে দূর করে দেবে। এ বিষয়ে নিজের অস্বতন্ত্রতা প্রকাশ করে কৃষ্ণ বললেন—"ন তু মমমাত্র স্বাতন্ত্র্যমিতি ভাবঃ"—অর্থাৎ এ বিষয়ে আমার কোনও স্বাধীনতা নেই। এভাবে নিবিষ্ট চিত্তে আমার নিত্যরূপ ধ্যানের এরকম অপরিসীম প্রভাব যে, ধ্যানকারীর সন্নিধানে আমার আর না যাওয়ার উপায় নেই। আমাতে আবিষ্ট ভক্তের অনুরাগময় ধ্যান বলপূর্বক আমাকে তৎসন্নিধানে আকর্ষণ করে নেয়। গোপীদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার ছলে

কৃষ্ণ বললেন, এইবার তোমরা যখন আমাকে পাবে, তখন নিত্যকালের জন্যই পাবে। আবার আমি প্রেম বিবর্ধনের অত্যাগ্রহে তোমাদের কাছ হতে আমার দেহ দূরে নিতে পারব না।

ভগবান কৃষ্ণ এক প্রসিদ্ধ প্রমাণের মাধ্যমে গোপীদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, অনন্য চিত্তে আমাকে ধ্যান করলে আমাকে যে নিশ্চয়রূপে লাভ করতে পারবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি বললেন—

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ।
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদ্বীর্যচিন্তয়া।।

—(ভা. ১০/৪৭/৩৭)

অর্থাৎ—কৃষ্ণ বললেন, "সেই রাস রজনীতে মুরলী বাদন করে তোমাদেরকে ডেকেছিলাম। তা তোমাদের নিশ্চয় স্মরণ আছে। সেদিন তোমরা সবাই ছুটে এলে আমার নিকটে, কিন্তু গৃহেতে অবরুদ্ধ হয়ে যাঁরা আসতে পারল না তাদের কি গতি লাভ হয়েছিল তা জান তো?" তাঁরা সেই প্রকার বাধা প্রাপ্ত হয়েও তাদের মৎ-বিষয়ক ধ্যান গভীরতর হয়ে উঠল। ধ্যানের প্রভাবে তাদের গুণময় দেহের বন্ধন দূরীভূত হয়ে গেল। গুণাতীত দেহে তাঁরা আমার অপ্রকট প্রকাশ শ্রীবৃন্দাবনে আমাকে লাভ করল। আমার নিবিড় আশ্লেষণ (ambrace) লাভে তারা পরম আনন্দ সিন্ধুর নীরে নিমজ্জিত হল। তবে গৃহাবরুদ্ধা গোপিগণ ও তথাকথিত পারিবারিক গৃহ-শৃঙ্খল তুচ্ছ করে কৃষ্ণের মধুর মুরলীস্বন শ্রবণ করে মধ্যরাত্রিতে আগমনকারী গোপিগণের কৃষ্ণ প্রাপ্তির তুলনামূলক বিচরণী প্রদান করে কৃষ্ণ বললেন, শুনো কল্যাণীগণ! গৃহাবরুদ্ধা সেই গোপিগণ তাদের গুণময় দেহ ত্যাগ করে আমাকে প্রাপ্ত হয়েছে। তোমরা কিন্তু এই দেহে আমাকে লাভ করতে পারবে, কারণ তোমাদের দেহ গুণাতীত, চিদ্‌ঘন, মহাভাবময়। তাঁরা অপ্রকট প্রকাশ ব্রজে আমাকে পেয়েছে। তোমরা কিন্তু প্রকট প্রকাশাবস্থায় এই বৃন্দাবনে সাক্ষাৎভাবেই আমাকে লাভ করবে।

ভগবান কৃষ্ণ এইভাবে গোপীদেরকে প্রবোধনা দিয়ে তাঁদের কৃষ্ণ প্রাপ্তির আশা বর্ধিত করেছিলেন। কৃষ্ণের এই যে স্বপ্রেম বিবর্ধন পরায়ণতা, তা'র সফল রূপায়ন ঘটেছে ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকাতে। তিনি হচ্ছেন একমাত্র এই

কৃষ্ণ প্রেমধনের পরম ভক্তারিণী। সেজন্য ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন—

"স্বমাধুর্য দেখি' কৃষ্ণ করেন বিচার।।
অদ্ভুত, অনন্ত, পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা।।
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্যামৃত আস্বাদে সকলি।।

—(চৈ. চ. আদি ৪/১৩৭-১৩৯)

আবার কৃষ্ণ বলেছেন—

এ মাধুর্যামৃত সদা যেই পান করে।
তৃষ্ণাশান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে।।

—(চৈ. চ. আদি ৪/১৪৯)

এ কারণে কৃষ্ণপ্রেম বিবর্ধনে একমাত্র উৎস হচ্ছেন বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধারাণী। নিরন্তর কৃষ্ণ মাধুর্যামৃত পান করে তিনি সতত কৃষ্ণ সেবারত। এই মাধুর্যামৃত পানে তাঁর তৃষ্ণা শান্ত হবে। অধিক হতে অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়ার আশা তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছে। গোপীসমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অলঙ্কৃতকারী শ্রীমতী রাধারাণীতে প্রেম বিবর্ধন হয়ে যে চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল তা আস্বাদন করার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণ গৌর অবতার হলেন। এটি আমাদের "শ্রীচৈতন্যাবতারের হেতু" শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। তবে আলোচ্য বিষয়ের উপসংহার-পূর্বক শুদ্ধ পাঠকবৃন্দের কাছে নিবেদন এই যে, সুদুর্লভ মানব যোনি লাভ করে এই কৃষ্ণ প্রেম লাভের সুযোগ হতে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না। কলিযুগে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ নামাবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীচৈতন্যাবতারে এই নাম-প্রেম অযাচিত ভাবে স্থানাস্থান, কালাকাল, পাত্রাপাত্র নির্বিশেষে আপামর চণ্ডাল পর্যন্ত সকলকে বিতরণ করেছেন। আমরা সেই নাম-প্রেম কিরূপে সদ্‌গুরু (বৈষ্ণবগুরুর) পাদাশ্রয়ের মাধ্যমে অচিরাৎ লাভ করতে পারব তার জন্য প্রযত্ন করা উচিত।

(হরিবোল)

***

ভগবান্ কিরূপে লভ্য হন্

ভগবান্‌কে না জানার ফলে সাধারণ লোক বলে থাকে আপনারা কেবল ভগবান্, ভগবান্ বলছেন; কিন্তু সেই ভগবানকে কেমনভাবে ও কিরূপে জানতে পারব ? প্রকৃতপক্ষে এটি একটি গূঢ় রহস্যপূর্ণ প্রশ্ন। এ সম্বন্ধে আমরা এখানে কিছু আলোচনা করতে প্রয়াসী হয়েছি। স্বরূপ বিস্মৃত বদ্ধজীব কর্মফলের অধীন হয়ে কঠিন জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এটির পরিণতি-স্বরূপ সে নানা দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করে। বহিরঙ্গা শক্তির কবলিত হয়ে জীব মানবজীবনের বিশেষত্ব ভুলে যায়। ত্রিতাপক্লিষ্ট এই পতিত জীবদের প্রতি কৃপা করে স্বয়ং ভগবান্ ব্যাস অবতারে মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্বলিত বিবিধ উপায় বৈদিক সাহিত্যাদি রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এই সাহিত্য প্রত্যক্ষভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধিত। আবার জীবেরা যেহেতু শাশ্বতভাবে ভগবানের অংশবিশেষ, তাই তাদের সেই পরিপূর্ণ বস্তুকে জানাই তাদের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। জীবের এই বিস্মৃতির উপচার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ এই দিব্য ভগবৎ জ্ঞান প্রদান করেন, যার অন্য নাম ভক্তিময়ী সেবা। সমস্ত জীবের মধ্যে সুপ্তভাবে অবস্থিত এই সেবা মনোভাব বা ভগবদ্ প্রেম কোনও তথাকথিত যান্ত্রিক উপায়ে পুনর্জাগরিত করা যায় না। এটি সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ কৃপার ওপর নির্ভর করে। আবার ভগবানের দিব্য নাম, গুণ, রূপ, যশাদির বর্ণনা শ্রবন-কীর্তন থেকে আরম্ভ হয়। এটি মনন বলে লব্ধ নয়। জ্ঞানীর অরোহবাদ দ্বারা এটা লাভ করা যায় না। এটা প্রাপ্ত হওয়ার একমাত্র উপায় শুদ্ধ ভক্ত-ভাগবতের মুখ থেকে প্রতিদিন শ্রবণ। এটা নিত্য করণীয়। 'নিত্য ভাগবত সেবয়া'। এটা প্রতিদিনের কার্য। এটা শ্রবণ করার ফলে সমস্ত রকম ভৌতিক আসক্তির বিনাশ হয়ে থাকে ও ভগবৎ পদারবিন্দে আসক্তি জাত হয়। শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধেও বলা হয়েছে—

যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা।। —(ভা. ১/৭/৭)

"ভগবৎ লীলা, গুণ, যশাদি সমন্বিত বৈদিক সাহিত্য-আদি শ্রবণ করার মাধ্যমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তৎক্ষণাৎ ভক্তির উদয় হয় এবং তার ফলে জীবের শোক, মোহ ও ভয় দূর হয়ে যায়।"

তাই এই শ্রবণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বদা মায়া মরীচিকার পিছনে ধাবমান হয়ে প্রতি মুহূর্তে শোক-সন্তপ্ত মানব ভবরোগের অধীন হয়ে পড়ছে। তাই এখানে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যে, কেবল শ্রীমদ্ ভাগবতের দিব্য জ্ঞান সমন্বিত কথামৃত শ্রবণ করলে ব্যক্তি পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয় ও তা জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভবরোগের লক্ষণ-গুলি দূর হয়ে যায়। ভগবান সম্বন্ধে শ্রবণ করা মাত্রেই ভগবানের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয়। ভগবান কৃষ্ণ পরিপূর্ণ বস্তু। তিনি ও তাঁর কথার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই তাঁর কথা শ্রবণের অর্থ হচ্ছে দিব্য ধ্বনির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সম্পর্ক স্থাপন করা। এই দিব্যধ্বনি এরূপ ফলপ্রদ যে, এটি সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত সমস্ত প্রকার ভৌতিক দোষ দূর করিয়ে দিব্য ক্রিয়া করাতে আরম্ভ করে। এ ছাড়া অত্যাধিক বিষয়াসক্ত বা সঘন-ভৌতিকতা আসক্তি বা প্রাধান্যের জন্য ব্যক্তি তথাকথিত সামাজিক স্থিতিতে আদৌ শান্তি লাভ করতে পারে না, বরং তার আশঙ্কা বেড়েই চলেছে। সেই সমস্ত নিরাকরণের একমাত্র উপায় হ'ল, শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণিত পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ। এর দ্বারাই প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, ভগবৎ ভক্তি আচরণ করার দ্বারাই জীব জাগতিক শোক, মোহ, ভয়াদি থেকে মুক্ত হয় ও পারমার্থিক স্থিতি লাভ করে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও এই ভগবদ্‌ভক্তির প্রাধান্য দিয়ে কর্ম, জ্ঞান ও যোগকে নিরাশ করা হয়েছে।

'ভক্তি' বিনা কৃষ্ণ কভু নহে 'প্রেমোদয়'।
প্রেম বিনা কৃষ্ণ প্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়।। —(চৈ. চ. অ. ৪/৫৮)

তাই "ভক্তি বিনা সুপ্ত কৃষ্ণ-প্রেম কখনই জাগ্রত হয় না এবং সেই কৃষ্ণ-প্রেম জাগ্রত না হলে কৃষ্ণকে লাভ করার অন্য কোন পন্থা নেই।" তাই নবধা ভক্তি যোগের প্রথম অঙ্গ শ্রবণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, 'শ্রবণাখ্য ভক্তি' হতেই ভক্তি যোগের আরম্ভ। এটা অন্য কোনও উপায়ের দ্বারা লভ্য নয়। শাস্ত্রগুলিতে ভক্তিযোগের মহিমা বার বার উদ্ঘোষিত হয়েছে। অন্য পন্থাগুলি নিরাশ করে

ভক্তির উৎকর্ষতা প্রতিপাদন করতে গিয়ে শ্রীমদ্ ভাগবতের একাদশ স্কন্ধেও বলা হয়েছে—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা।।

—(ভা. ১১/১৪/২০)

অর্থাৎ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—"হে উদ্ধব! ইন্দ্রিয় সংযম করে, অষ্টাঙ্গযোগ সাধন দ্বারা কিংবা নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ দ্বারা কিংবা অদ্বয় সত্যের বিশ্লেষণাত্মক অধ্যায়ন দ্বারা কিংবা বেদাধ্যয়ন দ্বারা কিংবা তপস্যা ও দান দ্বারা কিংবা সন্ন্যাস গ্রহণ দ্বারা আমাকে কেউ সন্তুষ্ট করতে পারে না। কেবল শুদ্ধভক্তি দ্বারা আমাকে লাভ করতে হয়।"

আবার বেদে বর্ণিত সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের মধ্যে 'ভক্তি' কিংবা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবিধানকে অভিধেয় বলা হয়। কারণ এটি জীবের অন্তিম লক্ষ্য কৃষ্ণপ্রেম বৃদ্ধি করায়। এই লক্ষ্যই প্রত্যেক মানবের সর্বোচ্চ সিদ্ধি ও মহান ধন্। এভাবে একজন ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা-স্থিতি লাভ করে থাকে। বিভিন্ন ভৌতিক কার্যকলাপে নিযুক্ত থেকে জীবের মৌলিক কৃষ্ণচেতনা আবৃত অবস্থায় থাকায় সে এই সর্বোত্তম পদ্ধতি যা'র দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান অতি শীঘ্র ভক্তিদ্বারা বশীভূত হয়ে যান্, তা সে জানতে পারে না। তাই সে বেদে বর্ণিত কর্মকাণ্ডে অন্তর্গত বিধি-বিধান, জ্ঞানমার্গীয় নির্বিশেষবাদ ও অষ্টাঙ্গযোগ সিদ্ধিকে বহুমানন করে থাকে। কিন্তু ভগবদ্ ভক্তি এই সমস্তর উর্ধ্বে অবস্থিত ও এর দ্বারাই সহজে জীব কৃষ্ণপদারবিন্দে শরণাগতি আচরণ করে থাকে। এটিকে সরলভাবে বুঝাইতে গিয়ে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন যে—

ইহাতে দৃষ্টান্ত—যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
'সর্বজ্ঞ' আসি' দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে।।
'তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন।।'
সর্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে।।

সর্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্বশাস্ত্রে উপদেশে, 'শ্রীকৃষ্ণ'—সম্বন্ধ।।
'বাপের ধন আছে'—জ্ঞানে ধন নাহি পায়।
তবে সর্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়।।
'এই স্থানে আছে ধন'—যদি দক্ষিণে খুদিবে।
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে।।
'পশ্চিমে' খুদিবে, তাহা 'যক্ষ' এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য়।।
'উত্তরে' খুদিলে আছে কৃষ্ণ 'অজগরে'।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে।।
পূর্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে।।

—(চৈ. চ. ম. ২০/১২৭-১৩৫)

এটির তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, একবার এক জ্যোতিষ এক দরিদ্র-ব্যাক্তির গৃহেতে গিয়ে তার দুঃখ- দুর্দশা দেখে তাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন—"তুমি কেন দুঃখী? তোমার পিতা একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বহু ধন-সম্পত্তি ছিল। কিন্তু অন্যত্র মৃত্যুবরণ করায় তিনি তোমাকে গুপ্তধন বিষয়ে কিছু বলে যেতে পারেন নি। জ্যোতিষের কাছ থেকে এ খবর পেয়ে সেই দরিদ্র ব্যক্তিটি পিতার গুপ্তধন সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য জানতে পারল। কিন্তু সে নিজের জ্ঞানবলে তো সেই ধন লাভ করতে পারবে না। তাই সে ধন প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে যখন জিজ্ঞাসা করল তখন জ্যোতিষ তাকে বললেন, ধন আছে বলে মনে করে তুমি যদি দক্ষিণ দিকে খুলবে, তাহলে তোমার ধনপ্রাপ্তি হবে না বরং বিষাক্ত ভীমরুল-দল বার হবে। তেমনি পশ্চিম দিকে গমন করলে সেখানে অবস্থিত এক যক্ষ তোমার বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, যার ফলে তুমি ধন স্পর্শ করতে পারবে না। আবার উত্তর দিকে গমন করলে সেখানে এক কৃষ্ণকায় অজগর সর্প আছে। সে তোমাকে গিলে খাবে। তাই সেদিকে ধন পাওয়ার আশাও বৃথা। অতএব পূর্ব দিকে অল্প খোলা মাত্রে খুব শীঘ্র তুমি ধনের পাত্রটি স্পর্শ করতে পারবে। এ কথা বলার তাৎপর্য হচ্ছে কর্মকাণ্ডকে বিষাক্ত ভীকরুল দলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যদি কেউ এই কর্মকাণ্ডীয় বিধিবিধান অনুসরন

করবে, তাহলে সে কেবল বিষাক্ত ভীমরুল দলের দ্বারা দংশিত হবে। জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ শুষ্কমনন বা মনোধর্মকে যক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এটি কেবল নানাপ্রকার মানসিক বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকে। অষ্টাঙ্গযোগ পদ্ধতিকে এক কৃষ্ণকায় অজগর সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে জীব ব্রহ্মে লীন হওয়ার জন্য ইচ্ছা করে। কিন্তু ব্রহ্মে লীন হওয়া বা কৈবল্য স্থিতিলাভ এক কৃষ্ণ অজগর সর্পদ্বারা ভক্ষিত হওয়ার সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু কেউ যদি ভক্তিযোগ আচরণ করবে, তাহলে সে খুব শীঘ্র সাফল্য লাভ করতে পারবে। পক্ষান্তরে, এও বলা যেতে পারে যে, ভক্তিযোগ আচরণ করার দ্বারা নির্বিঘ্নে গুপ্তধন লাভ হয়ে থাকে।

তাই ভগবানকে লাভ করার জন্য ভক্তিযোগই হচ্ছে প্রকৃষ্ট মার্গ। আবার ভগবদ্ গীতাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'ভক্ত্যামাম্ অভিজানাতি', 'ভক্ত্যাস্ত্ব অনন্য লভ্য', 'ভক্ত্যাহং একয়া গ্রাহ্য।' এসব অবতারণা করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান্ কৃষ্ণকে জানতে যে অত্যন্ত আগ্রহী তার এই ধারা গ্রহণ করা উচিত। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী এ সম্বন্ধে এখানে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রদান করে বলেছেন, পূর্বদিক ভগবান্ কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি আচরণের কথা বুঝায়। দক্ষিণদিক সকাম কর্ম (কর্মকাণ্ড)-কে বুঝায়। এটির পরিণাম হচ্ছে ভৌতিক লাভ। পশ্চিমদিক জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ শুষ্ক মননকে বুঝায়। উত্তরদিক মানসিক কল্পনা বা অষ্টাঙ্গযোগকে বুঝায়। কেবল পূর্বদিক যা ভক্তিযোগকে বুঝায় তার দ্বারা জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য লাভ হয়ে থাকে।

তাই এইসব বিচার করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কৃষ্ণভক্তিই জীবের প্রকৃত ধনের ভাণ্ডার। ভক্তিযোগ আচরণ করার দ্বারাই ব্যক্তি সতত ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে অবস্থান করে দিব্য আনন্দময় স্থিতিতে কালযাপন করে। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে—"ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি। 'ভক্তে'কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি।।" তাই প্রামাণিক শাস্ত্রগুলির এটাই সিদ্ধান্ত যে, কর্ম, জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগ পদ্ধতি পরিহার-পূর্বক শুদ্ধ ভক্তিযোগ আচরণ করা সর্ব প্রথম কর্তব্য। এটির দ্বারা কৃষ্ণের প্রীতিবিধান হয়ে থাকে। তাই এই ভক্তিযোগের মহিমা সম্বন্ধে অধিক প্রকাশ করতে গিয়ে একাদশ স্কন্ধে শ্রীমদ্ ভাগবতে ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ।।

—(ভা. ১১/১৪/২১)

অর্থাৎ—"ভক্ত তথা সাধুসন্তগণ আমার অতি প্রিয় হওয়ায় আমি কেবল তাঁদের দৃঢ়বিশ্বাস ও ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা লভ্য হয়ে থাকি। এই যে ভক্তিযোগ ক্রমশ আমার পাদপদ্মে আসক্তি জন্মায়, তা চণ্ডাল কুলে জাত এক মানবকেও বিশুদ্ধ করতে পারে।" এ কথা বলার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে—'ভক্তিযোগ আচরণ করার ফলে ব্যক্তি অনায়াসে দিব্য স্থিতিতে উন্নীত হতে পারে।'

ভৌতিক স্থিতি অতিক্রম করে দিব্যস্থিতিতে প্রবেশ করা জীবনের চরম লক্ষ্য। শাস্ত্রাদিতে চেতনার স্তর অনুযায়ী বিবিধ উপায় থাকলেও পরমেশ্বর ভগবানের এটাই নির্দেশ যে ভক্তিই একমাত্র নিশ্চিত উপায়। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় ভগবান্ পরিস্কারভাবে বলেছেন,—'কৃষ্ণভক্তিই ভগবদ্ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়।'

শ্রীমদ্ ভাগবতেও এ সম্বন্ধে অনুরূপ মত প্রদান করেছেন। সর্ববেদান্ত সার, প্রমাণ শিরোমণি শ্রীমদ্ ভাগবতে কর্ম, জ্ঞান ও যোগকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ করে ভক্তির মাহাত্ম্য প্রদান করা হয়েছে। তা'তে বলা হয়েছে—

শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্বথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্।।

—(ভা. ১০/১৪/৪)

অর্থাৎ—"প্রিয়ো প্রভো! যে সমস্ত জ্ঞানমার্গাবলম্বী ব্যক্তি নিজেদের মঙ্গল লাভের জন্য ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করে কেবল ভক্তিশূন্য জ্ঞান লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তাঁরা কেবল অন্তঃসারশূন্য স্থূল তুষাবঘাতি সদৃশ ক্লেশমাত্রই লাভ করেন। এ ছাড়া আর কিছু তাঁরা লাভ করতে পারেন না।" এমনকি সমস্ত শাস্ত্রে কেবল ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য উদ্ঘোষিত হয়েছে। ভক্তি ছাড়া অন্য সমস্ত প্রচেষ্টা কেবল বৃথা সময়ের অপচয় মাত্র। তাই ভক্তিই হচ্ছে কৃষ্ণ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। সেই দশম স্কন্ধ ভাগবতে বলা হয়েছে—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ।।
—(ভা. ১০/৯/২১)

অর্থাৎ—গোপিকাসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদের পক্ষে যেমন সুলভ, দেহাভিমানী তাপস কিংবা আত্মদর্শী জ্ঞানীদের পক্ষে তেমনই সুলভ নন্। (অর্থাৎ তপস্বী কিংবা জ্ঞানী অতি কষ্টে ভগবানকে লাভ করার পরিবর্তে তিনি তাঁর অসম্যক্ বা আংশিক প্রভাবকে লাভ করেন)। বলার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, ভক্তি আচরণ ছাড়া জ্ঞানানুশীলনকারী জ্ঞানিগণ বা তপস্যা আচরণকারী তপস্বী বা মননশীল মুনিগণ স্ব স্ব কল্পনা বলে অদ্বয় সত্য ভগবানকে জানতে পারেন না। বরং ভগবদ্-ভক্তি বিমুখ হয়ে তাঁর (ভগবানের) অসম্পূর্ণ বা আংশিক প্রকাশ ব্রহ্ম প্রতীতি বা পরমাত্মা প্রতীতিকে প্রকৃত শ্রেয় বস্তু বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু ভগবানকে লাভ করার জন্য সেসব উপযুক্ত পথ নয়। এটা উপস্থাপন করতে গিয়ে শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা।।
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ।।
—(ভা. ১১/১৪/২০-২১)

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে বললেন,—"হে উদ্ধব, আমার প্রতি প্রবলা ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করতে পারে, অষ্টাঙ্গযোগ, অভেদ ব্রহ্মবাদরূপ সাংখ্যজ্ঞান, ব্রাহ্মণগণের স্বশাখা অধ্যায়নরূপ স্বাধ্যায়, সর্ববিধ তপস্যা ও ত্যাগরূপ সন্ন্যাসাদি দ্বারাই আমি সেরূপ বশীভূত হই না। সাধুগণের প্রিয় আমি অনন্য শ্রদ্ধাজনিত ভক্তি দ্বারাই বশীভূত হই। একাগ্রভাব সম্পন্না ভক্তি চণ্ডালদেরকেও পবিত্র করে থাকে।"

এটির প্রকৃত অর্থ এই যে, ফল্গু জ্ঞান ও বৈরাগ্য কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় নয়। অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী ভক্তিতেই কৃষ্ণের অধিষ্ঠান। প্রাকৃত গুণময়ী কর্ম-জ্ঞান চেষ্টাতে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না। মনোধর্মী সাধকের ভেদবুদ্ধিমূলক ফল্গু যোগ ও জ্ঞান চেষ্টা জড়েন্দ্রিয় তৃপ্তিময়ী। তা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তিময়ী নয়। তাই তা'র দ্বারা

কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্ভবপর নয়। প্রেমভক্তি ছাড়া কর্ম, জ্ঞান, যোগাদিতে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হন্ না। কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি সতত ভক্তি মুখাপেক্ষী। ভক্তি মহাদেবীর আবির্ভাবে বৈরাগ্য ও অহৈতুক জ্ঞান স্বতঃ জাত হয়। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যথা—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্।। —(ভা. ১/২/৭)

অর্থাৎ—"ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে অচিরেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড়জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আসে।" আবার শ্রুতি শাস্ত্রতেও বলা হয়েছে—

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি।
ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।। —(মাঠর-শ্রুতি-বচন)

অর্থাৎ—"ভক্তিই জীবকে ভগবানের কাছে নিয়ে যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরমপুরুষ একমাত্র ভক্তির বশ। অতএব ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ।" এই প্রকার ভক্তিতে বশ হয়ে ভগবান্ সতত একনিষ্ঠ ভক্তের বশ্যতা স্বীকার করে থাকেন। তাৎপর্য এই যে, কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি মার্গ আশ্রয়কারী ব্যক্তিদের কাছে ভগবান বশ্যতা স্বীকার করেন না। তারা বিমলা ভক্তির অধিকারী নন।

তাই ভক্তি ছাড়া ভগবানকে জানার অন্য কোনও উপায় নেই। এই ভক্তিযোগ এরূপ শক্তিশালী যে, এটি তথাকথিত সমস্ত সুনীতি বা পুণ্যকর্মের ফলাফলকেও অপেক্ষা করে না। এমনকি অধিক ধন বা সমৃদ্ধি বা তীক্ষ্ণ মেধাশক্তিযুক্ত হলেও ভগবানকে কেউ জানতে পারবে না। এ কথা পদ্ম পুরাণে বর্ণিত হয়েছে—

ন ধনেন সমৃদ্ধেন ন বৈ বিপুলয়া ধিয়া।
একেন ভক্তিযোগেন সমীপে দৃশ্যতে ক্ষণাৎ।।
তোয়ং বদ্ধাতুবস্ত্রেণ কৃতকার্য্যং কথং ভবেত।
প্রাপ্য দেহং বিনা ভক্তং ক্রিয়তে স বৃথা শ্রমঃ।।
বাহুভ্যাং সাগরং তর্তুং যদবন্ মূর্খোঽভিবাঞ্ছতি।
সংসার সাগরং তদবদ্ বিষ্ণুভক্তিং বিন নরঃ।।

অর্থাৎ—"কোন রকম ভৌতিক ধন, সম্পত্তি বা জড়ীয় সুখ সমৃদ্ধি বা উপযুক্ত ধী-শক্তিসম্পন্ন হয়ে ভগবানকে জানতে পারবে না। কেবল ভক্তিযোগবলেই তুমি সেই ভগবানকে ক্ষণেক মাত্র দর্শন করতে পারবে।" আবার একটি উপযুক্ত উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, "যেমন একটি বস্ত্রের দ্বারা জল বেঁধে রাখা যায় না এবং সেটা কেবল নিষ্ফল চেষ্টা মাত্র, তেমনই মানব দেহ লাভ করে যদি ভক্তি যাজন করা না যায়, তাহলে কেবল বৃথাশ্রমই সার হয়। এক মূর্খ যেমন সন্তরণ দ্বারা সাগর অতিক্রম করার বিফল চেষ্টা করে ও তাতে হতাশ হয়, তেমনই ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি আচরণ ছাড়া এ সংসার-সাগর অতিক্রম করা মানবের পক্ষে অসম্ভব।"

আবার সুনীতি বা পুণ্যকর্ম সকলও ভক্তিরহিত হয়ে মানবের চিত্ত বিশুদ্ধ করতে পারে না।

ধর্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনতি হি।।

—(ভা. ১১/১৪/২২)

অর্থাৎ—'সত্য, দয়া, ধর্ম, তপস্যা, জ্ঞান—এগুলি বিষ্ণুভক্তিরহিত মানব-চিত্তকে সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ করতে পারে না।" তাৎপর্য হচ্ছে—সত্য, পরদুঃখ নিবৃত্তির জন্য যত্ন, দান, যজ্ঞাদি ও ত্যাগাদিমূলক তপস্যা-সমূহ সম্যক্‌রূপে জীবকে পবিত্র করতে সমর্থ হয় না। বরং এটি ন্যূনাধিক পরিমাণে জীবকে ভোগে প্রবৃত্ত করায়। কিন্তু ভগবদ্ সেবাই পরম-ধর্ম বলে ভক্তির পাবনত্ব সর্বোপরি স্বীকৃত হয়েছে। তাই বিমলা শ্রীকৃষ্ণভক্তি ছাড়া কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায়ান্তর নেই। জ্ঞান, কর্ম বা যোগের দ্বারা কৃষ্ণ বশীভূত হন্ না। কেবল প্রেমৈক একনিষ্ঠ ভক্ত বিশুদ্ধ ভক্তিবলে সেই ভগবানকে তার হৃদয়ের মধ্যে বেঁধে রাখেন। এ সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

জ্ঞান-কর্ম-যোগ-ধর্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেমরস।।

—(চৈ. চ. আদি ১৭/৭৫)

'ভক্তি' বিনা কৃষ্ণে কভু নহে 'প্রেমোদয়'।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়।।

—(চৈ. চ. অ. ৪/৫৮)

ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি'।।
অতএব 'ভক্তি'—কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায়।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্বশাস্ত্রে গায়।।

—(চৈ. চ. ম. ২০/১৩৬,১৩৯)

আবার যদিও ভগবান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ঈশ্বর ও ইচ্ছাময় পুরুষ তথাপি তিনি ভক্ত পরতন্ত্র। অর্থাৎ প্রেমিক ভক্তের কাছে তিনি নিজের স্বতন্ত্রতা হারিয়ে বসেন। সেই প্রেমিকভক্ত শুদ্ধ ভক্তিবলে তাঁকে হৃদয়মধ্যে বেঁধে রাখেন। "ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয়-কমলে।" অর্থাৎ সেই কৃষ্ণ প্রেমিক ভক্তের বশ্যতা স্বীকার করে বলেছেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয় ঃ।। —(ভা ৯/৪/৬৩)

এইরূপে ভক্তবৎসল শ্রীভগবান ঐকান্তিক, অনন্য শরণাগত ভক্তজনের ভক্তি-বন্ধন ছিন্ন করতে পারেন না। ভক্তজনগণ ভগবানের প্রাণাধিক। ভক্ত ও ভগবানের প্রীতির সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র ঈশ্বর হয়েও ভক্তজনের বশ্যতা স্বীকার করে পরম আনন্দ অনুভব করেন। তিনি স্বয়ং প্রেমিক ভক্তের প্রেমভক্তিরূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধপাদ হয়ে প্রেমিক ভক্তের হৃদয় মন্দির ত্যাগ করেন না। অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিসম্পন্ন স্বয়ং ভগবান্ ভক্তজনের প্রেমবন্ধন ছেদন করতে অসমর্থ। এই মর্মে ভক্ত প্রবর প্রহ্লাদের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি—

সদা মুক্তোঽপি বদ্ধোঽস্মি ভক্তেন স্নেহ রজ্জুভিঃ।
অজিতোঽপি জিতোঽহং তৈরবশ্যোপি বশীকৃতঃ।।

এইভাবে শাস্ত্রে শুদ্ধভক্তি ও প্রেমিক ভক্তের মহিমা সর্বত্র কীর্তিত হয়েছে। শ্রীগৌরলীলাতে অকিঞ্চন ভক্ত শ্রীধরের উক্তি লক্ষ্য করলে আমরা জানতে পারি যে, ভক্তিই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার একমাত্র উপায়।

শ্রীগৌরসুন্দরের স্তুতিগান করে পরম ভক্ত শ্রীধর বলেছিলেন—

ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা জিনিল সমরে।
ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিল তোমারে।।
ভক্তিযোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা।
ভক্তিবশে তুমি কান্ধে কৈলা গোপরামা।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটি বহে যারে মনে।
সে তুমি শ্রীদাম-গোপ বহিলা আপনে।।
—(চৈ. ভা. ম. ৯/২১২-২১৪)

সেই ভগবান কৃষ্ণ কিরূপ প্রেমী ভক্তের অধীন তা শেখানোর জন্যে স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার করে শ্রীচৈতন্য অবতার হলেন। যেই প্রেমেতে তিনি বন্ধন হন, সেই প্রেম তিনি প্রদান করলেন। একে সাধক জীব সাধনভক্তি বলে অনুকূল শ্রীকৃষ্ণানুশীলন দ্বারা লাভ করতে পারেন। এর দ্বারা তিনি জড় ভোগ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে স্বরূপসিদ্ধি লাভপূর্বক সাধ্য ভক্তির অধিকারী হন। অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তি। এ ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ-পরা সেবা ছাড়া অন্য কোন অভিলাষ নেই। তা কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি-দ্বারা আবৃত নয়। এই প্রকার বিশুদ্ধভক্তি থেকে প্রেম উৎপন্ন হয় ও এই প্রেম দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধপাদ হয়ে থাকেন। এটিকে লাভ করাই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাই মানব মাত্রেই এই ভক্তি যাজনের মাধ্যমে ভগবানকে লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে বিমল প্রেমের অধিকারী হয়ে গুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করে ভগবদ্ ধামের চির নিবাসী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(হরিবোল)

প্রীতির প্রকৃত পাত্র

এক দিনের ঘটনা। আমি কোনও একটি বিশেষ কাজের জন্য ট্রেনে করে দিল্লীতে যাচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে একজন ভদ্রব্যক্তিও যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন অমৃতসরের অধিবাসী। যখন আমাদের গাড়ি এসে আগ্রা স্টেশনে পৌঁছিল, তখন দেখলাম পুরী অভিমুখে যাত্রাকারী কোনও একজন ভদ্রব্যক্তির সঙ্গে এই অমৃতসরে যাত্রাকারী যাত্রীর সঙ্গে আগ্রা প্লাটফর্মে সাক্ষাৎ হল। সে-সময় পুরীগামী ট্রেনটিও দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের দিল্লীগামী ট্রেন ও পুরী আগমনকারী ভদ্রব্যক্তির পুরীগামী ট্রেন উভয়ে উক্ত আগ্রা স্টেশন থেকে সিটি মেরে যাত্রা শুরু করার পূর্বে এই বন্ধুদ্বয় পরস্পর মধ্যে আলাপ আলোচনা করে পরস্পরকে এমনই বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়ে কোলাকুলি হচ্ছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের গন্তব্যস্থল ও যাত্রার সময়ও ভুলে গিয়েছিলেন। আমি তা দেখছিলাম ও মনে মনে ভাবছিলাম—এ আবার কিরকম প্রীতি। কিন্তু তাঁদের সেই সম্বন্ধটা ছিল ক্ষণস্থায়ী। কিছু সময় পরে আপ্ ট্রেন ও ডাউন ট্রেন দু'টি হুইসিল দিয়ে ষ্টেশন ছাড়ল। এদিকে সেই উভয় গাড়ীর যাত্রী দু'জন পরস্পর পরস্পরকে ছাড়ার জন্য প্রস্তুত না থাকায় উভয়ের সেই মিথ্যা প্রীতি সম্বন্ধও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এ কথা বলার বিশেষ তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, প্রকৃত প্রীতি জিনিষটা কি এবং কার সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় ও তার উপযুক্ত পাত্র কে—সে বিষয়ে আজ আমরা এখানে একটু আলোচনা করতে প্রয়াসী হয়েছি।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে আমরা এ কথা জানতে পারি যে, বিপরীতগামী ট্রেন-দু'টির যাত্রীদ্বয় পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ক্ষণিক সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হয়ে কেউ কাউকে ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন না। এই স্বল্প সময়ের বন্ধুতার মধ্যে তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে কত ভাবেই না আপনজন করে নিতে চেয়েছিলেন। বাস্তবিক এ বড় আশ্চর্যের কথা এই যে, এই প্রীতির বিষয়টি কে, তা এরকম বদ্ধদশা ভোগকারী জীবের পক্ষে উপলব্ধী করা অতি দুর্বোধ্য। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রসমূহ অনুধ্যান করলে আমরা জানতে পারি যে, প্রীতির প্রকৃত পাত্র হচ্ছেন

কৃষ্ণ। কৃষ্ণের প্রতি মমতাতিশয্যের নামই প্রীতি। বাস্তবিক কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেউ প্রকৃত প্রীতির পাত্র হতে পরেন না। তাই কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি না করে কৃষ্ণেতর বস্তুতে আসক্তি দূর করতে চেষ্টা করলে তা কখনই প্রীতি-পদবাচ্য হতে পারে না। প্রথমে কৃষ্ণেতর বস্তুতে অনাসক্তি ভাব জাত হোক, তারপর কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করব—তা প্রকৃত বিচার নয়। শ্রীমদ্ ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।।
— (ভা. ১১/২৬/২৬)

অথাৎ—"অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি সমস্ত প্রকার অসৎ সঙ্গ পরিহার করে শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ করবেন, যাতে তাঁদের বাক্যের দ্বারা তার মনের অত্যধিক বিরুদ্ধাসক্তির বিনাশ হয়।"

তাই জীবের আসক্তি বা ভোগ্যবুদ্ধি (ভোগধর্ম) পরিহার করার ফলে এবং নিত্য মঙ্গলপ্রদ ভক্তদের সঙ্গ করার প্রভাবে বহুকালের ভোগ-পিপাসা তাঁদের বাক্যের দ্বারা ছিন্ন হয়ে থাকে। ভক্তদের সঙ্গের প্রভাবে জীবের কৃষ্ণসেবাসক্তি প্রবল হলেই তাঁদের বাক্য জীবকে নির্মৎসর করে। অবশ্য তখন ভক্তের বাক্যগুলি নিতান্ত নির্দয় জানা গেলেও তা কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি বর্ধনের সহায়ক হয়ে থাকে। আবার উক্ত শ্লোকে 'ততো' শব্দ প্রয়োগ হওয়ার ফলে এটা সূচিত হয়েছে যে, কেবল দুঃসঙ্গ বর্জনরূপ প্রত্যাহার দ্বারা কৃষ্ণাসক্তি লাভ হয় না। তাই দুঃসঙ্গ ত্যাগ সবকিছু নয়। সেই সাথে সৎসঙ্গের তথা ভক্তদের সঙ্গ করার কথাও বলা হয়েছে। এজন্য এই ভক্তিযোগ মার্গে প্রীতি স্থাপনই হচ্ছে একটি সহজপন্থা। এই কৃষ্ণ প্রীতি বা কৃষ্ণ ভক্তি বা কৃষ্ণাসক্তি বৃদ্ধি করতে হলে সাধককে প্রথমে প্রতিকূল বর্জনের দৃঢ়তা ও চেষ্টা জাগ্রত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিকূল বর্জন ও অনুকূল গ্রহণ একসাথে সাধিত হয়ে থাকে। প্রতিকূলকে প্রথমে ত্যাগকরে মুক্ত বা কন্টকশূন্য হওয়ার পর অনুকূল পথ গ্রহণ করব—তা কখনই সম্ভবপর নয়। অজ্ঞতাবশতঃ জীবের এই জড় আসক্তি বা জাগতিক মোহ দূর না হওয়া পর্যন্ত , সে এই 'প্রীতি' শব্দের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। অনুকূল ও প্রতিকূল হচ্ছে পরস্পর পরস্পরের সহায়ক। তাই

অনুকূল গ্রহণের সংকল্প হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকূল বর্জনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা স্বতঃ জাত হয়। অনুকূল ও প্রতিকূল শব্দ দু'টি এক্ষেত্রে যা ব্যবহৃত হয়েছে, তা কেবল এই কৃষ্ণভক্তি বা প্রকৃত প্রীতিকেই লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। এই কৃষ্ণভক্তি বা প্রকৃত আসক্তি ভগবান কৃষ্ণের প্রতি বর্ধিত হলে কৃষ্ণেতর বস্তুতে যে অনুরাগ তা সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায়। এভাবে নির্ভুল বিষয়বস্তু সেই অদ্বয় জ্ঞানকে অনুশীলন করতে চেষ্টা করলে অবাস্তব বস্তুতে অবস্থিত যে নৈরাশ্যতা তা স্বতঃ উপলব্ধি হয়ে থাকে। আর এ উপলব্ধি না হওয়াই অজ্ঞতার পরিচয়। তাই যাদের জড়াসক্তি প্রবল তাদেরকে শ্রীমদ্-ভাগবত 'গো' ও 'খর' বলে অভিহিত করেছেন—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্
জনেম্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।। —(ভা. ১০/৮৪/১৩)

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি কফ, পিত্ত ও বায়ু—এই ত্রিধাতু-বিশিষ্ট দেহরূপ থলিটিকে আত্মা বলে মনে করে, স্ত্রী-পুত্রাদিকে স্বজন বলে মনে করে, জন্মভূমিকে পূজ্য বলে মনে করে, তীর্থে গিয়ে তীর্থের জলকেই তীর্থ বলে মনে করে তাতে স্নান করে, অথচ তীর্থবাসী অভিজ্ঞ সাধুদের সঙ্গ করে না, সে একটি গরু বা গাধা থেকে কোন অংশেই উৎকৃষ্ট নয়।"

জীব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সর্বদাই নিত্য সম্বন্ধে সম্বন্ধিত। তাঁর সন্তোষ বিধানার্থে প্রীতিপূর্ণ সেবা করাই জীবের নিত্যধর্ম। দিব্যজ্ঞান আহরণ করে জীব এই নিত্য সম্বন্ধ স্থাপনপূর্বক ভগবানের সন্তোষ বিধান করা উচিত্। তাই প্রীতির প্রকৃত পাত্রে যদি প্রীতি হয়, তাহলে সব ঠিক হয়ে যায়। এ ভৌতিক জগতে কেউ না কেউ পাঁচ প্রকার ভৌতিক সম্বন্ধে সম্বন্ধিত। প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ, পিতা-পুত্র সম্বন্ধ, পতি-পত্নী সম্বন্ধ, বন্ধু-বান্ধব সম্বন্ধ ও অপরাপর সম্বন্ধ। এসব সম্বন্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধিত হয়ে করা উচিত। পতি পত্নীর প্রতি বা প্রভু ভৃত্যের প্রতি সম্বন্ধ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধানার্থে পর্যবসিত হওয়া উচিত। পতি পত্নীর প্রতি আদর খারাপ নয়, যদি তা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের নিকটে প্রীতি বৃদ্ধি করায়। পত্নীরূপে বা স্বামীরূপে আদরের নিন্দা নেই, যদি অন্যকে কৃষ্ণের প্রতি

বা কৃষ্ণভক্তের সেবার প্রতি অগ্রসর করার চেষ্টা থাকে। কিন্তু এটা যদি করা না যায় তবে তার পতি হওয়া উচিত নয় কি পত্নী হওয়া উচিত নয় কিংবা জননী কি গুরু হওয়াও উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যা-
ন্ন মোচয়েদ্যঃ সমুপেতমৃত্যুম্।। —(ভা. ৫/৫/১৮)

অর্থাৎ—"ভক্তিপথের সদুপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হতে মোচন করতে সমর্থ নন, সেই গুরু গুরুপদবাচ্য নন, স্বজনও স্বজন পদবাচ্য নন, এমনকি সেই পিতা পিতা নন, অর্থাৎ তাঁর পুত্রোৎপত্তি করার চিন্তাও করা উচিত নয়। তেমনই সেই জননীর গর্ভধারণ করাও কর্তব্য নয়, সেই সকল দেবতা যাঁরা সমস্ত জীবের সংসার মোচনের অসমর্থ তাঁদেরকে মানবের নিকট পূজা গ্রহণ করা উচিত নয়। আবার সেই পতি পতি নন, অর্থাৎ তাঁর পাণিগ্রহণ করাও উচিত নয়।"

এ কথা বলার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আমাদের সমস্ত প্রকার সম্বন্ধ কৃষ্ণের প্রীতি কেন্দ্রিক হওয়া উচিত। জাগতিক দৃষ্টিকোণ দিক দিয়ে যত প্রকার সম্বন্ধ আছে, যদি সেসব ভগবৎ প্রীতি বিধানার্থে ব্যবহৃত না হয়, তবে তা কেবল বৃথা সম্বন্ধ, জড়ীয় অস্থায়ী সম্বন্ধ। আবার এক্ষেত্রে আরও বলা হয়েছে যে, একজনার পতি হওয়া উচিত নয়, যদি সে তার পত্নীর প্রতি যে জড়ীয় আসক্তি তা ত্যাগপূর্বক কৃষ্ণাসক্তি বৃদ্ধির প্রযত্নশীল না হয়। এই সবকিছুর কেবল একমাত্র উদ্দেশ্য হল আনন্দ উপভোগ করা। স্বরূপতঃ সকল জীব হচ্ছে সেই আনন্দময় পুরুষের অংশবিশেষ। শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।। —(ভর. সং ৫/১)

সেই পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সচ্চিদানন্দময়, অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন শাশ্বতময়, জ্ঞানময় ও আনন্দময়। তিনি হচ্ছেন সবকিছুর আদি ও সমস্ত কারণের কারণ। সেই গোবিন্দ বা আদিপুরষ কৃষ্ণ হচ্ছেন সর্ব আনন্দের উৎস অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন আননন্দময় বিগ্রহ। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে, তাঁর বিগ্রহ

চিন্ময়, জ্ঞানময় ও আনন্দময়। যেহেতু জীব সনাতনভাবে তাঁর অংশবিশেষ, তাই সে স্বাভাবিকভাবে সেই আনন্দ লাভ করার জন্যই সর্বদা লালায়িত। সেই ভগবান কৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত রসের উৎস, 'রসো বৈ সঃ' অর্থাৎ তিনি রসের সাগর। তাই তাঁর সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করলেই জীবের আত্মমঙ্গলের পথ পরিষ্কৃত হয়ে যায়।

সেই রসের সাগর সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান ও পরতত্ত্ব বস্তু। জীবগণ একমাত্র রসস্বরূপ শ্রীভগবানকে লাভ করে আনন্দ অনুভব করে। কারণ তিনিই হচ্ছেন সকল আনন্দের একমাত্র আধার। তাঁর নিকটে অবস্থিত আনন্দাভাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি জীবগণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

সেই রসের প্রদাতা ও রসের স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম লীলা পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় উপনিষদ ও শ্রুতি শাস্ত্র অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন—

রসো বৈ সঃ।
রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।
কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।
এষ হ্যেবানন্দয়তি।। —(তৈত্তিরীয় ২/৭/১)

অর্থাৎ—"সেই লীলা পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই রসস্বরূপ। জীব তাঁকেই অর্থাৎ সেই রসস্বরূপকেই লাভ করে আনন্দ প্রাপ্ত হন। সেই লীলা পুরুষোত্তমই সকলকে আনন্দ প্রদান করেন।" আবার দশম স্কন্ধ ভাগবতে শ্রীব্রহ্মাজী স্তুতি-মুখে বলেছেন,—

"সেই পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সচ্চিদানন্দময় (শাশ্বতময়, জ্ঞানময় ও আনন্দময়) এবং সেই আদি পুরুষ গোবিন্দ (কৃষ্ণ)ই হচ্ছেন সর্ব কারণের কারণ।" একারণে অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন একমাত্র পরিপূর্ণতম রসের স্বরূপ ও সকল আনন্দের উদ্ভব-স্থল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বমুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায়ও বলা হয়েছে—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" —(গী. ১৫/৭)

অর্থাৎ—"জীবাত্মা সনাতনভাবে আমার (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের) অংশবিশেষ।"

সচ্চিদানন্দময় পুরুষের সনাতন অংশবিশেষ হওয়ায় জীব হচ্ছে সচ্চিদানন্দময়, দিব্য স্থিতিতে অবস্থান করাতে ও এই পরমানন্দ লাভ করার জন্য উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু সনাতন অংশ হলেও জীব ইতরাসক্তিবশতঃ প্রকৃত পাত্রে সম্বন্ধ স্থাপন না করে ভ্রমবশতঃ মোহগ্রস্থ অবস্থার জন্য জড় জগতে মায়িক বস্তুতে সম্বন্ধ স্থাপন করে। তার কুপরিণামস্বরূপ সে আনন্দময় স্থিতিতে থাকার পরিবর্তে নিরানন্দময় স্থিতিতে পতিত হয়ে ত্রিতাপ-জনিত দুঃখ-যন্ত্রনাদি ভোগ করে। যদিও দৈবক্রমে সে ভক্তিন্মুখী সুকৃতির প্রাবল্যবশতঃ সাধন ভজনের প্রভাবে স্বরূপ সিদ্ধিলাভ করে অর্থাৎ স্বীয় স্বরূপানুভূতি লাভ করে, তথাপি তার পরমানন্দ লাভ হয় না। পুনরায় ভগবৎ অনুভব ব্যতীত জীব তত্ত্বতঃ নিজের স্বরূপানুভব করতে পারে না। তার স্বরূপগত আনন্দটাই হচ্ছে গৌণ। কিন্তু লীলা পুরুষোত্তম পরম পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুভবজনিত আনন্দটাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে পরমানন্দ। কেবল ভগবৎ কৃপায় জীব ভগবদনুভব জনিত প্রেমানন্দ লাভ করে। শ্রীভগবৎ কৃপা ব্যতিরেকে ভগবদনুভব লাভ হয় না। সেই ভগবৎ কৃপা প্রাপ্তি হওয়ার জন্য উৎসুক জীবকে তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তের আনুগত্য স্বীকার অবশ্য কর্তব্য। আবার ভগবানের কৃপাশক্তির কৃপায় ভক্তবৎসল ভগবান্ ঐকান্তিক ভক্তকে কৃপা প্রদর্শন করেন। সেই কৃপা শক্তির মূর্ত বিগ্রহ হচ্ছেন মহাভাব চিন্তামণি-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।

হ্লাদিনীশক্তি-স্বরূপা শ্রীরাধার দ্বারা আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রসস্বরূপ হয়ে রস উপভোগ করেন ও তার ফলে তিনি নিজে আনন্দিত হন। তাই জীব সেই আনন্দের কিঞ্চিৎ মাত্র প্রাপ্ত হওয়ার জন্য সেই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা উচিৎ। প্রকৃত রসের বিষয় হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। প্রীতি বা আনন্দ বিধানের একমাত্র আধার হচ্ছেন পরিপূর্ণতম রসের স্বরূপ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ।

বৃহৎ আরণ্যকেও পরংব্রহ্ম অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বস্তুর রস-স্বরূপের কথা সূচিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে—এই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম হচ্ছেন সর্বভূতের অর্থাৎ জীবগণের আনন্দ প্রদাতা। তাই জীবমাত্রেই এই আনন্দের সম্পূর্ণ অধিকারী। কিন্তু জড় বা ভৌতিক আনন্দের বশবর্তী হয়ে জীব এই পরানন্দকে উপেক্ষা করে অশেষ ক্লেশ আনয়ন করে থাকে। অনু অংশবিশেষ

জীবাত্মার নিকটে পূর্ণানন্দময় স্বয়ং ভগবান্ তাঁর কৃপাশক্তির অহৈতুকী কৃপা সঞ্চার করার ফলে অনু-পরিমিত আনন্দ স্বতঃ প্রকাশমান হয়। রসরাজ কৃষ্ণ তাঁর কৃপাশক্তি (হ্লাদিনী শক্তি)র দ্বারা নিজে অধীন হয়ে অপরকে অধীন করান। এটাই তাঁর প্রিয়ত্ব ধর্ম। এজন্য তিনি ইন্দ্রিয়াতীত ও দুর্লভতম হয়েও সর্বদা ভক্তের প্রেমবাধ্য। শৃঙ্গার রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে সকলকে আকর্ষণ করে প্রেমোন্মত্ত করে থাকেন এবং নিজেও প্রেমে বিহ্বল হন্। তাঁর অঙ্গাঙ্গীর মধ্যে কোনও ভেদ নেই। অর্থাৎ তাঁর যা স্বরূপ, তা-ই শ্রীবিগ্রহ ও যা শ্রীবিগ্রহ তা-ই স্বরূপ। তাই তিনি সম্পূর্ণরূপে শৃঙ্গার রসস্বরূপ। আবার তিনিও হচ্ছেন স্বয়ং রসের সাগর। সেই রসের অনন্তলীলা বৈচিত্র্য আছে। এই লীলা বৈচিত্র্যে হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর প্রধান সহায়িকা হয়ে থাকেন। হ্লাদিনী প্রধানা বা স্বরূপ শক্তি স্বরূপা শ্রীরাধার সঙ্গে রসরাজের অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ ক্রীড়া বা লীলাবিলাস নিত্যকাল, নিত্যধাম বা গোলোক বৃন্দাবনে চলছে। জীব এই লীলা বিলাসের সম্যক অনুভবের জন্য কৃপাশক্তির কৃপাকটাক্ষের উপরে নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এই কৃপাকটাক্ষ প্রকৃতপক্ষে প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারাই লভ্য হয়ে থাকে। জীবমাত্রেই উপাসক, আর বিষয় বিগ্রহ কৃষ্ণই হচ্ছেন একমাত্র উপাস্য। কিন্তু স্বরূপ-শক্তি স্বরূপা মহাভাবময়ী হ্লাদিনীর দ্বারা উপাস্য স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ নিজেকে ও উপাসক ভক্তকে উভয়কে আকৃষ্ট করান ; আর উপাস্য উপাসক উভয়ে উভয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হন। এরকম ভাবের যেই আদান-প্রদান, যেটাকি ভক্তির চরমস্থিতিতেই কেবল সংঘটিত হয়ে থাকে, তা কেবল প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ দ্বারাই সম্ভবপর হয়ে থাকে। বেদ বেদান্তাদি সকল শাস্ত্রে এটাই গূঢ় রহস্য।

তাই সেই প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধটাই নিত্য সাধুসঙ্গের দ্বারা ক্রমবর্ধমান করার প্রভাবে অলীক দৈহিক সম্বন্ধটা ত্যাগ করতে পারলে প্রকৃত আনন্দটা অনুভবের বিষয় হয়ে থাকে। তা না হলে শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতার বাণী অনুসারে এ ভৌতিক সম্বন্ধটাকে বহুমানন করলে, তা কেবল অশেষ দুঃখের কারণ হয়। এজন্য বৃথা কালক্ষেপণ নীতি অবলম্বন না করে প্রকৃত আনন্দ বা পারমার্থিক আনন্দ বৃদ্ধির জন্য সমগ্র মানব সমাজ প্রয়াসী হওয়া উচিত।

(হরিবোল)

পরম দয়াল শ্রীকৃষ্ণ

অজ্ঞতারশতঃ মায়াবদ্ধ জীব নিজেকে ভূত-প্রকৃতির প্রভু বলে মনে করে। সে মনে মনে চিন্তা করে, যে-সমস্ত বস্তু তার অধিকারে আছে অথবা যে-সমস্ত বস্তু সে দেখছে, সেই সমস্ত বস্তুর মালিক হচ্ছে সে। সে জানতে পাচ্ছে না যে, তার ফলে সে ভগবানের ভৌতিক শক্তির অধীন হয়ে পড়ছে। তবে জীবের (মানবের) কর্তব্য হিসাবে কর্মের মাধ্যমে ভগবানকে সেবা করা উচিত, কারণ ভগবান (কৃষ্ণ) হচ্ছেন সমস্ত লোক ও সমস্ত লোকের অধিবাসীগণের একমাত্র ঈশ্বর। তিনি হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞ কর্মের একমাত্র উপভোগকারী। তাঁকে উপভোগ প্রদান করতে পারলেই জীবগণ শান্তি লাভ করতে পারবে। শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা (৫/২৯) শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ ছলে বলেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।।

"সাধু-সন্ত-মহাত্মাগণ আমাকে সমস্ত যজ্ঞ-কর্ম, তপস্যা ও ব্রতাদির অন্তিম উদ্দেশ্য, সমস্ত লোক ও দেবতাদের ঈশ্বর এবং সমস্ত জীবের উপকারী ও মঙ্গলাকাঙ্খী বন্ধুরূপে জেনে ভৌতিক দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন।" জীবের প্রতি এভাবে কৃপা প্রদর্শন করে ভগবান্ স্বয়ং জীবের মঙ্গলাকাঙ্খী বন্ধু হিসাবে তার কিরূপে প্রকৃত শান্তি লাভ হতে পারে সেই উপায় নির্ধারণ করেছেন। জীব কৃষ্ণকে ভুলে গিয়ে নিজেকে ভোক্তা বলে মনে করলেও ভগবান্ কিন্তু তাকে ভোলেন নি। তিনি হচ্ছেন সমগ্র জীবজগতের একমাত্র হিতাকাঙ্খী বন্ধু । জীবের প্রতি অনুগ্রহ করে তিনি ধরাধামেতে অবতীর্ণ হন।

তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার।।

যেহেতু ভগবান্ জীবের স্বরূপ বিস্মৃতির কথা জানেন, তাই তিনি জীবকে এক মুহূর্তও ছাড়েন না। যেমন পিতা পুত্রের কোন অমঙ্গল কামনা না করে সদাসর্বদা তার কল্যাণ অথবা হিতসাধন করে থাকেন, ঠিক্ তেমনই ভগবান্

সমস্ত জীবের বীজপ্রদ পিতা হিসাবে তাদের প্রকৃত শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের পথ নির্দেশ করে দেন। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় ভগবান বলেছেন—

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা।। —(গী. ১৪/৪)

"হে কুন্তী পুত্র ! একথা জেনে রাখা উচিত যে, এ ভূতপ্রকৃতিতে সমস্ত প্রকার জীব জাত হয় এবং সমস্ত প্রকার জীব যোনিতে যে সকল জীব জাত হয় সে সকলের বীজ প্রদানকারী পিতা হচ্ছি আমি।" পরম পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের আদি পিতা। মায়া মোহিত হয়ে তারা ভগবানকে বিস্মৃত হলেও বীজপ্রদ পিতা হিসাবে ভগবান্ তাদেরকে ভোলেননি। বরং তিনি বেদ পুরাণাদি দিয়ে শাস্ত্রের মাধ্যমে তাঁর স্বরূপ জ্ঞান সম্বন্ধে তাদেরকে সচেতন করে দিয়েছেন।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা-কৃষ্ণ বেদপুরাণ।।
—(চৈ. চ. ম. ২০/১২২)

তাই জীবের প্রতি কৃপা করে কৃষ্ণ বেদ, পুরাণাদি শাস্ত্র সৃষ্টি করেছেন। সেই সমস্ত অধ্যয়ন করে জীব ভগবানের সঙ্গে তার সম্বন্ধ বিষয় জানতে পারবে এবং সেই সম্বন্ধ আবার সংস্থাপন করার জন্য অভিলাষ পোষণ করবে। জীবের প্রতি অশেষ কৃপা প্রদর্শন করে ভগবান্ শাস্ত্র, গুরু, আত্মা (হৃদয়স্থিত পরমাত্মা) -রূপে জীবের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন।

'শাস্ত্র-গুরু-আত্মা'-রূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান।।
—(চৈ. চ. ম. ২০/১২৩)

জীবকে পারমার্থিক তত্ত্ব অবগত করাবার জন্য কৃষ্ণ শাস্ত্র রূপে, গুরু রূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন ; জীবের প্রতি এটি হচ্ছে কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা। জীবের ত্রিতাপগ্রস্ত অবস্থা অবলোকন করে তিনি তার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন। কৃষ্ণের এই অপার করুণা সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণনা করেছেন—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।। —(চৈ. চ. আ. ১/৪৫)

শাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে গুরু কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। ভগবান্ কৃষ্ণ গুরু রূপে নিজের ভক্তদেরকে উদ্ধার করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় পরম পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাঁর অসীম কৃপার ফলে পারমার্থিক গুরুরূপে প্রকাশিত হন। তাই আচার্যের ব্যবহারে ভগবানের প্রতি দিব্য প্রেমময়ী সেবা ছাড়া অন্য কিছু কার্যকলাপ নেই। উপরোক্ত বিবরণ থেকে ভগবান্ কৃষ্ণ কত কৃপাময় তা স্পষ্ট অনুমেয়। জীব কৃষ্ণের সেবক। কিন্তু মায়াগ্রস্ত হয়ে সে তাঁকে ভুলে গিয়েছে। তাই পরম পুরুষ ভগবান্ কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা বদ্ধজীবের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কোন জীব (ব্যক্তি) যদি নিষ্ঠাপর ভক্ত হতে ইচ্ছা করে এবং মন প্রাণ দিয়ে ভক্তি যাজনে নিজেকে নিয়োজিত করতে ব্যাকুলতা প্রকাশ করে, তখন তার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার জন্য কৃষ্ণ একজন শিক্ষাগুরুকে প্রেরণ করেন, যাঁর মাধ্যমে জীবের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার সুপ্ত প্রবৃত্তি জাগ্রত হতে পারে।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে।। —(চৈ.চ. আ. ১/৫৮)

ভগবান্ কৃষ্ণ প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে গুরুরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। কৃষ্ণ গুরুরূপে বদ্ধজীবের বহিঃ-ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে আবির্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত জীবের অন্তরের মধ্যে চৈত্যগুরু-রূপে পথ প্রদর্শন করেন। ভগবান্ কৃষ্ণ জীবের প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করেন, তা নিম্নোক্ত উপাখ্যান থেকে অতি সহজেই বোঝা যায়। দ্বাপর যুগে ভগবান্ কৃষ্ণ নন্দমহারাজের আঙ্গিনায় ক্রীড়া করার সময় মা যশোদার সমক্ষে রাক্ষসী পূতনা একজন ধাত্রী অথবা সেবিকা হিসাবে স্তন্যপান করাতে এসেছিল। পরম দয়ালু কৃষ্ণ যশোদা মাতার মাধ্যমে সেই রাক্ষসীকে স্তন্যদুগ্ধ পান করানোর সুযোগ প্রদান করেছিলেন। রাক্ষসী পূতনা একটি মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে তার স্তনদ্বয়ে উৎকট কালকূট বিষ লেপন করে কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য এলেও ভগবান্ কৃষ্ণ তার স্তন্যদুগ্ধ পানের সঙ্গে তার প্রাণবায়ু শোষণ করে তাকে মাতার স্থিতি প্রদান করেছিলেন। শ্রীমদ্ ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম।। —(ভা. ৩/২/২৩)

"আহা, কি আশ্চর্য! বকাসুরের ভগ্নী দুষ্টা পুতনা রাক্ষসী শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সংহার করার উদ্দেশ্যে কালকূট মিশ্রিত স্তন পান করিয়েও ধাত্রীর যোগ্য গতি লাভ করেছিল। অতএব কৃষ্ণ থেকে দয়ালু আর কে আছে যে, আমি তার শরণাপন্ন হব ?"

ভগবান্ কিরূপ দয়ালু, এমনকি তাঁর শত্রুর প্রতিও, তার উদাহরণ এখানে প্রদান করা হয়েছে। কৃষ্ণের শৈশবাবস্থায় পুতনা কালকূট বিষ দিয়ে কৃষ্ণকে সংহার করতে চেষ্টা করেছিল। সে কূট তথা চাতুরি করে একজন মাতার মতো আচরণ করেছিল এবং কৃষ্ণকে স্তন্যপান করিয়েছিল। মাতার মতো কার্য করার ফলে ভগবান্ কৃষ্ণ তাকে মাতৃত্ব রূপে স্বীকার করেছিলেন। এই উপাখ্যানে ভগবান্ কৃষ্ণের পরম দয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে। এমনকি যদি খল স্বভাব পশুহত্যাকারী অতি ক্রূর ব্যাধও যদি ভগবানের শ্রীচরণে প্রণত হয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করে, তা হলে সেও পরম দয়ালু শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিত্য মঙ্গলের আশীর্বাদই লাভ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে বৈষ্ণবাচার্যগণ একটি অখ্যায়িকা বলে থাকেন—

একদিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণে বার হয়েছিলেন। এমন সময় পথিমধ্যে এক রাজকুমারের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হলো এবং সে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করার পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাকে 'রাজপুত্র শতং জীব' (শত বছর পরমায়ু হোক) বলে আশীর্বাদ করে গন্তব্য পথে অগ্রসর হলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর এক মুনিপুত্রের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হলো এবং সেই মুনিপুত্র শাস্ত্রবিধি অনুসারে গোবিন্দকে প্রণতি নিবেদন করায় গোবিন্দ তাকে আশীর্বাদ করে বললেন—'মা জীব মুনি পুত্রক', প্রিয় সখা অর্জুনের আর বিস্ময়ের অন্ত রইল না। তিনি (অর্জুন) মনে মনে ভাবলেন ,—এ আবার কি রকম আশীর্বাদ ? রাজপুত্র সাধারণতঃ বিষয়ী লোক, তাকে বললেন, 'রাজপুত্র শতং জীব।' আবার এই মহাধ্যানী যোগীকে বললেন— 'মা জীব মুনি পুত্রক'।

বিপরীত ভাবোদ্দীপক বাক্য শ্রবণ করে অর্জুন কতো রকমের চিন্তা করে চললেন। এমন সময় পথি-মধ্যে পুনরায় স্বীয় পরমভক্ত এক সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো এবং সেই সাধু গদ্‌গদ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতিভরা প্রণতি জানালেন—

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

যশোদানন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় ভক্তের প্রীতিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করে তাকে আলিঙ্গন-পূর্বক আশীর্বাদ করলেন—'জীব বা মর বা সাধো'। অল্প সময় পরে এক ক্রূরমতি ব্যাধের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। সেই ভয়ঙ্কর ব্যাধ শ্রীকৃষ্ণকে সভয়ে প্রণাম জানালো। ভগবান্ সর্বজীবের প্রতি সমদর্শী। সেইজন্য ব্যাধকেও তিনি আশীর্বাদ করে বললেন,— 'মা জীব মা মর ব্যাধ।'

এটি দর্শন করে অর্জুনের পূর্ব সংশয় অধিক বৃদ্ধি পেল। তিনি আশীর্বাদ চতুষ্টয়ের সম্যক তাৎপর্য বুঝতে না পেরে ভগবান্ কৃষ্ণের নিকট শরণাগত হলেন। অর্জুনকে শরণাগত হওয়া দেখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—"হে অর্জুন, আমি কোন দিন কাউকেও মন্দ আশীর্বাদ করিনি। আমি রাজকুমারকে শতবছর পরমায়ু হোক বলে যে আশীর্বাদ করেছি, তা'র তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, রাজা পুণ্যকামী এবং এই জন্মে তার পুণ্যকর্ম করার অধিকার রয়েছে। জন্মান্তরে কি হবে না হবে তা'র কোন নিশ্চয়তা নেই। অতএব তা'কে প্রীতিভরে আশীর্বাদ করলাম—'রাজপুত্র শতং জীব'। তারপর মুনিপুত্রের আশীর্বাদ— মুনিরা সাধারণতঃ এই জন্মের কঠোর সাধনার ফল পরজন্মে পেয়ে থাকেন। এই জন্মের তপস্যার ফল মেলে না; সেইজন্য আমি তার মৃত্যু কামনা করেছি। মৃত্যুর পর সে তার সাধনা-লব্ধ ফল স্বর্গলোক অথবা সত্যলোক প্রাপ্ত হবে। তৃতীয়তঃ সাধুকে আমি যে বর প্রদান করেছি, তা অত্যন্ত গূঢ় এবং বিস্ময়কর ব্যাপার। কারণ সাধু নিষ্কাম; এই জন্মে অথবা পরজন্মে তিনি কোন বস্তুর কামনা করেন না। তিনি সদাসর্বদা হরিগুণগান করে পরম শান্তিতে বাস করেন। 'কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলেই অশান্ত।' সেইজন্য তাঁর ইচ্ছা, তিনি মরতে পারেন অথবা বাঁচতে পারেন। জীবিতাবস্থায় তিনি মহানন্দে ভজন করছেন। দেহান্তেও তিনি ভগবানের নিত্য সেবা লাভ করবেন। অর্জুনকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভগবান্ কৃষ্ণ

বললেন, তোমাকে আমি কুরুক্ষেত্রে বলেছিলাম—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্।।
—(গী. ৯/২৫)

"যারা দেবতাদের উপাসনা করেন তারা দেবলোক প্রাপ্ত হবেন; যারা পিতৃপুরুষদের উপাসনা করেন তারা পিতৃলোক লাভ করেন; যারা ভূত-প্রেম আদির উপাসনা করেন তারা ভূতলোক লাভ করেন; এবং যারা আমার উপাসনা করেন তারা আমাকেই লাভ করেন।"

তাই সাধু অথবা ভক্ত প্রকটাবস্থায় ভগবানের বিবিধ সেবায় নিযুক্ত থাকেন এবং দেহান্তে অথবা অপ্রকট হওয়ার পরেও তাঁরা ভগবানের দিব্য ধামেতে তাঁদের নিত্য সেবা সুখ লাভ করবেন। উভয় অবস্থায় ভগবদ্ সেবাই তাদের একমাত্র কাম্য।

ভগবান্ কৃষ্ণ শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতাতেও একথা বলেছেন—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।। —(গী. ৮/১৬)

"এ ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চতম লোক থেকে শুরু করে নিম্নতম লোক পর্যন্ত সমস্ত স্থান দুঃখপূর্ণ। এ স্থানগুলিতে বারংবার জন্মমৃত্যুই লেগে রয়েছে। কিন্তু হে কুন্তীপুত্র! যিনি আমার পরমধাম প্রাপ্ত হন্, তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না।"

এইভাবে পরম দয়াময় ভগবান্ কৃষ্ণ জীবের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করে তার (জীবের) শ্রেয়লাভের পন্থা নির্দেশ করেছেন। জীব উদ্ধারের জন্য ভগবানের এই যে দয়া প্রদর্শন তা জীবের প্রতি তাঁর অপার করুণার নিদর্শন।

ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জুনকে আবার নিজের কথা বলতে শুরু করলেন,—তারপর "ব্যাধকে যে আশীর্বাদ করেছিলাম তা শ্রুতিকটু হলেও তাতেই তার মঙ্গল হবে। সে পূর্ব কর্মদোষের জন্য বর্তমান অপকর্ম-রূপ প্রাণীহত্যা করে নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতর হচ্ছে। মৃত্যুর পরও তার কিছুমাত্র শান্তি নেই। মৃত্যুর পর সে সেই সমস্ত জীবদের দ্বারা বার-বার অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তরে নিহত হতে

থাকবে। এই জগতে প্রত্যেককে কর্মফল ভোগ করতে হবে। কর্মীদের বাস্তব সুখ নেই। এ জন্মে ও পর জন্মে তাদেরকে ত্রিতাপে দগ্ধীভূত হতে হয়। সুতরাং আমি ব্যাধকে যে আশীর্বাদ দিয়েছি, তার তাৎপর্য উপলব্ধি করে যদি কর্মীরা ভাগবত ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করবে, তাহলে তাদের জীবন ধন্য হবে।"

এই পুণ্যময়ী আখ্যায়িকা থেকে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, একমাত্র ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা যাঁরা ভগবানকে আরাধনা করেন, তাঁরাই ধন্য। তবে উপরোক্ত বর্ণনাদি লক্ষ্য করে প্রধান বৈষ্ণবাচার্য সপ্তম গোস্বামী নামে অভিহিত শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, জীব কৃষ্ণের অমৃতময় লীলা জড় জগতে লাভ করতে পারবে না বলে কৃষ্ণ দয়া করে স্বীয় অচিন্ত্য লীলা এ প্রপঞ্চে উদয় করান। অধিকন্তু জীব সেই লীলাতত্ত্ব বদ্ধাবস্থায় বুঝতে পারে না। তা দেখে তিনি স্বয়ং নবদ্বীপে ভক্তরূপে অথবা গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়ে পরম উপায় স্বরূপ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা ব্যাখ্যা করেন এবং নিজে ভক্তরূপে আচরণ করে শিক্ষা দেন। কিন্তু আমরা এতই হতভাগ্য যে আমাদের তাতে আগ্রহ প্রকাশিত হয় না।

সমগ্র জীবজগতের মঙ্গলাকাঙ্খী বন্ধু হিসাবে সমস্ত জীবের প্রতি তাঁর অপার করুণা রয়েছে। তাঁর কৃপা সকলের প্রতি সমান। কিন্তু আমরা আমাদের বিচার বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে বুঝতে পারি না। তাই তিনি স্বয়ং এ ধরাধামেতে আচার্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের মতো বদ্ধজীবদের উদ্ধারের পন্থা নির্ণয় করেছেন। তাই বিচার করে দেখুন, জীবের প্রতি তাঁর কিরূপ অপার দয়া।

(হরিবোল)

ভগবানের নিরপেক্ষতা

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় বলেছেন—

"সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।"

—(গী. ৯/২৯)

অর্থাৎ—"আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউ আমার প্রিয়, অপ্রিয় বা শত্রু-মিত্র নয়।" আবার শ্রীমদ্ ভগবদ্-গীতা (৫/২৯)-তে ভগবান বলেছেন—"সুহৃদং সর্বভূতানাং...।" অর্থাৎ - "আমি সকল জীবের একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্খী বন্ধু। ভগবানের এই সমস্ত কথা অত্যন্ত গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণ লোক এ কথা সহজে উপলব্ধি করতে পারে না।

দুই প্রকার বিচার আছে। একটি হচ্ছে আপাত-বিচার ও অন্যটি হচ্ছে তত্ত্ববিচার। ভগবানকে বা ভগবানের কথা আপাত বিচারে বুঝতে গেলে সাধারণ লোক নিশ্চিতভাবে ভগবানকে ভুল বুঝবে, কখনই ঠিকভাবে বুঝতে পারবে না। একমাত্র তত্ত্ববিচারেই ভগবানকে বা ভগবানের লীলা-কাহিনী ঠিক ভাবে বুঝতে পারা যায়। তাই তত্ত্বগত হিসাবে না বুঝলে ভ্রম উৎপাদিত হবে। ভগবান কৃষ্ণ তা ভগবদ্গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।। —(গী ৪/৯)

অর্থাৎ—"হে অর্জুন ! যিনি আমার জন্ম অর্থাৎ আবির্ভাব এবং কর্মের বিশুদ্ধভাব তত্ত্বগতভাবে জানেন, তিনি তাঁর শরীর ত্যাগ করার পর এই ভৌতিক জগতে আর জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি আমার দিব্য অর্থাৎ নিত্য শাশ্বতধাম প্রাপ্ত হন।"

ভগবানের এই কথা থেকে স্পষ্ট সূচিত হচ্ছে এই যে, ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানতে হবে। কখনই ভগবানের বিষয়ে অর্থাৎ ভগবান সম্বন্ধে আপাত-বিচার করা উচিত নয়।

যারা উপযুক্ত তত্ত্বাচার্যের কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে না, তারাই কেবল ভগবানকে দোষারোপ করে থাকে, তাঁর কর্মে দোষ দেখে থাকে। ভগবান যা বলেছেন তা ঠিক নয় বলে তারা তাদের অভিমত প্রকাশ করে থাকে। প্রথমে আমরা বলেছি ভগবান নিরপেক্ষ, তিনি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। তিনি সকলের একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্খী বন্ধু। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানহীন অবিদ্যাগ্রস্ত বদ্ধজীবগণ বলে থাকে যে, ভগবান কখনই সকলের সুহৃদ্ নন। কিংবা নিরপেক্ষ নন। তারা বলে, আমরা দেখছি বা বিচার করে বুঝতে পাচ্ছি যে, ভগবান দেবতাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, তাঁদেরকে সুরক্ষা দিয়েছেন বা তাঁদের পক্ষ সমর্থন করেছেন; কিন্তু অসুরদের প্রতি নিগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, তাদের প্রতি শত্রুতাচরণ করেছেন ও তাদেরকে নিহত করেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি কিরূপে নিরপেক্ষ বা সকলের সুহৃদ হলেন।

বাস্তবিকপক্ষে একজন সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে এটা একটি গূঢ় প্রশ্ন। এটা তার এক বিরাট সংশয় বা ভ্রম। এটা নিরাকৃত হওয়া উচিত। তা নাহলে 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'— এই বাণী অনুসারে সে নিশ্চিতরূপে বিনষ্ট হবে।

এইজন্য শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় অর্জুন একজন সাধারণ লোকের যা প্রশ্ন বা সংশয় তা ভগবান কৃষ্ণের কাছে উত্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর মুখ হতে সে-সকল প্রশ্নের তাত্ত্বিক উত্তর লাভ করেছিলেন। অনুরূপ শ্রীমদ্ ভাগবতে পরীক্ষিত মহারাজ এই প্রশ্ন শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে উত্থাপন করেছিলেন ও শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তা'র তাত্ত্বিক উত্তর প্রদান করেছিলেন। তা জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।

শ্রীমদ্ ভাগবতের ৭ম স্কন্ধে ভগবানের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে পরীক্ষিত মহারাজ ও শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মধ্যে যে বার্তালাপ হয়েছিল তাতে বহুকিছু আলোচনা হয়েছিল। আমরা সেই বিষয়বস্তুর আধারের ওপর আধারিত দুই-চারটি কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করছি।

যিনি ভগবানের প্রিয়ভক্ত বা শুদ্ধভক্ত তিনি এ সকল তত্ত্ব ভালভাবে জানেন, তথাপি যখন তিনি তাঁর থেকে উন্নত অধিকারী পান তখন তিনি জানা তত্ত্বের সঠিকতা সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চিত হওয়ার জন্য সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এজন্য পরীক্ষিত মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে এটা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন- "সমস্য কথম বৈষম্যম্।" অর্থাৎ— যেহেতু ভগবান সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, সেহেতু তিনি কিরূপে পক্ষপাত আচরণ করতে পারেন ? আবার "প্রিয়স্য কথম্ অসুরেষু প্রীতি অভাব।" অর্থাৎ—ভগবান সকলের পরমাত্মা হওয়ার জন্য সকলের অতি প্রিয়; তাহলে কেন তিনি অসুরদের প্রতি অপ্রিয় ব্যবহার করবেন ? "সুহৃদশ্চ কথং তেষু অসৌহার্দম্।" অর্থাৎ—যেহেতু ভগবান্ সুহৃদং সর্বভূতানাং; সকলের মঙ্গলাকাঙ্খী বন্ধু, তাহলে তিনি কিরূপে অসুরদেরকে বিনাশ করে পক্ষপাতিতা আচরণ করেন ? এগুলি হচ্ছে সাধারণ লোকের প্রশ্ন। এ সকল প্রশ্ন পরীক্ষিত মহারাজের মনেতে উদিত হয়েছিল ও তিনি তার তাত্ত্বিক উত্তর শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে চেয়েছিলেন।

বাস্তবিকপক্ষে ভগবানই নিরপেক্ষ, কিন্তু আমরা যখন ভগবান কৃষ্ণের ক্ষেত্রে কিছুটা পক্ষপাতিতার আচরণ করতে দেখি, তখন বুঝতে হবে তা আমাদের জড় দৃষ্টির জন্য সেরূপ ভাবে প্রতীত হয়। তা না হলে অসুরেরা বা ভগবানের তথাকথিত শত্রুরা ভগবানের হাতে মৃত্যুবরণ করে কেমন করে মুক্তি লাভ করে থাকে ? ভগবানের শত্রুতা বা বন্ধুতা ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা উপস্থাপিত বাহ্য প্রকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি সর্বদাই দিব্যস্থিতিতে থাকেন। তিনি কারোর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুক বা নিগ্রহ প্রকাশ করুক তিনি সর্বদাই দিব্য। যে ব্যাক্তি ভৌতিক দোষদুষ্ট তার ক্ষেত্রে রাগ-দ্বেষ বা শত্রু-মিত্র ভাব দেখা যায়। ভগবান এরূপ দোষদুষ্ট না হওয়ার জন্য তাঁর ক্ষেত্রে এ সকল অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ বা শত্রু-মিত্র ভাব বলে কিছুই নেই। আমরা হচ্ছি ভৌতিক জগতের অধিবাসী, আমাদের ক্ষেত্রে এ সব কথা বিশেষভাবে প্রযুজ্যমান। আমরা আমাদের শত্রুকে ভয় করি, অপরের কাছে সাহায্য চাই। কিন্তু ভগবান কারোর দেখে ভয় করেন না কি কারোর কাছে সাহায্যও চান না। তিনি হচ্ছেন আত্মারাম। তিনি কেন অসুরদেরকে দেখে ভয় করবেন। তাই তাঁর ক্ষেত্রে পক্ষপাতিতার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজের জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে বলেছিলেন—

নির্গুণোঽপি হি অজোঽব্যক্তো ভগবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স্বমায়া-গুণম্-আবিশ্য বাধ্য-বাধকতাং গতঃ। —(ভা. ৭/১/৬)

অর্থাৎ—ভগবান্ বিষ্ণু সর্বদাই ভৌতিক গুণের ঊর্দ্ধে অবস্থান করেন, সে জন্য তাঁকে নির্গুন বলা হয়। তিনি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত হওয়ার জন্য তাঁর ক্ষেত্রে রাগ-দ্বেষাদির বশবর্তী জড় বা ভৌতিক শরীর রহিত। যদিও ভগবান্ সর্বদাই ভৌতিক স্থিতির ঊর্দ্ধে অবস্থান করেন, তথাপি তিনি তাঁর চিৎ-শক্তির মাধ্যমে এ প্রপঞ্চে একজন সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হয়ে ক্রিয়া করেন এবং একজন বদ্ধ-জীব সদৃশ কর্তব্য করতে বাধ্য হন বলে প্রতীত হন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তিনি সেরূপ নন বা সেরূপ বাধ্যবাধকতাভাবে কর্ম করেন না।

ভৌতিক স্থিতিতে যে-সমস্ত রাগ-দ্বেষ ও বাধ্য-বাধকতা দেখা যায়, তা ভূত-প্রকৃতির ক্রিয়ার জন্য হয়। কিন্তু ভগবান্ এ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হলেও তিনি সর্বদাই তাঁর দিব্য চিৎ-শক্তিতে অবস্থান করেন। তিনি ভূত-প্রকৃতিতে বা জড়-বহিরঙ্গা শক্তিতে অবস্থান করেন না। এখানে তাঁর যেসকল ক্রিয়াকলাপ, তা তিনি তাঁর দিব্য-স্থিতিতে অবস্থান করে সম্পাদন করে থাকেন। যদিও তাঁর কার্যকলাপ ভৌতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন বলে জানা পড়ে, তথাপি তত্ত্বতঃ সেগুলি হচ্ছে অদ্বয় ও অভিন্ন। তাই ভগবান কারোর প্রতি শত্রুতা আচরণ করছেন বা কারোর প্রতি মিত্রতা আচরণ করছেন—এরকম বলাটাই হচ্ছে ভ্রমাত্মক। বদ্ধজীবের এরকম বলাটাই হচ্ছে ভগবানের ওপরে দোষারোপ করা। সেজন্য বলা হয়েছে—ভগবানকে তত্ত্ব-দৃষ্টিতে দেখতে হবে, কারণ তত্ত্ব-দৃষ্টিতে দেখলে তিনি হচ্ছেন সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, নিরপেক্ষ। ভূত-প্রকৃতির ত্রিগুণের বশবর্তী হওয়ার ফলে আমরা জড় দৃষ্টির বা দোষদুষ্ট দৃষ্টির ফলে ভগবানের ওপরে দোষারোপ করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনিই সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন বা নিরপেক্ষ। কারোর প্রতি তিনি শত্রুতাচরণ বা মিত্রতাচরণ করেন না।

ভৌতিক জগতে ত্রিগুণের দ্বারা বদ্ধ হওয়ার জন্য জীব গুণের প্রাধান্য অনুযায়ী ক্রিয়া করে। প্রত্যেকেই এ ভৌতিক জগতে ভূত-প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করে। কিন্তু ভগবান গুণাতীত হওয়ার জন্য বা ভূত-প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়ার জন্য তাঁর ক্রিয়া দিব্য বা ভৌতিক গুণ-জনিত নয়। তাই তিনি নিরপেক্ষ। ভূত-প্রকৃতির ত্রিগুণ একই সময়ে ক্রিয়া করে না। এগুলি ঋতু পরিবর্তনের মতো ক্রিয়া করে। কখন কখন রজঃ গুণের আধিক্য হয় তো, কখন কখন তমো গুণের ও কখন কখন সত্ত্ব গুণের।

সাধারণতঃ দেবতাদের সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়ে থাকে। কিন্তু অসুরদের রজঃ বা তমো গুণের আধিক্য হয়। সেজন্য যখন দেবতা ও অসুরেরা যুদ্ধ করে, তখন সাধারণতঃ সত্ত্বগুণের প্রাধান্যের জন্য দেবতারা বিজয়ী হন ও অসুরেরা পরাহত হয়। তাই সেক্ষেত্রে ভগবানের কোনও পক্ষপাতিতার প্রশ্ন ওঠে না।

আবার শুকদেব গোস্বামী বলেছেন—

জ্যোতিরাদির - ইবাভাতি সংঘাতান্ ন বিবিচ্যতে।
বিদন্তি-আত্মানম্-আত্মস্থং মথিত্বা কবয়োঽন্ততঃ।।
—(ভা. ৭/১/৯)

অর্থাৎ—''সর্বভূতে সমদর্শী ভগবান্ বিভিন্ন বস্তুতে বিভিন্ন প্রকারে ন্যূনাধিকরূপে প্রকাশিত হন, যেমন কাষ্ঠ প্রভৃতিতে অগ্নি, পাত্রাদিতে জল এবং ঘট-পটাদিতে আকাশ নানারূপে প্রকাশ পায়, সেরূপ সুরাসুর প্রভৃতিতে তিনি অর্থাৎ ভগবান সমভাবে ব্যাপ্ত আছেন। বিবেকী ব্যক্তিগণ আত্মস্থ পরমাত্মাকে মন্থন করে কার্য- দর্শন-লিঙ্গ দ্বারা বিচার করে জানতে পারেন কতদূর একজন ব্যক্তি ভগবানের দ্বারা অনুগৃহীত হয়েছেন।''

যদ্-যদ্-বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।। —(গী ১০/৪১)

অর্থাৎ—''এ কথা জেনে রাখো যে, যা সব সুন্দর, গৌরবময় এবং বল প্রভাবাদির আধিক্য-যুক্ত বস্তু আছে, সে-সবই আমার তেজের একাংশ থেকে উদ্ভব।'' এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আমরা বাস্তবিকপক্ষে দেখতে পাই কোনও ব্যক্তি খুব আশ্চর্য-জনক ক্রিয়া করছে তো আর একজন সেরকম করতে পারে না ও সাধারণ জ্ঞানের বলে যা সম্ভব তাও করতে পারে না। তাই ভক্তের কার্যকলাপ থেকে জানা যায় তিনি ভগবানের দ্বারা কতদূর অনুগৃহীত হয়েছেন। আবার ভগবদ্গীতায় ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন—

তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মানুপযান্তি তে।। —(গী. ১০/১০)

অর্থাৎ—''যাঁরা সর্বদা আমাতে যুক্ত হয়ে প্রেম, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে আমার পূজা করে, আমি তাঁদেরকে বুদ্ধি দিই, যাঁর সাহায্যে তাঁরা আমার

কাছে ফিরে আসতে পারে।" এর থেকে জানা যায় যে, ভগবান কৃষ্ণ সকলকে ভক্তিযোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছেন; কিন্তু ব্যক্তি সেই ভক্তিযোগ গ্রহণের জন্য কতদূর সমর্থ তা তার সামর্থের উপর নির্ভর করে। এটাই হচ্ছে রহস্য। এক্ষেত্রে ভগবান কৃষ্ণের পক্ষপাতিতার কোনও প্রশ্নই নেই। ব্যক্তির গ্রহণ করার ক্ষমতার ওপরে কৃষ্ণের গুণ, আনুপাতিকভাবে প্রদর্শিত হয়। কিন্তু যারা বুদ্ধিহীন তারা ভুলবশতঃ তা'কে কৃষ্ণের পক্ষপাতিতা বলে মনে করে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সেটা সেরকম কথা নয়। কৃষ্ণ সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। ব্যক্তির কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করার সামর্থ্য-ওপরে কৃষ্ণচেতনা মার্গের অগ্রগতি নির্ভর করে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এ সম্বন্ধে একটি বাস্তব উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন আকাশে অনেক জ্যোতিষ্ক আছে। নির্মল আকাশে চন্দ্র কতো উজ্জ্বল দেখা যায়। দিনের বেলায় তেমনি নির্মল আকাশে সূর্য কতো উজ্জ্বল, দীপ্তিমন্ত দেখা যায়। কিন্তু আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তবে জ্যোতিষ্কগুলি আর সেরকম উজ্জ্বল বা দীপ্তিমন্ত দেখা যায় না। ঠিক্ তেমনি ব্যক্তি যতই অধিক পরিমাণে সত্ত্ব-গুণের উন্নতি করেন, ততই অধিক পরিমাণে তিনি ভক্তিযোগ মার্গে অগ্রগতি করেন বা ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু তিনি যদি অধিক পরিমাণে রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হন, তাহলে তাঁর দীপ্তি ততো হ্রাস পায় বা তিনি ভক্তিযোগ মার্গে অগ্রগতি করতে পারেন না। তাই ব্যক্তির সদ্‌গুণের প্রকাশ ভগবানের পক্ষপাতিতার ওপরে নির্ভর করে না, তা তাঁর সত্ত্ব-গুণের আধিক্য ওপরে নির্ভর করে। তাই একজন সহজে অনুমাণ করতে পারেন, কোনও ব্যক্তি সত্ত্বগুণে কতদূর অগ্রগতি করেছেন বা রজঃ-তমোগুণের দ্বারা কতদূর আচ্ছাদিত হয়েছে। অসুরেরা রজঃ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে থাকে ও দেবতারা সত্ত্বগুণে অগ্রগতি করে থাকেন। এ ভাবে দেবতারা ভগবানের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন ও অসুরেরা তা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই এক্ষেত্রে ভগবানের পক্ষপাতিতার সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন হতে পারে না।

আবার শুকদেব গোস্বামী বলেছেন—

য এষ রাজন্নপি কাল ঈশিতা
সত্ত্বং সুরানীকমিবৈধয়ত্যতঃ।

তৎপ্রত্যনীকানসুরান্ সুরপ্রিয়ো
রজস্তমস্কান্ প্রমিণোত্যুরুশ্রবাঃ।। —(ভা. ৭/১/১২)

অর্থাৎ—"হে রাজন, কাল সত্ত্বগুণকে বর্ধিত করে। এইভাবে ভগবান্ নিয়ন্ত্রণকারী হয়েও সত্ত্বগুণবিশিষ্ট দেবতাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং তমোগুণ বিশিষ্ট প্রতিপক্ষ অসুরদেরকে হিংসা করে থাকেন। কালপ্রেরক ভগবান্ বিভিন্ন প্রকারে ক্রিয়া করতে কালকে প্রেরণা দেন, কিন্তু তিনি কখন পক্ষপাতভাব আচরণ করেন না ; বরং তাঁর ক্রিয়াকলাপ মহিমাময়, তাই তাঁকে 'উরুশ্রবা' বলা হয়।"

এই উক্তি হতে জানা যায় যে, যখন দেবতারা ভগবানের দ্বারা অনুগৃহীত হন ও রাক্ষসেরা নিহত হয়, তখন সেটা ভগবানের পক্ষপাতিতা নয়। সেটা হচ্ছে কালের প্রভাব।

ইতিহাস, পুরাণাদিতে বহু এরকম বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যেখানে আমরা দেখতে পাই অসুরেরা ভগবানের কৃপা লাভ করেছে। তার উদাহরণ হচ্ছে পূতনা। "অহো! বকী যং স্তন কাল কূটং"—পূতনার উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণকে বিনাশ করা। সেই উদ্দেশ্যে সে তার স্তনেতে কালকূট বিষ লাগিয়ে কৃষ্ণের কাছে এসেছিল স্তন্যপান করাবার জন্য। কিন্তু সে যখন কৃষ্ণের দ্বারা নিহত হলো, তখন সে কৃষ্ণের মাতার স্থিতি বা যশোদার স্থিতি লাভ করলো। কৃষ্ণ এতই কৃপালু ও নিরপেক্ষ যে তিনি পূতনার স্তন্যপান করে তাকে সঙ্গে সঙ্গে মাতারূপে স্বীকার করলেন। বাহ্যত কৃষ্ণের পূতনা বিনাশ ক্রিয়া ভগবানের নিরপেক্ষতার কোনও ধারণা আনে না বা হ্রাস করায় না, কারণ তিনি হচ্ছেন—"সুহৃদং সর্বভূতানাং"। সকল জীবের একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্খী বন্ধু। তাই তাঁর ক্ষেত্রে পক্ষপাতিতার দোষারোপ কদাপি করা যেতে পারে না। তিনি যে পরমেশ্বর, পরম নিয়ন্ত্রণকারী—সেই স্থিতি তিনি সর্বদা রক্ষা করে থাকেন। কৃষ্ণ পূতনাকে এক শত্রুরূপে বিনাশ করলেন, কিন্তু তিনি পরমেশ্বর হওয়ার জন্য তাকে অতি উন্নত মাতৃ-স্থিতি দিলেন। তিনি কিরূপে সকলের সুহৃদ্ তা এ থেকে পরিষ্কার ভাবে জানা যাচ্ছে।

সাধারণতঃ একজন হত্যাকারীকে ফাঁসিদণ্ড দেওয়া হয়। মনু-সংহিতায় বলা হয়েছে, রাজা বা উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতি হত্যাকারীকে ফাঁসিদণ্ড দিয়ে

তার প্রতি কৃপা করেন। তা নাহলে সেই হত্যাকারী সমাজে আরও অনেক মানুষকে হত্যা করে নানা উপদ্রব করবে। যারফলে তার পাপকর্মের জন্য সে অধিক ক্লেশ বা দণ্ড ভুগবে। কিন্তু রাজা বা বিচারপতি কৃপা করে হত্যাকারীকে ফাঁসিদণ্ড দেওয়ার জন্য তাকে অধিক ক্লেশ-ভোগ হতে রক্ষা করে দিলেন। সেরূপভাবে পরম নিয়ন্ত্রণকারী বা পরম বিচারক কৃষ্ণ কৃপা প্রদর্শন করেন। যেমন তিনি অসুরদেরকে বিনাশ করে কৃপা প্রদর্শন করেন। তাই এভাবে এ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা যেতে পারে। শ্রীমদ্ ভাগবতের ৭ম স্কন্ধ পাঠ করলে পাঠকগণ অধিক সূক্ষ্মতত্ত্বের কথা জানতে পারবেন। অতএব ভগবান্ সর্বদা নিরপেক্ষ ও সকল জীবের প্রতি কৃপালু, সকলের মঙ্গলাকাঙ্খী বন্ধু।

(হরি বোল)

ভগবানের ভক্ত ব্যাকুলতা

আমরা জানি এ ভৌতিক জগতে সকল মায়াবদ্ধ জীব শান্তি লাভের জন্য খুব উদ্বিগ্ন। কিন্তু তারা শান্তি লাভের সূত্র জানে না। মায়াবদ্ধ হয়ে জীব মনে করে যে, যা-সব তার অধিকারে আছে বা যা-সব সে দেখছে সেসমস্তর মালিক হচ্ছে সে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানই হচ্ছেন সমস্ত কিছুরই মালিক বা প্রভু। জীব ভগবানের ভৌতিক শক্তির অধীন হয়ে নিজেকে ভোক্তা বলে মনে করে। ভগবান কৃষ্ণ ভগবদ্ গীতায় অর্জুনকে বলেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।। (গী ৫।২৯)

অর্থাৎ—"সাধু-সন্ত-মহাত্মাগণ আমাকে (ভগবানকে) সমস্ত যজ্ঞ, কর্ম, তপস্যা ও ব্রতাদির অন্তিম উদ্দেশ্য, সর্বলোক ও সকল দেবতাগণের ঈশ্বর এবং সকল জীবের উপকারী ও মঙ্গলাকাঙ্খী বন্ধুরূপে জেনে ভৌতিক দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন।"

ভগবান কৃষ্ণই সমস্ত জীব-জগতের একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্খী বন্ধু। তিনি সমস্ত তপস্যা ও যজ্ঞের একমাত্র উপভোগকারী। উপরন্তু তিনি সর্বলোক এমনকি বৈকুণ্ঠ লোকেরও উপভোগকারী। কিন্তু স্বরূপ বিস্মৃত অবিদ্যাগ্রস্ত জীব তা জানতে পারে না। এ ভৌতিক জগতটা হচ্ছে দুঃখালয়, অশাশ্বত। জন্ম, মৃত্যু, জ্বরা ও ব্যাধিতে পরিপূরিত এ ভৌতিক জগতে সকলেই ত্রিতাপে (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) দগ্ধীভূত হচ্ছে। প্রত্যেকেই এখানে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করছে। উপরন্তু এ জগত অস্থায়ী ও বিনাশশীল। এটা একদিন না একদিন ধ্বংস হবে। কিন্তু অজ্ঞজীব এখানে ভোক্তাভিমান করে বহু দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছে। এ জগতে এমন কোনও ব্যক্তি নেই যে, যিনি কখনো কোনও দুঃখ ভোগ করেননি। এখানে দুঃখ-কাতর জীব নিরন্তর সুখ অভিলাষ করে। উপনিষদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—"সুখ মে ভুয়াদ্ দুঃখ মে মাভূত্।।" এ হল বিশ্বের সকল মানবের জপমালা। দুঃখী হওয়ার জন্য মানব সুখ চায়। সুখ

যে মানব পায় না তা নয়। মাঝে মাঝে সে পায় ক্ষণিক সুখ। সেই নশ্বর সুখে তার পরিতৃপ্তি হয় না। অন্তরে অন্তরে সে খুঁজে বেড়ায় সেই সুখ যে-সুখ নিরবচ্ছিন্ন, শাশ্বত ও অনাবিল (নির্মল)। যে সুখ দুঃখ-সংস্পর্শ বর্জিত, নিত্য নিরতিশয় আত্যন্তিক, সেই সুখের নামান্তর হচ্ছে ব্রহ্মানন্দ। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে মানুষ যা কামনা করে তা হচ্ছে সেই ব্রহ্মবস্তু, সেই ভগবান। নিত্যকাল, প্রতিক্ষণেই তাঁকে প্রতিটি জীব খুঁজে বেড়ায়। মানব এ দুঃখালয়ে সর্বদা দুঃখে জর্জরিত। তাই সে দুঃখী বলে সুখ চায়। যে ক্ষণিক চপল সুখ সে লাভ করে তা অনাবিল নয়। তা দুঃখ মিশ্রিত। মহাজন সংগীতে বর্ণিত হয়েছে—

"ভাল ক'রে দেখ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে, সে দুঃখের কারণ।"

—(উপদেশ ঃ-ভক্তিবিনোদ)

এ ভৌতিক জগতে দুঃখে ভরপুর। এখানে সুখ বলে যা প্রতিভাত হয়, তা দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই নয়। সেজন্য গীতায় বলা হয়েছে—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ।। —(গী. ৫/২২)

অর্থাৎ —"যা'র সংস্পর্শে এলে দুঃখই মিলবে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা'র সংস্পর্শে আসেন না। জড়েন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে এলে তুমি দুঃখই পাবে। (ইন্দ্রিয় সুখই দুঃখের কারণ)। হে কুন্তীপুত্র ! এ রকম সুখের (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সুখের) আরম্ভ আছে এবং শেষও আছে। সেজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাতে আনন্দিত হন না।"

যাঁরা প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিত তাঁরা কখনো ইন্দ্রিয় সুখের জন্য আসক্ত হন্ না; কারণ এই ইন্দ্রিয় সুখই হচ্ছে বরাবর ভৌতিক স্থিতির কারণ। তাই ব্যক্তি যতই অধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি আসক্ত হবে সে ততই অধিক পরিমাণে ভৌতিক দুঃখ ভোগ করবে। এ হল গীতা ভাগবতের বাণী অর্থাৎ শাস্ত্রের নির্দেশ। এ সম্বন্ধে মহাজন গীতিও আছে। অন্যতম প্রধান বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটি গীতি এক্ষেত্রে উদ্ধার করা যেতে পারে। যথা—

ওরে মন, ভাল নাহি লাগে এ সংসার।
জনম-মরণ-জরা, যে সংসারে আছে ভরা,
তাহে কিবা আছে বল' সার।।
ধন-জন-পরিবার, কেহ নহে কভু কা'র,
কালে মিত্র, অকালে অপর।
যাহা রাখিবারে চাই, তাহা নাহি থাকে ভাই,
অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর।।
আয়ু অতি অল্পদিন, ক্রমে তাহা হয় ক্ষীণ,
শমনের নিকট দর্শন।
রোগ-শোক-অনিবার, চিত্ত করে' ছারখার,
বান্ধব-বিয়োগ দুর্ঘটন।।
ভাল ক'রে দেখ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে, সে দুঃখের কারণ।
সে সুখের তরে তবে, কেন মায়া-দাস হ'বে,
হারাইবে পরমার্থ-ধন।।
ইতিহাস-আলোচনে, ভেবে দেখ নিজ মনে,
কত আসুরিক দুরাশয়।
ইন্দ্রিয়তর্পণ সার, করি'কত দুরাচার,
শেষে লভে মরণ নিশ্চয়।।
মরণ-সময় তারা, উপায় হইয়া হারা,
অনুতাপ-অনলে জ্বলিল।
কুক্কুরাদি পশুপ্রায়, জীবন কাটায় হায়,
পরমার্থ কভু না চিন্তিল।।
এমন বিষয়ে মন, কেন থাক অচেতন,
ছাড় ছাড় বিষয়ের আশা।
শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়, কর' সবে ভব জয়,
এ দাসের সেই ত' ভরসা।।

এ সংগীতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাজন 'মন শিক্ষা' সম্বন্ধে বলেছেন। এ সংসারটা হচ্ছে দুঃখালয়। এখানে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিতে ভরপুর।

এখানে আজ যারা বন্ধু হয়েছে কাল তারা শত্রু সাজছে। প্রতিদিন এরকম ঘটনা ঘটছে এ জগতে। পিতা-পুত্রের মধ্যে শত্রুতা, ভাই-ভাইয়ের মধ্যে শত্রুতা, স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে শত্রুতা, প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে শত্রুতা আচরণ করছে। এজন্যই কত ব্যভিচার, কত হত্যাকাণ্ড সব প্রতি মুহূর্তে সংঘটিত হচ্ছে। এ অনিত্য সংসারটাই হচ্ছে দুঃখালয় ও অশাশ্বত। এখানে সবকিছু বিনাশশীল। আবার আয়ুও অতি অল্প। তাও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। শ্রীমদ্ ভাগবতে তাই বলা হয়েছে—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃ শ্লোকবার্ত্তয়া।।

—(ভা. ২/৩/১৭)

অর্থাৎ—"সূর্যদেব প্রতিদিন উদয় ও অস্তগত হয়ে মানবগণের হরিকথাহীন বৃথা আয়ু হরণ করছেন ; কেবল উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির কথায় যাঁর কাল-যাপিত হয়, তাঁরই আয়ু তিনি হরণ করেন না।" তাই সূর্য্যের উদয় ও অস্তগত হওয়ায় হরিকথাহীন জীবের তথা মানবের আয়ু হ্রাস পেতে পেতে অবশেষে সে যমের নিকটে যায়। এভাবে প্রতিদিন সমাজে দেখতে পাওয়া যায় কত দুঃখ কত শোক। প্রতিদিন কত কত লোক যমালয়ে যাচ্ছে। কতই বন্ধু-বান্ধব বিয়োগ ঘটছে। আমরা যদি ভালভাবে অনুধ্যান করি তবে দেখতে পাব যে, এখানে অনাবিল, নিরবচ্ছিন্ন, শাশ্বত সুখ নেই। যা আছে তা হচ্ছে অনন্ত দুঃখের কারণ। তবে মানব যে সুখ চায় তা হচ্ছে সেই ব্রহ্মবস্তু, পরংব্রহ্ম ভগবান কৃষ্ণ বা জগন্নাথ। প্রতিটি জীব সেই ভগবানকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেই সুখ সে খুঁজছে যা হচ্ছে অনাবিল ও শাশ্বত। সেই সুখ বা আনন্দ সকলেই কামনা করে। জীব যে কোনও বস্তুর কামনা করুক না কেন তা'র মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখ। যত কিছু সুখ বা আনন্দ আছে সে সমস্তর পরিসমাপ্তি—"আনন্দ ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ।" কারণ তাঁর থেকে উন্নত অধিক আনন্দ আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। জগতে যত জল বা জলাশয় আছে সে-সবের পরিসমাপ্তি যেমন সমুদ্রে, তেমনই সকল প্রকার ক্ষুদ্র, বৃহৎ আনন্দের পরিসমাপ্তি হচ্ছে সেই ভগবানের নিকটে। সেই ভগবানকে পাওয়ার জন্য ভক্তি প্রয়োজন। সেজন্য গীতায় ভগবান বলেছেন—"ভক্ত্যাহং একয়াগ্রাহ্য।" "ভক্ত্যাস্ত্ত অনন্যলভ্য।" একথা ভগবান গীতায় বারংবার বলেছেন। ভক্তিতে কেবল ভগবানকে পাওয়া যায়। সেই ভক্তি

অনন্যা ভক্তি বা শুদ্ধ ভক্তি বা অকিঞ্চনা ভক্তি নামে পরিচিত। ভগবান হচ্ছেন চিন্ময়, অনন্দময়। তাই ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।। —(ব্রহ্মসংহিতা ৫/১)

সেই ভগবান হচ্ছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে আনন্দময়। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারলে জীব সেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করতে পারবে। নচেৎ এখানে সেই আনন্দ লাভ করা অসম্ভব। এখানে যে আনন্দ আছে তা অনাবিল নয়। তা দুঃখ মিশ্রিত। এজন্য এ সংসার যাতনা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ভগবানের নাম নিরন্তরভাবে স্মরণ করতে হবে। ভগবানের সেই প্রেমনাম হলো "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র। যথা—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"

ভগবানের এই নাম ও ভগবান স্বয়ং অভিন্ন বস্তু। বিশেষকরে এহ কলিযুগে ভগবান্ নামাবতার হয়েছেন। তা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হয়েছে। যথা—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ-নিস্তার।।
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম ।।

—(চৈ. চ. আ. ১৭/২২ ও ৭/৭৪)

কলিযুগে ভগবানের অন্য অবতার নেই, কেবল নামাবতার। অনুরূপভাবে 'বৃহৎ-নারদীয়'পুরাণেও বলা হয়েছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

—(বৃ. না. পু. ৩৮/১২৬)

"কলিযুগে অন্য গতি নেই, অন্য গতি নেই, অন্য গতি নেই কেবল হরিনাম, কেবল হরিনাম, কেবল হরিনাম। একমাত্র হরিনাম আশ্রয় করতে হবে। সতত নাম স্মরণ, নাম চিন্তন, নাম গাহন (act of singing)। এর

মাধ্যমে প্রকৃত আনন্দ ও শান্তি মিলবে। কিন্তু অজ্ঞান জীব প্রকৃত আনন্দ কিভাবে পাওয়া যাবে তা না বুঝে অলিক, অনিত্য আনন্দ লাভের জন্য প্রযত্ন করছে। এ সম্বন্ধে 'শ্রীমদ্-ভাগবতের' একাদশ স্কন্ধে বলা হয়েছে অর্থাৎ 'নবযোগেন্দ্র সংবাদে' প্রবুদ্ধ ঋষি সংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে যা বলেছেন তা এখানে আলোচ্য।

কর্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্।।
—(ভা. ১১/৩।১৮)

অর্থাৎ—"জগতে মানুষ দুঃখনিবৃত্তি করে সুখ লাভের জন্য কর্ম করে। কিন্তু বিচার করে দেখলে দেখা যায় যে, নিত্য সুখের পরিবর্তে কেবল দুঃখই পেয়ে থাকে। প্রকৃত সুখ পায় না।" পরবর্তী শ্লোকেও এ বিষয়ে অধিক বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

নিত্যার্তিদেন বিত্তেন দুর্লভেনাত্মমৃত্যুনা।
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ।।
—(ভা. ১১/৩/১৯)

অর্থাৎ—"নিরন্তর দুঃখপ্রদ, অতি পরিশ্রমে লভ্য, আত্মমৃত্যুজনক এই বিত্তদ্বারা গৃহ, পুত্র, স্বজন, পশু প্রভৃতি যে সকল অনিত্যবস্তুর সংগ্রহ করা যায়, তা'র দ্বারা মানুষের একটুও সুখলাভ হয় না।"

বদ্ধজীবেরা নানা প্রকার অভাবে অভাবগ্রস্ত। একটি বস্তু প্রাপ্তিতে যে সুখ লাভ হয় সেই সুখের দ্বারা সাময়িক দুঃখ নিবৃত্তি হলেও পরমুহূর্তে সহস্র সহস্র অভাব জীবকে আক্রমণ করে। এজন্য জাগতিক বস্তুর অনুসন্ধান করতে গেলে জীব প্রকৃত দুখ বা আনন্দ পায় না। জীব প্রকৃত মঙ্গল, আনন্দের সন্ধান জানে না। এ কারণে সে ত্রিতাপময় সংসার-কারাগারে ক্লিষ্ট হচ্ছে। ভগবান্ কৃষ্ণ হচ্ছেন সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারলে আমাদের জাগতিক দুঃখের অপনোদন হওয়ার সাথে সাথে আমরা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করতে পারব। সেজন্য নিরন্তর নাম স্মরণ করতে হবে। কলিযুগে নামই ভগবান্। সকাতর হৃদয়ে অনুক্ষণ ভগবানকে ডাকতে হবে, তাঁর চিন্তায় চিন্ময়ত্ব লাভ করতে হবে। বিষয়াসক্ত, বহির্মুখ মানুষেরা অর্থ ও সম্পদের জন্য কঠোর

পরিশ্রম করছে। প্রাপ্ত ধন-সম্পদ যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তারা নিদ্রাত্যাগ করে নিরন্তর সেই ধনলাভের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। ব্যাকুল হৃদয়ে মহা-উদ্বেগে তারা কালযাপন করে। সর্বদা সেই চিন্তাই করে ও সেজন্য ক্রন্দনও করে। শয়নে, স্বপনে, ও জাগরণে সেই একই চিন্তা ধন ও তার ধ্যান। প্রাপ্ত ধন হারালে জীবের কত চিন্তা জাগে। মনের মধ্যে তার ফলে এক উৎকণ্ঠা বিস্তার লাভ করে। তা'র থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন হয়। কিন্তু যাঁরা ভগবানের ভজন করেন, তাঁকে ক্ষণিক দর্শন করেন, তাঁরা তাঁকে হারিয়ে সর্বস্ব ভুলে, সর্বচিন্তা পরিহার করে একমাত্র তাঁর চিন্তায় অনুক্ষণ নিমগ্ন থাকেন। তাই যদি জীবের ভগবদ্ প্রাপ্তির জন্য এতাদৃশ ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পায় তবে ভগবানের চিন্তা (স্মরণ) ব্যতিরেকে অন্য চিন্তা তার মনের মধ্যে স্থান পায় না। শ্রীমদ ভাগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।। —(গী. ৯/৩৪)

অর্থাৎ—"তোমার মনকে সর্বদা আমার চিন্তায় নিযুক্ত কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে প্রণাম কর এবং আমাকে পূজা কর। সম্পূর্ণরূপে আমাতে মগ্ন হলে তুমি নিশ্চিতরূপে আমার কাছেই ফিরে আসবে।" এ কারণে শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে সব-সময় ভগবান কৃষ্ণকে চিন্তা করতে হবে। তাহলে প্রকৃত আনন্দ ও প্রকৃত শান্তি লাভ করতে পারবে। নচেৎ প্রকৃত আনন্দ ও প্রকৃত শান্তি এ দুঃখালয়ে, এ প্রপঞ্চে নেই। এখানে সকলেই কেবল দুঃখে হাহাকার করছে। নানা যন্ত্রণায় প্রতিটি জীব ছটপট করছে। একথা সকল প্রামাণিক শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যিনি কি স্বয়ং জগন্নাথ বা কৃষ্ণ তিনিই এ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। তিনি হরি কিন্তু হরিনাম উচ্চারণ করে অশ্রুবর্ষণ করেছিলেন। সর্বদা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে তিনি ক্রন্দন করেছিলেন। তিনি আমাদেরকে প্রকৃত বাস্তব শিক্ষা প্রদান করেছেন। অনুরূপভাবে সাত বছরের বালক প্রহ্লাদও "হা কমললোচন হরি" বলে ক্রন্দন করেছিলেন। পাঁচ বছরের বালক ধ্রুবও ভগবানকে পাওয়ার জন্য বনেতে গিয়েছিলেন এবং সর্বত্র তিনি 'কমল-লোচন হরি ভগবান কৃষ্ণ (বিষ্ণু)'-কে অন্বেষণ করেছিলেন। ক্রন্দন করে করে তাঁরা সকলেই ভগবানকে পেয়েছেন। বিল্বমঙ্গলও ক্রন্দন করেছিলেন এবং তিনিও হরিকে পেয়েছেন। একারণে ক্রন্দন

না করলে সেই ভগবানকে লাভ করা যায় না। যাঁরা ক্রন্দন করেছেন, তাঁরা সেই কৃষ্ণ বা জগন্নাথকে পেয়েছেন। সেই জগন্নাথ স্বয়ং মহাপ্রভুরূপে এসে, যদিও তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ তথাপি তিনি নিজে কৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন করেছেন। এ সম্বন্ধে আমরা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে দেখতে পাই—

"কৃষ্ণ রে! বাপ রে! মোর জীবন শ্রীহরি!
কোন্ দিকে গেলা মোর প্রাণ করি' চুরি?

—(চৈ. ভা. আদি ১৭/১১৬)

আর্তনাদ করি' প্রভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
"কোথা গেলা, বাপ কৃষ্ণ, ছাড়িয়া, মোহরে ?"
—(চৈ. ভা. আদি ১৭/১১৯)

"কৃষ্ণ রে! বাপ রে মোর! পাইমু কোথায় ?
এইমত বলিয়া যায়েন গৌররায়।।
—(চৈ. ভা. আদি ১৭/১২৮)

"কোথা গেলে পাইমু সে মুরলীবদন!"
বলিতে ছাড়য়ে শ্বাস, করয়ে ক্রন্দন।।
—(চৈ. ভা.মধ্য ২/১৭৫)

অতএব ভক্তিই হচ্ছে ভগবদ্ প্রাপ্তির উপায়। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণ অনুরূপ কথা বলেছেন। "ভক্ত্যাহং একয়াগ্রাহ্য। ভক্ত্যাস্তু অনন্যলভ্য।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্ত অবতার হয়ে কৃষ্ণ প্রাপ্তি (ভগবদ্ প্রাপ্তি)-র উপায় নির্ণয় করেছেন। ভক্তিতেই সেই ভগবান লব্ধ হন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

ভক্তি-যোগ, ভক্তি-যোগ, ভক্তি-যোগ—ধন।
'ভক্তি' এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন।।
—(চৈ. ভা. মধ্য ২৪/৭২)

এই ভক্তিযোগ হচ্ছে একমাত্র ধন, যার মূল্য কল্পনা বা নির্ধারণ করা যায় না। তাকেই বলা হয় পারমার্থিক ধন। সেই ধন নিত্য শাশ্বত। ভৌতিক জগতে যে ধন-সম্পদ তা বিনাশ-শীল, তা নষ্ট হয়ে যায়, তা সব-দিনের জন্য থাকে

না। কেবল এই পারমার্থিক ধন যা জীব অর্জন করে থাকে ভক্তিযাজনের মাধ্যমে, তা-ই জীবের সঙ্গে যায়। এজন্য প্রত্যেকেরই সেই ভক্তিধন আহরণ করা উচিত। শাস্ত্রকারেরা আমাদেরকে এই কথা শিক্ষা দিয়েছেন। মহাপ্রভু স্বয়ং এসে জীবকে এই শিক্ষা প্রদান করেছেন। তিনি ভক্তরূপে অবতীর্ণ হয়ে সকল জীবকে এই শিক্ষা দিয়েছেন—

আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু সবে—"কৃষ্ণ গাও গিয়া।।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন।।
যদি 'আমা' প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর।।
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে।।"
এই মত শুভ দৃষ্টি করি' সবাকারে।
উপদেশ কহি' সবে বলে—"যাও ঘরে।।"
—(চৈ. ভা. মধ্য ২৮/২৫-২৯)

এ হচ্ছে শ্রীমান্ মহাপ্রভুর উপদেশ। দিবারাত্রি চব্বিশ ঘন্টা কৃষ্ণ চিন্তা কর। এক মুহূর্তও কৃষ্ণ বিস্মৃত হও না। কৃষ্ণও শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতায় অনুরূপ উপদেশ প্রদান করেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।
—(গী. ১৮/৬৫)

অর্থাৎ—"সর্বদা আমাকে চিন্তা কর এবং আমার ভক্ত হও। আমাকে পূজা কর এবং আমাকে তোমার প্রণাম জানাও। এভাবে তুমি নিশ্চিতভাবে আমার কাছে ফিরে আসবে। এটা আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, কারণ তুমি হচ্ছে আমার অতি প্রিয় সখা।"

সেই কৃষ্ণ চৈতন্যাবতারে এসে অহর্নিশ শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে সর্ব অবস্থায় কৃষ্ণ চিন্তা করতে উপদেশ দিয়েছেন। কেবল কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করার

জন্য জীবগণকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ ছাড়া অন্য কথা নেই। এ দুঃখালয়ে প্রকৃত সুখ, শান্তি ও আনন্দ লাভ করতে হলে এ হচ্ছে একমাত্র উপদেশ। এ জন্য মানুষ তাঁকে অনুসন্ধান করে, কিন্তু সে পথের সন্ধান জানে না। শাস্ত্র-সমূহ জীবকে নির্দেশ দেন স্পষ্টভাবে সেই পথের অনুসন্ধান। শাস্ত্রকারগণ বলেন এই পথ ধরে নিত্য সুখপ্রদ ঘনানন্দ বস্তু শ্রীভগবানকে অনুসন্ধান কর, তাঁর ভজন কর, তাঁর ধ্যান কর। এই উপায় অবলম্বনে তাঁকে পাইলে জীব-মাত্রেই চিরশান্তি লাভ করবে। তিনি শান্তির আস্পদ (object)। তাঁকে সর্বদা মনেতে ধরে রাখতে পারলে জীবগণ শান্তি লাভ করতে পারবে। তা না হলে শান্তি লাভ সুদূর-পরাহত। ভগবৎ প্রাপ্তিতেই কেবল সকল শান্তি লাভ হয়ে থাকে। তাঁকে বিস্মৃত হয়ে অন্য উপায় অবলম্বন করলে নৈরাশ্যই লাভ হয়ে থাকে। জীবের প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করে ভগবান্ শাস্ত্রের মাধ্যমে উপদেশ প্রদান করেছেন। স্বয়ং ভক্তাবতার অবলম্বন করে ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় নির্ণয় করেছেন। জীবের প্রতি এ হচ্ছে তাঁর অসীম কৃপা ও অপার করুণা। জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস অর্থাৎ তাঁর সেবক (ভক্ত)। এজন্য তিনি তাদের জন্য সর্বদা চিন্তিত।

ইতিপূর্বে কোনও একটি প্রবন্ধে আমরা সংসার দশাপ্রাপ্ত বদ্ধজীবের ত্রিতাপগ্রস্ত অবস্থা এবং তা থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য ভগবান মঙ্গলাকাঙ্খী বন্ধু হিসাবে কিরূপ আন্তরিক উদ্যম করেছেন সেসম্বন্ধে সম্যক্ আলোকপাত করেছি। তবে পূর্বে সেই প্রবন্ধটিতে ভক্ত কিরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ব্যাকুল সে-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানও কিরূপ অনুরূপভাবে ভক্তের জন্য ব্যাকুল সেই-প্রসঙ্গেও স্বল্প আলোচনা করা হয়েছে, তবে এই বর্তমান প্রবন্ধটিতে তা'র বিস্তৃত আলোচনা করতে প্রয়াসী হয়েছি। সাধু, গুরু ও বৈষ্ণবের কৃপায় ত্রিতাপগ্রস্ত বদ্ধ জীব যখন নিজের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে—" 'কে আমি' 'কেনে আমায় জারে তাপত্রয়'।" অর্থাৎ 'আমি কে? আমি কেন এখানে ত্রিতাপে দগ্ধীভূত বা জর্জ্জরিত হচ্ছি?' শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীমান্ মহাপ্রভুর কাছে যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, অনুরূপভাবে জীব নিজের স্বরূপ স্থিতি সম্বন্ধে উপযুক্ত সাধু-বৈদ্যের কাছে সেই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে। জীব চির-অশান্তিতে হা-হুতাশভাবে জীবন অতিবাহিত করছে এই জড় জগতে। তাই সাধু, গুরু ও বৈষ্ণবের কৃপায় সে শান্তি প্রাপ্তির উপায় লাভ

করে। কেমন করে ভগবৎ সেবারাধনার মাধ্যমে জীব পরমশান্তি লাভ করবে তা'ও প্রতিটি প্রামাণিক শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভগবান নিজেকে সেই সমস্ত প্রামাণিক শাস্ত্রের-মাধ্যমে জানিয়েছেন—

'শাস্ত্র-গুরু-আত্ম'-রূপে আপনারে জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান।।

—(চৈ. চ. ২০/১২৩)

এই কারণে প্রামাণিক পরম্পরাগত আচার্য্য সৎ-শাস্ত্রের মাধ্যমে জীবকে ভগবানের ভজন করার উপদেশ ও উপাসনা করার পথ নির্দেশ করেন। শাস্ত্রবিধিমত ভগবৎ উপাসনা করে ব্যক্তি শাশ্বত শান্তির অধিকারী হন্। যিনি ভাগ্যবান তিনি সাধুজনের সাক্ষাৎ পান। এইজন্য বলা হয়েছে—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।।

—(চৈ. চ. ১৯/১৫১)

অর্থাৎ—যিনি ভাগ্যবান জীব তিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে উপাসনা করে শাশ্বত শান্তির অধিকারী হন। এই উপায়েই তিনি শান্তি লাভ করে থাকেন। তা না হলে শান্তিলাভের অন্য কোনও পন্থা নেই। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় ভগবান কৃষ্ণ নিজেই বলেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।।

—(গী. ৫/২৯)

অর্থাৎ—তিনিই হচ্ছেন সর্বযজ্ঞ ও সকল তপস্যাদির একমাত্র ভোক্তা বা উপভোগকারী, তিনিই হচ্ছেন সর্বলোকের একমাত্র মহেশ্বর। এ কারণে যে জীব তাঁকে সকলের একমাত্র সুহৃদ বা মঙ্গলাকাঙ্খী বন্ধু বলে জানতে পারেন, তিনিই শান্তি লাভ করতে পারেন। তাই সেই ভগবৎ উপাসনায় ব্রতী হও। কিন্তু জগতের সকল জীব পার্থিব, ক্ষণভঙ্গুর অশান্ত বস্তুর অনুশীলন করছে। সে জন্য তারা শান্তি লাভের ইচ্ছা করলেও শান্তি লাভ করতে পারছে না। অশান্ত বস্তুর অনুশীলনে শান্তিলাভ হয় না। তবে প্রশ্ন হতে পারে, অশান্তি বলতে কি বুঝায় ও সেটা কি? তার উত্তরে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, যে

বস্তু নিত্যকাল থাকে না, যেমন পঞ্চ-ভৌতিক উপাদানে গড়া এই জড় শরীরটা সবদিনের জন্য থাকবে না। এই পার্থিব জগত—এসব জড় বস্তু, এসব অশান্ত বস্তু। একারণে প্রকৃতশান্তি পেতে হলে তত্ত্ব দ্রষ্টা, ভগবৎ দ্রষ্টা সাধু-মহাজনের বাক্য শ্রবণ করতে হবে। এ ছাড়া শান্তি লাভের অন্য উপায় নেই। শান্তি লাভের উপায় ভক্ত-মহাজনগণ নির্দেশ করতে পারেন। তাঁরা বলেন—'সত্যং শিবং সুন্দরম্'। শান্তবস্তু ভগবান। ভগবান মঙ্গলপ্রদ, আনন্দময়। তিনিই জীবের প্রীতির আস্পদ (object)। এ কারণে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত হতে না পারলে জীব শান্তি লাভ করতে পারবে না। শান্ত, নিত্য বস্তু হচ্ছেন আত্মা। এ কারণে আত্মার আত্মা হরি বা ভগবানই হচ্ছেন প্রকৃত প্রীতির বিষয়। সেই ভগবান নিত্য, শাশ্বত ও চিন্ময়। আত্মা শান্ত বস্তু। কিন্তু শরীর, বুদ্ধি, মন, প্রকৃতি—মায়া সৃষ্ট বস্তু, তাই এসব অশান্ত। এসব পূর্বে ছিল না, বর্তমান আছে এবং পরে থাকবে না। এই ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্য জীবনে যদি শান্ত বস্তু ভগবানের অনুশীলন করা যায়, তাহলে নিত্য শাশ্বত শান্তি লাভ হবে। তা নাহলে তা লাভ করা সম্ভবপর নয়। শান্ত ও আনন্দময় জীবন প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে বেদাদি শাস্ত্র বলেন,—অসৎ বস্তু দেহ ও মনের দ্বারা যে ভৌতিক আনন্দের চর্চা করা হয়, তা নিত্যকাল থাকে না। তা পরিণামশীল অর্থাৎ নষ্ট হয়। "সংসরতি সংসার"—একেই সংসার বলা হয়। 'সংসরতি' অর্থাৎ এটা পরিবর্তনশীল। বাল্যকালের আনন্দ যৌবনে থাকে না। বার্ধক্য এসে উপস্থিত হ'লে মৃত্যু মুখে পতিত হতে হয়। আত্মা নিত্য, আনন্দ ও শান্ত বস্তু। উপনিষদও বলেন—আত্মা শ্রোতব্য, দ্রষ্টব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য। এ কারণে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করতে হলে আত্মাকে দর্শন করতে হবে, আত্মার কথা শ্রবণ করতে হবে, ধ্যান করতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে, আত্মা কি রকম বস্তু ? তাঁকে কিভাবে দর্শন করতে হয়?—এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে,—'কেশাগ্রশতধা'। কেশের অগ্রভাগকে নিয়ে তাকে শত ভাগে বিভক্ত কর। সেই শতভাগের এক ভাগকে নিয়ে আবার তাকে শত ভাগে বিভক্ত কর। পরিশেষে তারই এক ভাগের পরিমাণ যা তা-ই হ'ল আত্মা। তা কতই সূক্ষ্ম বস্তু। তাঁকে দেখবে কে? আত্মা কিন্তু সকলের হৃদয়ে অবস্থান করছেন। আত্মা নিত্য চেতন-শীল বস্তু। শরীরটা অচেতনশীল বস্তু। চেতনশীল আত্মার অবস্থানের জন্য শরীর চেতনশীল হয়েছে। সেই চেতনশীল বস্তু আত্মা শরীর থেকে বহির্গত হয়ে গেলে শরীর

জড়ে পরিণত হয়ে যায়। জড়বস্তু সদৃশ এটা তখন পড়ে থাকে। আর ডাকলে ডাকের সাড়া দেয় না। হাহাকার করে মস্তকে করাঘাত করে ক্রন্দন করলেও উত্তর দেয় না। কেন এমন হয়? আত্মা না থাকার কারণে। জড় শরীরটা পড়ে আছে। শরীরটা আত্মা নয়। আত্মা সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন— কাঠের ভিতরে অগ্নি আছে, দুই টুকরো কাঠ নিয়ে ঘর্ষণ করলে অগ্নি নির্গত হয়। তেমনই আত্মা স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। শরীরের ভিতরে আছেন বলে চেতনা পরিদৃশ্যমান হচ্ছে। আত্মা না থাকলে শরীর জড় বস্তুতে পরিণত হয়ে যায়। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি শরীরে আত্মানুশীলন অসম্ভব। তা কেবল মনুষ্য শরীরে সম্ভব। এজন্য মনুষ্য শরীর দুর্লভ বস্তু। মনুষ্য জীবনেই কেবল আত্মানুশীলন, ভগবৎ অনুশীলন করা সম্ভব। ইতর যোনিতে, ইতর শরীরে এটা সম্ভবপর নয়। এজন্য আত্মার পুষ্টি সাধনের জন্য ভগবান রাম, নৃসিংহ, বামন, বরাহ, শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহরূপে এখানে অবতরণ করেন। এ সমস্ত ভগবত অবতারের নাম, লীলা, গুণ, পরিকরাদির অনুশীলনে আত্মার জাগরণ হয়, পুষ্টি হয়। আত্মাকে আহার না দিলে কি হয়? যেমন শরীরটাকে খাদ্য না দিলে তা দুর্বল হয়ে ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে পড়ে, তেমনি আত্মাকে আহার না দিলে তা কৃশ হয়ে যাবে। ভগবত ইতর বস্তুতে অভিনিবেশ হবে। তাতে অনুরক্তি বৃদ্ধি পাবে। ভগবৎ বিস্মৃতি ঘটবে। জীবের শরীরটি পঞ্চ ভৌতিক উপাদানে গঠিত। এ জড় শরীরটা রক্ষা করার জন্য ব্যক্তি আহার সংগ্রহার্থে গাধার মতো দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আনন্দ বা সুখ সে লাভ করতে পারছে না। তবে আত্মাকে আহার দেওয়া কিছু কঠিন কাজ নয়। ভৌতিক শরীরটাকে আনন্দ বর্ধন করার জন্য মানুষ কত রকমের কাজ করছে। কেউ কুলিগিরি করছে তো কেউ বাদ্‌শাহ্‌গিরি করছে। কেউ ব্যবসা করছে তো কেউ চাক্‌রী করছে। এই বিনাশশীল শরীরটাকে পোষণ, পরিবার পোষণ করার জন্য মানব বিভিন্ন উপায়ে ধন রোজগার করছে। ধনাদি সংগ্রহ করে তার বিনিময়ে সে আহার্য সামগ্রী সংগ্রহ করছে। তাতেও সে তৃপ্ত হচ্ছে না। আরাম-যুক্ত আবাসের জন্য শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, বিদ্যুৎ-শক্তি সংযুক্ত মূল্যবান অট্টালিকার আবশ্যকতা অনুভব করছে। সেজন্য কত অর্থ সংগ্রহ এবং খরচা করতে হচ্ছে। আবশ্যক স্থলে বিদ্যুৎ-আদির জন্য করও প্রদান করতে হচ্ছে। আবার পায়ে হাঁটা কষ্টকর মনে করে গাড়ী খরিদ করে তারজন্য করও প্রদান করতে হচ্ছে। কিন্তু এসব

মনে রেখে আত্মার আহারের কথা একবার চিন্তা করে দেখ তো! তা সহজলভ্য। সূর্যের আলোকে কর লাগে না। কিন্তু এটা স্বতঃসিদ্ধ যে বিদ্যুৎ আলোকের জন্য কর দিতে বাধ্য। কত অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। কিন্তু আত্মার আহারের জন্য কোনও অতিরিক্ত প্রয়াসের প্রয়োজন নেই। মহাজনগণ আত্মার জন্য আহার রেখে দিয়েছেন। নারদ, ব্যাস, শুক, প্রহ্লাদি মহাজনগণ শ্রীমদ্‌ভাগবত আদি শাস্ত্রে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির যে মহিমা কীর্তন করেছেন, তা-ই হচ্ছে আত্মার আহার। আমাদের জেনে রাখা উচিত যে ভগবান সম্বন্ধীয় বস্তু-সমূহ হচ্ছে চিন্ময়। অচিৎ বস্তু, অর্থাৎ ভগবৎ ইতর বস্তু অনুশীলনে জীব কখনো সুখ বা শান্তি লাভ করতে পারে না। কিন্তু চিন্ময় বস্তু আত্মার অনুশীলনে নিত্য শান্তি, পরাশান্তি অনুভূত হয়। নিরন্তর ভগবানের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখাই হচ্ছে শুদ্ধভক্তি সাধন। সেই শুদ্ধ ভক্তি-যোগ শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু তথা তাঁর প্রিয় গুরুবর্গ-আচার্যবর্গের এ ধরাধামেতে আগমন। অবশ্য এই ভয়ঙ্কর কলিযুগে কতক তথাকথিত ধর্মধ্বজাধারী ব্যক্তি গুরুত্রুব অভিনয় করে কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদির শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। কিন্তু তা কলিযুগের জন্য অনুমোদিত পন্থা নয়। যেহেতু জ্ঞানানুশীলন, যোগানুশীলন এককভাবে করা যায়, তাই তাতে ভয় বা বিপদের আশঙ্কা আছে। ধর্মানুশীলন মিলিতভাবে করলেও পরস্পরের মধ্যে ভেদভাব সৃষ্টি হয়। তাতে বিবাদ সৃষ্টি হয়ে পরস্পরের মধ্যে মারধরও হয়ে থাকে। কিন্তু ভক্তিযোগ সাধন করতে হলে সকলে একসাথে মিলেমিশে মূল আশ্রয় বিগ্রহ শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণ-সুখের উদ্দেশ্যে করতে হয়। ভগবৎ-প্রসঙ্গ সর্বাবস্থায় সর্বকালে করা যায়। কারণ তা নিত্য, শাশ্বত ও সনাতন; তা সর্বকালিক। কিন্তু এ ব্যতিরেকে যে জ্ঞানানুষ্ঠান, কর্মানুষ্ঠান করা হয় তা দেশকালাদি - অপেক্ষাযুক্ত। ভক্তিই জীবের একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধন। তা ভগবৎ-প্রাপ্তির সহজতম প্রকৃষ্ট পন্থা। ভক্তি বা প্রীতি জীবের সর্বস্ব। কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জীব ভগবৎ বিস্মৃত হয়ে দেহ, গেহ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে প্রীতি ব্যবহার করে তাৎকালিক কিছু ক্ষণিক সুখলাভ করে থাকে। ভগবান বা ভক্তকে প্রীতির ভূমিকায় না রেখে আত্মীয়-স্বজনদের রাখার জন্য ক্ষণিক সুখ লাভের পরিণামে সাংসারিক তাপক্লিষ্ট হতে হয়। এজন্য ভগবান নিজেই বলেছেন—"প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ।।"

(ভা. ৫/৫/৬)। তাই চেতা (alert) দেওয়া হয়েছে, যে পর্যন্ত জড় বিষয় দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্রাদিতে জীবের মমত্ব বুদ্ধি থাকে, প্রিয়ত্ব বুদ্ধি থাকে, সে পর্যন্ত তার জন্ম-মৃত্যুর কবল হতে অব্যাহতি নেই। ভগবানই জীবের নিত্য প্রীতির বিষয়। এ কারণে আত্মার আত্মা হরিকে (জগন্নাথকে) প্রীতি বা সুখী করতে পারলে বুদ্ধি, দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় প্রাপ্তির সার্থকতা। এজন্য দশম স্কন্ধ ভাগবতে বলা হয়েছে—

বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃ প্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ।
মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেঽকল্পনায় চ।। —(ভা. ১০/৮৭/২)

অর্থাৎ—(শ্রীল শুকদেব গোস্বামী শ্রীপরীক্ষিত মহারাজকে বললেন)—"হে রাজন! জগদীশ্বর জীবগণের রূপরসাদি বিষয়ের গ্রহণ, উৎকৃষ্ট জন্মলাভের উপযোগী কর্মসমূহের আচরণ, পারলৌকিক সুখভোগ এবং মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও প্রাণরূপ উপাধি-সমূহের সৃষ্টি করেছেন।" এসব হচ্ছে শান্তি লাভের উপায়। কিন্তু যারা হতভাগা তারা সাধন, ভজন করতে পারে না। তারা কেবল বৃথা ইন্দ্রিয় তর্পণে মত্ত হয়ে দুঃখ সাগরেই ভেসে বেড়াচ্ছে। এ প্রকার জীবের সংখ্যা এ জগতে সর্বাধিক। আবার এই কলিযুগে জীবের অহং-মম ভাব প্রবল। ভগবৎ বিস্মৃত হয়ে জীব নিজেকে ভোক্তাভিমান করছে। সেজন্য এই ভগবৎ বিস্মৃত, কৃষ্ণ বিস্মৃত জীবগণের জন্য ভাগবত শাস্ত্র জগতে প্রকটিত হয়েছেন। তাই ভাগবত সাধারণ শাস্ত্র নন্।

কৃষ্ণ-তুল্য ভাগবত—বিভু, সর্বাশ্রয়।
প্রতি-শ্লোকে প্রতি-অক্ষরে নানা অর্থ কয়।।
—(চৈ. চ. মধ্য ২৪/৩১২)

এটা ভগবান কৃষ্ণের বাণী অবতার। এটা ভাগবতাবতার। আবার শ্রীমদ্‌ ভাগবতেও বলা হয়েছে—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ।। —(ভা. ১/৩/৪৩)

"এই ভাগবত পুরাণ সূর্য সদৃশ উজ্জ্বল। ভগবান কৃষ্ণ স্বধামে প্রত্যাবর্তনের পর এই পুরাণ ধর্ম-জ্ঞানাদি সহ উদিত হয়েছেন। কলিযুগের তীব্র অর্থাৎ গাঢ়

অজ্ঞান অন্ধকারের জন্য যাদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে বা যাবে তারা এই পুরাণ থেকে আলোক প্রাপ্ত হবে।"

অর্থাৎ, কলিযুগের পূর্বে দ্বাপর যুগ ছিল। কৃষ্ণ স্বয়ং এ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে লীলা পুরুষোত্তমরূপে বিবিধ লীলা প্রকাশ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধভূমিতে গীতাবাণী-রূপ তিনি তাঁর ধর্ম উপদেশও প্রদান করেছেন। তারপর দ্বাপর যুগের শেষে তিনি তাঁর লীলা সঙ্গোপন করে ধর্ম, জ্ঞান আদি সহ স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। দ্বাপর যুগের পর কলিযুগের আগমন। কলিযুগের লোকেদের জন্য ধর্ম, জ্ঞানাদি কোথায় অবস্থান করল? কৃষ্ণ তো সব সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। তাই বলা হয়েছে—

"কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ।।"

"কলিযুগের লোকেদের জন্য পুরাণ সূর্য-স্বরূপ ভাগবত মহাপুরাণ উদিত হয়েছেন।" এটা ভগবানের বাণী অবতার। এতে ধর্ম, জ্ঞান আদির কথা রয়েছে। যা কৃষ্ণের উপদেশে, শিক্ষা তা সব এতে রয়েছে। কলিযুগ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভাগবত শাস্ত্র প্রকটিত হয়েছেন। কলিহত জীবগণের জন্য সর্ববেদান্ত শিরোমণি শ্রীমদ্ ভাগবত এক অভিনব বার্তা বহন করে এনেছেন। সকল শাস্ত্র জীবকে উপদেশ প্রদান করেন ভগবানকে ভজন করার জন্য, কিন্তু ভাগবত শাস্ত্র তা বলেন নি। বরং তিনি অধিক কথা বলেন। তিনি কি বলেন? তাঁর সন্দেশ পূর্বে অ-ঘোষিত ছিল। ভাগবত বলেন, "হে জীব! তোমার সামর্থ্য নেই ভজন করার, যোগ্যতা নেই ডাকার, তাই গ্রহণ কর তুমি আমার কথা। তুমি কেবল কর্ণের মাধ্যমে শ্রবণ কর, নীরবে শোনো। তুমি তাঁকে কি ডাকবে, তিনি তোমাকে ডাকছেন। তুমি তাঁর জন্য কত আর্তি। তোমা অপেক্ষায় কোটিগুন আর্ত হয়ে সেই জগন্নাথ, কৃষ্ণ তোমাকে আহ্বান করছেন। তা শ্রবণ কর। তোমার যদি কান আছে, তবে তুমি তা শ্রবণ করতে পারবে; তা না হলে শুনতে পারবে না।"

ভাগবতের দেবতা হচ্ছেন মুরলীধারী কৃষ্ণ। নিরন্তর মুরলী বাদন করে সবাইকে তাঁর কাছে ডাকছেন। তাঁর সর্বভূত মনোহর রূপ। তুমি তাকে ডাকতে পার না। সেজন্য তিনি তোমাকে ডাকছেন। মানুষ ভগবানের কাছে যেতে পারে না। সে জন্য ভগবান নেমে এসেছেন এ ধরাধামে, এই মানুষের কাছে। এই

অজ্ঞ জীব তাঁকে ডাকতে জানে না। সে জন্য বংশীধারী মোহন বাঁশরীতে ডাকছেন—এটাই হচ্ছে বিশ্ব বাজারে ভাগবত শাস্ত্রের অভিনব অবদান। ভাগবত আত্ম-পরিচয় দিয়ে বলেছেন, —"নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং"। "ভাগবত নিগম কল্পতরুর গলিত ফল, কৃপায় গলে পড়ছেন। আমাদের দেবতা অসীম করুণায় গোলোক ধাম হ'তে নেমে এসেছেন—এ ধরাধামে, গোকুলে, কালিন্দী-পুলীনে। ভগবানের এই কৃপার সংবাদ শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রতিটি পৃষ্ঠায় ভরে আছে।

শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধে এই প্রসঙ্গে বর্ণনা আছে,—বকাসুরের ভগ্নী বকী (পূতনা) স্তনে কালকূট বিষ লাগিয়ে ব্রজপুরীতে এসেছিল। তখন কৃষ্ণ ব্রজপুরে নন্দালয়ে শৈশব লীলা প্রদর্শন করছিলেন। সে অর্থাৎ পূতনা রাক্ষসী কৃষ্ণকে স্তন্যপান করিয়ে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে কালকূট বিষ স্তনেতে লাগিয়ে এসেছিল। সেই কুভাবনা নিয়ে পূতনা এসেছিল। কিন্তু কৃষ্ণ কত দয়ালু। "লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম্।। (ভা. ৩/২/২৩)। ভগবান কৃষ্ণ তাকে ধাত্র্যুচিতাং গতি প্রদান করলেন। সেই ভগবান কৃষ্ণ কেবল যশোদা মাতার স্তন্যপান করেছিলেন, তিনি আর কারও স্তন্যপান করেননি। পূতনা কিন্তু তাঁকে স্তন্যপান করাতে আহ্বান করেছিল। সে কৃষ্ণকে স্তন্যপান করিয়ে মাতার কার্য করেছিল। কৃষ্ণ কি দয়ালু। তিনি ভালটাকে গ্রহণ করলেন ও তাকে ধাত্রী-উচিতা গতি প্রদান করলেন অর্থাৎ মাতৃপদ প্রদান করলেন। কারণ সে মাতার কার্য করেছিল। এমন দয়ালু ঠাকুর আর কে আছেন? এ হল ভাগবত শাস্ত্রের কথা। জগতের সকল শাস্ত্রের ইতিহাস অনুশীলন করে আমরা দেখব এমন দয়ালু ঠাকুর কে আছেন? আমরা আর কার শরণ নিব? পূতনার মতো মহাপাপীয়সীকেও তিনি পাঠিয়েছেন বৈকুণ্ঠে ধাত্র্যুচিতা-গতি প্রদান করে। তাঁর মতো করুণা আর কেউ দেখাতে পারবেন? এইহেতু কোনও দেশে কোনও কালে এমন করুণাময় ঠাকুরকে ছেড়ে আমরা আর কার আশ্রয় নিতে পারি? কলিপাপদগ্ধ আমরা ক্ষুদ্র জীব। এই কারণে এটাই হচ্ছে আমাদের প্রতি শ্রীমদ্ ভাগবতের মর্মস্পর্শী আশ্বাস-বাণী।

মানুষ ভগবানকে চায়, আর এটাই তো ভাগবতে বড় কথা। কিন্তু ভগবান মানুষকে চান্। ভক্ত ভগবানের জন্য আকুল। কিন্তু এর থেকে আরো অতি মর্মান্তিক কথা ভগবান ভক্তের জন্য ব্যাকুল। স্তন্য অর্থাৎ মাতৃদুগ্ধ পান করার

জন্য গোপাল যশোদার জন্য কাঁদছেন। বৎসা-হারিয়ে কানাই তাদেরকে খুঁজে খুঁজে কাতর হয়ে বনে বনে ঘুড়ে বেড়াচ্ছেন। ব্রজললনাগণের মন হরণ করে নিকটে আনার জন্য বাঁশরীতে কলধ্বনি করে গোপীজনবল্লভ তাদেরকে ডাকছেন। এটাই হচ্ছে ভাগবতীয় লীলার মধুরিমা। ভক্ত ভগবানের জন্য কাতর। তা অপেক্ষা ভগবান ভক্তের জন্য কত কাতর। এই কথাটি ভাগবতে বলা হয়েছে। এজন্য 'উদ্ধব সন্দেশ'-এ বর্ণিত মথুরা হতে ব্রজভূমিতে দূত প্রেরণের বাণী কত মনোরম। ভগবান কত কাতরতাপূর্ণ বাণীতে, কত কারুণ্যপূর্ণ বাণীতে অশ্রু বিসর্জন করে উদ্ধবকে পাঠিয়েছিলেন—'গচ্ছ সৌম্য ব্রজভূমি।' 'ব্রজভূমিতে যাও।' ''আমার বিয়োগে ব্রজবাসিগণ, গোপগোপিগণ, নন্দ যশোদা আর্তনাদ করছেন। বিরহ-তাপে তাঁরা দগ্ধীভূত হয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা জীবিত থেকেও মৃতপ্রায়। আমার এই সন্দেশ নিয়ে তাঁদেরকে দাও। 'আমি নিশ্চয় ফিরে আসব।' এই কথা তাঁদের কাছে বলে এসেছিলাম। সেই কথা বিশ্বাস করে তাঁরা জীবন ধারণ করে আছেন। তাই তুমি বিলম্ব না করে শীঘ্র যাও উদ্ধব।'' এই কথার মাধ্যমে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন ভগবান ভক্তের জন্য কতো ব্যাকুল, তিনি ভক্তকে কতো ভালবাসেন।

তবে জীব স্বরূপতঃ ভক্ত। ''জীবের 'স্বরূপ' হয়-কৃষ্ণের 'নিত্য-দাস'।'' এইজন্য নিত্যদাস সূত্রে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়াই তার কেবলমাত্র কর্তব্য। পক্ষান্তরে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমেই জীব দিব্য আনন্দ লাভ করে। সেই সেবার জন্য তার সর্বদা ব্যাকুল হওয়া উচিত। ভক্তের ব্যাকুলতা অনুসারে ভগবানের আসনও টলমল্ করে। তিনি আর তাঁর আসনে স্থির হয়ে না থেকে ভক্তজনের সম্মুখে নিজরূপ প্রকাশ করেন। তিনি কেবল ইচ্ছা করেন, জীব তাঁকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করুক। এইজন্য দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য আমাদেরকে তীব্র ব্যাকুলতা প্রকাশ করা উচিত। এটাই হচ্ছে দুর্লভ মানব জন্মের একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।

(হরে কৃষ্ণ)

❋❋❋

অভক্তের সেবা ভক্তবৎসল শ্রীহরির গ্রহণীয় নন্

অভক্তের সেবা কেন ভগবান শ্রীহরি গ্রহণ করেন না সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করার জন্য যত্নবান্ হয়েছি। তবে এই 'ভক্তি' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার সময় শ্রীল রূপপাদ ভক্তি সম্বন্ধে যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তা স্বতঃ মনে উদয় হয়—'' কৃষ্ণানুকূল সেবাই ভক্তি নামে খ্যাত।'' কায়-মন-বাক্যে ভগবৎ পদারবিন্দে শরণাগতি আচরণ করে উক্তভাবে সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তিকে ভক্ত বলা হয়। এ প্রকার ভক্ত হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে সুকৃতিবান। ভৌতিক লাভ বা জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগের কামনা তাঁদের আদৌ নেই। বরং আত্মানুভূতিসম্পন্ন একজন শুদ্ধভক্তের সঙ্গলাভের দ্বারা ভগবানের সেবা সম্বন্ধীয় পূর্ণজ্ঞান লাভ করাই হচ্ছে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। তারফলে তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল প্রেম ও ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করা। এভাবে ভক্তিপথে ক্রমশ উন্নতি করতে করতে নিজের বিশুদ্ধ হৃদয়ে সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভগবান শ্রীহরিকে ঐ প্রেমিক ভক্তগণ প্রেম রজ্জুতে বন্ধন করে থাকেন। তাঁদের এই ভক্তির পরাকাষ্ঠা শাস্ত্রসমূহে উদ্‌ঘোষিত হয়েছে। স্বয়ং ভগবান্‌ও প্রেমিক ভক্তের বশ্যতা স্বীকার করে বলেছেন—

> সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
> মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।।

—(ভা. ৯/৪/৬৮)

অর্থাৎ—'আমি সেই প্রেমিকভক্তদের হৃদয়স্বরূপ এবং তাঁরাও আমার হৃদয়-স্বরূপ। তাঁরা আমা-ব্যতীত অন্য কিছু জানেন না এবং আমিও তাঁদের ছাড়া আর কিছু জানি না।''

এরকম স্থিতিতে ভক্ত এক মুহূর্তও ভগবান থেকে বিযুক্ত হতে পারেন না। পক্ষান্তরে তাঁরা সর্বদা ভৌতিক সংস্পর্শ হতে মুক্ত। এই ভৌতিক সংস্পর্শ হতে ব্যক্তি যে-পর্যন্ত পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন না হচ্ছে সে-পর্যন্ত সে ভগবানের ভক্ত হতে

পারে না বা তার প্রদত্তকোনও বস্তু ভগবান গ্রহণ করেন না। এই কারণে স্বভাবতঃ সে অভক্ত।

এই অভক্তদেরকে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় 'দুষ্কৃতিনঃ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এরা হচ্ছে ঈশ্বর বিশ্বাসহীন নাস্তিক। মায়ামোহিত হয়ে রজোগুণ ও তমোগুণাচ্ছন্ন হয়ে স্ব-মন কল্পিত বহু যোজনা সব করে থাকে ও পরিণামে ভৌতিক লাভের আশায় ধাবমান হয়ে অনন্ত দুঃখই ভোগ করে। ভগবানকে ভুলে যাওয়ার জন্য এরা হচ্ছে নরাধম। এরা কোনও ধর্মনীতি অবলম্বন করে না। আজকাল এদের সংখ্যা প্রচুর। মানব জীবনের পরম কর্তব্যের প্রতি এরা সম্পূর্ণ অবহেলা প্রদর্শন করে থাকে। এরা তথাকথিত বড় বড় কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক হলেও মায়াশক্তি এদেরকে পথভ্রান্ত করিয়ে ভগবানকে ভুলিয়ে দেয়। ভগবানকে এরা সাধারণ মানব বলে মনে করে। এ ধরাধামে ভগবানের অবতীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে এরা বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করে নিজেদের মনগড়া বহু অবৈধ অবতার সৃষ্টি করে ও ভগবানকে নিন্দা করে। সমস্ত প্রকার শাস্ত্র প্রমাণ তথা সাধু-সন্ত আচার্যদের প্রমাণ সত্ত্বেও এরা পরম পুরুষ ভগবানের পাদপদ্মে শরণাগতি আচরণ না করে নাস্তিক হয়ে পড়ে। পরিণামে ভগবানের দিব্য প্রকৃতিকে জানতে না পেরে তাঁর জন্মকর্মাদি সব সাধারণ বলে বিচার করে। তাই শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতায় সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।। —(গী. ৯/১১)

অর্থাৎ—"আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ন হই তখন মূর্খেরা আমাকে উপহাস করে। তারা আমার পরম দিব্য প্রকৃতি ও সবার ওপরে আমার পরম অধিকারের কথা জানতে পারে না।"

যদিও পরমপুরুষ ভগবান একজন মানবরূপে আবির্ভূত হন, তথাপি তিনি একজন সাধারণ মানব নন। সমগ্র দৃশ্য জগত তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃজন, পালন ও সংহারের নিয়ন্ত্রণকারী কখনই একজন সাধারণ মানব হতে পারেন না। বহু মূর্খলোক আছে যারা ভগবান কৃষ্ণকে একজন শক্তিশালী মানবরূপে গ্রহণ করে, কিন্তু ভগবান বলে মনে করে না। বাস্তবিকপক্ষে তিনি হচ্ছেন আদিপুরুষ, পরমপুরষ। ভৌতিক ও চিৎ উভয় জগতের নিয়ন্ত্রণকারী। তাঁর

শরীর শাশ্বতময়, জ্ঞানময় ও আনন্দময়, তিনি সাধারণ মানব নন। তাঁর শরীরটাকে এক্ষেত্রে 'মানুষীং' বলে অভিহিত করা হয়েছে, কারণ তিনি ঠিক্ একজন মানবের মতো কার্য করেন। বৈদিক সাহিত্যে তাঁকে "আনন্দরূপায় কৃষ্ণায়" ও "তম্-একম্ গোবিন্দং" বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এসব সত্ত্বেও ভৌতিকবাদী পণ্ডিত ও ভগবদ্‌গীতার বহু ভাষ্যকার শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানব মনে করে উপহাস করে। অবশ্য পূর্বজন্মের পুন্যকর্মের ফলস্বরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভকারী এই তথাকথিত পণ্ডিতগণের এ রকম ধারণা তাদের স্বল্পজ্ঞানের পরিচায়ক। তারা ভগবানের এই অত্যন্ত রহস্যময় গুহ্যক্রিয়া ও তাঁর বিভিন্ন শক্তি সম্বন্ধে কিছু জানতে পারে না। পূর্ন জ্ঞান ও আনন্দের প্রতীক ভগবান কৃষ্ণের দিব্য গুণাবলী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হওয়ায় তারা তাঁকে উপহাস করে থাকে।

তবে পূর্বে আমরা বলেছি শুদ্ধভক্ত বা সাধু গুরু আচার্যদের সঙ্গ লাভ করে তাঁদের শ্রীমুখ হতে ভগবানের দিব্য গুণাবলী গম্ভীরতার সহ শ্রবণ করার দ্বারা জীবের চিত্ত বিশুদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে তা আর বহিরর্থে বিভ্রম হয় না। 'রুদ্র-গীতা'তেও বলা হয়েছে যে, সাধুসঙ্গে ভক্তি-যাজনকারী ব্যাক্তির চিত্ত বিষয়মলশূন্য হওয়ার সাথে সাথে আর তমোগুহায় প্রবিষ্ট হয় না। ফলে সে রকম ব্যক্তি অনায়াসে মননশীল হয়ে ভগবৎ তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। কেবল তাই নয়, সে রকম ব্যক্তির চিত্ত ভগবানের নাম-রূপ-গুণ ও লীলাদির শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ কালে লয়-বিক্ষেপ শূন্য হয়ে যায়। চিত্তে লয় বিক্ষেপকারক দশবিধ নামাপরাধ ও ভক্তি অপরাধ স্থান না পাওয়ার জন্য উক্ত বিশুদ্ধ চিত্ত সাধকের প্রতি ভক্তিদেবী প্রসন্ন হন। তদ্দারা তিনি সতত সাধন ভজনে রত হন। বারংবার এ প্রকার ভক্তিযোগযুক্ত অভ্যাসে যুক্ত হয়ে তিনি ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করেন। এ ভাবে তিনি সদাসর্বদা শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলারস আস্বাদন করেন। শুদ্ধভক্তগণ জানেন যে, কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ ভগবান। তাই তাঁরা সম্পূর্ণভাবে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে তাঁর দিব্য সেবায় মগ্ন থাকেন।

ভগবানের দিব্যতা ভক্তই উপলব্ধি করে থাকেন। এটা তাঁর হৃদয়ঙ্গমের বিষয়। উদাহরণ-স্বরূপ যখন ভগবান কৃষ্ণ কংসের বন্দীশালাতে বসুদেব ও

দেবকীর সম্মুখে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন তাঁদের পুনঃ-অনুরোধে নিজেকে একজন সাধারণ শিশুরূপে পরিবর্তন করেছিলেন। অনুরূপ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধভূমিতে অর্জুনের প্রার্থনায় বিশ্বরূপ প্রদর্শন পূর্বক আবার মৌলিক কৃষ্ণরূপ ধারণ করে দ্বিভুজধারী কৃষ্ণ হলেন। এসবের একমাত্র উদ্দেশ্য ভক্তরঞ্জন। ভক্তকে আনন্দ দেওয়াই তাঁর একমাত্র অভিপ্রায়। শ্রীমদ্ ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবকে স্তুতিমুখ বাক্যে বলেছেন—

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্ যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ।। —(ভা. ৭/৯/১১)

উক্ত শ্লোকের অর্থ এই যে, পরমপুরুষ ভগবান সর্বদা স্বতঃসন্তুষ্ট। এই কারণে যখন তাঁকে কিছু ভক্তিতে অর্পণ করা হয়, তা ভগবৎ কৃপায় ভক্তের অশেষ উপকার সাধন করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ভগবান কারোর সেবা-আবশ্যক করেন না। কেবল ভক্তগণের সেবা গ্রহণ করে তাঁদেরকে আনন্দ দেওয়াই তাঁর একমাত্র অভিপ্রায়। এইজন্য এটির একটি সরল উদাহরণ দেওয়া যায়। যদি একজন ব্যক্তির মুখ সুসজ্জিত হয়ে থাকে, তবে দর্পণে প্রতিবিম্বিত তার সেই মুখও অনুরূপ সৌন্দর্যময় দেখা যায়।

তাই নবধা ভক্তিযোগে ভগবানের যে সেবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা যদিও ভগবানের গৌরবগানের জন্য উদ্দিষ্ট, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার ফলে ভক্তেরই মঙ্গল সাধিত হয়ে থাকে। ভগবানের গৌরবগান দ্বারা পক্ষান্তরে ভক্তই গৌরবান্বিত হয়ে থাকে। সতত ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, লীলা, গুণাদি শ্রবণ, কীর্তনাদির দ্বারা ভক্তের হৃদয় বিষয়মলশূন্য হয়ে প্রেমানন্দ, ঘনানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

তবে উপরোক্ত শ্লোকে শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজের এই স্তুতিমূলক-বাক্যের রহস্য এই যে, শ্রীহরি সতত নিজের লাভপূর্ণ অর্থাৎ স্বকীয়, স্বাভাবিক ঘনানন্দের দ্বারা সন্তুষ্ট বা সন্তৃপ্ত। এসব সত্ত্বেও তিনি নিজের ভক্তবাৎসল্যের চরম পরাকাষ্ঠার নিদর্শন-স্বরূপ প্রেমভক্তি-তত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রেমিক ভক্তজনের পূজা গ্রহণ করে থাকেন। সেই সঙ্গে সেই ঐকান্তিক প্রণয়ী

ভক্তজনের প্রতি তিনি সতত অনুরক্ত। যেহেতু সেই ভগবান প্রেমিক ভক্ত-প্রদত্ত প্রেম-সম্পত্তি-রূপ পূজা লাভে পরিপূর্ণ হয়ে থাকেন, তাই তিনি ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানহীন অভক্ত-কৃত পূজার অপেক্ষা করেন না।

ভগবানের দ্বারকালীলায় আমরা দেখতে পাই যে, দ্বারকাধীশ ভগবান কৃষ্ণ হস্তীনাপুরে দুর্যোধনের ষোড়শ-উপচার (ষোড়শোপচার) পূজা উপেক্ষা করে অকিঞ্চন, প্রিয়ভক্ত বিদুরের গৃহে বিনা নিমন্ত্রণে শাকান্ন গ্রহণ করে ভক্তকে মহিমান্বিত করেছেন। আবার ভগবানের অন্য এক লীলাতে আমরা দেখতে পাই যে, কৃষ্ণের বাল্যসখা সুদামা-বিপ্র দ্বারকা নগরীতে নিজের বাল্যবন্ধু কৃষ্ণকে দর্শন করার লালসায় সপত্নী প্রদত্ত খুঁদ্ভাজা বন্ধুর জন্য উপহার স্বরূপ গ্রহণ করে দ্বারকা নগরীতে প্রবেশ করার পর দ্বারকার ঐশ্বর্যময়, মণি-মাণিক্যখচিত রাজপ্রাসাদ তথা বহু-আড়ম্বরপূর্ণ রাজকীয় চাক্‌চিক্য দর্শনে নিজের সেই খুঁদ্ভাজার পুঁটলিটাকে কেমন করে মহা রাজরাজেশ্বর ভগবান কৃষ্ণকে প্রদান করবেন তা চিন্তা করে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। কিন্তু ভক্তজনের নিত্যসহচর ভগবান্ কৃষ্ণ নিজের পুরাতন বাল্যবন্ধুকে দর্শন করে অতি আনন্দিত হওয়ার সাথে সাথে বন্ধুর যথাবিধি সৎকার করে কি উপহার এনেছেন জিজ্ঞাসা করায় সুদামা নিরুত্তর রইলেন। তাঁর স্বভাবসুলভ লজ্জাশীলতা লক্ষ্য করে ভগবান কৃষ্ণ জানতে পারলেন যে বন্ধু কিছু উপহার এনে তাঁকে দেওয়ার জন্য সঙ্কোচ বোধ করে গোপন রাখতে ইচ্ছা করছেন। তাই ভক্তপ্রীতির আতিশয্যে ধৈর্যহারা হয়ে বলপূর্বক সেই পুঁটলিটাকে টেনে বার করে নিয়ে তার ভিতর হতে এক মুষ্টি (মুঠো) খুঁদ্ভাজা আনন্দে ভাবগ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করলেন। এই ঘটনা হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, অর্পিত বস্তুর অবস্থা বা স্বাদ কৃষ্ণ গ্রহণ না করে প্রেমিক ভক্তের হৃদয়ের ভাবটাকেই গ্রহণ করে থাকেন।

অনুরূপ অন্য একটি ঘটনা অনুধ্যান করলে, আমরা জানতে পারি যে, পাণ্ডবদের বনবাসের সময় খলবুদ্ধি দুর্যোধন দ্বারা পাণ্ডবদের নিকটে প্রেরিত সশিষ্য দুর্বাসার সৎকারের জন্য পাণ্ডু পুত্রবধূ দেবী দ্রৌপদীর কাতর প্রার্থনায় স্বয়ং ভগবান সেখানে উপস্থিত হয়ে "দ্রৌপদী, দ্রৌপদী, আমার খুব খিদে পেয়েছে। খাবার জিনিস কি আছে আমাকে দাও, আমি কিছু শুনতে চাই না, আমাকে আগে খেতে দাও।" এভাবে জিজ্ঞাসা করায় দ্রৌপদী বললেন, "একি

লীলা প্রভু! সেই বিপদ হতে উদ্ধারের জন্য আমি আপনার আশ্রিতা, অথচ স্বয়ং আপনি আপনার ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য আমাকে প্রার্থনা করছেন।" ভক্তবৎসল ভগবান কৃষ্ণ আর কালবিলম্ব না করে স্বহস্তে স্বচ্ছধৌত রন্ধন পাত্রের এক কোণ হ'তে পাণ্ডবদের উচ্ছিষ্ট-স্বরূপ ক্ষুদ্র শাকপত্রটি গ্রহণ করে নিজের উদর পূর্তি ও ক্ষুধা নিবৃত্তির সূচনা দিয়েছেন। এসব উদাহরণ অবতারণা করার রহস্য এই যে, ভাব বিনোদিয়া হরি ভক্তের ভাবই গ্রহণ করেন।

পক্ষান্তরে, অভক্ত, বিষয়ীজনের প্রদত্ত সমস্ত পূজার উপকরণ ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে অর্পিত না হয়ে নিজের হিত কামনার জন্য শ্রীহরির নিকটে অর্পিত হয় বলে তা পরিণামে নিজের ভোগেতে অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয় তর্পণেতে পর্য্যবসিত হয়। পূর্বে উদ্ধৃত উদাহরণ হ'তে আমরা জানতে পারি যে, যেমন মুখমণ্ডলের শ্রী দর্পণগত প্রতিবিম্বে পরিলক্ষিত হয়, তেমনি যে উদ্দেশ্যে যেমন সম্ভার দ্বারা অর্থাৎ উপকরণ দ্বারা পূজা করা যায়, পূজার ফলও তেমন উৎপন্ন হয়। আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ অভিলাষে শ্রীভগবৎ প্রীতি সম্পাদন ইচ্ছার স্থান নেই। অনুরূপ ভগবৎ সুখ সাধিকা সেবা চেষ্টাতে আত্মসুখ বাঞ্ছার স্থান থাকতে পারে না। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উক্তি হতে জানা যায় যে, নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করার ইচ্ছাকে 'কাম' বলা হয়। কেবল ভগবান কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় সন্তোষ বিধানের ইচ্ছাকে 'প্রেম' বলা যায়। একারণে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ও ভগবৎ সুখ সাধনের প্রচেষ্টা যুগপৎ সম্ভবপর নয়।

ভগবৎ প্রীতির জন্য যা করা যায় তাতে কামগন্ধ না থাকায় তা'র ফল পরমোত্তম। সেই পরমোত্তম ফলরূপ প্রেম সম্পত্তি দ্বারা ভগবৎ ধামেতে সর্বদা ভগবৎ দর্শন ও তাঁর প্রেমসেবার সৌভাগ্য লাভ হয়। শ্রীহরির প্রীতি বিধানেই নিজের পরম হিত সাধিত হয়। শ্রীহরির চরণে সর্বস্ব সমর্পণ ব্যতীত পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয় না। আত্মসুখ কামনার লেশমাত্র গন্ধ থাকা পর্যন্ত বিশুদ্ধ ভক্তির প্রসাদ মেলে না। শুদ্ধ ভক্তের ভিতরে আত্মসুখ-কামনার গন্ধ পর্যন্ত থাকে না, শ্রীহরির নিকটে তাঁদের সাক্ষাৎ ভগবৎ বুদ্ধি থাকে।

ভগবানের সেই প্রেমিক ভক্তগণ সাক্ষাৎ ভগবৎজ্ঞানে শ্রীবিগ্রহের প্রীতিপূর্ণ সেবায় নিযুক্ত থাকেন। সে-রকম ভক্ত শ্রীবিগ্রহের মাধুরীতে বিমুগ্ধ হয়ে সর্বদা ভগবৎ সেবা পরায়ণ হয়ে থাকেন। সেই ভক্তের প্রেমবশ্যতা স্বীকার করে

শ্রীহরি প্রতিমা স্বরূপে তাঁর সমক্ষে নিত্য নবনবায়মান মাধুর্য প্রকাশ করে থাকেন। শ্রীহরির শ্রীমূর্তি প্রণয়ি ভক্তের সঙ্গে প্রেমালাপও করেন। এমনকি সেই ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীহরি ভক্তজনের প্রেমবশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন-স্পর্শনাদি প্রদান করেন। সর্ববেদান্ত শিরোমণি শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ অবলোকন করলে আমরা দেখতে পাই যে, বহু প্রেমিকভক্ত এভাবে মাধুর্যৈক নিলয় কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য লাভ করেছেন। লীলাশুক বিল্বমঙ্গল, শ্রীজয়দেব গোস্বামী, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীপাদ আদি প্রেমাতুর ভক্তগণের জীবনী তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

ইতিপূর্বে আমরা অভক্তের প্রীতিশূন্য শত সম্ভার-যুক্ত অর্থাৎ শত উপকরণযুক্ত বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ সেবা বা অভ্যর্থনা ভগবান কেমন করে অস্বীকার করেছেন, তা বর্ণনা করেছি। তবে এক্ষেত্রে ভগবান কেমন করে প্রেমৈকনিষ্ঠ সাধুজনের সেবা গ্রহণের জন্য সতত ব্যাকুল সে-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি।

এই পবিত্র ভূমি উৎকলের পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথের আবির্ভাব রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে আমরা 'স্কন্দ' পুরাণের বর্ণনা থেকে জানতে পারি যে , দ্বারকার মহিষীদের সম্মুখে মাতা রোহিণী কর্তৃক ভগবান কৃষ্ণের অপূর্ব দিব্যলীলা-রহস্য উন্মোচনই হচ্ছে মুখ্য কারণ। ষোল হাজার মহিষিগণের দ্বারা সতত সেবিত ভগবান কৃষ্ণের মুখে সতত 'রাধা' নাম উচ্চারণের কারণ জিজ্ঞাসা করার উত্তরে রোহিণীমাতা নন্দনন্দন, যশোদানন্দন, ব্রজেশতনয়, গোকুলেশ কৃষ্ণের দিব্য বৃন্দাবন লীলার কথা বর্ণনা করেছিলেন। তাতে তিনি মাধুর্যৈক নিলয় কৃষ্ণের গোপিগণের সহিত তথা সর্বোপরি গোপিকাশ্রেষ্ঠ শ্রীরাধিকা সহ ব্রজে যে লীলা প্রদর্শিত হয়েছিল সেই অদ্ভুত মাধুর্যময় দিব্য লীলাদির কথা কীর্তন করেছিলেন। সেই দিব্য কথামৃত শ্রবণের জন্য উৎকণ্ঠিতা ষোল হাজার রাণী সহ দ্বারদেশে প্রহরী-স্বরূপ দণ্ডায়মানা কৃষ্ণের একমাত্র আদরের ভগিনী দেবী সুভদ্রা ভাবাবেশে স্বরূপ-বিস্মৃতা হয়েছিলেন। মাতা রোহিণীর মুখ-নিঃসৃত সেই লীলা কাহিনী এমনই আকর্ষণীয় ছিল যে, রাজপ্রাসাদে অনুপস্থিত কৃষ্ণ ও বলরামকেও আকৃষ্ট করেছিল। অবিলম্বে তাঁরা উৎকণ্ঠিত চিত্তে তীব্র শ্রবণ লালসায় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ও স্বলীলাচরিত মাতা রোহিণীর শ্রীমুখ হতে শ্রবণ করে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব তথা

মহাভাবের পূর্ণতম প্রকাশ-স্বরূপ সেখানে দণ্ডায়মান হয়ে রইলেন। কথা শ্রবণের আগ্রহাতিশয্যে মাতার নিকটবর্তী হওয়ার ইচ্ছা করে তাঁরা দ্বারদেশে দুই হস্ত প্রসারণপূর্বক ভাবাবেশ স্থিতিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় নিজেদের আদরের ভগিনী সুভদ্রাকে দেখে পরাহত হলেন। তথাপি সেই অপূর্ব কথা কীর্তনের প্রভাব এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, তাঁরা সেই মহা ভাবময় অবস্থায় সুভদ্রাকে মধ্যভাগে রেখে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় দেবী সুভদ্রার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে চিত্রপ্রতিমার ন্যায় স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান রইলেন। দৈবযোগে মহাভাবের সেই চরম অবস্থা ভগবানের অতি প্রিয় ভক্ত দেবর্ষি নারদের দ্বারা দৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলিযুগে সেই বিগ্রহত্রয় যাতে উপাসিত হতে পারে সেই প্রার্থনার ফলস্বরূপ স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ভক্তের ইচ্ছা পূরণের জন্য শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রী জগন্নাথ, বলদেব ও দেবী সুভদ্রা রূপে শ্রীমন্দিরের রত্ন সিংহাসনে বিরাজিত। এই শ্রীবিগ্রহত্রয় তাঁদের দর্শনাভিলাষী বহু ভক্তদেরকে দর্শন, স্পর্শনাদি দান এবং বন্দনাদি গ্রহণ-পূর্বক তাঁদেরকে স্নেহাশীর্বাদ প্রদান করার সাথে সাথে অচলামেরু রূপে সদাসর্বদা শ্রীপুরুষোত্তম ধামে অবস্থান করছেন।

অনুরূপ অন্য একটি ঘটনায় আমরা সত্যবাদীস্থ শ্রীসাক্ষীগোপালের দর্শনে ভগবানের ভক্তবৎসলতার প্রমাণও পেয়ে থাকি। এই উপাখ্যান আমাদেরকে স্মরণ করে দেয় যে, বহুবছর পূর্বে দক্ষিণ ভারতের বিদ্যানগরে দু'জন ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁরা ধাম পরিক্রমা উপলক্ষে বৃন্দাবনের শ্রীগোপাল দর্শনাভিলাষী হয়ে শ্রীগোপালবিগ্রহের নিকটে উপস্থিত হন। তাঁদের সেই যাত্রার সময়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ (বড় বিপ্র) পথে রোগাক্রান্ত হওয়ার ফলে যুবা ব্রাহ্মণ (ছোট বিপ্র) তাঁকে বহু সেবাশুশ্রূষা করেন। এ কারণে তার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে বড় বিপ্র তাকে কিছু দান দিতে ইচ্ছা পোষণ করেন। ছোট বিপ্রের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বড় বিপ্র সেই গোপালবিগ্রহকে সাক্ষী রেখে নিজের কন্যাটাকে ছোট বিপ্রকে অর্পণ করার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু যাত্রা সমাপনান্তে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর তথাকথিত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিবারের অন্য লোকেদের ভয়ে বড় বিপ্র কুলিন ব্রাহ্মণ পরিবারের অন্তর্গত ছোট বিপ্রকে কন্যাদান করতে না পেরে প্রতিশ্রুতি পালনে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করার সাথে সাথে গ্রামের মোড়লের (headman of a village) নিকটে ছোট বিপ্রের ধৃষ্টতা সম্বন্ধে মিথ্যাভিযোগ দাখিল করেন। গ্রামের মোড়ল ছোট বিপ্রকে কৈফিয়ৎ তলব করেন ও তারজন্য

কে সাক্ষ্য দিতে পারবেন, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে ছোট বিপ্র প্রত্যুত্তরে বললেন বৃন্দাবনের গোপাল হচ্ছেন তাঁর সাক্ষী। তাই তুরন্ত সাক্ষীকে গ্রামে ডেকে আনার জন্য গ্রামের মোড়ল ছোট বিপ্রকে আদেশ করলেন। ছোট বিপ্র বৃন্দাবনে পৌঁছিয়ে শ্রীগোপালের নিকটে সমস্ত কথা অবগত করিয়ে তাঁকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। ভক্তের মান-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সেই বিগ্রহ তুরন্ত সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সেই গ্রামেতে উপস্থিত হলেন ও সেইদিন হতে তিনি সাক্ষীগোপাল নামে নামিত হলেন। বর্তমান সেই শ্রীবিগ্রহ সমসাময়িক উৎকল-শাসক রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেবের শাসনকালে বিদ্যানগর হতে আনীত হয়ে প্রথমে কটকে, তারপর স্থানান্তরিত করে পুরীর সত্যবাদী নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ভক্ত-প্রেমের এটা একটা জ্বলন্ত নিদর্শন। ভক্তের অনাবিল স্নেহে তিনি সতত আবদ্ধ। প্রেমিক ভক্ত তাঁকে সদাসর্বদা স্মরণ করে থাকেন। ভগবানও প্রেমিক ভক্তকে সর্বদা চিন্তা করে থাকেন। আবার তিনি নিজেকে প্রেমিক ভক্তের নিকটে লুকিয়ে রাখতে পারেন না। ভক্তের অগোচরে তাঁর সেবা করার জন্য ভগবান সতত লালায়িত। রেমুণার শ্রীশ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথের এরূপ নামকারণের রহস্য উন্মোচন করলে আমরা দেখতে পাই যে, ভক্তপ্রবর শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ বৃন্দাবনের ভূমিতলে দীর্ঘদিন ধরে অবস্থানকারী গোপাল বিগ্রহকে তাঁর দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে উদ্ধার অর্থাৎ উত্থিত করলেন এবং অন্নকূটাদি উৎসবের আয়োজন করে তাঁকে স্থাপনাও করলেন। কিন্তু তাঁর দেহ-তাপের অপনোদনের জন্য জগন্নাথ পুরী হ'তে মলয় চন্দন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উৎকল অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেই অবসরে তিনি বালেশ্বরে রেমুণাতে এসে পৌঁছিলেন। সেখানে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের ক্ষীরভোগ প্রসিদ্ধ ছিল। এ কারণে পুরী গোসাঁই মনে মনে চিন্তা করলেন যে, এই ক্ষীরভোগ কি রকম স্বাদ তা তিনি যদি একটু আস্বাদন করতে পারতেন, তাহলে বৃন্দাবনে গোপালের নিকটে তিনি অনুরূপ ভোগের ব্যবস্থা করতে পারবেন। তিনি ছিলেন বিরক্ত সন্ন্যাসী। কারোর কাছে কিছু যাচ্ঞা (ভিক্ষা) করেন না। কিন্তু সেদিন গোপীনাথের নিকটে ক্ষীরভোগ লাগার পূর্বে তিনি নিজেই সেই ভোগ আস্বাদনের কথা চিন্তা করার জন্য মনে মনে বড় লজ্জিত হলেন এবং নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। সন্ধ্যার সময় গোপীনাথের আরতি দর্শন ও কীর্তনে অংশগ্রহণ করে কাউকে কিছু না বলে চুপ্‌চাপ্ এসে মন্দিরের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত হাটের

সন্নিকটস্থ বটগাছের মূলে উপবেশন করে ভজন করতে লাগলেন। এদিকে পূজারী উপস্থিত ভক্তদেরকে ক্ষীর প্রসাদ বিতরণ করে মন্দির বন্ধ করে শুতে গেলেন। অন্তর্যামী ভগবান ভক্তের অন্তরের কথা জানেন। আবার প্রেমিক ভক্ত প্রেম-রজ্জুতে তাঁর হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে বন্দী করে রেখেছেন। "ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয়-কমলে।" শ্রীপাদ পুরী গোসাঁইর জন্য নিজের বস্ত্রের আড়ালে লুক্কায়িত ক্ষীর পাত্রটি বটগাছের নীচে ভজনরত অবস্থায় তাঁকে দিয়ে দেওয়ার জন্য সেই পূজারীকে স্বপ্নাদেশ দিলেন। পূজারী তৎক্ষণাৎ ক্ষীরভোগের পাত্রটি নিয়ে শ্রীপাদ পুরী গোসাঁইকে প্রদান করলেন। ভক্ত-প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা এক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

এরকম বহু ভক্ত মহাজনগণের মূল্যবান্ জীবনচরিত আলোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ভগবান নিজের ভক্তকে স্ব-সেবার মাধ্যমে দর্শন স্পর্শন তথা ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ প্রদান করেন। এমনকি প্রেমিকভক্তকে নিজের আত্মা থেকে বেশী স্নেহ করেন ও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। শ্রীমদ্ ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবান্ কৃষ্ণ উদ্ধবকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে, তিনি কেমন করে নিজের ভক্তের প্রেমবশ্যতা স্বীকার করে তাঁর অধীন হয়ে পড়েন। এমনকি তিনি নিজের প্রিয়তমা লক্ষ্মী, বিধাতা ব্রহ্মা, প্রথম বিস্তৃতাংশ বলদেব বা শঙ্কর্ষণ ও নিজের আত্মাকেও ততো প্রিয় বলে মনে করেন না, যতই তিনি নিজের প্রেমিক ভক্তকে প্রিয় বলে মনে করেন। ভক্তের স্তুতি-গান করে ভগবান উদ্ধবকে নিম্নলিখিত শ্লোকে বলেছিলেন—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্কর ঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্।।

—(ভা.১১/১৪/১৫)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাতেও আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর পঞ্চতত্ত্বের প্রকাশের মধ্যে অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ শ্রীপাদ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর একজন অতি প্রিয় ভক্ত ছিলেন। তাঁর নিষ্ঠাপর সেবা ও প্রগাঢ় ভক্তিদ্বারা তিনি তোটা গোপীনাথের প্রীতিভাজন হয়েছিলেন। নিজের প্রিয় বিগ্রহের গোপীনাথকে তাঁর দণ্ডায়মান অবস্থায় ফুলের মালা অর্পন করার অসামর্থ্যতা প্রকাশ করায় ভক্তের সেবা অঙ্গীকার করার জন্য গোপীনাথ

সেস্থানে বসে পড়লেন। এ রকম শুদ্ধভক্ত বা বৈষ্ণব সতত কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত থেকেও নিজের আবশ্যকতার জন্য ভগবানের কাছে কিছুই যাচ্ঞা করেন না। ভক্তের কিছু কামনা না থাকলেও ভগবান তাঁর সেবা করার জন্য ছায়ার মতো তাঁর অনুধাবন করে থাকেন। এক্ষেত্রে কিছু চাওয়ার আবশ্যক নেই। যে ভগবানকে কিছু সেবা করে তার প্রতিবদলে অর্থাৎ বিনিময়ে কিছু চায় তাহলে সে ভক্ত পদবাচ্য নয়, সে বণিক।

তবে এ সব অবতারণা করার অভিপ্রায় এই যে ভগবান সর্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র হলেও তিনি সতত ভক্ত পরতন্ত্র। স্বয়ং ভগবান প্রেমিক-ভক্তের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হওয়ায় অধিক আনন্দ লাভ করে থাকেন। এই জন্য তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধভূমিতে অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন এবং অর্জুনের নির্দেশে তিনি রথ চালনা করেছিলেন। নিজের স্বীকারোক্তি প্রকাশ করে ভগবান বলেছেন—

সদা মুক্তোঽপি বদ্ধোঽস্মি ভক্তেন স্নেহ রজ্জুভিঃ।
জিতোঽপি জিতোঽহং তৈর বশ্যোঽপি বশীকৃতঃ।।
ত্যক্ত বন্ধুধন স্নেহোময়ি যঃ কুরুতে রতিম্।
একস্তস্যাস্মি স চ মেন ন হ্যন্যোঽস্ত্যাবয়োঃ সুহৃৎ।।
অপি মে পূর্ণকামস্য নবং নবমিদং প্রিয়ম্।
নিঃশঙ্কঃ প্রণয়াদ্ ভক্তো যন মাং পশ্যতি ভাবতে।।

অর্থাৎ—" শ্রী হরিভক্তি সুধোদয়ে ভক্তপ্রবর শ্রীপ্রহ্লাদের প্রতি শ্রীভগবৎ ভক্তির রহস্য এই যে, ভগবান্ নিত্যমুক্ত হলেও কিংবা ভববন্ধন মুক্তিদাতা হয়েও ভক্তজনের স্নেহপাশেতে সতত আবদ্ধ। আবার অজিত হয়েও ভক্তজনের নিকটে পরাজিত। তিনি অন্যের বশীভূত না হলেও ভক্তজনের প্রেমে নিত্য বশীভূত। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, ধনাদির প্রতি স্নেহ-মমতা পরিত্যাগ করে যে অকিঞ্চন ভক্ত কেবল ভগবানের প্রতি রতি, প্রীতি আদি বিধান করেন, ভগবান একমাত্র তাঁর এবং তিনিও ভগবানের।" এ রকম স্থিতিতে সেবার বিনিময়ে ভগবানের কাছ থেকে কিছু চাওয়া যায় না। শর্তবিহীন ঐকান্তিক ভগবৎ সেবাই প্রেমিক ভক্তের একমাত্র লক্ষ্য। এ ছাড়া ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে অন্য কোনও সম্বন্ধ নেই। "প্রণয়ী ভক্ত নিঃশঙ্ক প্রণয়ে ভগবানকে দর্শন করেন। সেই সঙ্গে

তাঁরাও তাঁর সঙ্গে প্রেমালাপ করে থাকেন। ভগবান্ যদিও স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় পুরুষ পূর্ণ মনোরথ তথাপি তিনি প্রণয়ী ভক্তের নিঃশঙ্ক প্রীতি তাঁর কাছে নবনবায়মান রূপে প্রতিফলিত হয়। তাতে ভগবান অত্যন্ত প্রীতি হন। এ রকম প্রেমিকভক্ত ভক্তিতে যা কিছু অর্পণ করেন, ভগবান তা আনন্দে গ্রহণ করেন।" শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় অর্জুনকে উপদেশ প্রদান করে ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।। —(গী. ৯/২৬)

অর্থাৎ—"বিশুদ্ধ চিত্ত ভক্তগণ ভক্তিপূত চিত্তে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল যা কিছু অর্পণ করেন, তা ভগবান অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করেন।" তাৎপর্য এই যে, প্রেম রসরঞ্জিত পত্র, পুষ্পাদি শ্রীহরি প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করেন। কারণ প্রেমবশ্য শ্রীহরি কেবলমাত্র প্রেমরস আস্বাদন করে থাকেন। আবার ভক্তের প্রেমদানে বন্দী হয়ে থাকেন বলে ভক্ত প্রদত্ত কোনও দ্রব্য উপেক্ষা করেন না। ভক্তের প্রেমাধীন শ্রীহরি ভক্ত প্রদত্ত শাক-ফল-মূলাদি অতি আদরে ভক্ষণ করেন।

এ কারণে এ কথা এখানে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, যদিও ভগবান একমাত্র উপভোগকারী, আদিপুরুষ ও সমস্ত যজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা তথাপি ভক্তকে দিব্য সেবাধিকার দেওয়ার জন্য ও তাঁর কাছ হতে দিব্য সেবা গ্রহণ করার জন্য তিনি তাঁর নিবেদিত বস্তু সকল আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে থাকেন। অবশ্য এটা মনে রাখতে হবে যে, স্নেহ বা শ্রদ্ধা সহকারে খাদ্য বা ঈপ্সিত বস্তু ভগবানকে অর্পন করার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো—কৃষ্ণপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কার্য করা। কেবল ঈক্ষণের দ্বারা যে-ভগবান ভূতপ্রকৃতির মধ্যে জীব সঞ্চার করতে পারেন, তিনি ভক্তার্পিত বস্তু ভক্তের প্রেম বা শ্রদ্ধাপূর্ণ বাণী শ্রবণের মাধ্যমে ভোজন করেন। তাঁর পরমস্থিতির জন্য তাঁর শ্রবণই সম্পূর্ণরূপে ভোজন ও স্বাদগ্রহণের সঙ্গে সমান। তাই ভগবান কৃষ্ণ নিজেকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন, সেভাবে উপরোক্ত প্রেমিক ভক্তের মতো যাঁরা তাঁকে গ্রহণ করেন তখন তাঁরা বুঝতে পারেন যে পরমসত্যস্বরূপ সেই ভগবান খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন ও উপভোগ করতে পারেন। তাই তিনি ভক্তজনের অতি প্রিয় ও নিত্যবস্তু। সেই ভক্ত মহাজনদের দ্বারা কৃষ্ণ কেমন করে নিজের স্বতন্ত্রতা হারিয়ে তাঁদের প্রেমাধীনতা স্বীকার

করেছেন, শ্রীমদ্ ভাগবতের নবম স্কন্ধে সে বিষয়ে নিম্ন-লিখিতভাবে বর্ণিত হয়েছে—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।।
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা।।
যে দারাগারপুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে।।
ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা
মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতম্।।
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।।
—(ভা. ৯/৪/৬৩-৬৮)

পরম ভাগবত সসাগরা পৃথিবীর একাঙ্ক (একচ্ছত্র) চক্রবর্তী নরদেব সম্রাট শ্রী অম্বরীষের চরণে কৃতাপরাধী শ্রী দুর্বাসার প্রতি শ্রীভগবৎ-ভক্তির তাৎপর্য এই যে—ভগবান সর্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র হয়েও সতত ভক্ত পরাধীন ও ভক্ত পরতন্ত্র। পরমভক্ত সাধুগণের দ্বারা গ্রস্ত-হৃদয় হয়ে তিনি নিত্য ভক্তজনগণের প্রিয়। শ্রীহরি অকিঞ্চন সাধুগণের এক মাত্র আশ্রয়। সেই সাধুগণ তাঁর এতই প্রিয় যে, সেই ভগবান তাঁর স্বরূপগত আনন্দ ও নিত্যষড়ৈশ্বর্য সম্পত্তির অভিলাষ করেন না। এর একমাত্র কারণ হলো, সেই সাধুগণই তাঁর অমূল্য সম্পদ। তাঁরা কৃষ্ণৈক শরণত্ব আচরণ করার সাথে সাথে সতত দিব্য প্রেমময়ী সেবাতে নিযুক্ত। এটাও অবশ্য জেনে রাখতে হবে যে, যে-সব সাধু পত্নী, গৃহ, পুত্র, নিজজন, প্রিয় প্রাণ, চিত্ত —এই সব পরিত্যাগ করে ভগবানের চরণে একান্ত শরণাগত, তাঁদেরকে পরিত্যাগ করতে তিনি কখনোই উৎসাহিত নন। সেজন্য একটি সরল উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, সতী স্ত্রী যেরূপ নিজের সৎপতিকে বশ করে থাকেন, সেরূপ শ্রীহরির নিকটে আবদ্ধ হৃদয়, সমদর্শী সাধুগণ তাঁকে কেবল ভক্তির দ্বারাই বশীভূত করে থাকেন। তাঁর সেবার

দ্বারা সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় অনায়সে লব্ধ হলেও সেরকম অকিঞ্চন ভক্তগণ ভগবৎ সেবাতে পূর্ণ মনোরথ হয়ে সে-সব মুক্তি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হন না। তাই এরকম পরিস্থিতিতে অন্য নশ্বর সুখের বিষয়ে-বা আর কি বলার আছে? সেই ভগবৎ ভক্তগণ সেবা ব্যতীত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই বিষয় চতুষ্টয়ের প্রার্থী নন্। সেই অকিঞ্চন, নিষ্কিঞ্চন সাধুগণ ভগবানের হৃদয়-স্বরূপ এবং ভগবানও তাঁদের হৃদয়-স্বরূপ। ভগবানের সেবা ব্যতীত তাঁরা আর অন্য কিছুই জানেন না, অর্থাৎ অন্য আর কাউকে নিজের বলে মনে করেন না। তবে এর গূঢ় রহস্য উন্মোচন করলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রেমভক্তির বশ শ্রীহরি ভক্তবাৎসল্যবশতঃ সতত ভক্তি পরতন্ত্র ও ভক্তের প্রেমাধীন হয়ে থাকেন।

আবার শ্রীগৌর লীলাতে শ্রীগৌরহরির উক্তি, অকিঞ্চন ভক্ত শ্রীধরের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার জন্যই সেই রহস্য (ভক্ত পরতন্ত্রতার রহস্য) এক্ষেত্রে সুব্যক্ত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের গ্রন্থকর্তা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌরহরির শ্রীধরের প্রতি অনাবিল (নির্মল) প্রেমের কিছু সঙ্কেত প্রদান করেছেন—"শ্রীচৈতন্য ভাগবতে" তা ব্যক্ত হয়েছে যথা—

বিষয়-মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
সুত-ধন-কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে।।
—(চৈ. ভা. মধ্য ১৬/১৪৭)

দেখি'মূর্খ দরিদ্র যে বৈষ্ণবেরে হাসে।
তার পূজা-বিত্ত কভু কৃষ্ণেরে না বাসে।।
—(চৈ. ভা. মধ্য ১৬/১৪৮)

'অকিঞ্চন-প্রাণ কৃষ্ণ'—সর্ব বেদে গায়।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ এই তাহারে দেখায়।।
—(চৈ. ভা. মধ্য ১৬/১৫০)

তোমারে দিলাম আমি প্রেমভক্তি দান।
—(চৈ. ভা. মধ্য ১৬/১৩৭)

উপসংহারে এইমর্মে বলা যেতে পারে যে, উপরোক্ত যেসব বিষয়বস্তু আলোচনা করা হলো, তাতে ভগবানের প্রিয় ভক্তগণ তাঁর প্রতি যে গভীর প্রেমভাব তথা ভগবানের স্ব-আশ্রিত জনগণের (নিজ জনগণের) প্রতি যে

অনাবিল প্রেম তা চিন্ময়। তাতে সামান্যতম ভৌতিকতা বা জড় কাম গন্ধ নেই। তা দিব্য প্রেম সম্বন্ধের ওপরে আধারিত। তাই ভক্ত বৎসল শ্রীহরি ভক্ত নিবেদিত যে কোনও বস্তু আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং তা'র প্রতিদানে ভক্তজনকেও নিত্য আনন্দ প্রদান করেন। বাহ্য স্থিতিতে কিছু আবশ্যকতা নেই। সেই আনন্দ হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে অনুভূত হয় ও ভক্ত মহাজনকে দিব্য ভাব স্তরে উপনীত করায়।

শ্রীমতী কুন্তীদেবীর অভিব্যক্তি লক্ষ্য করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, সেই ভগবান অকিঞ্চনের বস্তু এবং সেই অকিঞ্চন নিষ্কিঞ্চন ভক্ত সেই গোবিন্দের একমাত্র বিত্ত। স্বয়ং ভগবানের প্রতি নিজের প্রার্থনায় প্রকাশ করেছেন—

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্।।
—(ভা. ১/৮/২৬)

অর্থাৎ—"আভিজাত্য, ঐশ্বর্য বা প্রভুত্ব, বিদ্যার প্রতিভা ও সৌন্দর্য প্রভৃতির অভিমানে যারা স্ফীত হয়েছে সেরকম প্রাকৃত মদান্ধ ব্যক্তিগণ নিরভিমান, অকিঞ্চন ভক্তগণের লভ্য 'শ্রীকৃষ্ণ', 'গোবিন্দ'কে প্রাপ্ত হতে পারে না। সেই গোবিন্দ একমাত্র নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের জন্য সুলভ ও সেই ভক্তগণ সর্বদা গোবিন্দের সেবা-সুখের জন্য তৎপর।"

"তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন—মম বৈষ্ণব-পরাণ।।"
—(প্রার্থনা—নরোত্তম ঠাকুর)

এ কারণে রস বিচার ও সম্বন্ধ বিচার নির্বিশেষে সকলেই এই সুদুর্লভ কৃষ্ণভক্তি আচরণ করে নিজের এই মানব জীবনটাকে ধন্য করার সাথে সাথে লীলা পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা লাভ করুন।

(হরিবোল)

***

ভগবানের দণ্ডই আশীর্বাদ

পরম করুণাময় ভগবান্ হচ্ছেন জীবের মঙ্গলাকাঙ্খী বন্ধু। জীবের স্বরূপ স্মৃতি জাগ্রত করার জন্য তথা ভগবানের সঙ্গে তার যে নিত্য সম্বন্ধ আছে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি বেদ, পুরাণাদি শাস্ত্র সৃষ্টি করেছেন। সেই সঙ্গে নিজজন, স্বশ্রেষ্ঠ সাধু, গুরু ও বৈষ্ণবগণকে এই প্রামাণিক তত্ত্ব-জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে মায়া কবলিত জীবদের উদ্ধারের জন্য এ ধরাধামেতে প্রেরণ করে থাকেন। এমনকি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবতারী পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন অবতারের মাধ্যমে বা স্বয়ং এ মর্ত্য জগতে বিবিধ লীলা প্রকাশ করে থাকেন। সে-সবের মধ্যে তাঁর অতি গুরুত্বপূর্ণ লীলা মহাবদান্য অবতার, মহা ঔদার্যময় বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপ প্রকাশ। এ লীলায় তিনি আচার্য রূপে দণ্ড প্রদানের মাধ্যমে আশ্রিত জীবদেরকে অশেষ করুণা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর এ রকম দণ্ডপ্রদান লীলা শ্রীজগন্নাথ পুরী ধামেতে প্রকটিত হয়েছিল।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য মহাশয়ের অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেবক ছিলেন শ্রীকমলাকান্ত বিশ্বাস। তিনি শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের সমস্ত ব্যবহার উত্তমরূপে জানতেন। কমলাকান্ত এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন বিশ্বাসী ভৃত্য ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের সহকারী রূপে তাঁর সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। এক সময় মহাপ্রভুর অন্য এক অনুগতজন শ্রীপরমানন্দ পুরী নবদ্বীপ থেকে শ্রীজগন্নাথ পুরীতে আসার সময় তাঁর সঙ্গে শ্রীকমলাকান্ত বিশ্বাসকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা উভয়েই জগন্নাথ পুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করেছিলেন। নীলাচল ধাম শ্রীক্ষেত্র পুরীতে অবস্থানকালে কমলাকান্ত বিশ্বাস কোনও এক ব্যক্তির মাধ্যমে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন—

নীলাচলে তেঁহো এক পত্রিকা লিখিয়া।
প্রতাপরুদ্রের পাশ দিল পাঠাইয়া।। —(চৈ. চ. আ. ১২/২৯)

তবে সেই পত্র বিষয়ে আচার্য মহাশয় কিছু জানতেন না; কিন্তু কোন না

কোনভাবে সেই পত্রটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হস্তগত হয়েছিল। সেই পত্রটিতে লেখা ছিল—

সে পত্রীতে লেখা আছে—এই ত' লিখন।
ঈশ্বরত্বে আচার্যেরে করিয়াছে স্থাপন।। —(ঐ ১২/৩০)

"সেই পত্রটিতে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যকে পরম পুরুষ ভগবানের এক অবতার বলে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।" কিন্তু তাতে এটাও উল্লেখ ছিল যে—

কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।
ঋণ শোধিবারে চাহি মুদ্রা শত-তিন।। —(ঐ ১২/৩২)

"শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের কিছুদিন আগে ঘটনাক্রমে তিনশ' টাকা ঋণ হয়ে গেছে, যা কমলাকান্ত বিশ্বাস সেই টাকাটা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে চান্।"

পত্রটি পাঠ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্তরে ব্যথিত হয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মুখ চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল দেখা যাচ্ছিল। তাই বাইরে হেসে তিনি বললেন—

আচার্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।
ইথে দোষ নাহি, আচার্য—দৈবত ঈশ্বর।। —(ঐ ১২/৩৪)

"সে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যকে পরম পুরুষ ভগবানের অবতার রূপে প্রতিপন্ন করেছে। তাতে অবশ্য কোন দোষ নেই, কেননা প্রকৃতই শ্রীঅদ্বৈত আচার্য স্বয়ং ভগবানের অবতার।" কিন্তু সে ভগবানের অবতারকে এক সাধারণ মানব মনে করে তাঁর ঋণ পরিশোধ করার জন্য যে যোজনা করেছে, তার জন্যে আমি তাকে দণ্ডবিধান করবো।

ঈশ্বরের দৈন্য করি' করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি' করাইব শিক্ষা।। —(ঐ ১২/৩৫)

"কিন্তু যেহেতু সে ভগবানের অবতারকে এক দারিদ্র্য প্রপীড়িত ভিক্ষুকে পরিণত করেছে। তাই আমি তার ভুল সংশোধন করার জন্য তাকে দণ্ড বিধান করবো।"

শ্রীমন্ মহাপ্রভু এখানে শিক্ষার মাধ্যমে সচেতন করে দিচ্ছেন যে, কোন মানুষকে ভগবানের অবতার বলে বা নারায়ণের অবতার বলে বর্ণনা করে,

আবার একই সময়ে তাঁকে যদি অভাবে পীড়িত এবং দারিদ্রগ্রস্ত বলে স্থাপন করা হয়, তাহলে তা পরস্পর বিরোধী এবং সেটা হবে সবচাইতে বড় অপরাধ। বৈদিক সংস্কৃতি ধ্বংস করার জন্য প্রচার কার্যে যুক্ত মায়াবাদীরা প্রচার করে যে, সকলেই ভগবান, এবং দারিদ্রগ্রস্ত মানুষদের তারা 'দরিদ্র নারায়ণ' বলে বর্ণনা করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও এই ধরনের ভ্রান্ত ও অর্থহীন ধারণা বরদাস্ত করেন নি। তিনি কঠোর ভাষায় বলেছেন, ''মায়াবাদীর ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ'' অর্থাৎ মায়াবাদী দর্শনের নীতি অনুসরণকারী ব্যক্তির নিশ্চিতভাবে সর্বনাশ হবে। তাই এই ধরণের মূর্খদের দণ্ডদান করে শিক্ষা দিতে হয়।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে 'বলী বামন' চরিতে দেখতে পাওয়া যায় যে, পরমপুরুষ ভগবান অথবা তাঁর অবতার দারিদ্র প্রপীড়িত বলে বর্ণনা করটা সম্পূর্ণ অসঙ্গত হলেও ভগবান্ বামন অবতারে মহারাজ বলির কাছ থেকে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সকলেই জানে যে; বামনদেব দারিদ্র প্রপীড়িত ছিলেন না। বলি মহারাজের কাছ থেকে তাঁর এই ভিক্ষা-লীলা তাঁকে করুণা করারই একটি উপায় মাত্র। বলি মহারাজ যখন সেই ভূমি তাঁকে দান করেন, তখন তিনি দু'টি পদক্ষেপের দ্বারা ত্রিভুবন অধিকার করে তাঁর সর্বশক্তিমত্তা প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু বাহ্যতঃ এটি দণ্ড বলে প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে মহারাজ বলির প্রতি ভগবানের এক অপার কৃপা প্রদর্শন মাত্র। যা'র ফলে বলি মহারাজ সর্বস্ব দান করে আত্ম নিবেদনের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তিনি দ্বাদশ মহাজনের মধ্যে অন্যতম বলে পরিগৃহীত হয়েছেন। পরিশেষে সেই বলি মহারাজ সুতলে একাঙ্গ চক্রবর্তী হয়েছেন এবং ভগবান্ তাঁর দ্বারদেশে প্রহরী রূপে অবস্থান করে তাঁকে সুরক্ষা প্রদান করছেন। এ ভাবে ভগবানের দণ্ডটা তাঁর ক্ষেত্রে আশীর্বাদে পরিণত হয়েছে।

তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু আচার্য সম্বন্ধে এইসব কথা শুনে গোবিন্দকে আদেশ দিয়েছিলেন, ''আজ থেকে বাউলিয়া কমলাকান্ত বিশ্বাসকে এখানে আসতে দেবে না।'' কারণ সে (কমলাকান্ত বিশ্বাস) ভগবানের এই গূঢ় লীলা যথাযথভাবে (তত্ত্বগতভাবে) অবগত না হয়ে আপাতঃ দৃষ্টিতে সব কিছুরই বিচার করেছে। যেহেতু সে সহজিয়া হয়ে সহজ ঢঙ্গে সব কথা গ্রহণ করেছে, তাই মহাপ্রভু তাকে (কমলাকান্ত বিশ্বাসকে) বাউলিয়া বলে দর্শনের বাধা সৃষ্টি

করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই দণ্ডবিধানের কথা শুনে আচার্য অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

দণ্ড শুনি 'বিশ্বাস' হইল পরম দুঃখিত।
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য হর্ষিত।। —(ঐ ১২/৩৭)

অর্থাৎ—''শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই দণ্ডবিধানের কথা শুনে কমলাকান্ত বিশ্বাস অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত আচার্য তা শুনে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন।''

তবে এই 'দণ্ড-বিধান'-এর কথাটি বিচার করলে আমরা শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতায় স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের স্বমুখ নিঃসৃত বাণী থেকে জানতে পারি যে, ''সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।'' অর্থাৎ ''আমি সকলের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন, আমি কারও প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন অথবা কারও প্রতি প্রীতি পরায়ণ নই।''—(গী. ৯/২৯)। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান সকলের প্রতি সমভাবান্ন, তাই কেউই তাঁর শত্রু নয় অথবা কেউই তাঁর মিত্র নয় এবং যেহেতু তিনি সর্বজীবের বীজ প্রদানকারী পিতা, তাই সকলেই তাঁর সন্তান। তাই পরমপিতা হিসাবে তিনি কখনও কাউকে শত্রু অথবা মিত্র বলে ভাবেন না। কিন্তু কমলাকান্ত বিশ্বাস শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে ভগবানের অবতার বলে ব্যক্ত করার পর তাঁর আবার তিনশ' টাকা ঋণ হয়েছে এই প্রাকৃত বিচারধারা যোগ করার ফলে তার যে অপরাধ হয়েছিল, তা'র জন্য শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন কমলাকান্ত বিশ্বাসকে তাঁর কাছে আসার অনুমতি না দিয়ে দণ্ডবিধান করেছিলেন, তখন যদিও তা ছিল অত্যন্ত কঠোর দণ্ড, তথাপি শ্রীঅদ্বৈত আচার্য এই দণ্ডের গূঢ় তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। কেননা, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকৃতপক্ষে কমলাকান্ত বিশ্বাসকে কৃপা করেছেন। তাই তিনি আদৌ দুঃখিত হন নি। কিন্তু কমলাকান্ত বিশ্বাসকে দুঃখিত হতে দেখে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য তাকে বললেন—

বিশ্বাসেরে কহে,—তুমি বড় ভাগ্যবান্।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্।। —(ঐ. ১২/৩৮)

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু তাকে বললেন, ''পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা দণ্ডিত হওয়ায় তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান্।''

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর এটি একটি যথার্থ বিচার। তিনি স্পষ্টভাবে উপদেশ দিলেন যে, পরমপুরুষ ভগবানের আদেশ ক্রমে কারোর যদি কখনও কোন বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতেও হয়, সেজন্য তার দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। ভক্তদের সর্বদা তাদের প্রভু পরম পুরুষ ভগবানের সব রকম ব্যবহারে সুখী হওয়া উচিত। একজন ভক্ত বিপদে পড়ুক বা ঐশ্বর্য ভোগ করুক পরম পুরুষ ভগবানের প্রদত্ত সৌভাগ্য সর্বদা তার সাদরে গ্রহণ করা উচিত, যা তার বিচারানুসারে আনন্দদায়ক হোক অথবা দুঃখদায়ক হোক্। এইভাবে কমলাকান্ত বিশ্বাসকে প্রবোধন দিয়ে শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্য মহাশয় তাঁর নিজের জীবনের একটি অনুভূতি সম্বন্ধে তাকে বললেন—

পূর্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই' মনে আমি কৈলুঁ অনুমান।। —(ঐ ১২/৩৯)

অর্থাৎ—"পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাকে সর্বদা গুরুজনরূপে সম্মান করতেন, কারণ শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের গুরুভ্রাতা শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী মহাশয় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর গুরু ছিলেন।" তাই গুরুদেবের গুরুভ্রাতা হিসাবে মহাপ্রভু আচার্যকে গুরু জ্ঞান করতেন, আর সেইরূপ সম্মানও করতেন। কিন্তু আচার্যের সে সম্মান ভাল লাগত না। তাই তিনি অন্তরে দুঃখিত হয়ে একটি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

মুক্তি—শ্রেষ্ঠ করি' কৈনু বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান।। —(ঐ ১২/৪০)

অর্থাৎ—আচার্য বললেন, " আমি যোগ বাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা করেছিলাম, যাতে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, মুক্তি হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য। সেজন্য মহাপ্রভু আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে অপমান করেছিলেন।"

তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মহাপ্রভুর কাছ থেকে সম্মান লাভের পরিবর্তে তাড়না বা ভর্ৎসনা লাভই উপযুক্ত কার্য বলে মনে করে মায়াবাদীদের খুব পছন্দযোগ্য 'যোগ-বাশিষ্ঠ' নামক একটি গ্রন্থ রয়েছে, যাতে পরমপুরুষ ভগবান সম্বন্ধে নানারকম নির্বিশেষ ভ্রান্ত ধারণায় পূর্ণ। সেই গ্রন্থ বিষ্ণু-ভক্তির বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের গ্রন্থ বৈষ্ণবদের কখনও পাঠ করা উচিত নয়। কিন্তু অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা তিরস্কৃত হওয়ার বাসনায় যোগ-

বাশিষ্ঠ গ্রন্থের নির্বিশেষ মতগুলি সমর্থন করতে শুরু করেছিলেন। তার ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং আপাত দৃষ্টিতে তাঁর প্রতি অপমানজনক ব্যবহার করেছিলেন। তাই এই দণ্ড পাওয়াতেই অদ্বৈতাচার্য মহাশয় ' কৃপা পেয়েছি ' বলে আনন্দে নাচতে লাগলেন। তারপর তিনি কমলাকান্ত বিশ্বাসকে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অন্য একটি দণ্ড বিধান লীলা সম্বন্ধে বর্ণনা করে বললেন—

দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্ শ্রীমুকুন্দ।। —(ঐ ১২/৪১)

"শ্রীমুকুন্দ অনেক সৌভাগ্যের ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে যে দণ্ড পেয়েছিল, আমি সেই দণ্ড লাভ করে পরম আনন্দিত হয়েছিলাম।"

এইভাবে মুকুন্দের কথা উল্লেখ করে শ্রীল অদ্বৈতাচার্য মহাশয় কমলাকান্ত বিশ্বাসকে বললেন—শ্রীমুকুন্দ ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পার্ষদ। তিনি এমন অনেক জায়গায় যেতেন, যেখানকার মানুষেরা ছিল বৈষ্ণব বিরোধী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সেকথা জানতে পারলেন, তিনি তখন মুকুন্দকে তাঁর কাছে আসতে নিষেধ করে দণ্ড বিধান করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও ছিলেন কুসুমের মতো কোমল, কিন্তু তিনি ছিলেন বজ্রের মতো কঠোর, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে মুকুন্দকে আসতে দিতে সকলেই ভয় পাচ্ছিলেন। তাই অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে মুকুন্দ একদিন তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোনদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে তাঁর কাছে আসতে দেবেন কি না?" সেই ভক্তটি যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এসে সেকথা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, "লক্ষাধিক বছর পর মুকুন্দ আমার কাছে আসার অনুমতি পাবে।" সেই সংবাদ যখন মুকুন্দকে দেওয়া হ'ল, তখন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নাচতে শুরু করলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শুনলেন যে, এরকম ধৈর্য সহকারে লক্ষ লক্ষ বছর পর তাঁর দর্শন লাভের জন্য অপেক্ষা করছে, তিনি তখন পুনরায় তাকে ফিরে আসতে বললেন। মুকুন্দের এই দণ্ডের কথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডে দশম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এই যে দণ্ড বিধানের মাধ্যমে কৃপাপ্রদর্শন তার গূঢ় তাৎপর্য সাধারণ লোকের পক্ষে বোঝা বড় কষ্টকর ব্যাপার। যেহেতু তিনি আচার্য

লীলা করছিলেন, তাই তিনি স্ব-আচরণের মাধ্যমে জীবজগতকে শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। এমনকি তাঁর মাতা শ্রী শচীদেবীও বাদ পড়েন নি।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর-কৃত শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মধ্যলীলা দ্বাবিংশ অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে যে, এক সময় মাতা শচীদেবীর এক অনুরূপ দণ্ড মিলেছিল। তিনি (মাতা শচীদেবী) তাঁর স্ত্রীসুলভ প্রকৃতির বশবর্তী হয়ে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে দোষ দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর পুত্রকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। সেই দোষারোপটিকে একটি অপরাধ বলে মনে করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শচীমাতাকে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর চরণে প্রণতি নিবেদন করে সেই অপরাধ থেকে মুক্ত হতে বলেছিলেন।

এইভাবে নানা প্রকারে কমলাকান্ত বিশ্বাসকে প্রবোধন দিয়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে বললেন, "প্রভু! আমি তোমার অপ্রাকৃত লীলা বুঝতে পাচ্ছি না। তুমি কমলাকান্তকে আমার থেকেও বেশী কৃপা করেছ।"

আমারেহ কভু যেই না হয় প্রসাদ।
তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ।। —(ঐ ১২/৪৫)

"তুমি কমলাকান্তকে যে কৃপা দেখিয়েছ, আমাকে তুমি তা কখনও দেখাও নি। আমি তোমার শ্রীচরণে কি অপরাধ করেছি, প্রভু! যে জন্য তুমি আমাকে ঐভাবে কৃপা করলে না?"

পূর্বে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু যখন 'যোগ-বাশিষ্ঠ' পড়ছিলেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে প্রহার করেছিলেন ; কিন্তু তিনি কখনও তাঁকে তাঁর কাছে আসতে নিষেধ করেন নি। কিন্তু কমলাকান্তকে দণ্ড দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বলেছিলেন যে, কখনও যেন তাঁর কাছে না আসেন। তাই শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলেছিলেন যে, তিনি কমলাকান্ত বিশ্বাসকে তাঁর থেকেও বেশী কৃপা করেছেন, কেননা তিনি কমলাকান্তকে তাঁর কাছে আসতে নিষেধ করেছেন। যদিও অদ্বৈত আচার্য প্রভুর বেলায় তিনি তা বলেন নি। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কমলাকান্ত বিশ্বাসকে অদ্বৈত আচার্যের থেকেও বেশী কৃপা করেছেন বলে মনে হয়েছে। সে কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রসন্ন হয়ে হাসতে

লাগলেন এবং তৎক্ষণাৎ কমলাকান্ত বিশ্বাসকে নিয়ে আসতে বললেন। তা দেখে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, " তুমি কেন এই মানুষটিকে ডেকে তোমার দর্শন দান করলে? সে আমাকে দুই ভাবে প্রতারণা করেছে।" সে কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, এবং তাঁরা দু'জনে পরস্পরের অন্তরের ভাব বুঝলেন।

তারপর মহাপ্রভু কমলাকান্তকে উপদেশ প্রদান করে বললেন, "তুমি একটি তত্ত্বজ্ঞানরহিত বাউলিয়া। কোন্ কথা কি তা তোমার ঠিক্‌ভাবে জানা নেই। তুমি কেন এইভাবে আচরণ করো? তুমি কেন শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের গোপন ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করে, তাঁর ধর্ম আচরণে বিঘ্ন সৃষ্টি করো?"

শ্রীমন্ মহাপ্রভু কমলাকান্ত বিশ্বাসকে বাউলিয়া বলার অর্থ তার নিজের অজ্ঞানতা দোষের জন্য কমলাকান্ত বিশ্বাস উড়িষ্যার রাজা মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কাছে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর তিনশ' টাকা ঋণ পরিশোধ করে দিতে অনুরোধ করেছিলেন, অথচ সেই সঙ্গে সে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যকে পরমপুরুষ ভগবানের অবতার বলে প্রতিপন্ন করেছে। এটি পরস্পর বিরোধী। পরমপুরুষ ভগবানের অবতার এই জড় জগতে কারও কাছে ঋণী হতে পারেন না। এই ধরনের ভ্রান্ত মতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও সন্তুষ্ট হন না। একে বলা হয় 'রসাভাস'। অর্থাৎ একটি রসের সঙ্গে অন্য একটি রসের মিশ্রণ। এইভাবে কমলাকান্ত বিশ্বাসকে বুঝিয়ে তার অপরাধ ক্ষালন করে মহাপ্রভু তাকে বিদায় দিলেন।

এমনই অনেক ঘটনা আছে যেখানে ভগবান্ অথবা তাঁর পার্ষদ অথবা শুদ্ধভক্তেরা (বৈষ্ণবেরা)ও অনুরূপ দণ্ডপ্রদান লীলা প্রকাশ করে জীবদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেছেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতেও দেখতে পাওয়া যায় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর শচীমাতার নির্দেশানুসারে জগন্নাথ পুরীতে অবস্থান কালে প্রতি বছর রথযাত্রা উৎসবের সময় গৌড় দেশের ভক্তরা রথযাত্রায় অংশগ্রহণের জন্য এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য জগন্নাথ পুরীতে আসতেন। এক সময় এরকম একটি যাত্রী দলের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন অবধূত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু। সেই দলের সমস্ত যাত্রীর সমস্ত সুবিধা-অসুবিধা বোঝার দায়িত্ব শিবানন্দ সেনের উপর ন্যস্ত ছিল। দৈবক্রমে যাত্রাপথে কোনও

একটি স্থানে নদী পার হওয়ার সময় ঘাটের পাওনা পরিশোধ করতে শিবানন্দ সেনের একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। এদিকে অবধূত নিত্যানন্দ প্রভু সহযাত্রীদের সঙ্গে আগে এসে থাকার জন্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থাদিতে অসন্তুষ্ট হয়ে ক্রোধ প্রকাশ করে বললেন—"সেই শিবানন্দ কোথায় গেছে ? যেহেতু সে বাসস্থান, খাদ্য, পানীয় আদির কিছু ব্যবস্থা করেনি, তাই তার পুত্র মরুক্।" একথা শিবানন্দের পত্নী শুনতে পেলেন, সহজে তো স্ত্রীজাতি উপরোক্ত পুত্র মরার কথা অবধূতের মুখে শুনে সহ্য করবেন বা কেমন করে। একটু আড়ালে থেকে তিনি কাঁদতে লাগলেন। যখন শিবানন্দ সেন সেখানে এসে পৌঁছিলেন এবং সমস্ত ঘটনা শুনলেন তখন তিনি পত্নীকে ভৎর্সনা করে বললেন, তুই মূর্খটা না কিরে? আজ বড় সৌভাগ্যের কথা যে অবধূত আমাদের প্রতি কৃপা করেছেন। তারপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। তখন নিত্যানন্দ প্রভু অত্যন্ত ক্রোধিত হয়ে সজোরে তাঁর পেটে একটি লাথি মারলেন। লাথি খেয়ে শিবানন্দ মহানন্দে ভাবগদ্গদ চিত্তে সেখানে নৃত্য করতে লাগলেন। যদিও আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি ভিন্ন প্রকার মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিবানন্দের প্রতি অবধূতের অপার প্রেম ভাব ছিল। তাঁকে অধিক কৃপা করার জন্য এটি ছিল তাঁর প্রতি একটি অদ্ভুতলীলা। এটি সাধারণ জীব সহজে বুঝতে পারবে না।

অনুরূপ একটি ঘটনা দ্বাপর যুগে ভগবান্ কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা প্রদর্শন কালে ঘটেছিল। সেখানে কুবেরের দুই পুত্র নলকুবের ও মণিগ্রীব কিভাবে ভগবৎ পার্ষদ নারদের দ্বারা শাপগ্রস্ত হয়ে ভগবান্ কৃষ্ণের দ্বারা শাপমুক্ত হয়েছিলেন তার বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে। দ্বাপর যুগে ভগবান কৃষ্ণ যখন একটি ছোট শিশুরূপে নন্দ মহারাজের প্রাঙ্গনে নানা প্রকার ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত ছিলেন, তখন তাঁর স্বাভাবিক দুষ্টামির জন্য তিনি মাতা যশোদাকে দধি মন্থন করতে দিতেন না। তাই মাতা চিন্তা করলেন তাঁকে একটি উদুখলে বেঁধে রেখে নির্বিঘ্নে তাঁর কার্য সম্পাদন করবেন। এইভাবে উদুখলে বাঁধা হওয়ার পর শিশুকৃষ্ণ অন্য একটি অলৌকিক্ অদ্ভুতলীলা প্রদর্শন করতে ইচ্ছা করলেন।

দেবর্ষি নারদ ভগবান্ কৃষ্ণের একজন অতিপ্রিয় ভক্ত। একবার তিনি পরিব্রাজন করে আকাশ মার্গে যাওয়ার সময় দেখতে পেলেন যে, কুবেরের দুই পুত্র নলকুবের ও মণিগ্রীব নিঃশঙ্কোচ-চিত্তে মদ খেয়ে গঙ্গানদীতে সুন্দরী

স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মৈথুন ক্রীড়াতে রত। তারা এমনই মাতাল হয়ে গিয়েছিল যে নারদ মুনির উপস্থিতিতেও তারা নির্লজ্জ ভাবে জলক্রীড়া করছিল। কিন্তু সেই যুবতী স্ত্রীলোকেরা দেবর্ষি নারদকে দেখে লজ্জিত হয়ে বস্ত্রের দ্বারা তাদের দেহ আবৃত করল। কিন্তু কুবেরের দুই পুত্র উলঙ্গ অবস্থায় সেখানে অবস্থান করছিল। তাদের এই প্রকার অধোপতিত অবস্থা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য তিনি অভিশাপ দিয়ে তাদেরকে অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি বললেন, তোমরা দুইভাই দু'টি অর্জুন বৃক্ষ হয়ে থাকবে। কিন্তু তারা যখন তাদের ভুল বুঝতে পেরে নারদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা দু'টি সাধারণ অর্জুন বৃক্ষ না হয়ে বৃন্দাবনে নন্দ মহারাজের প্রাঙ্গণে অর্জুন বৃক্ষরূপে জন্মলাভ করার সুযোগ লাভ করবে। যখন ভগবান্ কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে সেখানে লীলা খেলা করবেন তখন তাঁর দর্শন ও স্পর্শ লাভ করে তোমরা শাপ মুক্ত হবে। পরবর্তী অবস্থায় মাতার দ্বারা উদুখলে বন্ধনপ্রাপ্ত ভগবান্ কৃষ্ণ যখন প্রাঙ্গণে এসে দু'টি যামলার্জুন বৃক্ষ দেখতে পেলেন, তখন তিনি নারদের কথা সত্যরূপে প্রতিপাদন করার জন্য দুই বৃক্ষের ফাঁকের মধ্য দিয়ে গলে গেলেন, কিন্তু উদুখলটি তা'র মধ্যে গলতে না পেরে বৃক্ষ দু'টির মধ্যে আটকে গেল। শিশু কৃষ্ণ উদুখলটিকে বলপূর্বক টানার ফলে বৃক্ষ দু'টি আজগবি হঠাৎ ভয়ঙ্কর শব্দ করে উপড়ে পড়ল এবং তারপর বৃক্ষ দু'টির মধ্য থেকে দু'জন উজ্জ্বল, দীপ্তিমন্ত পুরুষ বার হয়ে এসে শিশু কৃষ্ণকে প্রণাম পূর্বক প্রদক্ষিণ করে সেখান থেকে বিদায় নিলেন। এটি বর্ণনা করার তাৎপর্য হলো এই যে, কুবেরের দুই পুত্র কোটি কোটি বছর ধরে তপস্যা করলেও ভগবানের দর্শন বা স্পর্শ লাভের সুযোগ পেতেন না। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত দেবর্ষি নারদের দ্বারা শাপগ্রস্ত হয়ে তারা এত বড় গৌরবের অধিকারী হতে পারল। তাই আপাতদৃষ্টিতে দণ্ড বলে প্রতীয়মান হলেও সাধুর অভিশাপ পরিণামে আশীর্বাদই হয়ে থাকে।

এমনই অনেক প্রমাণ রয়েছে যে, ভগবান্ অথবা ভগবদ্ভক্তের দণ্ড কিংবা অভিশাপ পরবর্তী সময়ে মহান্ আশীর্বাদ রূপে পরিণত হয়েছে। ভগবান কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলায় "কালীয় দমন" লীলাও হচ্ছে অনুরূপ। ভগবান্ কৃষ্ণ বালক অবস্থায় গোপ বালকদের সঙ্গে যমুনা-কূলে বিবিধ লীলা করার সময় দেখতে পেলেন যে, যমুনার হ্রদের মধ্যে একটি বিরাট বিষধর কালীয় সর্প বাস করছে।

তার উৎকট্‌বিষে যমুনার জল বিষাক্ত হয়ে গেছে এবং তার সেই বিষাক্ত বাষ্পের প্রভাবে নদীকূলে অবস্থিত বৃক্ষলতা ও ঘাস সব শুষ্ক হয়ে গেছে। এমনকি সেই বিষাক্ত নদীর জলের ওপর দিয়ে যদি কোন পাখি উড়ে যেত তখন সেও সেই বিষের জ্বালায় দগ্ধীভূত হয়ে জলেতে পড়ে মরে যেতো। তাই সেই হ্রদ ও যমুনার জল বিষমুক্ত করার জন্য প্রতিজ্ঞা করে ভগবান কৃষ্ণ সেই বিষাক্ত হ্রদের মধ্যে লাফ দিয়ে পড়লেন। দীর্ঘ দুইঘন্টা ধরে সেই সর্পের সঙ্গে যুদ্ধ করার পর ভগবান্ কৃষ্ণ তার ফণার ওপর চড়ে গিয়ে তার মাথার ওপর সজোরে পদাঘাত করতে লাগলেন। ভগবানের পাদপদ্মের আঘাতে কালীয় নাগ বিষোদ্গারের পরিবর্তে রক্তোদ্গার করে অবশ হয়ে পড়ল। তখন সেখানে উপস্থিত কালীয় নাগের পত্নীরা (নাগপত্নীরা) ভগবানের এতাদৃশ অলৌকিক লীলা সৌন্দর্শন করে প্রার্থনা করতে লাগলেন, "হে পরম প্রিয় প্রভু! আপনি সকলের প্রতি সমান। আপনার কাছে পুত্র, বন্ধু কিংবা রিপুর কোন ভেদ নেই। সেইজন্য আমাদের পতির প্রতি আপনি যে দণ্ডবিধান করেছেন তা হচ্ছে উপযুক্ত। হে প্রভু! আপনি বিশেষতঃ এ পৃথিবীতে দুরাত্মাদেরকে বিনাশ করার জন্য অবতার গ্রহণ করেছেন এবং আবার যেহেতু আপনি হচ্ছেন পরম সত্য, তাই আপনার দয়া ও দণ্ডের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই আমরা ভাবছি, আমাদের প্রতি আপনি যে দণ্ড বিধান করলেন, তা হচ্ছে বাস্তবিকপক্ষে আপনার অনুগ্রহ। তাঁরা বললেন—

> অনুগ্রহোঽয়ং ভবতঃ কৃতো হি নো
> দণ্ডোঽসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ।
> যদ্ দন্দশূকত্বমমুষ্য দেহিনঃ
> ক্রোধোঽপি তেঽনুগ্রহ এব সম্মতঃ।।
>
> —(ভা. ১০/১৬/৩৪)

অর্থাৎ — "নাগপত্নীরা বললেন, যেহেতু আপনার দণ্ড নিশ্চিতভাবে পাপীদের পাপ নাশ করে থাকে, সেইহেতু আপনি দণ্ডরূপে আমাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন। বিশেষতঃ আমাদের এই স্বামী পাপের ফলস্বরূপ সর্পত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই পাপ নাশ করার জন্য আপনার ক্রোধকে আমরা অনুগ্রহ বলে মনে করি।"

এটি অতি স্পষ্ট যে সর্প শরীরধারী এই যে জীব এখানে আবির্ভূত হয়েছে,

সে নিশ্চয় নানা প্রকার পাপ দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল, নচেৎ সে সর্পশরীর কেন পেয়েছে ? ভগবান্ তার ফণার ওপর নৃত্য করার ফলে যে পাপের জন্য সে এই সর্প শরীর প্রাপ্ত হয়েছিল, সে-সমস্ত পাপকর্মের প্রতিক্রিয়া নষ্ট হয়ে গেল। তাই এটি অত্যন্ত শুভকর যে, ভগবান কৃষ্ণ তার ওপর ক্রোধ প্রকাশ করে তার প্রতি এই প্রকার দণ্ড বিধান করেছিলেন। নাগপত্নীরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি এই সর্পের প্রতি কেমন করে এত অনুকম্পা প্রকাশ করলেন? এ থেকে এটি পরিষ্কারভাবে প্রতিত হচ্ছে যে পূর্ব জন্মে সে নিশ্চয় নানাপ্রকার পুন্যকর্ম তথা ব্রত বিধি পালন ও তপস্যার বলে প্রত্যেককে সন্তুষ্ট করেছিল এবং জীবের হিতার্থে নিশ্চয় কিছু মঙ্গলজনক কার্য করেছিল।"

তাঁরা আবার ভগবান্‌কে প্রার্থনা করে বললেন, "হে প্রিয় ভগবান্! আমরা এটি দেখে আশ্চর্য হয়েছি যে, সেই কালীয় এরূপ ভাগ্যবান্ যে, আপনার পাদপদ্মের ধূলি তার মস্তকে ধারণ করতে পারলো। এই ধূলি লাভের জন্য সাধু-সন্ত-মহাত্মারা এইপ্রকার ভাগ্যের প্রত্যাশা করে থাকেন। এমনকি লক্ষ্মী দেবী আপনার পাদপদ্মের ধূলি লাভ করার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। হে ভগবান্! যদিও এই সর্পরাজ কালীয় ক্রোধানুগামী এক হীন ভৌতিক প্রকৃতির জন্য সর্পযোনিতে জন্মলাভ করেছে, তথাপি সে এক অত্যন্ত দুর্লভ ফল প্রাপ্ত হ'ল। যে সমস্ত জীব এই ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন প্রকার জীবযোনি লাভ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা কেবল আপনার কৃপাবশতঃ অতি সহজে সর্বোচ্চ আশীর্বাদ লাভ করতে পারবে।

তাই উপসংহারে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, যে ব্যক্তি বর্তমান অবস্থায় সমস্ত প্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগকে পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ সহ্য করে এবং এজন্য ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলে যে আমার বিরাট দণ্ড ভোগ করার ছিল, কিন্তু ভগবান্ কৃপা করে আমাকে সামান্য কিছু শারীরিক ক্লেশ জনিত যন্ত্রণা প্রদান করে আমার দণ্ডটা লাঘব করে দিয়েছেন। তাই সে ভগবানের কাছে নিজের ভক্তিপূত প্রণাম অর্পণ করে। এইপ্রকার একটি ঘটনা শ্রীমন্ মহাপ্রভু জগন্নাথ পুরীতে সন্ন্যাস লীলা প্রদর্শন কালে শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভাগ্যে ঘটেছিল। দীর্ঘ সাতদিন বেদান্ত আলোচনার পর মহাপ্রভুর কাছ থেকে বেদের প্রকৃত তত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করে ভট্টাচার্য মহাশয় নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন এবং কায়-মন-বাক্যে সর্বতোভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর

পদারবিন্দে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। তিনি ব্রহ্মবাদীর নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন অথবা মুক্তিলাভের ধারাকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে মহাপ্রভুর প্রদর্শিত ভক্তিমার্গ সগৌরবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভক্তি মার্গের প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে, শ্রীমদ্ ভাগবতের (১০/১৪/৮) শ্লোকে "মুক্তিপদে স দায়ভাক্"-কে "ভক্তিপদে স দায়ভাক্" বলে ভাববিহ্বল চিত্তে মহাপ্রভুর সম্মুখে গান করেছিলেন, কারণ তিনি মুক্তি শব্দটিকে উচ্চারণ করতে ইচ্ছাও করেন নি। শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধে ব্রহ্মার স্তব থেকে উদ্ধৃত উক্ত শ্লোকটি পাঠ করে তিনি বললেন—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্ বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।।

—(ভা. ১০/১৪/৮)

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি আপনার করুণা ভিক্ষা করেন এবং নিজের পূর্বজন্মকৃত কর্মের জন্য সমস্ত প্রকার দুঃখ বিপদ সহ্য করেন, এবং কায়-মন-বাক্যে সর্বদা আপনার ভক্তিযাজনে নিযুক্ত থাকেন এবং আপনাকে সর্বদা প্রণাম করে থাকেন, তিনি আপনার শুদ্ধভক্ত হওয়ার জন্য নিশ্চিতভাবে একজন প্রামাণিক পাত্র।"

শ্রীমদ্ ভাগবতের এই শ্লোকটি পাঠ করার সময় সার্বভৌম ভট্টাচার্য মূল পাঠে 'মুক্তিপদে' শব্দটি বদলিয়ে 'ভক্তিপদে' করে দিয়েছিলেন। মুক্তির অর্থ মোক্ষ এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হওয়া। ভক্তির অর্থ পরম পুরুষ ভগবানের দিব্য সেবা করা। শুদ্ধভক্তি জাগ্রত হওয়ায় ভট্টাচার্য মহাশয়কে 'মুক্তিপদে' শব্দটি ভালো লাগেনি, যা ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্ম রূপকে বুঝায়। তবে জড় বিদ্যার আধিক্যের কারণে আত্মগরিমা প্রদর্শনকারী সার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন নিজের গর্ব, দম্ভ, অস্মিতাভাব পরিত্যাগ করে জগদ্গুরু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কাছ থেকে তত্ত্ব শ্রবণের মাধ্যমে কৃপাশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে ভক্তি পথেতে এসেছিলেন।

তাই সুধী পাঠকবৃন্দ ভগবানের আপাত প্রতীয়মান দণ্ডকে আগ্রহের সঙ্গে বরণ করে তাঁর পরম কল্যাণময় আশীর্বাদ লাভ করে দুর্লভ মানব জন্ম সার্থক করুন।

(হরিবোল)

শ্রীমতী রাধারাণী কে ?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদিশক্তি শ্রীমতী রাধারাণী। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কিছু পার্থক্য নেই, তাঁরা এক। কেবলমাত্র লীলারস আস্বাদন করার জন্য দুই দেহ ধারণ করেছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে আনন্দ প্রদান করার জন্য নিজের বাম অংশ থেকে শ্রীরাধাকে জাত করালেন। শ্রীমতী রাধারাণী আদিশক্তিরূপে জগতে খ্যাত হয়ে তাঁর নিজের চিৎশক্তির বলে অসংখ্য গোপী ও লক্ষ্মীদেরকে কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তবে সাধারণ লোকেরা এ তত্ত্ব না জেনে শ্রীমতী রাধারাণীকে একজন সাধারণ নারী বলে জ্ঞান করেন। কারণ কামে বশবর্তী হয়ে তারা এ জগতে সমস্ত বস্তুকে কামময় দৃষ্টিতে দর্শন করেন। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধারাণীর সমস্ত লীলা হচ্ছে প্রেমময়। এ জগতে প্রেমের লেশমাত্র গন্ধ নেই। এটি কামময় জগত। কাম ও প্রেমের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা—তারে বলি, 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম।।

—(চৈ. চ. আ. ৪/১৬৫)

"নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনাকে বলা হয় কাম, আর শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের প্রীতিসাধনের ইচ্ছাকে বলা হয় প্রেম।" শ্রীমতী রাধারাণীর অন্য একটি নাম 'ক্যাচিৎ', অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণকে অখণ্ড সুখ প্রদান করেন। "সর্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।" দেহ ধর্ম, বেদধর্ম, লোকধর্ম সব ত্যাগ করে কৃষ্ণের সেবা করেছিলেন। তবে এ তত্ত্ব সম্বন্ধে সকলে অবগত নন।

কখন কখন কেউ যুক্তি করেন শ্রীমতী রাধারাণীর নাম শ্রীমদ্-ভাগবতে নেই। কিন্তু এটি জানা উচিত শ্রীমতী রাধারাণীর নাম ও মহিমা শ্রীমদ্ ভাগবত ছাড়া শ্রীব্যাসদেবের রচিত বহু প্রামাণিক শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। শ্রীবৃহৎ-ভাগবতামৃতে শ্রীপরীক্ষিত মহারাজের উক্তি—

গোপীনাং বিততাদ্ভুতস্ফুটতর-প্রেমানলার্চিশ্ছটাদগ্ধানাং
কিল নামকীর্তনকৃতাত্তাসাং বিশেষাৎ স্মৃতেঃ।
তত্তীক্ষ্নজ্বলনোচ্ছিখাগ্রকণিকাস্পর্শেন সদ্যো মহা-
বৈকল্যং স ভজন্ কদাপি ন মুখে নামানি কর্ত্তুং প্রভুঃ।।
—(বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ - ১/৭/১৩৪)

অর্থাৎ—মহারাজ পরীক্ষিত নিজ জননী উত্তরাকে বললেন, "হে মাতা! আমার গুরুদেব শুকমুনি ভাগবত কথা কীর্তন করার সময় গোপীদের কারোর নাম উচ্চারণ করতে সমর্থ হননি। তা'র কারণ গোপীদের নাম উচ্চারণ করলে তাঁর বিশেষ স্মৃতিতে চিত্ত অতি বিস্মৃত জ্বালাময় প্রেমাবলে মহাবিহ্বল হয়ে পড়তেন, যারফলে আর ভাগবত কথা বলতে পারতেন না।"

তবে বহু প্রামাণিক শাস্ত্রে শ্রীরাধারাণীর মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, 'শ্রীগোপাল তাপিনী'তে বলা হয়েছে—

তস্যাদ্যো প্রকৃতি রাধিকা নিত্য নির্গুণা।
যস্যাংশে লক্ষ্মী দুর্গাদিকা শক্তয়ঃ।।

অর্থাৎ—"শ্রীকৃষ্ণের নিত্য শক্তি, আদিশক্তি শ্রীরাধা নিত্য নির্গুণা; এবং লক্ষ্মী, দুর্গাদি সব ভগবৎ শক্তিবর্গ যাঁর অংশ।" 'শ্রীবৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে' শ্রীকৃষ্ণের উক্তি —

সত্ত্বং তত্ত্বং পরত্বঞ্চ তত্ত্বত্রয়মহং কিল।
ত্রিতত্ত্বরূপিণী সাপি রাধিকা মম বল্লভা।।

অর্থাৎ—" আমি যেমন নিত্য আনন্দময় হয়ে বিশ্বের কার্য, কারণ ও ত্রিতত্ত্ব-স্বরূপ, তেমনই শ্রীরাধা নিত্য আনন্দময়ী হয়ে কার্য, কারণ স্বভাবস্থিতা।" শ্রীপদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে শ্রীশিবজী নারদকে বললেন—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মী-স্বরূপা সা কৃষ্ণাহ্লাদ স্বরূপিণী।।
তৎ সো প্রোচ্যতে বিপ্র হ্লাদিনীতি মনীষিভিঃ।
তৎকলাকোটিকোট্যাংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রীগুণাত্মিকাঃ।।

অর্থাৎ —"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমপুরুষ দেবাদিদেব, এবং শ্রীমতী রাধিকা হচ্ছেন নিত্য শক্তি। রাধিকা সর্বলক্ষ্মী তাঁর অংশ স্বরূপা। হে নারদ,

দুর্গাদি দেবীগণ শ্রীমতী রাধিকার কোটি কোটি অংশের এক কলা।" শ্রীপদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে—

বহুনা কিং মুনিশ্রেষ্ঠ বিনাতাভ্যাং ন কিঞ্চন।
চিদ্ তিল্লক্ষণং সর্ব রাধাকৃষ্ণ ময়ং জগত।।
ইত্থং সর্ব তয়োরেব বিভূতি বিধি নারদ।
নশ্যক্যতে ময়াবক্তুং বর্ষ কোটি শতৈরপি।।

অর্থাৎ—"শ্রী শিবজী নারদ মুনিকে বললেন, হে মুনিবর! আমি তোমাকে আর কি বলব? শ্রীরাধাকৃষ্ণ ছাড়া জগতে আর কিছু নেই। এইভাবে সবই তাঁদের বিভূতি বলে জানবে। আমি শত কোটি বছর ধরে বললেও শ্রীরাধাকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করতে সক্ষম হব না।" 'শ্রীগৌতমীয়-তন্ত্রে' বর্ণিত আছে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিণী পরা।।

অর্থাৎ—"শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের আদিশক্তি এবং আদি লক্ষ্মী। সর্বগুণ বিভূষিতা এবং সমস্তকে আকর্ষণ করেন।" 'শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে' বলা হয়েছে—

সৃষ্টিকালে চ সাদেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরা।
মাতা ভাবেন্মহাবিষ্ণোঃ স এব চ মহান্ বিরাট্।।

অর্থাৎ—"শ্রীরাধাই মূল প্রকৃতি এবং ঈশ্বরী। জগত সৃষ্টির সময় যে মহাবিষ্ণু হ'তে জগত সৃষ্টি হয়, সেই বিরাট পুরুষের মাতা শ্রীরাধা। মহাবিষ্ণু হতে জগত সৃষ্টি এবং শ্রীরাধা হতে মহাবিষ্ণু উদ্ভব বলে শ্রীরাধাকে তত্ত্বতঃ জগন্মাতা বলা হয়।" 'শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে' আবার বলা হয়েছে—

রাধা বাম শসম্ভূতা মহালক্ষ্মী প্রকীর্ত্তিতা।
ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরস্যৈব নারদ।।

অর্থাৎ—"যে মহালক্ষ্মী ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি শ্রীরাধার বামসম্ভূতা অর্থাৎ তিনি শ্রীরাধার অংশ। সুতরাং শ্রীরাধা হচ্ছেন সর্ববিধ ঐশ্বর্য্যের মূল অধিষ্ঠাত্রী দেবী।"

"স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্বাহোবীর যস্যতে"

—শ্রীঋগ্বেদ (১/৩০/৫)

অর্থাৎ—"হে বীর রাধানাথ স্তুতি ভাজন তোমার এই রূপ স্তুতি, তোমার বিভূতি সত্য ও প্রিয় হোক্।"

এই রকম শাস্ত্রে বহু প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায় যে শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের আদিশক্তি। 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে' বলা হয়েছে—

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি।।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এক তত্ত্ব হয়েও অনাদি কাল হতে দুই দেহ ধারণ করে আছেন। তা'র কারণ শ্রীকৃষ্ণ রসময়। রস আস্বাদন করাই তাঁর স্বরূপধর্ম। বিলাসের মধ্যে রস আস্বাদিত হয়। এই বিলাস করার জন্য দুই দেহ ধারণ করে রস আস্বাদন করেন। রাধাকৃষ্ণ অভেদ হলেও নিত্যকাল ভেদ হয়ে আছেন। ভেদ ও অভেদ দু'টিই নিত্য। কেবল অভেদ অপেক্ষা ভেদে উৎকর্ষতা অথবা প্রাধান্য অধিক। কারণ অভেদ তত্ত্বে কেবল স্বরূপ আনন্দই থাকে। কিন্তু ভেদের মধ্যে স্বরূপ-আনন্দের উপর স্বরূপ-শক্তির আনন্দ বিলাস করে। ভগবান্ স্বরূপানন্দ অপেক্ষা স্বরূপ শক্তির দ্বারা অধিক আনন্দিত হন। সেইজন্য শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ হলেও ভেদে প্রাধান্য অধিক, কারণ তাতে বিলাস রয়েছে। অভেদ বস্তুতে বিলাস নেই, বিলাসের মধ্যে রস আস্বাদন হয়। শ্রীকৃষ্ণ রস-স্বরূপ, রস আস্বাদন করা এবং রস আস্বাদন করানো তাঁর স্বভাব। প্রিয়জনের বশ্যতা স্বীকার করে শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর, নাগর শেখর হয়েছেন।

যে ভগবৎ-স্বরূপ প্রীতিতে বশ্যতা স্বীকার করেছেন, সেই ভগবৎ-স্বরূপে অধিক রূপগুণ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, অর্থাৎ মাধুর্য প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য স্বরূপে ভগবান্ সকলকে নিজের বশে রেখে লীলা করেছেন, কারোর বশীভূত হন নি। কিন্তু স্বয়ং-রূপের লীলায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় ঐশ্বর্য ভুলে অপূর্বভক্ত বাৎসল্যের ফলে ভক্তের বশীভূত হয়েছেন। সেই অধিনতা শ্রীভগবানের পরম প্রিয়তম। শ্রীভগবান্ আত্মারামতা, পূর্ণকামতা, মহাযোগেশ্বরতা আদি গুণসমূহ অর্থাৎ স্বরূপানন্দ গুণ পরিত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু ভক্তবশ্যতা অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি দ্বারা বিলাস পরিত্যাগ করতে পারেন না। অধিকন্তু আদরের সঙ্গে হৃদয়ে ধারণ করে থাকেন। এই স্বভাব যে শক্তি দ্বারা তিনি লাভ করেছেন তা-ই

হ্লাদিনী শক্তি। এই হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত বিলাসের নাম প্রেম। আবার প্রেমের ঘনীভূততম অবস্থায় প্রেমকে মহাভাব বলা হয়। এই মহাভাবই শ্রীরাধার স্বরূপ। মহাভাব কৃষ্ণপ্রেমের ঘনীভূত অবস্থা। তাই মহাভাবকে কৃষ্ণপ্রেমের বিকার বলে অভিহিত করা হয়েছে। 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে' বলা হয়েছে—

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি—'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার।।
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ।।

—(চৈ. চ. আ. ৪/৫৯,৬০)

"হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপা শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ আস্বাদন করান এবং ভক্তদেরকে ভজনানন্দ দান করে পোষণ করেন। হ্লাদিনী ভক্তদেরকে ভজনানন্দ দেন বলে ভক্তরা ভগবানের সেবা না করে থাকতে পারেন না। সুতরাং ভক্তদেরকে আনন্দ দেওয়া কৃষ্ণ-সুখে পর্যবেশিত হয়েছে। কৃষ্ণসুখ চিন্তা ছাড়া হ্লাদিনী স্বরূপা রাধারাণীর কোন সত্তা নেই। শ্রীরাধারাণীর কাছে কৃষ্ণ পরিপূর্ণ রূপে বশীভূত হয়েছেন। সমস্ত ভগবৎ স্বরূপের যত প্রকার কান্তাগণ আছেন, তাঁদেরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ এবং ব্রজাঙ্গনাগণ। পরব্যোমে দ্বারকা, মথুরা এবং ব্রজে যে সমস্ত কান্তাগণ আছেন, তাঁদের মধ্যে ব্রজঙ্গনাগণই শ্রেষ্ঠ। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হলেও ঐশ্বর্য মাধুর্যের অনুগত। মাধুর্যের অধিনে ঐশ্বর্য রয়েছে। সুতরাং ব্রজে মাধুর্যেরই পূর্ণ প্রাধান্য। সেইজন্য ব্রজে কান্তাপ্রীতি। পরব্যোমে লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধার বৈভব বিলাস। লক্ষ্মীগণ স্বরূপে শ্রীরাধা থেকে অভিন্ন হলেও শ্রীরাধা দ্বিভুজা, কিন্তু লক্ষ্মীগণ চতুর্ভুজা। সুতরাং আকার গতিভেদ আছে। শ্রীরাধা সর্বশক্তি গরীয়সী, লক্ষ্মীগণ সেরূপ নন্। এই সমস্ত কারণে লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধার বৈভব-বিলাসাংশ বলে অভিহিত করা হয়েছে। দ্বারকায় মহিষীগণ হচ্ছেন শ্রীরাধার বৈভব প্রকাশ, মূল স্বরূপের মতো আবির্ভাব সমূহকে প্রকাশ বলা হয়। শ্রীরাধা দ্বিভুজা, মহিষীগণও দ্বিভুজা। এইজন্য শ্রীমহিষীদেরকে শ্রীরাধার প্রকাশ বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু মহিষীদের মধ্যে শ্রীরাধা অপেক্ষা কম শক্তি অর্থাৎ সৌন্দর্য-মাধুর্যাদি কম প্রকাশিত হয়েছে বলে মহিষীগণ শ্রীরাধার বৈভব প্রকাশ।

আকার স্বভাব-ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ।। —(চৈ. চ. আ. ৪/৭৯)

ব্রজদেবীরা শ্রীরাধার কায়ব্যূহ রূপ অথবা আবির্ভাব-বিশেষ রূপে এবং স্বভাবে প্রত্যেকেরই মুখ্যাদি অঙ্গের গঠন ভিন্ন ভিন্ন, স্বভাবও ভিন্ন ভিন্ন, কেউ ধীরা, কেউ প্রখরা, কেউ স্বরূপা, কেউ বিপক্ষা, কেউ সুহৃদপেক্ষা, কেউ নিরপেক্ষা ইত্যাদি। বিভিন্ন গোপীতে বিভিন্ন কান্তাপ্রেম বৈচিত্র্য। রসসৃষ্টির জন্য শ্রীরাধাই এইরূপ বিচিত্র স্বভাব ও বিচিত্র রূপ বিশিষ্ট বহু গোপসুন্দরী রূপে আত্ম প্রকট করেছেন। সুতরাং বহু গোপ সুন্দরীর সঙ্গে বিলাস করা মানেই শ্রীরাধার সঙ্গে বিলাস করা।

পদ্ম পুরাণে 'পাতালখণ্ডে' বলা হয়েছে, "গোপ্যৈকয়া বস্তেত্র পরিচিত্রিত সর্বদা।" অর্থাৎ "বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ একজন মাত্র গোপীর সঙ্গে ক্রীড়া করেন।" এই উক্তি দ্বারা শ্রীরাধার সর্বোৎকর্ষতা সূচিত হয়েছে এবং এটিও সূচিত হয়েছে যে, অসংখ্য গোপীর সঙ্গে ক্রীড়াও একা রাধার সঙ্গে ক্রীড়া। যেহেতু শ্রীরাধাই অনন্ত গোপীরূপে আত্মপ্রকট করে শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস আস্বাদন করান। বহুকান্তা ব্যতীত শৃঙ্গার রসের পুষ্টি সাধিত হয় না, বিশেষতঃ রাসলীলা সম্পাদিত হতে পারে না ; অর্থাৎ বহুকান্তাদ্বারা সম্পাদিত নৃত্য, গীত ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান হতে পারে না। এটাই হচ্ছে রাসলীলা এবং এই রাসলীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ইচ্ছার পর্যবসান। এই রাস-লীলা শ্রীরাধাই করিয়ে থাকেন। শ্রীরাধাই হচ্ছেন রাসলীলার শৃঙ্খল। রাসলীলা সম্পাদনের জন্যই শ্রীরাধা বহু গোপসুন্দরী রূপে আত্ম প্রকট করেছিলেন।

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি' বহুত প্রকাশ।।
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব-রস-ভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে।।
—(চৈ. চ. আ. ৪/৮০,৮১)

অতএব শ্রীরাধারাণীই হচ্ছেন সর্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব-ঐশ্বর্য্যময়ী, আদিশক্তি। যেহেতু শ্রীজগন্নাথ রাধা-বিরহ-বিধুর, তাই এই অধ্যায়ে শ্রীমতী রাধারাণীর স্বরূপ বর্ণনা করা হল।

(হরেকৃষ্ণ)

মানভঞ্জন

শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য। যিনি কৃষ্ণ তিনিই গৌর, তিনিই জগন্নাথ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫০০ বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রকটকাল ৪৮ বছর। সেই ৪৮ বছরের মধ্যে ২৪ বছর পূর্বাশ্রম লীলা ও অবশিষ্ট ২৪ বছর সন্ন্যাস লীলা। সন্ন্যাস লীলায় শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভু পুরুষোত্তম ধাম শ্রীক্ষেত্রে একাধিক্রমে ১৮ বছর কাল অবস্থান করেছিলেন। তাঁর সেই থাকার জায়গা এখনও বিদ্যমান আছে। যেটা রাধাকান্ত মঠ তথা গম্ভীরা নামে পরিচিত। সেই গম্ভীরা আছে, সেই ক্ষুদ্র কুটীর আছে, সেখানে মহাপ্রভুর ব্যবহার্য কতক গুলি বস্তুও আছে। এ ক্ষেত্র মহাপ্রভুর অতি প্রিয় ক্ষেত্র। শ্রীকৃষ্ণ তা স্বয়ং ব্যক্ত করেছেন। "আমার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপ বিরহের পর মিলন এ ক্ষেত্রেই হবে।" শ্রীচৈতন্য হচ্ছেন কৃষ্ণ। তিনি রাধা ভাবে বিভাবিত হয়ে রাধার মতো সেই কৃষ্ণ-বিরহ অনুভব করেছিলেন। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলে সর্বদা ক্রন্দন করেছিলেন।

রজরাজ ও মহাভাবের মিলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধিকার মিলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ। এ অবতারে বিশেষ করে রাধা ভাবের প্রাধান্য আছে। শ্রীচৈতন্যের বিগ্রহ—কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা মূর্তি। কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা ও রাধা-বিরহ- বিধুর—এই বিপ্রলম্ভ ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র, শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র। বিরহের পর শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন ক্ষেত্র। যখন শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রাধাভাবে বিভাবিত হয়ে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, তখন শ্রীজগন্নাথ তাঁকে শ্যামসুন্দর রূপ দেখিয়েছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু তখন 'হা! আমার প্রাণনাথ বলে দৌড়ে গিয়েছিলেন।" শ্রীজগন্নাথের রূপ রাধা-বিরহ-বিধুর রূপ। তাই শ্রীজগন্নাথ শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুতে দেখেছিলেন রাধারাণীকে। তাই বহুদিন বিরহের পর মিলন। তবে কৃষ্ণের এই যে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ তা প্রকাশের কারণ কি, তা আমাদের নিশ্চিত ভাবে জানা উচিত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুর্যময়, তাঁর লীলা মাধুর্যময়; কিন্তু সেই কৃষ্ণ যখন শ্রীগৌর রূপে আসেন তখন তিনি ঔদার্য-বিগ্রহ হন। মাধুর্য-বিগ্রহ

শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য-বিগ্রহ হওয়ার কারণ কি? কারণ ত্রিবিধ বাঞ্ছা-পূর্তি। ব্রজলীলা শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ বাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারেনি।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।। —(চৈ.চ.আ. ১/৬)

রাধাপ্রেম কি রকম, কৃষ্ণ তা জানবেন কেমন করে? তিনি তো বিষয়-বিগ্রহ। রধারাণী আশ্রয়-বিগ্রহ । তাই বিষয়-বিগ্রহে অবস্থান করে আশ্রয় জাতীয় সুখ আস্বাদন করবেন কেমন করে? তা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অসম্ভব। তাই এটি হচ্ছে প্রথম কারণ।

মাধুর্যৈক নিলয় কৃষ্ণ "কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং।" যে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য কোটি কন্দর্পের সৌন্দর্যকে ধিক্কার করে, সেই সৌন্দর্য একমাত্র রাধারাণী পূর্ণরূপে আস্বাদন করেন। "একলি রাধিকা আস্বাদে সকলি।" কৃষ্ণ ভাবলেন আমার যে রূপ মাধুরী (সৌন্দর্য) রাধারাণী আস্বাদন করেন তা আমি কেমন করে জানব? তাই এটি হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ, এবং আমার সৌন্দর্য-রস আস্বাদন করে রাধারাণী যে অখণ্ড সুখ লাভ করেন, তা আমি কেমন করে আস্বাদন করবো? এটি তৃতীয় কারণ। এই অপূরণীয় ত্রিবিধ বাঞ্ছা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূরণ করার জন্য গৌর (গৌরাঙ্গ)-রূপে এসেছেন। রাধাভাব অঙ্গীকার বিনা এ বাঞ্ছা পূর্তি হতে পারবে না। মাধুর্যময় শ্রীকৃষ্ণ ঔদার্যময় লীলা প্রকাশের অন্য একটি কারণও আছে।

এক সময় শ্রীমতী রাধীকা তাঁর সর্ব সৌন্দর্য-মণ্ডিতা কুঞ্জে মাধবী, মালতী, যুঁই, শেফালিকা, বেলফুলের সুগন্ধময় বায়ুতে কুঞ্জটি সর্বোত্তমভাবে প্রমোদিত করে সাজিয়ে রেখেছেন। মধুমক্ষীকার গুঞ্জন, কোকিলের কুহুধ্বনী, পেখমধারী ময়ূরের নৃত্য, বৃক্ষরাজির নবপল্লবের মৃদু সমীরের সোঁ সোঁ শব্দ, তাতে শ্রীমতী কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের উৎকণ্ঠা অনুভব করে থাকেন, যেন প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ দ্রুত পদক্ষেপে আসছেন। প্রতি নিমেষে প্রাণবল্লভের আগমণ হচ্ছে বলে অনুভব করলেও দেখতে দেখতে সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে তথাপি কৃষ্ণ আসছেন না। এতে ভাবিনীর বাম্য ভাবের মান ক্রমশ উর্ধ্বগতি করল। প্রাণ-সখীর এ

অবস্থা দেখে প্রিয়নর্মসখী বিশাখা কোনও এক দূতীকে পাঠালেন কৃষ্ণের অনুসন্ধানে। দূতী কৃষ্ণের অনুসন্ধান করতে গিয়ে পথে চন্দ্রাবলীর দূতী শৈব্যাকে দেখতে পেলেন। শৈব্যা গর্ব করে জানালেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় সখী চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে অবস্থান করছেন। একথা শুনে দূতী শীঘ্র ফিরে এসে বিশাখাকে জানালেন। বিশাখা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। ললিতা তাঁকে সান্ত্বনা করতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু তিনি কোন কথা না শুনে শ্রীমতীকে অভিমানভরে জানালেন যে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে অবস্থান করছেন।

ব্রজের মধুর রসের পরাকাষ্ঠা শ্রীমতী রাধারাণীর একমাত্র অভিমান করেন যে কৃষ্ণ আমার। কিন্তু চন্দ্রাবলী এরূপ বলতে পারেন না, তিনি বলেন আমি কৃষ্ণের। তাই যে মুহূর্তে শুনলেন শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে আছেন, তখন ভাবিনীর বাম্যভাব চরম শিখরে পৌঁছিল। শ্রীমতী তখন অভিমানে ও ক্রোধে তাঁর অতি কমনীয় নিম্ন ওষ্ঠকে সুচারু দাঁতের দ্বারা দংশন করতে করতে বললেন, "এত বড় অকৃতজ্ঞকে আর কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করতে দিও না।" এ কি অপূর্ব বৈচিত্র্য। যাঁর কাছে নিমেষকাল কৃষ্ণ বিরহটা যুগসম, তিনি আবার এরূপ কথা বলতে পারলেন। বিশাখা বললেন এ রকম ধূর্ত কপটকে আমরা কোনও মতে কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করতে দেব না। শ্রীমতীও তাঁর অভিমানে ফেটে পড়লেন। বিশাখা ও ললিতা কুঞ্জদ্বারে প্রহরীরূপে রইলেন। এমন সময় কৃষ্ণ দ্রুত পদক্ষেপে সেখানে এসে গেছেন, কিন্তু দেখলেন শ্রীমতীর কুঞ্জের দ্বার মানা। কৃষ্ণ খুব অনুনয় বিনয় করা সত্ত্বেও কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলেন না। ললিতা যদিও একটু নরম কিন্তু বিশাখার কোপ প্রশমিত হলো না। অবশেষে কৃষ্ণ কাতর স্বরে বললেন, "তোমরা তোমাদের শ্রীমতীকে আমার আগমনের বার্তা একটু জানিয়ে দাও, আমি অপরাধী, তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব।" কিন্তু বিশাখা সখী আদৌ রাজি হলেন না, তথাপি কৃষ্ণের বাক্যে ললিতার হৃদয় একটু বিগলিত হওয়ায় শ্রীমতীর কাছে গিয়ে দেখলেন শ্রীমতী অধোমুখে ভূমিতে বসে নয়নাশ্রু বর্ষণ করছেন, ভূমি কর্দমাক্ত হয়ে গেছে, আর কর্দমাক্ত ভূমিতে নিজের বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দিয়ে কি যেন বীজমন্ত্র লিখছেন।

শ্রীমতী রাধিকা ললিতাকে দেখেই বলে উঠল, 'আমার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ কি এসেছেন? আবার পরক্ষণেই বাম্যভাবের অভিমানে ফেটে পড়ে বলতে

লাগলেন, "ছিঃ ছিঃ আমার মতো নগন্যা ললনাকে কেন তিনি চাইবেন? তাঁকে বলে দাও অনেক সুন্দরী তাঁর সুখ বিধান করার জন্য আছেন। স্বর্গের দেবীরা ও অপ্সরারা তাঁর পদসেবা করার জন্য লালায়িত। তিনি তাঁদের সেবা গ্রহণ করে সুখী হোন্। আমি জানি না, আমার মতো অকিঞ্চনা নারী কেন সর্বস্ব দিয়ে তাঁকে ভাল বেসেছিল? তাঁর বিরহাগ্নি আমাকে দগ্ধিভূত করুক, তিনি সুখী হোন।" ললিতা দেখলেন শ্রীমতীর অবস্থা। এ উদ্‌ঘূর্ণা অবস্থায় প্রিয় সখীকে আর কিছু বলা ঠিক্ নয়। ললিতা ফিরে এলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ললিতাকে বললেন, "দেখ ললিতে! আমি অপরাধি জানি, শ্রীমতীও চরম অভিমানে ভেঙে পড়েছে তাও আমি উপলব্ধি করতে পাচ্ছি। তবে আমি এটা বিশ্বাস করি, আমি যদি একবার তাঁর সান্নিধ্যে যেতে পারি, তাহলে তোমাদের শ্রীমতী আমার এই শ্যামসুন্দর রূপ দেখলে আর কোনও 'অভিমান' রক্ষা করতে পারবে না, সব ভুলে যাবে।" তখন বিশাখা আরও অগ্নিশর্মা হয়ে বলে উঠলেন, "ধূর্ত! তুমি বল কিনা তোমার রূপ দেখে আমাদের প্রাণসখী সবকিছু ভুলে গিয়ে তোমার দাসী হবে ? যাও, যাও, দূর হয়ে যাও, লজ্জা করে না একথা বলতে। তুমি তার প্রেমের কাঙাল না সে তোমার রূপের কাঙাল। ভুলে গেছ বুঝি! তুমি মদনমোহন হলেও, আমাদের প্রিয় সখী কিন্তু মদনমোহন -মোহিনী। একদিন তোমাকে তার প্রেমের কাঙাল হয়ে কাঁদতে হবে—একথা আমি বলে রাখছি কৃষ্ণ।" আর কোন উপায় না দেখে কৃষ্ণ মনের আক্ষেপে চলে গেলেন যমুনাসৈকতে। সেখানে অঙ্গের সমস্ত ভূষণ ছুড়ে ফেলে দিয়ে যমুনা বালির ওপর ভূলুণ্ঠিত হয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তাঁর শ্রীমুখ দিয়ে তখন ধ্বনিত হতে লাগল রাধে... রাধে... রাধে ...। "রাধে পুরাও মধুরিপু কামম্, রাধে পুরাও মধুরিপু কামম্।" যদিও তিনি আত্মারামী, তথাপি তিনি রাধারাণীর প্রেমের কাঙাল। পৌর্ণমাসী দেবী সর্বজ্ঞ, তিনি সমস্ত ঘটনা জানতে পেরে উপস্থিত হলেন কৃষ্ণের সান্নিধ্যে। শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা দেখে বললেন, "বৎস! তোমার এ অবস্থা কেন ?" পৌর্ণমাসীর কাছে কৃষ্ণ সব কথা ব্যক্ত করলেন। পৌর্ণমাসী দেবী বললেন, "আমি বৃন্দাদেবীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তিনি তোমাদের মিলনের সকল ব্যবস্থা করবে।" পৌর্ণমাসী দেবীর নির্দেশে বৃন্দাদেবী এসে উপস্থিত হলেন যমুনাসৈকতে। যমুনাসৈকতে কৃষ্ণের অবস্থা দেখে কিছুক্ষণ ভাবলেন—"লীলাময়ের লীলা পুষ্টিতে যোগমায়ার ক্রিয়ার কি অপূর্ব বৈচিত্র্য,

আর আমি হয়েছি তাঁর সহায়িকা। নিত্য মিলনে আবার বিরহ। হৃদয়-সর্বস্ব প্রাণবল্লভকে অভিমান করে বিদায় দিয়েছে। যে প্রাণবল্লভের বিরহ শ্রীমতী সহ্য করতে পারে না। যার কাছে ক্ষণকাল কৃষ্ণ-বিরহ যুগসম প্রতিয়মান হয়।

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎসর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।।

"সেই গোবিন্দের বিরহে যার এক নিমেষকাল যুগসম প্রতীয়মান হয়। বর্ষার ধারার মতো যার অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে।" সে আবার কুঞ্জদ্বার মানা করে দিয়েছে। এ আমার বুদ্ধির অগোচর। তথাপি পৌর্ণমাসীর আজ্ঞায় এবং প্রেরণায় আমি এ লীলায় মিলনের সূত্রধারিণী রূপে কার্য করতে পেরে নিজেকে ধন্যাতিধন্যা মনে করি। এ সমস্ত বিচার করে বৃন্দাদেবী কৃষ্ণের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় প্রদান-পূর্বক বললেন, "আমি বৃন্দা, পৌর্ণমাসীর নির্দেশে এসেছি।"

পৌর্ণমাসীর নির্দেশটি কি তা ব্যক্ত করে বললেন,—"হে দেব! এখন শ্রীমতীর মানভঞ্জন করতে হলে একটি মাত্র উপায় আছে, তা ছাড়া অন্য কোন উপায় আমি দেখতে পাচ্ছি না। তোমাকে এই অতি মাধুর্যপূর্ণ কুঞ্চিত চিক্কন কেশ পরিত্যাগ করে মুণ্ডিত মস্তক হতে হবে। আর মোহন-মুরলী ত্যাগ করে, খঞ্জনী গ্রহণ করে রাধানাম কীর্তন করতে হবে। পরনের পীতবাসের পরিবর্তে গৈরিক বসন পরিধান করতে হবে। এভাবে ভিক্ষুক বেশ ধারণ করলে আমি তোমাকে একটি গান শিখিয়ে দেব। সেই গান গাইতে গাইতে তুমি রাধার কুঞ্জে গেলে সেখানে রাধার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে এবং তখন মিলনের মুহূর্ত এসে যাবে। এ ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই। বৃন্দাদেবী একথা বলতেই পরম ইচ্ছাময় পুরুষ সঙ্গে সঙ্গে তখন সেই লীলারূপটি ধারণ করলেন অর্থাৎ এখন তিনি মুণ্ডিত ও গৈরিক বসন পরিহিত স্বর্ণ বর্ণ অপ্রাকৃত সন্ন্যাসী বেশধারী এক ভিক্ষুক। যাঁর ইচ্ছামাত্রেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়ে থাকে; তাঁর পক্ষে অপ্রাকৃত ভিক্ষুক বেশ ধারণ করা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তখন বৃন্দাদেবী তাঁকে একটি গান শিখিয়ে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এখন এই বেশে চললেন শ্রীমতীর কুঞ্জের দিকে। সেখানে খঞ্জনী হাতে বৃন্দাদেবীর গানটি সুস্বরে গাইতে লাগলেন।

শ্রীমতী রাধে বড় অভিমানী, বাম্যভাব শিরোমণি।
শ্যাম শাড়ী অঙ্গে আচ্ছাদন তব—তপ্তকাঞ্জন বরণ।।

ললিতা শ্রীকৃষ্ণের এই সন্ন্যাস বেশ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর তুমি এ গান কোথা থেকে শিখেছ ? সন্ন্যাসী ঠাকুর বললেন, "আমার গান্ধর্বিকা নামে এক গুরু আছেন। তাঁর কাছ থেকে আমি এই গান শিখেছি।" বিশাখা বললেন, "তুমি কেন এসেছ, তুমি কি চাও ঠাকুর ?" " আমি তো সন্ন্যাসী হয়েছি, তাই সবকিছু পরিত্যাগ করেছি। এ জগতে চাইবার আর আমার কি-ই বা আছে ? আমি তো একমাত্র প্রেমের ভিখারী।" বিশাখা বললেন, ঠাকুর তুমি কি ভাগ্য গণনা করতে জান ? সন্ন্যাসী বললেন, "জানি বৈ কি ? তাও আমার গুরু গান্ধর্বিকা শিক্ষা দিয়েছেন।" বিশাখা বললেন, ঠাকুর তুমি কুঞ্জের ভিতরে আসবে কি? তুমি যদি আমাদের প্রাণ-সখীর ভাগ্য গণনা করে দিতে পার, তাহলে তাঁর আশীর্বাদে তুমি অতি শীঘ্রই অবশ্য প্রেমধন লাভ করতে পারবে।

সন্ন্যাসী বললেন, কেন যাব না, প্রেমধন লাভের আশায় আমি তো এই 'সন্ন্যাসী' বেশ ধারণ করেছি। এই কথা বলে সন্ন্যাসী ঠাকুর বিশাখা ও ললিতার পিছনে পিছনে কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করলেন। শ্রীমতীর শয়ন কক্ষের বারান্দায় সন্ন্যাসী ঠাকুরের বসার জন্য একটি আসন দেওয়া হল। তাতে তিনি বসলেন। শ্রীমতীর উপবেশনের জন্য নিকটে আরো একটি আসন পাতার জন্য তৎপর হলেন। তখন ললিতা শ্রীমতীর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে সন্ন্যাসী ঠাকুরের আগমনের বার্তা জানালেন। ইত্যবসরে বিশাখা অনুরোধ করলেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমার সেই মধুর গানটি আর একবার গেয়ে শোনাবে কি? সন্ন্যাসী ঠাকুর বললেন, "কেন আমি শোনাব না? ওটা তো আমার অতি প্রিয় গান।" এই কথা বলে সেই গানটি গাইতে লাগলেন। যে মুহূর্তে শেষের পদটি গাইলেন—

"আজ রাধা প্রেমভিক্ষা মাগি কানু ফেরে দ্বারে দ্বারে হায়।"

শ্রীমতীর কর্ণে যখন এটি প্রবেশ করল, তখন শ্রীমতী তাঁর প্রাণফাটা আর্তি নিয়ে বক্ষে করাঘাত করে বললেন—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্মাহতাং করোতু বা।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।।

"সেই লম্পট পুরুষ আমাকে আলিঙ্গন করুন, অথবা পা দিয়ে দলিত করে ছুড়ে ফেলে দিন, অথবা আমাকে দর্শন না দিয়ে বিরহ অগ্নিতে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারুন, সেই লম্পট পুরুষ যা ইচ্ছা তাই করুন না কেন, তিনিই হচ্ছেন সর্বদা আমারই প্রাণনাথ।" রাধারাণীর হৃদয় থেকে এটি ভেসে এলো। ললিতা তখন প্রবোধ দিয়ে বললেন, "হে আমার প্রাণ সখী, ধৈর্য ধর, একজন অতি সুন্দর সন্ন্যাসী ঠাকুর এসেছেন। তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি তোমার ভাগ্য গণনা করে বলবেন, যারফলে তুমি তোমার প্রাণবল্লভকে সাক্ষাৎ করবে।" রাধারাণীর কুঞ্জের বারান্দাতে অতি নিকটে দু'টি আসন পাতা হলো। ললিতা সন্ন্যাসী ঠাকুরকে আসনে বসার জন্য অনুরোধ করলেন। তারপর রাধারাণী তাঁর কুঞ্জকুঠীরের ভিতর থেকে এলেন। মুখে ঘোমটা দিয়েছিলেন, কারণ তিনি কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোন পুরুষের মুখ দর্শন করেন না।

ললিতা সন্ন্যাসী ঠাকুরের সম্মুখে অন্য আসনটিতে রাধারাণীকে বসালেন। তারপর ললিতা রাধারাণীর বাম হাত ধরে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেখে বললেন, "হে সন্ন্যাসী ঠাকুর! দয়া করে আমাদের প্রাণসখীর ভাগ্য গণনা করে বলো"। সন্ন্যাসী ঠাকুর বললেন "আমাকে ক্ষমা করো, আমি একজন সন্ন্যাসী, আমি কেমন করে স্ত্রীলোকের হাত স্পর্শ করবো। আমার সন্ন্যাসী ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে।" তখন ললিতা বললেন, "তাহলে তুমি কেমন করে ভাগ্য গণনা করবে?" সন্ন্যাসী ঠাকুর বললেন, "আমি তোমাদের সখীর কপালের রেখা দেখে ভাগ্য গণনা করতে পারবো। তুমি ওর ঘোমটা খোলো।" বিশাখা তখন বললেন "হে সন্ন্যাসী ঠাকুর তুমি কি জান না, আমাদের সখী এ জগতের কোন পুরুষের মুখ দর্শন করে না।" তখন কপট সন্ন্যাসী বললেন, "আরে বাবা! আমি একজন দণ্ডী সন্ন্যাসী। আমার কোন কামনা নেই। আমি সবকিছু ত্যাগ করেছি। আমি কেবল প্রেমের ভিখারী। তবে তোমাদের সখী একজন সন্ন্যাসীর সম্মুখে মুখের ঘোমটা খুলতে কেন এত লজ্জা করছে ? যদি তোমাদের সখী ঘোমটা খোলে তাহলে কিছু ক্ষতি হবে না। আমি একজন সন্ন্যাসী, সাধারণ মানুষ নই।" এ সব কথা শ্রবণ করে ললিতা রাধারাণীর মুখের ঘোমটাটা যেই খুললেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী রূপের পরিবর্তে শ্যাম ত্রিভঙ্গ ললিত কৃষ্ণ

রূপ প্রকাশিত হলো। তিনি তখন অতি মনোহর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে পীত বসন পরিহিত শিরে শিখিপুচ্ছ ও হাতে মুরলী ধারণ করে দণ্ডায়মান হলেন।

তারপর কৃষ্ণের বক্র অপাঙ্গ দৃষ্টি যেই হরিণী নয়না শ্রীমতীর নয়নে পতিত হলো, এভাবে নয়নে নয়নে যখন মিলন হলো, তৎক্ষণাৎ কোথায় গেল সেই শ্রীমতীর বাম্যভাবের অভিমান। বিশাখা দেখে চকিত হলেন, "একি অপূর্ব লীলামাধুরী ?" তবে এক্ষেত্রে গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে আলোচ্য বিষয়। গৌর লীলায় রায়রামানন্দ হচ্ছেন কৃষ্ণের বিশাখা সখী। যে সময় শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁর প্রকৃত রূপ (আসল রূপ) রায় রামানন্দকে দেখালেন তখন তা দর্শন করে তিনি মূর্চ্ছিত হয়েছিলেন। তা'র কারণ কি ? তিনি তো বিশাখা সখী। তিনি কৃষ্ণ ও রাধা উভয়কে দর্শন করেছেন। তাঁদের অতি প্রিয় সখী। তবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত তনু। তাহলে সেই রূপ দর্শন করে শ্রীরায়রামানন্দের মূর্চ্ছিত হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীরায়রামানন্দ শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভুর রূপ দর্শন করে বলেছিলেন—

পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসী-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ।।

—(চৈ. চ. ম. ৮/২৬৮)

অর্থাৎ—"আমি প্রথমে আপনাকে সন্ন্যাসীরূপে দর্শন করেছিলাম, কিন্তু এখন আমি আপনাকে শ্যামসুন্দর গোপবেশ রূপে দর্শন করছি।"

তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা।।

—(চৈ. চ. ম. ৮/২৬৯)

"আপনার সামনে দেখছি একটি সুবর্ণ প্রতিমা এবং তাঁর উজ্জ্বল গৌরকান্তি দিয়ে আপনার সর্ব অঙ্গ ঢাকা।"

তাহাতে প্রকট দেখোঁ স-বংশী বদন।
নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন।।

—(চৈ. চ. ম. ৮/২৭০)

"তাঁর সেই রূপে তাঁর মুখে বাঁশী এবং নানাভাবের আবেশে তাঁর কমল

সদৃশ নয়ন-যুগল চঞ্চল।"

এইমত তোমা দেখি' হয় চমৎকার।
অকপটে কহ, প্রভু, কারণ ইহার।।

—(চৈ. চ. ম. ৮/২৭১)

"এইভাবে আপনাকে দর্শন করে আমার হৃদয় চমৎকৃত হয়েছে। হে প্রভু, অকপটে আপনি আমাকে তার কারণ বলুন।"

এই সমস্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে, গৌর লীলাই হচ্ছে কৃষ্ণলীলা এবং গৌরই হচ্ছেন কৃষ্ণ। তারপর রাধা কৃষ্ণের মিলনের পর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "হে রাধে, তোমার সমস্ত লীলাই হচ্ছে আমার আনন্দের জন্য। তোমার বাম্যভাব বৃদ্ধির জন্য আমি কখন কখন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়ে থাকি। তাই তোমার ভাব শ্রেষ্ঠ। আমি অন্য কোন উপায়ে তোমার মান ভঞ্জন করতে পারলাম না। তাই সন্ন্যাসী বেশে প্রেমের ভিখারী হয়ে এলাম। এই লীলার সমাপ্তির পূর্বে রাধারাণী যখন অত্যন্ত বিরহ অবস্থায় ক্রন্দন করছিলেন তখন সেই সময় কৃষ্ণ সেখানে এসে পৌঁছিলেন। শ্রীমতী রাধারাণীর এরূপ অবস্থা সহ্য করতে না পেরে তাঁর প্রাণ-প্রিয়সখী বিশাখা বললেন, "হে কৃষ্ণ, তোমাকে একদিন এভাবে ক্রন্দন করতে হবে।" এই ভক্তের বাক্যই যথার্থ হলো, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে (গৌর রূপে) সর্বদা ক্রন্দন করেছেন। এটাই গৌর স্বরূপে ক্রন্দনের কারণ। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসী হয়ে রাধাপ্রেমের ভিখারী হয়েছিলেন। কৃষ্ণ বলেছিলেন আমি ঋণী হয়ে গিয়েছি।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা।।

—(ভা. ১০/৩২/২২)

এখানে কৃষ্ণের উক্তি এই যে, "আমি ঋণ পরিশোধ করতে পারবো না। হে গোপিগণ! তোমরা আমাকে এতই ভালবেসেছ যে, সমস্ত বেদমর্যাদা, সংসার বন্ধন লঙ্ঘন করে অর্দ্ধরাত্রে আমাকে সেবা করার জন্য আমার কাছে এসেছ।" শ্রীকৃষ্ণ ঋণী হয়ে গেলেন তাঁর প্রেমিক ভক্তদের কাছে, তাই ঋণ পরিশোধ করার জন্য সন্ন্যাসীরূপে এসে তাঁর অতি প্রিয় ব্রজবাসী ভক্তদের মহিমা প্রচার করলেন। বর্তমান শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপে অর্থাৎ রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত তনু

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে প্রকট হয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ত্রিবিধ বাঞ্ছা পূর্তির জন্য রাধাভাব অঙ্গিকার করে তথা তাঁর বর্ণ ধরে তিন প্রকার সুখ আস্বাদনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শ্রীশচীমাতার গর্ভ সিন্ধু থেকে নিষ্কলঙ্ক ইন্দু (গৌরচন্দ্র) আবির্ভাব হলেন। গৌরই কৃষ্ণ। কিন্তু গৌর অবতারে রাধাভাবের প্রাবল্য রয়েছে। তাই সর্বদা রাধাভাবে কৃষ্ণ-বিরহ তীব্রভাবে অনুভব করে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদতেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপ হচ্ছে কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা রূপ এবং শ্রীকৃষ্ণের জগন্নাথ রূপ হচ্ছে রাধা-বিরহ-বিধুর রূপ। এই বিরহ ক্ষেত্রে দুই ক্রন্দন রূপের মিলন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করেছিলেন। যার ফলে তিনি সর্বদা শ্যামসুন্দর প্রাণবল্লভকে দর্শন করেছিলেন। গৌর ও কৃষ্ণ তত্ত্বতঃ এক। দুই অভিন্ন। তত্ত্বগত হিসাবে কোন ভিন্নতা নেই। কিন্তু ভাবান্তর হচ্ছে মহাভাব চিন্তামণি স্বরূপা রাধা সহ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের মিলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ। ব্রজলীলায় রাধাকৃষ্ণ দু'টি তনু। কিন্তু গৌরলীলায় একটি তনু। রসরাজময় শ্রীকৃষ্ণ সহ মহাভাবময়ী রাধারাণীর একিভূত তনু। এ ছাড়া তত্ত্বতঃ গৌর ও কৃষ্ণের মধ্যে কিছু প্রভেদ নেই।

'নন্দসুত' বলি' যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি। —(চৈ. চ. আ. ২/৯)

এই সব শাস্ত্রবাক্য থেকে স্পষ্টভাবে সূচিত হয় যে গৌরই কৃষ্ণ। সেইজন্য স্বরূপ দামোদর গোস্বামীপাদ বলেছেন, "নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্"। গৌর স্বরূপে ভাব বিশেষ 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতম্।' শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌর রূপে রাধাভাবকান্তি ধরে অবতরণ করেছেন। রাধাপ্রেমে পাগল হয়েছেন। সেইজন্য সন্ন্যাসী বেশে রাধাপ্রেম ভিক্ষা ধরে এসেছেন। সেইজন্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী লিখেছেন—

"চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং।"
"একীভূতং বপুরবতি রাধয়া মাধবস্য।"

তাই তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, কৃষ্ণই গৌর, গৌরই কৃষ্ণ। গৌরলীলাই কৃষ্ণ লীলা, কৃষ্ণলীলাই গৌর লীলা। যেমন শ্রীমন্ নাম ও স্বয়ং নামি অভিন্ন। নাম ও নামি অভিন্ন হলেও "পূর্বস্মাত পরমেব হন্তকরণং।" শ্রীকৃষ্ণের নাম ও শ্রীকৃষ্ণ

স্বয়ং অভিন্ন। কিন্তু নামি অপেক্ষা নাম অধিক দয়াময় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা তাঁর নাম অধিক দয়াময়। অনুরূপ কৃষ্ণলীলায় ভাববৈশিষ্ট্য অধিক, কিন্তু গৌরলীলায় কৃপাবৈশিষ্ট আস্বাদন বিশেষভাবে অধিকত্ব হয়েছে। কৃষ্ণলীলা মাধুর্যময়, কিন্তু গৌরলীলা ঔদার্যময়। তাই গৌর সুন্দর স্বয়ং কৃষ্ণ হলেও গৌর সুন্দর হচ্ছেন অদ্ভুত ঔদার্য, অদ্ভুত কারুণ্য ও অদ্ভুত বদান্য অবতার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোনও অবতার এরূপ মহাবদান্য নন্। তাই তিনবার এই অদ্ভুত শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই এই কলিযুগে তিনি স্বয়ং সচল জগন্নাথ রূপে শ্রীঅচল জগন্নাথকে জানিয়েছেন, (অর্থাৎ শ্রীঅচল জগন্নাথের কথা ব্যক্ত করেছেন)। তাই যাদের কর্ণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রবেশ করেনি, তারা কখনই শ্রীজগন্নাথকে পূর্ণরূপে দর্শন করতে পারবে না। জগন্নাথের নামে জগত দর্শন করবে।

(হরেকৃষ্ণ)

স্বপ্নবিলাস চরিত

"যেই গৌর, সেই কৃষ্ণ, সেই জগন্নাথ"—এই তত্ত্ব সাধারণতঃ লোকেরা জানে না। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু। এটি শাস্ত্রের প্রমাণ। কিন্তু যারা মূঢ়, তারা এই অভ্রান্ত সত্য জানতে পারে না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ"। অর্থাৎ "আমি সর্বত্র প্রকাশিত হই না। আমি যোগমায়া দ্বারা আবৃত হয়ে থাকি।" তাই যাঁরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁরাই কেবল তাঁকে জানতে পারবেন।

ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে।।
—(চৈ.চ. ম. ৬/৮৩)

নিজের জ্ঞান, বৈরাগ্য অথবা চেষ্টার মাধ্যমে তাঁকে জানা যায় না। তাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে দান করার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে এসেছেন। উত্তম, অধম কিছু বিচার না করে সবাইকে কৃপা করেছেন। কিন্তু আমাদের বদ্ধাবস্থা এতই প্রবল যে, আমরা সেই কৃপা লাভ করতে পারিনি। সেজন্য তিনি আরো করুণা করে তাঁর নিজ জনকে এ প্রপঞ্চে প্রেরণ করেছেন।

'শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা,—জীবের হয় জ্ঞান।।
—(চৈ. চ. ম. ২০/১২৩)

কিন্তু যাঁদের পুঞ্জিভূত সুকৃতি আছে, তাঁরাই কেবল গৌর তত্ত্ব বুঝতে পারবেন। সেরকম ব্যক্তিরাই কেবল গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে আশ্রিত হন্। তাঁরাই গৌরাঙ্গের কৃপা লাভ করে গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ করবেন। যার ফলে শ্রীমতী রাধারাণীর পাদপদ্ম থেকে নির্গত অমৃতময় প্রেম তাঁদের হৃদয়ে জাগ্রত হবে। তারপর তাঁরা প্রেম সমুদ্রে নিমজ্জিত হবেন। কেবল তখনই সেই গৌর তত্ত্ব বুঝতে সক্ষম হবেন। 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে' কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী গৌরতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন নিম্নলিখিত রূপে—

রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাই, শাস্ত্র-পরমাণ।।
মৃগমদ, তার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে—যৈছে কভু নাহি ভেদ।।
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।।
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি।।
—(চৈ. চ. আ. ৪/৯৬-৯৯)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার। —(ঐ ৪/১০০)
যুগধর্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার।। —(ঐ ৪/২২০)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময়-মূর্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।। —(ঐ ৪/২২২)

"শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন পূর্ণশক্তি, এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ শক্তিমান। বৈদিক শাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে তাঁদের দু'জনের মধ্যে কোন ভেদ নেই। কস্তুরী এবং তার গন্ধ যেমন অভিন্ন, অগ্নি এবং তার উত্তাপ যেমন অভিন্ন, তেমনই শ্রীমতী রাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণও অভিন্ন। কেবল লীলারস আস্বাদন করার জন্য তাঁরা দুই ভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন। প্রেম ও ভক্তি শিক্ষা দান করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর ভাব ও কান্তি অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি যুগধর্ম—ভগবানের দিব্য-নাম-সংকীর্তন এবং শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম প্রচার করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীনন্দ মহারাজের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর এই রূপ সমস্ত রসের মূর্ত প্রকাশ। তিনি হচ্ছেন শৃঙ্গার রসের মূর্ত বিগ্রহ।" শ্রীকৃষ্ণ যিনি নন্দ মহারাজের পুত্র, তিনি শচীমাতার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। "ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই।" তাই তিনি হচ্ছেন শৃঙ্গার রসরাজ। কিন্তু যখন তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব ও কান্তি অঙ্গিকার করেন তখন তিনি এক তনুতে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে আবির্ভূত হন্। শ্রীনরহরি সরকার উল্লেখ করেছেন—

চৈতন্য ভক্তি নৈপুন্য কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ত্রয়ো প্রকাশ্বত একত্র কৃষ্ণ চৈতন্য উচ্যতে।।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য রূপে আবির্ভূত হন। যিনি হচ্ছেন পূর্ণ প্রেমময়। যদি প্রেমের শেষ সীমা অর্থাৎ পূর্ণতম ভক্তিপ্রেম কৃষ্ণতে যোগ করা হয়, তাহলে তিনি হচ্ছেন চৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমপুরুষ অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব, পরতত্ত্ব, কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণতে ভক্তি নৈপুণ্য যোগ করা হয়, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হন।

শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গ হচ্ছেন শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মিলিত তনু। (রাধাকৃষ্ণ এক ভূতাঙ্গ)। এটির অর্থ গৌরাঙ্গ স্বরূপে দু'টি বিপরীত বস্তু মিলিত হয়। সেই দুই বিপরীত কি ? সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। এই দু'টির মিলন ও বিরহ একটি পাত্রেতে হয়েছে। তা হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য। এতে অতি গুহ্যতত্ত্ব আছে। যখন আমরা ভক্তি নৈপুণ্যের কথা বলি তখন তোমরা কি প্রকার ভক্তিকে বোঝ? এ প্রসঙ্গে ভক্তি অর্থ নিত্য সিদ্ধ, যার অন্যনাম প্রেমভক্তি। তাই ভক্তি নৈপুণ্যের তাৎপর্য হচ্ছে প্রেমভক্তির শেষ সীমা তা মাদনাক্ষ মহাভাব। এই প্রেম ভক্তির শেষ সীমা হচ্ছেন শ্রীমতী রাধে। শ্রীমতী বার্ষভানবী রাধারাণী হচ্ছেন মহাভাব চিন্তামণি-স্বরূপা এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন রসরাজ পূর্ণব্রহ্ম ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্। যখন এই দু'য়ের মিলন হয়, তখন তা-ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (গৌরাঙ্গ)। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে চার প্রকার সম্ভোগের কথা উল্লেখ আছে। একটি হচ্ছে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ। এই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের শৃঙ্গার রসরাজ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি এবং তিনিই হচ্ছেন মাদনাক্ষ মহাভাব। এই মাদনাক্ষ মহাভাব হচ্ছে একটি অগাধ সমুদ্র। যেখানে প্রেমের উত্তাল তরঙ্গমালা বিদ্যমান। তাই কৃষ্ণ সেই ভাব অঙ্গিকার করে গৌরাঙ্গ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

গৌরঃ কো অপি ব্রজ বিহরিণিভাব মগ্নশ্নকাতি।

ব্রজ বিহরিণী (রাধা) ভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিরহ অনুভব করেছিলেন। অর্থাৎ গৌর অবতারে রাধাভাবের প্রাধান্যতা আছে। শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অনন্ত।

শুদ্ধপ্রেম-সুখসিন্ধু, পাই তার একবিন্দু,
সেই বিন্দু জগত ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়।।
—(চৈ. চ. ম. ২/৪৯)

"শুদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম আনন্দের সমুদ্রের মতো, যদি কেউ তার এক বিন্দু লাভ করেন তাহলে তিনি সমগ্র জগৎকে ভাসিয়ে দিতে পারেন। এই ধরণের ভগবৎ-প্রেমের কথা প্রকাশ করার যোগ্য নয়, তবু আমি পাগল হয়ে এসব বলছি। আর এসব কথা বললেও বা কে বিশ্বাস করবে?"

গৌরলীলার এক বিন্দু সমগ্র জগতকে প্রেমে ভাসিয়ে দেয়। তুমি যদি একটি স্থানে সমগ্র ভৌতিক তথা আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য স্তূপীকৃত কর তাহলে তা মহাভাবের এক কণিকার সঙ্গে সমান হবে না। সেই ধনের একমাত্র অধিকারিণী হচ্ছেন শ্রীমতী রাধিকা। এভাবে তিনিই হচ্ছেন একমাত্র কৃষ্ণ ধনে ধনী।

স্বয়ং কৃষ্ণ চিন্তা করলেন, "আমি এই ধন চুরি করব।" তাই শ্রীমতী রাধারাণীর হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করে সেই সুগুপ্ত সম্পত্তি চুরি করে হৃদয়ে ধারণ করলেন এবং অঙ্গকান্তি চুরি করে গৌর হলেন। অন্তরে শৃঙ্গার রসরাজ রূপে অবস্থান করলেন, কিন্তু বাইরে গৌররূপে প্রকাশিত হলেন। এভাবে তিনি তাঁর ত্রিবিধ বাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। তিনি নিজের বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই প্রেম অকাতরে যোগ্য, অযোগ্য কিছু বিচার না করে বিতরণ করেছিলেন।

চিরাদদত্তং নিজ গুপ্তবিত্তং স্বপ্রেম-নামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহৎ প্রপদ্যে।।
— (চৈ. চ. ম. ২৩/১)

"এই প্রেম এর আগে আর কাউকে দেওয়া হয়নি। এই ধন অতিগুপ্ত এবং এটি গোলোক বৃন্দাবনের অমূল্য ধন। বর্তমান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে অকাতরে সবাইকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের মাধ্যমে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেছেন। তিনি কখনই উত্তম-অধম, পাত্র-অপাত্র বিচার করেন নি। তাই গৌরকৃষ্ণ হচ্ছেন মহাবদান্য, মহাঔদার্য ও মহাকারুণিক অবতার।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে এসে কৃষ্ণ প্রাপ্তির লীলা প্রকাশ করেছেন। এটাই হচ্ছে গৌর লীলার চমৎকারিতা। তিনি নিজে নিজেকে খুঁজেছিলেন। তিনি তাঁর অন্ত্যলীলায় সেই মহাভাব প্রকট করেছিলেন শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে। তাই তিনি হচ্ছেন মহাবদান্য, কারণ তিনি যে কৃষ্ণ প্রেম প্রদান করেছিলেন তা অন্য কেউ প্রদান করেন নি। মাদনাক্ষ মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধিকার হৃদয়স্থ দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ সম্পুটের মধ্যে প্রবেশ করে সেই সুগুপ্ত প্রেমধন চুরি করে বিনা মূল্যে সবাইকে বিতরণ করেছিলেন। এই কৃষ্ণপ্রেম নাম-সংকীর্তনের মাধ্যমে আমরা তা লাভ করতে পারব। বেদে ত্রিবিধ তত্ত্বকথা উল্লেখ আছে। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই ত্রিবিধ তত্ত্ব মিলিত হয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ ধারণ করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ত্রিভঙ্গ, কারণ শ্রীকৃষ্ণ এই ত্রিবিধ তত্ত্বে প্রকাশিত হন। সম্বন্ধ তত্ত্বের মূল বিগ্রহ হচ্ছেন শ্রীরাধা-মদনমোহন, অভিধেয় তত্ত্বের মূল বিগ্রহ হচ্ছেন শ্রীরাধা- গোবিন্দ এবং প্রয়োজন তত্ত্বের মূল বিগ্রহ হচ্ছেন শ্রীরাধা-গোপীনাথদেব। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হচ্ছেন রাধামদনমোহন, রাধাগোবিন্দ ও রাধাগোপীনাথের মিলিত বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বঙ্কিমা তাঁর পাদপদ্ম, যা হচ্ছে সম্বন্ধ তত্ত্ব—শ্রীরাধা-মদনমোহন। দ্বিতীয় বঙ্কিমা মুখারবিন্দ, যা হচ্ছে অভিধেয় তত্ত্ব—শ্রীরাধাগোবিন্দদেব এবং তৃতীয় বঙ্কিমা হচ্ছে বক্ষস্থল, যা হচ্ছে প্রয়োজনতত্ত্ব—শ্রীরাধাগোপীনাথদেব। তাই সারতত্ত্ব হচ্ছে এই যে, যাঁরা ভাগ্যবান তাঁর শ্রীরাধা ও মদনমোহনের মিলিত তনু গৌরহরির পাদপদ্ম হতে নিঃসৃত অমৃত আস্বাদন করবেন, যাঁরা আরো অধিক ভাগ্যবান তাঁরা শ্রীরাধা ও গোবিন্দের মিলিত তনু গৌরহরির মুখারবিন্দ থেকে নিঃসৃত অমৃত আস্বাদন করবেন এবং যাঁরা অত্যন্ত ভাগ্যবান তাঁরা শ্রীরাধা ও গোপীনাথের মিলিত বিগ্রহ শ্রীগৌরহরির হৃদয় হতে নিঃসৃত অমৃত আস্বাদন করবেন।

এখানে সন্দেহ হতে পারে শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রথমে একাত্মা রূপে থাকলেও দেহ ভেদে দুই স্বরূপ রূপে প্রকটিত হয়েছেন। পূর্বে তাঁরা যদি প্রথমে এক ছিলেন অর্থাৎ কৃষ্ণ স্বরূপে ছিলেন, তবে সেই স্বরূপে রাধাজী ছিলেন না। সাধারণ লৌকিক দৃষ্টিতে এরকম সন্দেহ হলেও অপ্রাকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে সেরকম সন্দেহ উঠতে পারে না। অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণতে পরস্পর বিরোধ ভাবের

সামঞ্জস্য সম্ভব হতে পারে। এজন্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ এক হয়েও দুই স্বরূপে প্রকাশিত হয়ে নিত্য লীলাবিলাস রস আস্বাদন করেন। এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, দুই স্বরূপ হচ্ছে স্বভাব সিদ্ধ এবং নিত্য। আবার যদি শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ মিলিত হয়ে একরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে প্রকটিত হয়েছেন, তবে পূর্বের মতো এ আশঙ্কা হতে পারে, বর্তমান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকটিত হয়েছেন তবে তার পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন না কিংবা একাত্মাস্বরূপ পূর্বে শ্রীচৈতন্য-দেবই প্রকটিত ছিলেন, পরে রাধাকৃষ্ণ প্রকটিত হয়েছেন। প্রথমে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ছিলেন না—এরকম নানা আশঙ্কা উঠতে পারে। কিন্তু 'মহাবরাহ পুরাণে' উল্লেখ আছে—

সর্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজা ক্বচিৎ।
পরমানন্দসন্দোহাঃ জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্বতঃ।।

অর্থাৎ—"ভগবানের শরীর, তাঁর স্বরূপ নিত্য, শাশ্বত, পরমানন্দ-স্বরূপ তথা জ্ঞানপূর্ণ। এটি প্রাকৃত (ভৌতিক) শরীরের মতো উৎপত্তি অথবা বিনাশ হয় না। ভগবানের কোন অবতার আগে অথবা পরে আসেন, কিন্তু স্বরূপ হচ্ছে নিত্য।"

এক দিন নিশান্ত সময়ে শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "প্রিয়তম! আজ আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। এক স্থানে যমুনা সদৃশ একটি নদী আছে অর্থাৎ বৃন্দাবনের চতুর্পার্শ্বে যেমন যমুনা বেষ্টিত হয়েছে, ঠিক তেমনই সেই স্থানে এই নদীটি বেষ্টন করে রেখেছে। এই বৃন্দাবনের দৃশ্য যেমন মনোরম, সেই স্থানের দৃশ্য ঠিক তেমনই মনোরম। এই বৃন্দাবনে যেমন অধিকাংশ লোক নৃত্য কলাতে পারদর্শি, সেখানে লোকেরাও ঠিক তেমনই নৃত্যকলাতে পারদর্শি। এখানে যেমন মৃদঙ্গাদি বাদ্য আছে, সেখানে ঠিক তেমনই বাদ্য যন্ত্রাদি আছে। এখানে যেমন আমরা দুজন উপস্থিত আছি, সেখানেও তেমনই আমি এক অপূর্ব সুন্দর কিশোর দ্বিজমণিকে দেখেছি। সত্যি যেন এটি জানা গেল যে, গৌরকান্তিতে যুক্ত গৌরাঙ্গ বিপ্রবর এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রেম সমুদ্রে বিহার করছেন। এখানে স্পষ্টভাবে সূচিত হচ্ছে এই যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ দ্বারা লীলাবিশিষ্ট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দৃষ্টিগোচর। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার পূর্বে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা

সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিরাজমান ছিলেন। তাই ভগবানের সমস্ত অবতার এবং সমস্ত লীলা হচ্ছেন নিত্য। তারপর শ্রীরাধিকা বললেন—

কদাচিৎ কৃষ্ণেতি প্রলপতি রুদন কর্হিচিদসৌ-
ক্ব রাধে! হা হেতি শ্বসিতি পততি প্রোজ্ঝতি ধৃতিম্।
নটত্যুল্লাসেন ক্বচিদপি গণৈঃ স্বৈঃ প্রণয়িভি-
স্তৃণাদি ব্রহ্মান্তং জগদতিতরাং রোদয়তি সঃ।।

"সেই গৌরাঙ্গ সুন্দর কখনও কখনও হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ উচ্চারণ করতে করতে অতি করুণ স্বরে বিলাপ করছেন। তাঁর দুই নেত্র দিয়ে নিরন্তর অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। 'হা রাধে! তুমি কোথায়?' এই কথা বলতে বলতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ছেন। কখনও কখনও ধরণীর উপর পতিত হচ্ছেন তো কখন কখন অতি অধির হয়ে পড়ছেন। কখনও কখনও অতি আনন্দে নৃত্য করছেন তো কখনও কখনও নিজের পরিজনের কাছে প্রলাপ বক্‌তে বক্‌তে অচেতন হয়ে পড়ছেন। তাঁর এরূপ আচরণের দ্বারা তিনি তৃণ থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ক্রন্দন করাচ্ছেন।"

ততো বুদ্ধির্ভ্রান্তা মম সমজনি প্রেক্ষ্য কিমহো!
ভবেৎ সোঽয়ং কান্তঃ কিময়মহমেবাস্মি ন পরঃ।
অহং ক্ব প্রেয়ান্মম স কিল চেৎ ক্বাহমিতি
ঞ্চে ভ্রমো ভূয়ো ভূয়ানভবদথ নিদ্রাং গতবতী।।

"এই বিচিত্র ঘটনা দেখে আমার বুদ্ধি ভ্রান্ত হয়ে গেল। 'হে রাধে, তুমি কোথায়?' এই প্রকার নাম উচ্চারণ করতে দেখে আমি ভাবতে লাগলাম এই পুরুষ আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ নয় তো? যদি এটি সত্য হয় তবে আমি কোথায়? তারপর 'হে কৃষ্ণ! তুমি কোথায়?' এইসব প্রলাপ বাক্য শুনে আমি আবার ভাবতে লাগলাম এই বিপ্র হচ্ছি স্বয়ং আমি, সে অন্য কেউ নয়। যদি আমি সেই ব্যক্তি হই, তাহলে আমার প্রিয়তম মাধব কোথায়? এইভাবে আমার বারংবার ভ্রম জাত হলো। তারপর আমার চক্ষু মুদ্রিত হয়ে গেলো।"

প্রিয়ে! দৃষ্টা তাস্তাঃ কুতুকিনি! ময়া দর্শিতচরী-
রমেশাদ্যা মূর্ত্তীর্ন খলু ভবতী বিস্ময়মগাৎ।
কথং বিপ্রো বিস্মাপয়িতুমশকৎ ত্বাং তব কথং
তথা ভ্রান্তিং ধত্তে স হি ভবতি কো হন্ত! কিমিদম্।।

এই প্রকার শ্রীমতী রাধিকার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "প্রিয়ে! আমি তোমাকে অনন্তশায়ী নারায়ণ আদি আমার অনেক রূপ দর্শন করিয়েছি, কিন্তু সেসব দেখে তুমি কখনই বিস্মিত হওনি, পরন্তু আজ ঐ ব্রাহ্মণকে দেখে তুমি কেন বিস্মিত হচ্ছ? কুতুকিনী! তোমার চিত্ত কেন ভ্রান্ত হচ্ছে? এটা বড় আশ্চর্য কথা, সেই বিপ্র তাহলে কে?"

তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি একটি পূর্ব ঘটনার সূচনা প্রদান করছে। একটি দিনের ঘটনা—শ্রীমতী রাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে অবস্থিত একটি সঘন কুঞ্জের মধ্যে উপবেশন করে পরস্পরের মধ্যে প্রেমালাপ করছিলেন। প্রেমালাপের সময় শ্রীমতীজী শ্রীকৃষ্ণকে বললেন,—"মাধব! আমার মধ্যে বড় লালসা জাত হচ্ছে নারায়ণ মূর্তি ও রঘুনাথ মূর্তি দেখার জন্য। তাই তুমি এই দুই রূপ এখন আমাকে দেখাও।" প্রিয়াজীর এই প্রকার কৌতুকপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সেই দুই রূপ শ্রীমতীকে দর্শন করালেন। ব্রজে সেই শেষশায়ী নারায়ণ মূর্তি আজও বিদ্যমান আছেন।

অন্য আর একদিন শ্রীমতী রাধিকাজী পরস্পরের মধ্যে বার্তালাপ প্রসঙ্গে আবার বললেন—"প্রিয়তম! স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের মনোভাব লক্ষ্য করে তাদের হৃদগত সুখানুভূতি জানতে যেমন পটু, তেমনি পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের মনোভাব বুঝতে অক্ষম।" প্রত্যুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—"প্রিয়ে! তুমি ঠিক কথা বলেছ, কিন্তু আমরা ব্যাপারে এ কথা সত্য নয়। আমি অন্য এক রূপে তা অনুভব করতে পারি।" শ্রীমতী বললেন,—"তুমি মিথ্যা বলছ।" শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন—"আমি কখনো মিথ্যা বলি না।" শ্রীমতী রাধিকার কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নেতে তাঁকে (শ্রীমতীকে) তাঁর শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপ দর্শন করালেন।

ইতি প্রোচ্য প্রেষ্ঠাং ক্ষাণমথ পরামৃষ্য রমণো
হসন্নাকুতজ্ঞং ব্যনুদদথ তং কৌস্তভমণিম্।
তথা দীপ্তং তেনে সপদি স যথা দৃষ্টমিব ত
দ্বিলাসানাং সক্ষং স্থির চরগণৈঃ সর্বমভবৎ।।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে পূর্বোক্ত পরিহাসময় কথাগুলি বলে একটু চিন্তা করে হাসতে হাসতে নিজের কৌস্তভ মণিটাকে সঞ্চালন করলেন। কৌস্তভ মণি সঞ্চালনের অল্প সময়ের মধ্যে ঐ মণি এমনই দেদীপ্যমান হতে লাগল যাতে শ্রীমতীজী স্বপ্নাবস্থায় যেমন দর্শন করেছিলেন, ঠিক্ তেমনই স্থাবর জঙ্গম সহ

তাঁর (শ্রীমতীজী) বিলাসের সমস্ত চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হতে লাগল।

> বিভাব্যাথ প্রোচে প্রিয়তম! ময়া জ্ঞাতমখিলং
> তবাকূতং যত্ত্বং স্মিতমতনুথাস্তত্ত্বমসি সঃ।
> স্ফুটং যন্নাবাদীর্যদভিমতিরত্রাপ্যহমিতি
> স্ফুরন্তী মেতস্মাদহমপি স এবেত্যনুমিমে।।

ঐ সময় শ্রীরাধিকাজী প্রদীপ্ত কৌস্তুভমণির প্রভাব জাগ্রত অবস্থায়ও ঐ দৃশ্য দেখলেন, যা তিনি স্বপ্নাবস্থায় দেখেছিলেন। এরকম দেখার পর তিনি চিন্তা করতে লাগলেন—"আহা! আমার প্রাণনাথ এমনই চতুর যে যার কোন সীমা নেই।" পরে চিন্তা করে বলতে লাগলেন—"প্রিয়তম! আমি তোমার অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছি। আমি স্বপ্নাবস্থায় যে বিপ্রবরকে দেখেছিলাম, সেই বিপ্রবর গৌরাঙ্গ হচ্ছ সাক্ষাৎ তুমি; কেননা তোমার ঈষৎ হাসিতে তা প্রকাশ হয়ে গেছে যে সেই গৌরাঙ্গ হচ্ছ তুমি—তোমার অভিমান এমনই। পরন্তু তুমি আমার কাছে স্পষ্ট রূপে কিছু প্রকাশও করোনি, এজন্য আমার শরীরের মধ্যেও এরকম অভিমান স্ফুরিত হচ্ছে যে আমিও হচ্ছি গৌরাঙ্গ। আমাদের দু'জনার এরকম অভিমান হওয়ার কারণ থেকে এরূপ মনে হচ্ছে যে, তুমি ও আমি দু'জনেই মিলে গৌরাঙ্গ রূপ হয়েছি।"

> যদপ্যস্মাকীনং রতিপদমিদং কৌস্তুভমণিং
> প্রদীপ্যাত্রৈবাদীদৃশদখিলজীবানপি ভবান্।
> স্বশক্ত্যাবির্ভূয় স্বমখিলবিলাসং প্রতিজনং
> নিগদ্য প্রেমাব্ধৌ পুনরপি তদাধাস্যসি জগৎ।।

"প্রিয়তম! তুমি এই কৌস্তুভ মণিকে প্রদীপ্ত করে এই মণিতেই আমাদের রতিপদ অর্থাৎ রতি স্থান বার বার দেখালে। এ থেকে এরকম প্রতীত হচ্ছে যে, তুমি নিজেই নিজের সমস্ত শক্তি সহ আবির্ভূত হয়ে নিজেকে এবং নিজের নিখিল লীলা প্রত্যেক জীবের নিকট প্রকাশ করে আবার এই চরাচর জগতকে প্রেম-সাগরে নিমগ্ন করবে।"

> যদুক্তং গর্গেণ ব্রজপতিসমক্ষং শ্রুতিবিদা
> ভবেত পিতো বর্ণঃ ক্বচিদপি তবৈতন্ন হি মৃষা।
> অতঃ স্বপ্নঃ সত্যো মম চ ন তদা ভ্রান্তিরভব-
> ত্ত্বমেবাসৌ সাক্ষাদিহ যদনুভূতোহসি তদৃতম্।।

শ্রীমতীজী আবার বললেন—"প্রিয়তম! আমি শুনেছি তোমার নামকরণের সময় বেদজ্ঞ গর্গাচার্য মহাশয় শ্রীব্রজপতি (শ্রীব্রজরাজ) নন্দ মহারাজকে বলেছিলেন, হে নন্দ! তোমার এই পুত্র পূর্বে শুক্লবর্ণ এবং রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল। এখন ও কৃষ্ণবর্ণ হয়েছে কিন্তু আবার অন্য কোন যুগে পীতবর্ণও ধারণ করবে। আমার এই কথা কখনই মিথ্যা হবে না। অতএব, আমার স্বপ্ন সত্য—এ বিষয়ে আমার কোন ভ্রম (সন্দেহ) নেই। এই গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ তুমি যা অনুভব করেছ, তা-ও সত্য।"

> পিবেদ্ যস্য স্বপ্নামৃতামিদমহো! চিত্তমধুপঃ
> স সন্দেহস্বপ্নাত্ত্বরিতমিহ জাগর্ত্তি সুমতিঃ।
> অবাপ্তশ্চৈতন্যং প্রণয়জলধৌ খেলতি যতো
> ভৃশং ধত্তে তস্মিন্নতুলকরুণাং কুঞ্জনৃপতিঃ।।

"যাঁর চিত্তরূপ ভ্রমর এই বিচিত্র স্বপ্নামৃত অর্থৎ স্বপ্ন বিলাসামৃত পান করবে, সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি শীঘ্রই এই সন্দেহ রূপ স্বপ্নাবস্থা থেকে তখন মুক্ত হবেন, অর্থাৎ নন্দনন্দন কৃষ্ণই হচ্ছেন শ্রীশচীনন্দন গৌর অথবা গৌর নয়—এই সন্দেহ রূপ নিদ্রা থেকে তখন মুক্ত হবেন এবং শ্রীচৈতন্যকে লাভ করে প্রেম-সাগরে বিহার করবেন ; কেননা কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি অসীম করুণাময় হবেন, অর্থাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় পাত্র হবেন।"

অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, শ্রীগৌরসুন্দরই হচ্ছেন শ্যামসুন্দর। শ্রীগৌরলীলাই কৃষ্ণলীলা এবং কৃষ্ণলীলাই গৌরলীলা।

(হরে কৃষ্ণ)

শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথের প্রকাশ

৯ই মে ১৯৯৫ সালের রবিবার পবিত্র শ্রীরাম নবমী তিথিতে আমরা ইস্কনের শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলরাম মন্দির পরিসীমার মধ্যে নতুনভাবে নির্মিত পদ্ম মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ জীউর শুভ অভিষেক ও প্রতিষ্ঠা উৎসব এক মহাসমারোহে পালন করেছি। সেই সঙ্গে নব নির্মিত মন্দিরের শুভ উন্মোচনও উড়িষ্যার গজপতি শ্রীদিব্যসিংহ দেবের দ্বারা করিয়েছি। আমাদের এটাও মনে রাখা উচিত যে, ভুবনেশ্বরের শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলরাম মন্দির গত ২৮শে জানুয়ারী ১৯৯১ সালের পবিত্র শ্রীরাম নবমী তিথিতে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। অনুরূপভাবে বৃন্দাবনে অবস্থিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলরাম মন্দিরও ১৯৭৫ সালের পবিত্র শ্রীরাম নবমী তিথিতে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। বৃন্দাবনে নির্মিত কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই ও কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামসুন্দরও একটি সুসজ্জিত মণ্ডপে পূজিত হচ্ছেন। অনুরূপভাবে ভুবনেশ্বরস্থ কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই ও কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে শ্রীশ্রী জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার বিগ্রহও পূজা পাচ্ছেন। বৃন্দাবনের মতো এখানে রাধা-শ্যামসুন্দর নেই, এখানে শ্রীজগন্নাথ পূজিত হচ্ছেন। কারণ এই জগন্নাথ ধাম অথবা পুরুষোত্তম ধাম হচ্ছে বিপ্রলম্ভ ভাব অথবা বিরহভাবের ক্ষেত্র। এখানে জগন্নাথ রাধা-বিরহ-বিধুর। কিন্তু বৃন্দাবনে জগন্নাথের বিগ্রহ নেই। সেখানে রাধা-কৃষ্ণের সম্ভোগ লীলা। সেখানে তাঁদের নিত্য শাশ্বত মিলনের লীলা চলছে। আবার বৃন্দাবন হচ্ছে যূথেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীর ক্ষেত্র। সেখানে বিপ্রলম্ভ অথবা বিরহের কথা নেই। এই শ্রীক্ষেত্রে অথবা পুরুষোত্তম ধামে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ভক্তাবতার হয়ে আগমন করেছিলেন। তিনি শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে এসেছিলেন। রাধাভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ক্রন্দন করেছিলেন। তাঁর কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা ভাব। তিনি প্রতিদিন জগন্নাথকে দর্শন করতে যেতেন। মহাপ্রভু রাধাভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণ বিরহে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে গিয়ে দ্বারপালের হাত ধরে বলতেন,—"আমাকে আমার প্রাণ-নাথের সঙ্গে মিলন করিয়ে দাও।" শ্রীমন্ মহাপ্রভু যেহেতু এ লীলা করেছিলেন এখানে, তাই এ

ক্ষেত্রটি হল বিপ্রলম্ভ ক্ষেত্র। জগন্নাথ হচ্ছেন কৃষ্ণ। তিনি রাধা-বিরহ-বিধুর। গৌরাঙ্গও হচ্ছেন কৃষ্ণ। তিনি রাধাভাব এবং কান্তি ধরে কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা হয়েছেন। তাই যখন জগন্নাথ গৌরাঙ্গকে দেখতেন, তখন তিনি রাধারূপ দেখতেন। ঠিক্ তেমনই মহাপ্রভু যখন জগন্নাথকে দেখতেন, তখন তিনি শ্যামসুন্দরকে দেখে বলতেন, "আরে, আমার প্রাণনাথ।" এখানে বিরহতে মিলন হতো। এ হলো এই ক্ষেত্রের কথা। এই শ্রীক্ষেত্র শঙ্খক্ষেত্র নামেও খ্যাত। শঙ্খক্ষেত্রের শুরু এই ভুবনেশ্বর থেকে। এখানে ক্ষেত্রপাল শ্রীশিবজীর মন্দির রয়েছে। তিনি হলেন শ্রীক্ষেত্রের দ্বারপাল। তাঁর কৃপায় শ্রীক্ষেত্র গমন সম্ভব। এই ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা যে হস্ত, পদ সঙ্কুচিত এবং চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে বিরাজমান করছেন তার গূঢ় তাৎপর্য রয়েছে। শ্রীজগন্নাথ তাঁর এই রাধা-বিরহ-বিধুর রূপে মহাভাব প্রকাশ করেছেন। যখন মথুরা থেকে অক্রূর এসে রাম কৃষ্ণকে রথেতে বসিয়ে মথুরাতে নিয়ে গেলেন, তখন গোপ-গোপিরা তথা সমস্ত ব্রজবাসী কৃষ্ণ-বিরহে ব্যথিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের অবস্থা ছিল মৃতপ্রায়। সেখানে সকলে তীব্র-বিরহ-বেদনা অনুভব করেছিলেন। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ রয়েছে। ভক্ত যে কেবল ভগবানের বিরহ অনুভব করেন, আর ভগবান্ কি সেই ভক্ত বিরহ অনুভব করেন না ? হ্যাঁ, তিনি নিশ্চয় অনুভব করেন। কৃষ্ণ গেলেন মথুরাতে, তারপর সেখান থেকে দ্বারকাতে গিয়ে সেখানে রাজা হলেন। ষোল হাজার এক শ' আট স্ত্রী বিবাহ করলেন। সকলেই তাঁর সেবায় ব্যস্ত ; কিন্তু তাঁর মনেতে আনন্দ ছিল না। রাধারাণীর বিরহ, গোপিদের বিরহ তাঁর হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। কখনও কখনও তিনি সেই বিরহে সংজ্ঞাহীন হয়ে যেতেন। তিনি শুয়ে থাকা অবস্থায় আপনমনে মুখে 'রাধে, রাধে, রাধে' নাম উচ্চারণ করতেন। এদিকে কিন্তু সকল রাণীদের মধ্যে এক ভয়ের সঞ্চার হল। এ কি? আমরা তো এত সেবা করছি ; কিন্তু ইনি সদাসর্বদাই এ কি 'রাধে, রাধে' বলছেন। এক দিনের ঘটনা,—শ্রীমতী রাধারাণীর চিন্তা করে তাঁর বিরহে বিধুর হয়ে কৃষ্ণ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন।

দৈবদ্বারা প্রেরিত হয়ে কিছু সময় পর সেখানে উপস্থিত হলেন নারদ মুনি এবং সেই সঙ্গে উদ্ধবও। তাঁরা ভগবানের প্রিয় ভাজন, আবার সর্বজ্ঞ ; সুতরাং কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবে বিভাবিত হয়ে একটি

চরম রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে চলেছেন ; তথাপি তাঁরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন কিভাবে কৃষ্ণের সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনা যায় । ইতিমধ্যে শ্রীবলরাম নিজেকে প্রকৃতিস্থ করতে পেরেছেন। তখন তিনজন মিলে যুক্তি করলেন এবং সমাধানে এলেন—বর্তমান যদি নারদ মুনি তাঁর বীণাযন্ত্রে মধুর স্বরে ব্রজের মহিমা কীর্তন করেন, তাহলে কৃষ্ণ নিশ্চয় খুব শীঘ্র জেগে উঠবেন। নারদ স্বীকৃতি দিলেন। তবে খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে বিচার করে বললেন, যে মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ জেগে উঠবেন, সেই মুহূর্তে তিনি নিশ্চয় সব অনুরোধ উপেক্ষা করে সঙ্গে সঙ্গে ব্রজ অভিমুখে ছুটবেন। তাই প্রথমে দারুককে ডেকে রথ সাজিয়ে রাখা আবশ্যক। উদ্ধব অধিক গভীর ও বিচক্ষণতার সঙ্গে বিচার করে বললেন, তা ঠিক্ কথা। তবে তিনি বললেন, তিনি যা বুঝেছেন, বর্তমান ব্রজে যে পরিস্থিতি, কৃষ্ণ যদি সেখানে যান এবং ব্রজের আর্তনাদ শোনেন, তাহলে তিনি তা সহ্য করতে পারবেন না। যার ফলে পরিস্থিতি অধিক জটিল হয়ে উঠবে, আবার তাঁকে ফিরে পাওয়া অতি দুষ্কর হয়ে উঠবে। একথা শুনে নারদ উদ্ধবকে বললেন, "উদ্ধব, তুমি তো সব সময় কৃষ্ণের দূতগিরি করে থাকো। আমার মনে হয়, তুমি আগে ব্রজেতে যাও। সেখানে সমস্ত ব্রজবাসীকে জানিয়ে দাও যে দ্বারকা হতে কৃষ্ণ ব্রজ অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছেন।" উদ্ধব এ কথা শুনে খুব বিমর্ষ হয়ে বললেন, "আপনার কথা শিরোধার্য।" তবে এটি খুব পরিতাপের বিষয় আপনি এটি নিশ্চয় অবগত আছেন, আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতে থাকাকালে তাঁরা দূতরূপে আমাকে ব্রজেতে প্রেরণ করেছিলেন। তখন আমি তাঁদেরকে আর সান্ত্বনা কি দেব, আমার প্রভুর বিরহে তাঁদের যে অবস্থা, তা দেখে আমি তাঁদেরকে বলেছিলাম, "আমি শীঘ্র ফিরে গিয়ে তাঁকে (কৃষ্ণকে) ব্রজে আসার জন্য সবিনয় অনুরোধ করব।" কিন্তু তা আজ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি। আজ যদি এত দীর্ঘদিনের ব্যবধানের পর আমি ব্রজেতে যাবো, তাহলে ব্রজবাসীরা আর আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। উপরন্তু আমাকে প্রতারক বলে ভর্ৎসনা করবেন। তখন তিনি সব দিক দিয়ে বিচার করে প্রভু বলরামকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন।

শ্রীবলরাম খুবই আক্রোশবশে এবং বেদনাভরা ভাষায় বললেন, "দেখ নারদ, আমি আগেই ব্রজে চলে যেতাম, তোমাদের বলবার কারোর অপেক্ষা রাখতাম না।" তবে চিন্তা করে দেখ, তোমাদের প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র 'যাব যাব' বলে

কেবল সময় অতিবাহিত করছে দেখে আমি নিজেই ব্রজবাসীদের পরিস্থিতি চিন্তা করে তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারব বলে বিশ্বাস করে ব্রজে ছুটেছিলাম। দুই মাস ধরে তাঁদেরকে কত বুঝিয়েছি, "কৃষ্ণ এই আসছে, কৃষ্ণ এই আসছে," কিন্তু তাঁরা জলবিহীন মীনের মত কৃষ্ণের বিরহে যে চরম আর্ত হয়ে উঠেছেন। সেখানে দেখা গেল কৃষ্ণের উপস্থিতি ব্যতীত তাদের সান্ত্বনার কেউ নেই। কৃষ্ণ-বিরহে তাঁরা মৃতপ্রায়। তথাপি ব্রজে কৃষ্ণের আবির্ভাব একমাত্র তাঁদের পক্ষে সঞ্জীবনীর কাজ করতে পারে জেনে, আমি বিশেষ করে মা যশোদার চরণ স্পর্শ করে বলে এসেছিলাম, "মা, আমি খুব শীঘ্র দ্বারকায় পৌঁছে কৃষ্ণ যাতে ব্রজে আসার জন্য কাল বিলম্ব না করে, তা'র ব্যবস্থা করব। মা, তুমি কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর।" সে যা অবস্থা কৃষ্ণের নামামৃত কেবল তাঁদের প্রাণ রক্ষা করেছিল। হায়! আমি দ্বারকায় ফিরে এসে কৃষ্ণকে কত অনুরোধ করলাম। "ভাই, তোমার সব কাজ ফেলে রেখে ব্রজে ছুটে যাও। তোমার অতি প্রিয় ব্রজবাসীদের প্রাণ রক্ষা কর। ইতিপূর্বে সে কোনও দিন আমার কথা উপেক্ষা করেনি। কিন্তু এবার 'যাব' 'যাব' বলেও এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তার আর ব্রজে যাওয়া হল না। হে সবজ্ঞ নারদ, তুমি বল আমি এখন ব্রজে গিয়ে মা যশোদাকে কিছু বললে তিনি কি আর আমাকে বিশ্বাস করতে পারবেন ? হায়, ব্রজবাসীরা তোমরা কি এখন বেঁচে আছ ? ওহে কমল হৃদয় ভাই কৃষ্ণ! তোমার হৃদয় এত কঠিন হ'ল" ? এইকথা বলতে বলতে বলদেব অতি ব্যথিত হৃদয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তখন বুদ্ধিমতী সুভদ্রা আবেগের সহিত বলে উঠলেন, "আপনারা চিন্তা করবেন না। আমি আগে ব্রজে যাচ্ছি। আমি নারী জাতি। আমি ব্রজেতে গিয়ে মা যশোদার কোলে বসে চোখের জল মুছে দিয়ে বলব, 'মাগো', তোমার কৃষ্ণ এই এখনই এসে যাবে। আমরা ভাই বোনে দুজনে একসঙ্গে দ্বারকা থেকে রওনা দিয়েছি। তবে পথে কৃষ্ণকে স্বাগত জানানোর জন্য কত রাজা মহারাজারা তোরণ নির্মাণ করেছেন, অগণিত দেবতুল্য নর-নারীগণ পূজার উপকরণ নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাই তাঁর আসতে একটু দেরি হচ্ছে দেখে, আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে আগে এখানে ছুটে এসেছি তোমাকে এই শুভ সংবাদ দেবার জন্যে। অনুরূপ আমি প্রতিটি গোপীর কাছে গিয়েও সান্ত্বনা দেব, "পুরুষ জাতি স্বাভাবিক ভাবেই একটু কুটিল, কিন্তু ব্রজের জনগণ সরল। সুতরাং আমার মতো নারীর কথা তাঁরা বিশ্বাস করবেন

এবং কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তাঁদের দুঃখ ভুলে গিয়ে আগমন-মহোৎসব অনুষ্ঠান করবেন।"

এই প্রস্তাবে তিনজনই সমর্থন করলেন। রথ সাজানোর কথা বলা হল। তখন বলদেবও চিন্তা করে দেখলেন বিশেষকরে ব্রজের প্রতি তাঁর অনুরাগ আছে এবং ভাই কানাইকে ছেড়ে থাকবেন কি করে ? সুতরাং তিনিও মনস্থ করলেন সুভদ্রার সঙ্গে তিনিও একটি রথে আরোহণ করে ব্রজে রওনা দেবেন। তারপর তিনটি রথ সাজানো হ'ল। উদ্ধব ও নারদ কথা দিলেন, পরের রথে তাঁরা কৃষ্ণকে পাঠাচ্ছেন। তখন আর কাল বিলম্ব না করে বলরাম ও সুভদ্রা দেবী স্ব স্ব রথে আরোহণ করে ব্রজ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

এখন নারদ তাঁর বীণাযন্ত্রে ব্রজগোপীদের প্রেমবার্তা কীর্তন শুরু করে দিলেন। যে মুহূর্তে ঐ অপ্রাকৃত ধ্বনি কৃষ্ণের কর্ণে ঝঙ্কৃত হ'ল, তখন সেই মুহূর্তেই কৃষ্ণ কেবল জেগে উঠলেন না, তিনি লম্ফ দিয়ে উঠে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা হয়ে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'কে আমার সেই মোহন মুরলী হরণ করে নিল?' এটা সেই গোপীদের কাজ।"এই কথা বলে গোপীদের অন্বেষণে ধাবিত হবেন, তখন উদ্ধবকে দেখে বললেন, "তুমি এখন এই ব্রজে কেন ? আবার পরক্ষণে নারদকে দেখেই চিন্তা করতে লাগলেন, ঋষিপ্রবর নারদ যখন এখানে উপস্থিত আছেন, তখন এটা কি ব্রজ নয় ?" তখন উদ্ধব ও নারদ উভয়েই বললেন, "প্রভু, আপনি ব্রজে গমন করবেন বলেই তো এই রথ এখানে আনা হয়েছে, দয়া করে রথে আরোহণ করুন। তখন রাধার ভাবে বিভাবিত মাতালের ন্যায় টল্‌মল্ করতে করতে উভয়ের সাহায্য নিয়ে রথে আরোহণ করলেন। দারুক নারদের নির্দেশ পেয়ে বায়ুবেগে রথ চালনা শুরু করে দিলেন।

এদিকে বলভদ্রের রথ ব্রজসীমানায় প্রবেশ করা মাত্রেই ব্রজের যে রূপ দর্শন করলেন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন, এখনও কি ব্রজবাসীদের প্রাণ আছে ? এই দুই ভাবের সমাবেশে দেখা গেল, তিনি অষ্টসাত্ত্বিক বিকার স্বরূপ মহাভাবের পরাকাষ্ঠার পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেলেন। অন্তরের ভাব দেহে প্রকাশ পেল, কারণ দেহ দেহী অভেদ। অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার সিদ্ধ অবয়বে প্রকাশ পায়। তাই শ্রীবলদেবের অন্তরের ভাবটি তাঁর চিদানন্দ দেহে যে অপ্রাকৃত স্বরূপটি গ্রহণ করল, ঠিক সেই রূপেই তাঁকে আমরা

শ্রীনীলাচলে জগন্নাথের বিগ্রহের সঙ্গে বলরামকে দেখি। সেইরূপ সুভদ্রাদেবীরও আর মা যশোদার কাছে যাওয়া সম্ভবপর হল না। তাঁরও পরিস্থিতি হল অনুরূপ। এটি হচ্ছে একটি বৈচিত্র্যময় সর্বতোভাবে অবিজ্ঞাত অপ্রাকৃত স্বরূপ-মাধুরীতে ব্রজরস মাধুরিমা সমুদ্রে অবগাহন।

ঠিক এমন সময়েই শ্রীকৃষ্ণের রথ এসে পৌঁছালো ব্রজ সীমায়। শ্রীকৃষ্ণ রথ থেকে লম্ফ দিয়ে ব্রজভূমি স্পর্শ করলেন। এখন যেন আবার যোগমায়া বিশেষ লীলা পুষ্টি এমনভাবে করে চললেন, যেন শ্রীকৃষ্ণ দৈবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্খলিত পদে উপস্থিত হলেন সেই নিধুবনে। আর তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হল, "হে রাধে, দেহি পদ পল্লব মুদারম্।" তখনই দেখা গেল তাঁর সেই চরম বৈচিত্র্যময় রূপ—সেই রাধার বিরহভাব-স্বরূপ নিয়ে প্রকাশিত হল। তাঁর হস্ত পদ কূর্মের মত অন্তর্গত হয়ে গেল। আর তাঁর বিস্ফারিত নেত্রে শ্রীরাধার প্রতি ঈক্ষণ করেই তিনি সংজ্ঞাহারা হলেন। এ যেন রাধাভাব সিন্ধুতে ভাসমান।

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ স্পর্শ করে যে বায়ু প্রবাহিত হল, তা শ্রীমতীর অঙ্গ স্পর্শ করলে তা যেন মৃত দেহে সঞ্জীবনী রূপে কাজ করল। এদিকে সেই মুহূর্তে শ্রীমতী ললিতা শ্রীমতী রাধিকার কর্ণে মৃদু মৃদু স্বরে শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্তা জানিয়ে দিলেন। তা মৃত প্রায় শ্রীমতীর হৃদয়ে জীবনী শক্তির স্পন্দন সংঘটিত হল। শ্রীমতী আস্তে আস্তে চোখ খুলেই প্রাণবল্লভকে দর্শন করা মাত্রেই তাঁর সবকিছু বিরহ বেদনা ভুলে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের তখন প্রায় সংজ্ঞাহারা অবস্থা দেখে শ্রীমতী তাঁর প্রিয় সখী বিশাখাকে নির্দেশ দিলেন শ্রীকৃষ্ণের সাহচর্যার্থে। বিশাখা জানেন এখন কি সঞ্জীবনী শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে মৃদুস্বরে রাধানাম উচ্চারণ করায় শ্রীকৃষ্ণ আস্তে আস্তে চক্ষু উন্মীলন করলেন। শ্যামের নয়নদ্বয় শ্রীমতীর নয়নদ্বয়ের ওপর দৃষ্টি পড়ায় উভয়েই পূর্ব স্মৃতি ভুলে গেলেন। কোথায় রইল শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা বাস, আর কোথায় গেল শ্রীমতীর সেই বিরহ সন্তাপ। উভয়ে দেখলেন, এখন রত্নসিংহাসনে বিরাজিত রাধা ও কৃষ্ণ আজ এখানে শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ রূপে বিরাজমান। এ হচ্ছেন রাধা-গোপীনাথের প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বক্র কটাক্ষে অনঙ্গ নয়নে শ্রীমতীর বক্ষ বিদীর্ণ করে আর এক দিকে শ্রীমতীর মুখপদ্ম মধু পান করতে করতে এখন উভয়ে বসেছেন দিব্য রত্নসিংহাসনে। তাঁর মধুরিমা স্খলিত ভাষায় বললেন, "হে রাধে। তত্ত্বতঃ আমাদের দু'জনার বিরহ কোথায়?

আমি সদাসর্বদা এই শ্রীক্ষেত্রে প্রকটিত থাকব এবং তোমার সেই ভাব-মাধুর্য ও রূপ অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে আমি আমার সেই স্বরূপ উপলব্ধি করবার যত্ন করব। আবার ভাই বলরাম ও ভগ্নী সুভদ্রা যাঁরা বিরহের পর মিলনের সহায়ক হয়েছেন এবং ব্রজে প্রবেশ করে তাঁদের যে স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে, আমি তাঁদেরকেও সঙ্গে নেব। সুতরাং রাধা প্রেম রস-সমুদ্রে ভাসমান তিনখণ্ড দারুতে শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা এই রূপ প্রকাশ করে শ্রীক্ষেত্রে নীলাচলে শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত থাকব। আর আমার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপটি হচ্ছে বিরহের পর যে মিলন—

রসরাজ মহাভাব এক তনু হয়া।
নাম সংকীর্তন রসে জগত মাতাইয়া।।

এইভাবে 'অনর্পিত চরিং চিরাৎ' প্রেম নিজে আস্বাদন মুখে পরম সৌভাগ্যবান্ জীবকে এটি আস্বাদন করবার সৌভাগ্য দান করব। এই ব্রজের গোপ গোপিগণ আমাদের উভয়ের মিলিত তনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মাধুর্য লীলার পরিকররূপে বিহার করবেন। এ হচ্ছে এই ক্ষেত্রের তাৎপর্য। সেই জন্য এই রূপ পরিগ্রহ। আমাদের পরমারাধ্যতম গুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্ এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই সব তত্ত্ব ভালভাবে জানতেন। যদিও সেই একই 'কৃষ্ণ বলরাম মন্দির' বৃন্দাবন ও ভুবনেশ্বরে, তথাপি তিনি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে এই ব্যতিক্রম করলেন। সেখানে অর্থাৎ বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণ রয়েছেন। আর এখানে অর্থাৎ ভুবনেশ্বরে জগন্নাথ , বলভদ্র ও সুভদ্রা রয়েছেন। রাধা-বিরহ-বিধুর রূপ কৃষ্ণের জগন্নাথ রূপ। আর কৃষ্ণ রাধাভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা রূপ হয়েছে চৈতন্যের। জগন্নাথ দেখেন চৈতন্যের মধ্যে রাধাকে আর চৈতন্য দেখেন জগন্নাথের মধ্যে কৃষ্ণকে। এ হচ্ছে কথা। তবে বহু লোক প্রশ্ন করেন—এখানে কেন রাধা-কৃষ্ণ নেই? তখন আমরা বলে থাকি এসব তত্ত্বকথা বুঝতে পারবে না। রাধা এখানে রয়েছেন। রাধা-কৃষ্ণের মিলিত তনু শ্রীচৈতন্য রয়েছেন। জগন্নাথ চৈতন্যের মধ্যে রাধাকে দর্শন করেন। সাধারণ লোক এটি বুঝতে পারবে না। রাধা দরকার। তাই অবশ্য গোপীনাথ এখানে রয়েছেন। আমাদের প্রসিদ্ধ এই পুরীক্ষেত্রে তোটা গোপীনাথ রয়েছেন। মহাপ্রভু প্রতিদিন তোটা গোপীনাথকে দর্শন করতে যেতেন। সত্যবাদীতে সাক্ষী গোপীনাথ রয়েছেন। রেমুণাতে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ রয়েছেন। এটি হচ্ছে গোপীনাথের ক্ষেত্র। তাই

গোপীনাথ কেন প্রকাশ হবেন না? এটাও জগন্নাথের ক্ষেত্র। জগন্নাথ ক্ষেত্র এখান থেকে অর্থাৎ ভুবনেশ্বর থেকে আরম্ভ হয়েছে। এখানেও গোপীনাথের প্রকাশের আবশ্যকতা রয়েছে। এর আরোও একটি কারণ রয়েছে। গোপীনাথ হচ্ছেন প্রয়োজন-তত্ত্ব। আমাদের ভক্তিযোগে ত্রি-তত্ত্বের কথা রয়েছে—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। সম্বন্ধাধিদেব হচ্ছেন—রাধামদনমোহন, অভিধেয়াধিদেব হচ্ছেন—রাধাগোবিন্দ এবং প্রয়োজন হচ্ছে প্রেম। আর সেই প্রয়োজনাধিদেব হচ্ছেন—রাধাগোপীনাথ। সেই প্রয়োজনাধিদেবের প্রণাম মন্ত্র হচ্ছে—

শ্রীমন্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্ গোপীর্ গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ।।

রাধা বিনা কৃষ্ণ থাকতে পারেন না। নিত্যকাল কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে রয়েছেন। তিনি রাধা-বিরহে-বিধুর হয়ে জগন্নাথ রূপ পরিগ্রহ করেছেন। কৃষ্ণকে ছেড়ে রাধাও থাকতে পারেন না। সেইজন্য গৌড়ীয় সাধুগণ, আচার্যগণ এইসব তত্ত্ব পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করেছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাজন যিনি সপ্তম গোস্বামী নামে পরিচিত তিনিও অনুরূপ কথা বলেছেন। তিনি একটি গীত গান করেছেন—

শতকোটী গোপী মাধব-মন।
রাখিতে নারিল করি' যতন।।
বেণুগীতে ডাকে রাধিকা-নাম।
'এস এস রাধে' ডাকয়ে শ্যাম।।
ভাঙ্গিয়া শ্রীরাস- মণ্ডল তবে।
রাধা-অন্বেষণে চলয়ে যবে।।
'দেখা দিয়া রাধে রাখহ প্রাণ'।
বলিয়া কাঁদয়ে কাননে কান।।
নির্জন কাননে রাধারে ধরি'।
মিলিয়া পরাণ জুড়ায় হরি।।
বলে তুঁহ বিনা কাহার রাস?
তুঁহ লাগি' মোর বরজ-বাস।।
এ হেন রাধিকা- চরণ তলে।
ভকতিবিনোদ কাঁদিয়া বলে।।

'তুয়া গণ-মাঝে আমারে গণি'।
কিঙ্করী করিয়া রাখ আপনি'।।

এই সঙ্গীতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন,— "তুঁহু লাগি মোর বরজ বাস।।" রাধা যদি ব্রজ ভূমিতে না থাকবেন, তাহলে কৃষ্ণও থাকবেন না। ব্রজে রাসও হতে পারবে না। তাই এ যেহেতু বৃন্দাবন, এখানে আমাদের পরমারাধ্যতম গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদ এসব প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাই এখানে রাধা প্রকাশ না পাওয়ার কিছু কারণ নেই? কৃষ্ণ রাধাকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না। কৃষ্ণের জন্য রাধা নিশ্চয় প্রকাশমান হবেন। আমাদের কৃষ্ণবলরামের পূজারী শ্রীপাদ শঙ্কর পণ্ডিত প্রভু দুই তিনবার স্বপ্ন দেখেছেন যে কৃষ্ণ পালিয়ে যাচ্ছেন রাধা নেই বলে। তাই অবশ্য রাধা প্রকাশ পাবেন। তবে আপনাদের অন্তরের আর্তী, প্রার্থনা শ্রবণ, ভক্তজনের কৃপায়, বৈষ্ণবদের কৃপাশীর্বাদে শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথ মন্দির আজ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথ প্রকাশমান হয়েছেন। তাই গোপীনাথের কাছে আমরা আমাদের প্রার্থনা জানাই—

গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন।
বিষয়ী দুর্জন, সদা কামরত,
কিছু নাহি মোর গুণ।।১।।
গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি।
তোমার চরণে, লইনু শরণ,
তোমার কিঙ্কর আমি।।২।।
গোপীনাথ, কেমনে শোধিবে মোরে।
না জানি ভকতি, কর্মে জড়মতি,
পড়েছি সংসার-ঘোরে।।৩।।
গোপীনাথ, সকলি তোমার মায়া।
নাহি মম বল, জ্ঞান সুনির্মল,
স্বাধীন নহে এ কায়া।।৪।।
গোপীনাথ, নিয়ত চরণে স্থান।
মাগে এ পামর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
করহে করুণা দান।।৫।।

গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি পার।
দুর্জনে তারিতে, তোমার শকতি
কে আছে পাপীর আর।।৬।।
গোপীনাথ, তুমি কৃপা-পারাবার।
জীবের কারণে, আসিয়া প্রপঞ্চে,
লীলা কৈলে সুবিস্তার।।৭।।
গোপীনাথ, আমি কি দোষে দোষী।
অসুর সকল, পাইল চরণ,
বিনোদ থাকিল বসি'।।৮।।

আজ শ্রীরাধা-গোপীনাথের প্রতিষ্ঠা উৎসব। আজ শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথের প্রকাশমান তিথিতে আমাদের এই প্রার্থনা শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথের কাছে, তাঁরা আমাদেরকে তাঁদের চরণে স্থান দেন। এই প্রার্থনা আমাদের সকলের হওয়া উচিৎ। অপার কৃপা পারাবার তাঁরা। আপনারা কাঁদতে কাঁদতে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তাঁদের করুণা প্রার্থনা করুন। অবশ্য তাঁরা আমাদেরকে তাঁদের চরণে স্থান দেবেন। আমাদের জীবনের যে পরম লক্ষ্য—প্রয়োজন তত্ত্ব কৃষ্ণপ্রেম, যা'র অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হচ্ছেন শ্রীরাধা-গোপীনাথ, তাঁদের কৃপা হলে আমরা সেই প্রেম প্রাপ্ত হতে পারব। জয় শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ কি জয়।

(হরিবোল)

যমুনাদেবী শ্রীবলরামের কাছে প্রর্থনা করছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীগৌর

কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাবদান্য অবতার শ্রীগৌর অবতার

প্রতি বছর ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিটি পৃথিবীর সর্বত্র গৌর আবির্ভাব তিথি বা গৌরপূর্ণিমা রূপে পরিপালিত হচ্ছে। সেই গৌরপূর্ণিমা আমাদেরকে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষ করে গৌরভক্ত বৈষ্ণবগণ মহা-আড়ম্বর সহকারে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিটি পালন করেন। আগামী গৌরপূর্ণিমা তিথিটি অতি নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। এই তিথিটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কথা আমাদের মানস পটে স্বতঃ স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই এই অবসরে আমরা মহাবদান্য অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বদান্যতা সম্বন্ধে দুই চারটি পদ-কথা কীর্তন করতে প্রয়াসী হয়েছি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামীর নিম্নোক্তি আছে—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।

অর্থাৎ—সকল দাতার মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা, যিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে কৃষ্ণ-প্রেমলীলা প্রকট করেন, যিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, যাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, যাঁর রূপ গৌরবর্ণ তাঁকে আমি প্রণাম করি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুতে সর্বোত্তম দানশীলতা আছে এবং তিনি হচ্ছেন প্রেমময় বিগ্রহ। শ্রীল রূপগোস্বামীর এই প্রণাম মন্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, শ্রীমান্ চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন মহাবদান্য অবতার। তাঁকে কেন মহাবদান্য অবতার বলা হয়েছে? তিনি কি দিয়েছেন? শ্রীল রূপগোস্বামীর মন্ত্রতে তা প্রদত্ত হয়েছে। "কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে"—তিনি কৃষ্ণ প্রেম প্রদান করেছেন। এজন্য তিনি মহাবদান্য অবতার হয়েছেন। পূর্বে অন্য কোনও অবতারে কৃষ্ণ প্রেম প্রদত্ত হয়নি। তাই—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।

হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।।
(বিদগ্ধমাধব প্রথমাঙ্কে শ্লোক—২, চৈ.চ.আ. ১/৪)

"তোমাদের হৃদয়-গুহাতে শ্রী শচীনন্দন উদিত হোন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান হরি। তিনি পূর্বে অন্যান্য অবতারে জগতে যা দান করেছিলেন, সেই সকল দান থেকে সর্ব- বিষয়ে শ্রেষ্ঠ দান, পূর্বে যা কখনো দেওয়া হয়নি—সেরকম অপূর্ব দান জগতে প্রদান করার জন্য তিনি এসেছিলেন।"

যা মানুষ জানে বা জানতে পারে, সেরকম কোনও কথা বলার জন্য শ্রীগৌর সুন্দর আসেননি। আবার যা ভগবানের বিভিন্ন অবতারের দ্বারা কখনো প্রচারিত হয়নি তাই জগতকে প্রদান করার জন্য শ্রীগৌরহরি এসেছিলেন। আমাদের মতো পতিত পাষণ্ডী অক্ষজ জ্ঞান প্রতারিত ব্যক্তিদেরকে কৃপাপূর্বক চরম মঙ্গল প্রদান করার জন্য তিনি উদ্যত, সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে প্রদান করতে তিনি সর্বদা উদ্‌গ্রীব। তিনি আমাদেরকে এক মহাদান প্রদান করতে উদ্যত, যার ফলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু আমাদের করতলগত হয়ে আমাদের নিত্য সেব্য রূপে সর্বদা আমাদের কাছে থাকতে পারবে। এ হচ্ছে মহাবদান্য মহান্ দয়ালু শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অপরিসীম দান।

পাঁচটি মুখ্যরস আছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য। জীব মাত্রেই এই পাঁচটি রসের মধ্য হতে যে কোনও একটি রসের সঙ্গে সম্বন্ধিত হয়ে সেব্যবস্তু কৃষ্ণের সেবা করা উচিত। সেই কৃষ্ণ প্রেমময়, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত ঔদার্য তাঁর নিকটে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। তিনি প্রেমবশ্য, প্রেমের ঠাকুর। তিনি পরিপূর্ণ বস্তু সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর! অখিল রসামৃত সিন্ধু। সুতরাং সজ্জনদের উপাস্য বস্তু। ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে তাঁর প্রীতি হয় না। যে প্রেমে তিনি স্বয়ং বশীভূত হন, তা তিনি নিজেই প্রদান করবেন। তা অন্য কোনও অবতার দিতে পারেন না।

"আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে"
—(চৈ.চ.আ. ৩/২৬)।

তাই কৃষ্ণ গৌররূপে সেই প্রেম প্রদান করে মহাবদান্য অবতার হয়েছেন। গৌরাবতার পূর্ণতম অবতার, অংশাবতার নন।

পূর্বে আমরা পাঁচটি মুখ্য রসের কথা বলেছি। সেই পাঁচটি মুখ্য রসের মধ্যে সর্বোত্তম রসটি হচ্ছে—মাধুর্য রস। সেটাই হচ্ছে উন্নত, উজ্জ্বল রস। সেই রসটি শ্রীগৌর সুন্দর এই জগতবাসীকে প্রদান করেছেন। বৈকুণ্ঠাদিতে কৃষ্ণের বিলাস মূর্তি শ্রীনারায়ণ বা বিষ্ণু আছেন। সেই বৈকুণ্ঠে আড়াইটি রস বিদ্যমান। তা হচ্ছে শান্ত, দাস্য ও সখ্য রসের অর্ধেক অর্থাৎ সম্ভ্রম সখ্য। সেখানে বিশ্রম্ভ সখ্য দেখা যায় না। তাই সেখানে উন্নতোজ্জ্বল রস নেই। যাঁরা সেই বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের উপাসক, তাঁদের উন্নত উজ্জ্বল রসে প্রবেশাধিকার হয় না।

আমাদের পরম গুরু শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেছেন—"শ্রীগৌরসুন্দর জীবদেরকে বলছেন, তোমরা কেন আর আড়াইটা রস বাদ দিয়ে সম্বন্ধ ক্ষুণ্ণ করছ?" তখন তিনি আরো আড়াইটা রসের কথা বলেন। উন্নত ও উজ্জ্বল এই দু'টি রস বালকৃষ্ণের উপাসনাতে নেই। মধুর রসে উজ্জ্বলের পরম উন্নতি। সেই রসটা শ্রীগৌরসুন্দর এই জগতকে প্রদান করেছেন। শ্রীরাধামাধবের উন্নত, উজ্জ্বল রস ইতিপূর্বে কোনও অবতারে বিতরিত হয়নি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগে জীবের প্রতি করুণা পরায়ণ হয়ে এই উন্নত, উজ্জ্বল রস পাত্রাপাত্র বিচার না করে যাকে তাকে বিতরণ করে দিয়ে গেছেন। আমরা তাঁর চরণে একান্তভাবে শরণাগত হলে অনর্থ নিবৃত্তিক্রমে স্বরূপাবস্থানে সেই রস আস্বাদন করতে পারব। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা কিরূপে সুষ্ঠুভাবে অনুশীলন করা যায়, তা শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং আচরণ করে শুশ্রূষু জীবদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। মধুর রসের সেবার উৎকর্ষ একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাতেই মেলে।

কৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর। উন্নত, উজ্জ্বল রসে সেই ভগবান যিনি আমাদের নিজজন, তাঁকে যে মধুর রসে সেবা করা যায়, তা শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। জীবনমুক্ত পুরুষগণ কিভাবে ভগবানকে অহৈতুকী ভক্তি বিধান করেন, তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল (গৌর সুন্দরের আবির্ভাবে তা জ্ঞাত হলো)।

ভগবানের মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন ও রাম অবতারে যে সব সেবা প্রচলিত আছে, তা গৌরব মিশ্রিত সম্ভ্রম সেবা। সুতরাং তা আত্মার সম্প্রসারণ কল্পে সীমাবদ্ধ। কৃষ্ণের সেই অন্যান্য অবতারে বিশ্রম্ভ সেবা সম্ভবপর নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শ্রীরামচন্দ্রকে আমরা মধুর রসে সেবা করতে পারব না।

কেননা সীতা দেবী অসন্তুষ্ট হবেন। এক পত্নীধর শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে লাঘবতা দৃষ্ট হবে। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ যখন শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তখন একপত্নী ব্রতধর শ্রীরামচন্দ্র তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর সেবকবৃন্দের গৌরব-মিশ্রিত দাস্য রসের সেবা গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু কান্ত রসের সেবা গ্রহণ করতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ, তিনি তাঁর মধুর রসাশ্রিত কান্তাগণের সম্ভোগ বিগ্রহ। শ্রীরামচন্দ্র শান্ত, দাস্য গৌরব সখ্য ও বাৎসল্য রসে সেবিত হলেও মধুর রসে কান্তভাবে তাঁর সেবা হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ গোপীজনবল্লভ। যে কোনও আত্মা গোপীর আনুগত্যে কান্তাভাবে তাঁর সেবা করতে পারেন। তিনি সেই সেবা হতে কাউকে বঞ্চিত করেন না। তা বলে জড় কামের বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় তিনি দেন না। যে কোনও আত্মা স্বরূপ শক্তির আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবামাধুর্য আস্বাদন করতে পারেন, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ গোপীজনবল্লভ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোনও অবতারে সেবকগণের ইচ্ছা থাকলেও সেই রকম সেবা তিনি গ্রহণ করেন না। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের এই উক্তি উদ্ধারের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতার কথা প্রকাশ করা। জীবের পরিপূর্ণতম সেব্য বস্তু হচ্ছেন কৃষ্ণ। উন্নত, উজ্জ্বল রসের সেই সেবাতে চরম উৎকর্ষতা বিদ্যমান। সেই রস প্রদান করে অর্থাৎ প্রেমরস প্রদান করে শ্রীগৌরসুন্দর মহাবদান্য অবতার হয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বে উন্নত, উজ্জ্বল ভগবৎ সেবারস জগতকে দেওয়া হয়নি। শ্রীরাধাগোবিন্দের পরম রমণীয় লীলার কথা তিনি এই জগতে প্রকাশ করেছেন। তিনি কৃষ্ণ কথা ছাড়া অন্য কথা বলেন না। যাঁর সৌভাগ্যের উদয় হবে কেবল তিনিই তা গ্রহণ করবেন।

জগতে যেসব দানের পরিচয় আছে, সেসব দান অল্প কাল স্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। আবার জগতে দানকারীদের সংখ্যাও অতি অল্প। যদি দান প্রার্থীদের আশা ভরসা বেশী থাকে তাহলে সেসমস্ত দাতা প্রার্থীদেরকে আশানুরূপ দান দিতে পারেন না। পণ্ডিত-মূর্খদেরকে, ধনবান-দরিদ্রদেরকে, স্বাস্থ্যবান-রোগীদেরকে, বুদ্ধিমান-নির্বুদ্ধিদেরকে তাদের আশানুরূপ দান দিতে পেরেছেন কি? না, দিতে পারেননি। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে দান প্রদান করেছেন তা মানবজাতি এত বড় দানের আশা প্রার্থনাও করতে পারে না। এত বড় দান জগতে আসতে পারে, জীবের ভাগ্যে বর্ষিত হতে পারে—একথা মানব জাতি পূর্বে ভাবতে পারেনি ও আশা করতে পারেনি। শ্রীগৌরসুন্দর যে অপূর্ব দান মানব জাতিকে প্রদান করেছেন, তা

সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রেম। জগতে প্রেমের বড় অভাব। সেইজন্য হিংসা, বিদ্বেষ, কামনা ও অন্যান্য কথা জীবদেরকে এত ক্লেশ প্রদান করছে। ভগবানের সেবা করার জন্য যাঁরা অত্যন্ত অভিলাষী তাঁদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য এমনকি দেব প্রতিম ব্যক্তিগণ সাক্ষাৎ দেবতাগণ পর্যন্ত প্রস্তুত (কারণ তাঁরা এই প্রেম লাভ করতে পারেননি)। এরকম দান প্রদান করেছেন শ্রীগৌরসুন্দর। সেজন্য তিনি মহাবদান্য অবতার। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রকে প্রণাম জানিয়ে বলেছেন—

"আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেম রসপ্রদায়, চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে।।"

কৃষ্ণ-প্রেম-রস লাভই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। সেই কৃষ্ণ-প্রেম-রস প্রদানের শক্তি একমাত্র রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণতেই বিদ্যমান। তিনি গৌররূপে সেই রস-বিগ্রহ আনন্দ-লীলাময় স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। সেই সুবর্ণ কান্তি শ্রীগৌরসুন্দর বদ্ধজীবের হৃদয়ের ভোগ-তিমির বিনাশের জন্য কিরণ বিস্তার করেছেন। যে উন্নত-উজ্জ্বল-রস বা প্রেমরস তিনি প্রদান করেছেন তা কৃষ্ণের দিব্য নামের মাধ্যমে প্রদান করেছেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেছেন—

যন্নাপ্তং কর্মনিষ্ঠৈর্ন চ সমধিগতং
যত্তপোধ্যান যোগৈর্-
বৈরাগ্যৈ স্ত্যাগতত্ত্বস্তুতিভিরপি
ন যত্তর্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ।
গোবিন্দ-প্রেম ভজামপি ন চ
কলিতং যদ্রহস্যং স্বয়ং চ-
ন্নাম্নৈব প্রাদুরাসীৎ অবতরতি পরে
যত্র তং নৌমি গৌরম্।।

অর্থাৎ—"কর্মনিষ্ঠা, তপ, ধ্যান, অষ্টাঙ্গ যোগে কিংবা বৈরাগ্য, স্তব, কর্ম, ত্যাগে গোবিন্দ প্রেমশালী মানবের যে গূঢ় তত্ত্ব অগোচর ছিল, তা যে গৌরচন্দ্রের উদয়ে কেবল নামে (সেই প্রেম) প্রকাশিত হলো, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি।"

নাম-প্রেম প্রদানই হচ্ছে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মহাবদান্য লীলা। শ্রীগৌরসুন্দর বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনই মানব-জাতীর একমাত্র পরম কৃত্য। সেটাই তাঁর

মহাবদান্যতা। শ্রেষ্ঠ দেবগণের, নারদাদি মুনিবরগণের, এমনকি ভক্ত-শ্রেষ্ঠ উদ্ধবাদিরও দুষ্প্রাপ্য, দুর্গম ব্যাপার ব্রজের প্রেমরস শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন হতেই জীব প্রাপ্ত হতে পারে। সেজন্য বলা হয়েছে—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি।।
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।।

—(চৈ.চ.অন্ত্য. ৪/৭০-৭১)

শ্রীগৌরসুন্দর নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে এই প্রেমধন বিতরণ করে মহাবদান্যাবতার হয়েছেন। নাম নতুন বস্তু নয়। শ্রুতি স্মৃতিতে নাম-নামীর অভেদত্ব ও শ্রীনামের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে নাম-প্রেম-ধর্ম প্রচার, তা হচ্ছে বৈষ্ণব ধর্ম। বৈষ্ণব ধর্মটা একটি পদ্মপুষ্প সদৃশ। কালক্রমে তা ক্রমশ প্রস্ফুটিত হয়েছে। প্রথমাবস্থায় কলিকা, পরে কিছুটা বিকশিতভাবে লক্ষিত। ক্রমশ পূর্ণ বিকশিতভাব প্রাপ্ত, পুষ্পবৎ প্রকাশিত। ব্রহ্মার সময়ে শ্রীমদ্ ভাগবতের চতুঃশ্লোকী সম্মত ভগবৎ জ্ঞান, মায়া, বিজ্ঞান, ভক্তিসাধন ও প্রেম কেবল অঙ্কুর রূপে জীবের হৃদয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। প্রহ্লাদাদির সময়ে কলিকা আকার দেখা গেলো। ক্রমশ বাদরায়ণ ঋষির সময়ে কলিকাগুলি বিকশিত হতে আরম্ভ করে বৈষ্ণব ধর্মের আচার্যগণের সময়ে পুষ্পাকারে দেখা গেলো। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর যখন উদয় হলো, তখন প্রেমপুষ্প সম্পূর্ণ রূপে বিকশিত হয়ে জগতের লোকেদের হৃদয় ও নাসিকাতে পরম রমণীয় সৌরভ প্রদান করতে লাগল। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বৈষ্ণব ধর্মের পরম নিগূঢ় ভাব যে নাম-প্রেম তা-ই জগতের জীবদের জন্য প্রকাশ করে মহাবদান্যাবতার হয়েছেন। শ্রীনাম-সংকীর্তন যে পরম আদরের ধন, তা কি আর কেউ প্রকাশ করেছিলেন? যদিও তা শাস্ত্রতে ছিল, তথাপি তা জীবের চরিত্রগত ছিল না। আহা, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উদয় হওয়ার পূর্বে প্রেমরস ভাণ্ডার কি এরূপভাবে বিতরিত হয়েছিল? না, হয়নি। সেই প্রেমরস বিতরণ করে শ্রীগৌরসুন্দর মহাবদান্যাবতার হয়েছেন।

মহাবদান্য শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমনাম সংকীর্তনের বন্যা চতুর্দিকে ব্যাপী গেছে। সেজন্য বলা হয়েছে—

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সবারে ডুবায়।।
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন।।

—(চৈ.চ.আদি ৭/২৫-২৬)

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের যে বংশীধ্বনি চরাচর বিশ্বকে পুলকিত, বিমোহিত ও আকৃষ্ট করে দশদিক মধুময় করেছিল সেই বংশীই বর্তমান যুগে তাঁর মহাবদান্য গৌরাঙ্গ স্বরূপে প্রবর্তিত নাম প্রেম ধর্ম। তার সুশীতল স্পর্শে ত্রিজগতে সর্ববিধ তাপ প্রশমিত করে এবং চরাচর বিশ্বকে অমৃতময় করে। প্রেমনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে মহাবদান্যাবতার শ্রীগৌরসুন্দর সেই প্রেম ভক্তিযোগ পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেছেন। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর ভাষায়—

স্ত্রী পুত্রদি কথাং জহুর্বিষয়িতাঃ শাস্ত্র প্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্য চন্দ্রে পরাম্
আবিষ্কৃতবতিভক্তিযোগ পদবীং নৈবান্য আসীদ্ রসঃ।।

—(শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত)

অর্থাৎ—"শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সেই ভক্তিযোগ পদবী আবিষ্কার করার ফলে বিষয় রসমগ্ন জনগণ স্ত্রী-পুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রীয় বাদ-বিসংবাদ ত্যাগ করলেন, যোগী প্রবরগণ প্রাণ-বায়ু নিরুদ্ধার্থ সাধনক্লেশ সর্বতোভাবে বর্জন করলেন, তপস্বীসমাজ তাঁদের তপস্যা হতে বিরত হলেন, জ্ঞানী সন্ন্যাসী সমাজ নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করলেন। যখন এরূপ হলো, তখন প্রেমভক্তি রস ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার রস আর জগতে দৃষ্ট হলো না।"

সর্বচিত্তাকর্ষক স্বয়ং কৃষ্ণ মনোহর কনক কান্তি ধারণ-পূর্বক অবতীর্ণ হওয়ায় মহাপ্রেমসাগরের রস-বন্যায় সমগ্র জগত অকস্মাৎ সর্বতোভাবে প্লাবিত হলো। শ্রীচৈতন্য প্রচারিত শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন-প্রেম-রসের এই সমস্ত প্রভাব পরিলক্ষিত হলো। তাতে চরাচর বিশ্বের সমস্তই আকৃষ্ট হলেন। এটাই হচ্ছে মহাবদান্য অবতার শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্য লীলা।

পরিশেষে শ্রী শ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বাণী উদ্ধার করে আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করছি। "শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেম-ভক্তির অসামান্য আলোক যেদিন মানবজাতি দেখতে পাবে, সেইদিন কর্মধারার কর্ম স্থগিত হয়ে অচ্যুত ভাব-সহ নৈষ্কর্মের উদয় হবে, জ্ঞানী তাঁর অজ্ঞানের অকর্মণ্যতা বুঝতে পেরে পরম মঙ্গলময় বাস্তব জ্ঞান (সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বিজ্ঞান) লাভ করবেন। গৃহী স্ত্রী-পুত্রাদির প্রাকৃত মঙ্গল কামনায় বিতৃষ্ণ হয়ে সকলে হরিভজন করুন—এরকম মঙ্গলাকাঙ্খীবিশিষ্ট হবেন, তপস্বীগণ তপঃ ক্লেশ পরিত্যাগ করে—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।

—(নারদ পঞ্চরাত্র)

বিচার বিশিষ্ট হবেন। যোগীন্দ্রগণ বায়ুর নিয়মন-জনিত ক্লেশ পরিত্যাগ করে ভক্তিযোগ পদের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হবেন।

(হরিবোল)

রসরাজ ও মহাভাবের একীভূত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ

আগামী ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথিতে আমরা প্রেম পুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গের শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে গৌর জয়ন্তী উৎসব পালন করতে যাচ্ছি। প্রেম পুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গ কলিহত জীবের উদ্ধারের জন্য সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তন করেছেন। এজন্য তাঁকে সংকীর্তন যজ্ঞের জনক বলে অভিহিত করা হয়। তবে গৌর অবতারে ভগবান কৃষ্ণের আবির্ভাবের দ্বিবিধ কারণ বা হেতু আছে। তার বিশদ ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী প্রবন্ধতে প্রকাশ করা হয়েছে। তাই আজ আমরা এখানে শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের একীভূত অঙ্গ রূপে অবতীর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গের গোপনীয় অতি গূঢ় লীলা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে প্রয়াসী হয়েছি।

আমরা জানি যে, ভগবান কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান এবং তাঁর হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারাণী পূর্ণ শক্তি। শক্তি, শক্তিমানের বিবিধ লীলার সহায়িকা। শক্তিমান যে সকল লীলারস আস্বাদনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, শক্তি ঠিক তেমনই নিজেকে অনুরূপভাবে বিস্তার করেন। তত্ত্ব বিচারে শক্তি ও শক্তিমান ভিন্ন, আবার অভিন্নও। তবে এই শক্তি, শক্তিমানের ভেদত্ব ও অভেদত্বকে নিয়েই প্রেম পুরুষোত্তম। শ্রীগৌরাঙ্গ অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারার আচার্যবর্গ বিশেষকরে গোস্বামীগণ এসম্পর্কে সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। শ্রীচৈতন্য চারিতামৃতের প্রণেতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীরাধা ও কৃষ্ণের শক্তি ও শক্তিমান হিসাবে অভেদত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—

রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ।।
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ।।
রাধা-ভাব-কান্তি দুই করি অঙ্গীকার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময়-মূর্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।।
—(চৈ.চ.আ.৪/৯৬, ৯৮, ৯৯-১০০,২২২)

অর্থাৎ— "অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বপূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীব্রজরাজনন্দনই একমাত্র পরতত্ত্বের মূর্ত বিগ্রহ। তাঁর শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপে আবির্ভবিই তাঁর পরতত্ত্বের সীমা। শ্রীরাধা পূর্ণ শক্তি, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। স্বরূপতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ এক বস্তু। কিন্তু লীলারস আস্বাদনের জন্য দুই রূপে প্রকটিত।।"

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ।।
—(চৈ.চ.আদি.৪/৯৮)

আবার শৃঙ্গার রসরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দন পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মহাভাবময়ী শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি ধরে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপে একীভূত রূপে প্রকটিত । তবে এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ নরহরি সরকারের আস্বাদন—

"চৈতন্য ভক্তি নৈপুণ্য কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।
তয়োঃ প্রকাশাদেকত্র কৃষ্ণ চৈতন্য উচ্যতে।।"

"শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং পরম পুরুষ ভগবান, অদ্বয় জ্ঞান পরতত্ত্ব বস্তু। কিন্তু শ্রীচৈতন্য বলতে তা ভক্তি-নৈপুণ্যকেই সূচনা করে। ভক্তি-নৈপুণ্য ও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই দুইয়ের প্রকাশ-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপ প্রকাশিত।"

শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পরতত্ত্ব সীমা। শ্রীরাধাকৃষ্ণ একীভূত অঙ্গই শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর স্বরূপে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভের মিলিত রসরঙ্গ সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান।

এক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভক্তি নৈপুণ্যের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে,ভক্তির অর্থ নিত্য সিদ্ধ সাধ্য-ভক্তি, যে-টা হচ্ছে স্বরূপতঃ প্রেম ভক্তি। অন্যকথায় এটাই হচ্ছে প্রেমময় ভক্তি। সেই প্রেমের নিপুণতা বা পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ চরম পরম পরিণতিই হচ্ছে মাদনাক্ষ মহাভাব। সেই মহাভাব চিন্তামণি স্বরূপা হচ্ছেন শ্রীমতী শ্রীবার্ষভাববী রাধারাণী। শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন সেই মহাভাব চিন্তামণির মূর্ত বিগ্রহ। শৃঙ্গার রসরাজ পূর্ণ ব্রহ্ম ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। মহাভাব চিন্তামণি স্বরূপা শ্রীরাধা ও শৃঙ্গার রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ এই দুইয়ের সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের একীভূত আবির্ভাববশতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বরূপ প্রকটিত। অতএব সেই স্বরূপ অদ্বয় জ্ঞান

পরতত্ত্ব সীমার পরম পরাকাষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণকে আহ্লাদিত করার চেতনা প্রদাত্রী হচ্ছেন একমাত্র হ্লাদিনী শক্তি-স্বরূপা শ্রীরাধা। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণহ্লাদদায়িনী চেতনার সত্তা, অর্থাৎ তিনিই একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী। মাদনাক্ষ মহাভাবের সেই চেতনার উত্তাল তরঙ্গ -রঙ্গ আছে। সেই চেতনা প্রদাতা বলে শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি ধরে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সার্থকতা যথার্থ হয়েছে। অতএব রসরাজ মহাভাবের একীভূত স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

দ্বিবিধ রূপে রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবময়ী শ্রীরাধা ভিন্ন ভিন্ন রূপ। একীভূত রূপে রসরাজ ও মহাভাব সম্মিলনে প্রেম পুরুষোত্তম বিপ্রলম্ভ রসাতুর মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তবে রসরাজ ও মহাভাবের ভেদত্ব ও অভেদত্বের নিত্যতা সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে শাস্ত্র বলেন যে, প্রতিক্ষণে যুগল কিশোরের অর্থাৎ রসরাজ ও মহাভাবময়ীর একবার একত্ব অর্থাৎ অভেদত্ব এবং একবার দ্বৈতত্ব হচ্ছেন। তাঁরা দ্বৈত (দুই) হয়ে ব্রজলীলায় মাধুর্য আস্বাদন করেন। আবার অদ্বৈত অর্থাৎ একীভূত হয়ে বিরহ মিলনের সম্মিলনে নবদ্বীপে বাঞ্ছাত্রয় পূরণ করে (যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে) নিজের স্বরূপ হতে অভিন্ন সেই দিব্য নামরস আস্বাদন করেন। সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ রসে শ্রীমন্ নাম প্রভু আস্বাদ্য। সকল রসে শ্রীমন্ নামই আস্বাদ্য। রসভেদে এবং অধিকার ভেদে শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র হচ্ছে কৃষ্ণাত্মক। এটা যুগলাত্মকভাবে আস্বাদিত হয়।

রসরাজ ও মহাভাবের দ্বৈতত্বে কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের দ্বৈতত্ব আস্বাদিত হয়। আবার রসরাজ ও মহাভাবময়ীর অদ্বৈতত্বে সেই নামের অদ্বৈতত্বও আস্বাদিত হয়। দ্বৈতত্বে নামীদ্বয় অর্থাৎ শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ অদ্বৈতত্বেও হচ্ছেন একীভূত নামী। সেই একীভূত অবস্থায় উপরোক্ত যুগল নামদ্বয় শ্রীগৌরনামরূপে পরিণত। পক্ষান্তরে গৌরনামই যুগল নামের একীভূত নাম। এইহেতু এই নামই হচ্ছেন অত্যন্ত কৃপাময়। শ্রীকৃষ্ণনাম অপেক্ষা অর্থাৎ যুগলনাম অপেক্ষা তা অধিক কৃপাময়। যুগল নামই কৃষ্ণনাম; কারণ যুগোল কিশোর শ্রীধারা ও কৃষ্ণ (শক্তি ও শক্তিমান) অভিন্ন।

লীলারস আস্বাদনকারী ভক্তগণ ভাবহিল্লোলে প্রেমরস কল্লোলে সদা সর্বদা অবগাহন করে থাকেন। রসিক ভক্ত সমাজ ব্রজলীলারস ও নবদ্বীপ লীলারসের মধ্যে নিমজ্জমান হন, ভাসমান হন এবং ক্রীড়াও করেন। এইভাবে তাঁরা তাতে সদা প্রবৃত্ত হন। ব্রজলীলাতে ললিতা ও বিশাখা সখীরূপে পরিচিতা, তাঁরা এখন গৌরলীলাতে শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী ও শ্রীরামানন্দ রায় নামে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিত্য সহচররূপে এই লীলার নিগূঢ়রস তত্ত্ব প্রদর্শক। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর বাক্য উদ্ধার করে বলেছেন যে, তিনি কিভাবে তার সঙ্কেত প্রদান করেছেন—"একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।" আবার শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ও অনুরূপভাবে সঙ্কেত প্রদান করেছেন। যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা করে তাঁকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ স্বরূপ প্রদর্শন করালেন, তখন শ্রী রায় বলেছেন—

"পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসী-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ।।
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা।।"
—(চৈ.চ.ম ৮/২৬৭-২৬৮)

তবে শ্রীপাদ রামানন্দরায়ের উপরোক্ত উক্তি হতে এটা সুস্পষ্ট যে ক্ষণে ক্ষণেহ (Every Moment) অদ্বয় পরতত্ত্ব বস্তু শক্তি ও শক্তিমান রূপে দ্বৈত হয়ে যুগল কিশোর হচ্ছেন এবং অদ্বৈত (একীভূত) হয়ে গৌর কিশোর হচ্ছেন। ব্রজলীলাতে ললিতা সখী রূপে পরিচিত শ্রীপাদ রামানন্দ রায় শ্যাম গোপরূপ এবং কাঞ্চন পঞ্চালিকা উভয়কে ভালভাবে জানেন। সেই দুই তাঁর হৃদয়ের ধন। আবার একীভূত তনু রূপে আবির্ভূত শ্রীগৌরকিশোরকেও তিনি চিনতে পেরেছেন। যখন তিনি উভয় প্রকাশ দ্বৈত (যুগল কিশোর) ও অদ্বৈত বা একীভূত (গৌর কিশোর)-কে জেনেছেন, তখন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকটে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপূর্ব দিব্যরূপ দর্শন করে রামানন্দ রায়ের মূর্ছিত হওয়ার কারণ কিছুই ছিল না।

তবে হাসি' তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
'রসরাজ', 'মহাভাব'—দুই এক রূপ।।
—(চৈ.চ.মধ্য ৮/২৮১)

মূর্ছা হওয়ার কোন কারণ নেই। যুগল রূপ তো পূর্বে পরিচিত এবং গৌর রূপও পূর্বে পরিচিত। দুই মিলে একীভূত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ হয়েছেন। তা-ও রামানন্দ রায়ের জানা। যেহেতু তিনি এসব বিষয় পূর্ব হতে জানতেন, তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

রাধিকার ভাবকান্তি করি' অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার।।
—(চৈ.চ.মধ্য ৮/২৭৮)

এটা রামানন্দরায়ের নিজস্ব উক্তি। তবে এক্ষেত্রে একমাত্র আস্বাদ্য বিষয় এই যে, মূর্ছিত হওয়ার পর শ্রীপাদ রায় কি আশ্চর্যজনক অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করলেন। যখন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকটে রামানন্দ রায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে দর্শন করলেন, তখন তাঁর সেই মূর্ছিত অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

দেখি' রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ, পড়িলা ভূমিতে।।
—(চৈ.চ.ম.৮/২৮২)

তবে এক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় মিলন ও বিরহ বা সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ ভাব মধ্যে ভাবী, ভূত ও ভবন ভেদে বিরহের ভেদ ত্রিবিধ। মিলন সম্বন্ধেও ত্রিবিধ ভেদ আছে। প্রথম বিরহের ভেদ ব্যক্ত হয়েছে যখন অক্রুর এসেছিলেন কৃষ্ণকে রথেতে বসিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সে-পর্যন্ত কৃষ্ণ যাননি কিন্তু তিনি নিশ্চয় যাবেন—এই ভাবনাতে বিরহের বেদনা আরম্ভ হয়েছে। এটা 'ভাবী বিরহ' নামে খ্যাত। অক্রুর কৃষ্ণকে নিয়ে চলে গেলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ অতিবাহিত হয়ে গেল। দিনের পর দিন কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনাতে প্রাণ ভেঙে পরছে। এটা 'ভূত বিরহ' নামে খ্যাত। সম্প্রতি গোপিগনের সম্মুখ হতে অক্রুর কৃষ্ণকে রথেতে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। প্রাণকান্ত কৃষ্ণকে তিনি গোপিগনের প্রাণ হতে ছিঁড়ে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাই গোপিগণ প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার জন্য রথের চাকার নীচে ভূমির ওপর লুটিয়ে পড়লেন। এ হলো 'ভবন বিরহ'। 'ভবন বিরহের' বেদনা তীব্রতম। ভাবী ও ভূতকে কেন্দ্র করে বেদনাময়।

মিলন ভূমিকাতেও অনুরূপ ভেদ পরিদৃশ্যমান। যখন নিধুবনে যুগল কিশোরের দর্শন হয়, তখন মিলনটি ভাবী শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ পরে হবে। যখন যুগল কিশোরের একীভূত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ তখন যুগলের মিলনটি ভূত অর্থাৎ হয়ে গেছে। শ্রীপাদ রামানন্দ রায় উপরোক্ত ভাবী ও ভূত মিলন পূর্বে দর্শন করেছিলেন। কিন্তু তিনি ভবন মিলনকে সন্দর্শন করেননি। এটা এক অপূর্ব দৃশ্য। এটা তাঁর ক্ষেত্রে এক অনাস্বাদিত ঘটনা। 'ভবন মিলনে'র মিলনটি ঘটমান অর্থাৎ সাক্ষাতে ঘটছে। রসরাজ শ্রীনন্দনন্দন যশোদানন্দন কৃষ্ণ মহাভাবময়ী শ্রীমতী শ্রীবার্ষভানবীকে 'জতু'র মত গলিয়ে তাঁর হৃদয় নিকুঞ্জের মধ্যে অর্থাৎ হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করছেন। তা প্রত্যক্ষীভূত করলেন শ্রীপাদ রামানন্দ রায়। তা এক অপরিকল্পিতপূর্ব মনোরম দৃশ্য। প্রথমে রসরাজ মহাভাব ভেদে দুইরূপ' পরে সেই দুইরূপ প্রত্যক্ষে একরূপ হওয়া দেখলেন। শ্রীগৌরসুন্দর আজ তা রায় রামানন্দকে দেখালেন। শ্রীপাদ রামানন্দ

রায় দেখলেন শ্যামশশধর আজ চম্পক বর্ণাঙ্কের হৃদয় মধুকোষের পাপড়িগুলি খুলে কিরূপে ধীরে ধীরে কোমল কর্ণিকার ভূমিকাতে প্রবেশ করছেন।

মিলনেতে বামাকান্তা আদর পেয়ে শক্ত হয়ে থাকে। স্বাধীন ভর্ত্তৃকাও সেইরূপ। বিরহের তাপ দিয়ে গলিয়ে বিরহের প্রতাপে মহাভাবের কোষ সকল স্তরে স্তরে প্রবেশ করলে রসরাজ নীলমণি শ্রীকৃষ্ণ গাঢ় অনুরাগে রঞ্জিত হৃদয় নিকুঞ্জে লুক্কায়িত হয়েছেন। আজ শ্রীপাদ রামানন্দরায় লুক্কায়িত হওয়ার প্রক্রিয়াটি দর্শন করলেন। রসরাজ মহাভাবের কিরূপ একত্রীকরণ হয়ে বিপ্রলম্ভ রসাতুর শ্রীগৌরস্বরূপ প্রকটিত হচ্ছেন এবং তার মধ্যে কিরূপ বিরহ-মিলনের একাধিকরণ হয়ে বিলাস বিচিত্রতার বিরোধিতা সমন্বিত হচ্ছেন—তা সাক্ষাৎভাবে শ্রীপাদ রামানন্দ রায় দেখলেন। সুমধুর হাস্য করে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীপাদ রামানন্দ রায়কে এই 'ভবন মিলন' দেখালে শ্রীরায় তা দর্শন করে বিপুল আনন্দে মূর্ছিত হলেন। যারফলে তিনি ধূলিকণার ওপর লুটিয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তাঁর এরকম অবস্থাতে মহা ঔদার্যময় বিগ্রহ প্রেম পুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গ নিজের কর স্পর্শের দ্বারা তাঁকে সচেতন করালেন। চেতনা পাওয়ার পর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় আবার সেই সন্ন্যাস রূপ দেখে বিস্মিত হলেন। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

প্রভু তাঁরে হস্ত স্পর্শি, করাইলা চেতন।
সন্ন্যাসীর বেষ দেখি' বিস্মিত হৈল মন।।
আলিঙ্গন করি' প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনা এইরূপ না দেখে অন্যজন।।
গৌর অঙ্গ নহে, মোর—রাধাঙ্গস্পর্শন।
গোপেন্দ্র সুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন।।
তাঁর ভাবে ভাবিত করি' আত্ম-মন।
তবে নিজ-মাধুর্য্য করি আস্বাদন।।

—(চৈ.চ.মধ্য ৮/২৮৩, ২৮৪, ২৮৬, ২৮৭)

এটা বর্ণনা করার অভিপ্রায় এই যে, সুধীভক্ত-সমাজ গৌরানুগত্যে শুদ্ধ নাম কীর্তন করে নামপ্রভুর কৃপায় এই গূঢ়-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে দুর্লভ মানব জন্ম সার্থক করুন।

(হরিবোল)

শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের একীভূত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ

গৌর জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রতি বছর প্রেমপুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গের পরম পবিত্র আবির্ভাব উৎসব ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে। তবে সেই গৌরাঙ্গের এ ধরাধামে আবির্ভূত হওয়ার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সমন্ধে সকলের অবগত হওয়া উচিত। দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করে যদি আমরা এটি না জানতে পারি, তাহলে আমাদেরকে এই ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম-মৃত্যু-চক্রে নানা যোনিতে ভ্রমণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে 'শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত' গ্রন্থে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বর্ণনা করে বলেছেন।

অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম।
ন বিদুঃ সর্বশাস্ত্রজ্ঞা হ্যপি ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ।।

অর্থাৎ—'যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে 'স্বয়ং ভগবান' বলে উপলব্ধি করেনি, তারা সর্বশাস্ত্রজ্ঞ হলেও এই চৈতন্য শূন্য সংসারে (হরিবিমুখ রাজ্যে) কেবল ভ্রমণই করে থাকে।"

আমরা জানি যে গৌরাবির্ভাবের কারণ প্রধানতঃ দু'টি—বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ অর্থাৎ গৌণ ও মুখ্য। যুগধর্ম নাম- সংকীর্তন প্রচার ও ব্রজ-প্রেম দান—এই দু'টি প্রেম-পুরুষোত্তমের আবির্ভাবের বহিরঙ্গ কারণ। যুগে যুগে ধর্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে স্বয়ং লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে স্ব-লীলার মাধ্যমে ধর্ম সংস্থাপন করেন। প্রেম পুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের মুখ্য অন্তরঙ্গ কারণ—তিনটি। গৌরাঙ্গই কৃষ্ণ। কৃষ্ণের তিনটি বাঞ্ছা জাত হ'ল, যথা— (১) শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কি রকম, (২) আমার (অর্থাৎ কৃষ্ণের) অদ্ভুত মাধুরিমা যা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তা কি রকম, (৩) আমার মাধুরিমার অনুভূতি হতে শ্রীরাধার যে সুখের উদয় হয়, তা কি রকম। এই তিনটি বাঞ্ছা পূর্তি হচ্ছে অন্তরঙ্গ কারণ, তা'র একমাত্র উপায় হ'ল ব্রজের প্রেমভক্তির সূত্র। প্রেমভক্তির অন্য নাম রাগ ভক্তি। এই রাগমার্গীয় ভক্তি এজগতে কেউ প্রদান করেননি। প্রেম ভক্তির পীঠ একমাত্র ব্রজবন। এই প্রেমভক্তির একমাত্র পরম ভাণ্ডারী হচ্ছেন, মহাভাব চিন্তমণি-

স্বরূপা শ্রীবার্ষভানবীদেবী শ্রীমতী রাধারাণী। অতএব প্রেম ভক্তি মন্দাকিনীর মূল উৎস হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী। অঙ্গীকার করতে হলে তাঁর ভাব অঙ্গীকার্য। রসাস্বাদন চতুর রসিকশেখর ব্রজবিলাসী নাগরেন্দ্র ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ লোভবশতঃ রসের ভাণ্ডার হরণ করে এনেছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

অতএব রাধাভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।

অর্থাৎ—"নিজের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য আস্বাদনের জন্য শ্রীশ্যামসুন্দর রাধাভাব অঙ্গীকার করে শ্রীগৌরসুন্দর হলেন।" আমরা সেই শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের একীভূত অঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের প্রণেতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরাধা কৃষ্ণের একীভূত অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—

রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র পরমাণ।।
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।।
রাধা-ভাব-কান্তি দুই করি অঙ্গীকার ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময়-মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।।

অর্থাৎ—"অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব পূর্ণব্রহ্ম শ্রীব্রজরাজ নন্দনই একমাত্র পরতত্ত্বের মূর্তি বিগ্রহ। তাঁর শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপ তাঁর পরতত্ত্বের সীমা। শ্রীরাধা পূর্ণ শক্তি, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। স্বরূপতঃ শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ এক বস্তু। কিন্তু লীলারস আস্বাদনের জন্য দুই রূপে প্রকটিত। আবার শৃঙ্গার রসরাজ ব্রজেন্দ্র নন্দন পূর্ণ ব্রহ্ম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মহাভাবময়ী শ্রীরাধার ভাবকান্তি ধারণ করে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপ রূপে প্রকটিত।" আবার শ্রীপাদ নরহরি সরকার এ বিষয়ে বলেছেন—

"চৈতন্য ভক্তি নৈপুণ্যং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
তয়োঃ প্রকাশাদেকত্র কৃষ্ণচৈতন্য উচ্যতে।।"

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, অদ্বয় জ্ঞান পরতত্ত্ব বস্তু। কিন্তু শ্রীচৈতন্য রূপে তাতে

ভক্তিনৈপুণ্য সূচিত হয়। ভক্তি নৈপুণ্য ও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই দুইয়ের প্রকাশবশতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বরূপ প্রকাশিত। শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পরতত্ত্ব সীমা। শ্রীরাধাকৃষ্ণ একীভূত অঙ্গই শ্রীগৌরাঙ্গ। তাঁর স্বরূপে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভের মিলিত রসরঙ্গ দেদীপ্যমান।

ভক্তি নৈপুণ্যের তাৎপর্য সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র বলা যেতে পারে যে, ভক্তির অর্থ নিত্যসিদ্ধ সাধ্য ভক্তি, যা স্বরূপতঃ প্রেম ভক্তি, অর্থাৎ প্রেমময় ভক্তি। সেই প্রেমের নিপুণতা বা পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ চরম পরম পরিণতিই মাদনাক্ষ মহাভাব। সেই মহাভাব চিন্তামণিস্বরূপই শ্রীমতী বার্ষভানবী রাধারাণী। শ্রীমতী রাধারাণী সেই মহাভাব চিন্তামণির মূর্তি বিগ্রহ। শৃঙ্গার রসরাজ পূর্ণব্রহ্ম ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। মহাভাব চিন্তামণি স্বরূপা শ্রীরাধা ও শৃঙ্গার রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ—এই দুইয়ের সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের একীভূত আবির্ভাববশতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বরূপ অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব সীমার পরম পরাকাষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণকে অহ্লাদিত করার চেতনা প্রদাত্রী একমাত্র হ্লাদিনী শক্তি-স্বরূপা শ্রীরাধা। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদদায়িনী চেতনার সত্তা অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী মাদনাক্ষ মহাভাবে সেই চেতনার উত্তাল-তরঙ্গ-রঙ্গ আছে। সেই চেতনাপ্রদাতা বলে শ্রীরাধার ভাব-কান্তিধর শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের সার্থকতা যথার্থ। অতএব রসরাজ মহাভাবের একীভূত স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

দ্বিবিধ রূপে রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবময়ী শ্রীরাধা ভিন্ন ভিন্ন রূপ। একীভূত রূপে রসরাজ ও মহাভাব সম্মিলনে প্রেম পুরুষোত্তম বিপ্রলম্ভ রসাতুর মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের ভাষায় "একীভূত বপুরবতি রাধয়া মাধবস্য" শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীমাধবের একীভূত তনু তোমাদেরকে রক্ষা করুক।

"শ্রীগৌরাকৃতি-মদনগোপালঃ-প্রিয়ায়াঃ রাধিকায়াঃ কান্ত্যা গৌরাকৃতির্যো মদন গোপালঃ।" শ্রীস্বরূপা শ্রীরাধার কান্তি দ্বারা গৌরাকৃতি মদনগোপাল অর্থাৎ ব্রহ্মগোপাল। সুতরাং মূর্তিমান রসব্রহ্ম অর্থাৎ রসরাজ কন্দর্প-দর্প-হর নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, শ্রীরাধা-ভাবকান্তিধর শচীনন্দন শ্রীগৌর সাক্ষাৎ শৃঙ্গার রসরাজ মূর্তিধর স্বয়ং নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। "সাক্ষাদ্ রাধা-মধুরিপু বপুর্ভাতি গৌরাঙ্গ।" সাক্ষাৎ শ্রীরাধা ও মাধবের একীভূত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ বিরাজমান। "গৌরঃ কোঽপি ব্রজ বিহরিণী ভাবমগ্নশ্চকান্তি।" ব্রজ বিহরিণী শ্রীরাধারাণীর ভাবনিমগ্ন

কোনও এক অনির্বচনীয় গৌরাঙ্গ শোভা পাচ্ছেন। ত্রিবিধ বাঞ্ছার পরিণতিতে যুগল কিশোর একীভূত স্বরূপে গৌর কিশোর।

তবে হাসি প্রভু তারে দেখাইল স্বরূপ।
'রসরাজ' ,'মহাভাব' দুই এক রূপ।।

এভাবে প্রেম পুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গ হচ্ছেন শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এই উভয়ের মিলিত একীভূত তনু।

(হরিবোল)

শ্রীচৈতন্যাবতারের কারণ

সমস্ত মায়াবদ্ধ জীব এই ভৌতিক জগতে শান্তি লাভের জন্য খুব উদ্বিগ্ন। কিন্তু তারা শান্তি লাভের সূত্র জানে না। সেই শান্তি লাভের উপায় ভগবান কৃষ্ণ ভগবদ্‌গীতায় বর্ণনা করেছেন। তিনি হচ্ছেন দৃশ্যমান ভৌতিক জগতের প্রভু বা মালিক। কিন্তু বদ্ধজীবেরা ভৌতিক জগতে বা ভূতপ্রকৃতির কঠিন নিয়মের অধীন। তাই শান্তি লাভের জন্য বদ্ধজীব সদাসর্বদা সেই সর্বশক্তিমান ভগবান কৃষ্ণের আদেশ পালন করা উচিত। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে পূর্ণ শরণাগতি আচরণ করা উচিত। সেটাই হচ্ছে বদ্ধ জীবের একমাত্র করণীয়। সেই শরণাগতির মূল ভক্তি বা ভগবৎ ধর্ম জীব মাত্রেই পালন করা উচিত। কিন্তু যদি ব্যক্তি বেদনির্দিষ্ট নীতি যথার্থ রূপে পালন করতে ব্যতিক্রম প্রদর্শন করে, তাহলে সে অধর্মাচরণ করছে বলে বুঝতে হবে। এই ভাবে ক্রমশ ধর্মের গ্লানি হয়ে অধর্মের প্রাবল্য ঘটলে, ভগবান ভাগবৎ ধর্মের সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। ভগবদ্ গীতার বর্ণনানুসারে—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।" —(গী. ৪/৭)

ভগবান কৃষ্ণ গত দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ হয়ে অর্জুনকে লক্ষ্য করে সমগ্র জনসমাজকে ভগবদ্‌গীতার উপদেশ প্রদান করেছেন। সেই উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে অন্তিমে (গী. ১৮/৬৬) শ্লোকানুসারে পূর্ণ শরণাগতির কথা বলেছেন। যেমন—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।"

কিন্তু দ্বাপর যুগের লীলা সঙ্গোপনের সঙ্গে সঙ্গে ভগবান কৃষ্ণ অনুভব করলেন যে, তিনি কেবল শরণাগতি আচরণের কথা বলেছেন। তাকে কার্যেতে পরিণত করে স্ব-আচরণের মাধ্যমে আদর্শ স্থাপন করেন নি। তাই তাঁর মনেতে খেদ উপজিল। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, আমি এই শরণাগতি কথাটি কেবল উপদেশ প্রদানের

মাধ্যমে বলেছি, কিন্তু আচরণের মাধ্যমে তা প্রদর্শন করিনি। তাই তা জনসমাজে প্রচলনের উদ্দেশ্যে তিনি গৌরাবতার হলেন।

ভগবান কৃষ্ণ তাঁর দ্বারকালীলাতেও প্রদর্শন করেছিলেন যে, তিনি কিরূপে নিজের মাধুর্য নিজেই আস্বাদন করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। একদা দ্বারকাতে ভ্রমণরত থাকা কালে স্ফটিক প্রস্তরে নির্মিত মণিময় স্তম্ভে নিজের প্রতিবিম্বকে দেখে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন এবং নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেছিলেন " আহা! এই প্রগাঢ় মাধুর্য-চমৎকারকারী অবিচারিতপূর্ব চিত্রিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটি কে? এঁকে আমি ক্ষুব্ধ চিত্তে দেখছি এবং রাধিকার মতো বলপূর্বক আলিঙ্গন করতে ইচ্ছা করছি।" এই উক্তিটি শ্রীল রূপগোস্বামীকৃত 'ললিত মাধবে' দেখতে পাওয়া যায়—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব।।
—(ললিত মাধব ৮/৩৪)

তাই এটা অনুমেয় যে, কৃষ্ণ মাধুর্য কি রকম? তা এমন চমৎকারকারী যে কৃষ্ণ নিজেও আস্বাদন করতে চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য চারিতামৃতেও বর্ণনা আছে—

কৃষ্ণমাধুর্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল।।
শ্রবণে, দর্শনে আকর্ষয়ে সর্বমন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন ।।
—(চৈ.চ.আ.৪/১৪৭-১৪৮)

কৃষ্ণ মাধুর্যটা এরকম একটা বস্তু যে, স্বয়ং কৃষ্ণ হতে আরম্ভ করে গোপী, বলদেব, নারায়ণ, লক্ষ্মী, অন্যান্য প্রাণী—সকলকেই কৃষ্ণমাধুর্য চঞ্চল করতে স্বাভাবিক সামর্থবিশিষ্ট। সেই মাধুর্য শ্রীবার্ষভানবীদেবী শ্রীমতী রাধারাণী সহ সকল গোপী সমাজ বিশুদ্ধ প্রেমময় হৃদয়ে তথাকথিত দুর্জয় পারিবারিক গৃহ - শৃঙ্খল ছিন্নপূর্বক কৃষ্ণ ভজনের দ্বারা তা আস্বাদন করে কৃষ্ণকে ঋণী করে দিয়েছিলেন। তাই সেই ঋণ পরিশোধের অসামর্থ্যতা প্রকাশ করে কৃষ্ণ বলেছিলেন—

ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাহভজন্ দুর্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধনা।। —(ভা.১০/৩২/২২)

অর্থাৎ- ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "হে গোপিগণ! আমার সঙ্গে তোমাদের যে সংযোগ তা বিশুদ্ধ প্রেমময়। তোমরা দুর্জয় গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করে আমাকে ভজনা করেছ, সেজন্য আমি দেবতাদের ন্যায় (এমনকি ব্রহ্মার এক দিনের মতো) দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হলেও তার প্রত্যুপকার সাধন করতে সমর্থ হবো না। অতএব তোমরা নিজ নিজ সাধুকৃত্য দ্বারা প্রত্যুপকৃত হও।" এই যে ঋণ পরিশোধের কথা ভগবান কৃষ্ণ বললেন, তা পরিশোধের জন্য তিনি গৌর অবতার হলেন।

তাই শ্রীগৌর আবির্ভাবের কারণ প্রধানতঃ দু'টি—বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ অর্থাৎ গৌন ও মুখ্য। যুগধর্ম হলো নাম সংকীর্তন প্রচার ও ব্রজ প্রেম দান। এই দু'টি হলো প্রেম- পুরুষোত্তমের আবির্ভাবের বহিরঙ্গ কারণ। পূর্ব বর্ণিত কথানুসারে যুগে যুগে ধর্মের সংস্থাপন উদ্দেশ্যে স্বয়ং কৃষ্ণ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে স্ব-লীলার মাধ্যমে তা আবার সংস্থাপিত করেন। ঠিক তেমনই সেই প্রেম পুরুষোত্তমের মুখ্য অন্তরঙ্গ কারণ ত্রিবিধ। যথা— (১) শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কি রকম? (২) আমার অদ্ভুত মাধুরিমা, যা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তা কি রকম? (৩) আমার মাধুরিমার অনুভূতি হতে শ্রীরাধার যে সুখের উদয় হয়, তা কি রকম?

বহিরঙ্গ কারণের তাৎপর্য এই যে, প্রয়োজনটি অপরের বলে কারণটি বহিরঙ্গ। নাম দান ও প্রেম দান— এই দ্বিবিধ কার্য কলিহত মায়াবদ্ধ জীবের জন্য। নাম দান কলিযুগের যুগোচিত কর্ম। পীতবর্ণ হচ্ছে কলিযুগাবতারের বর্ণ। "কলিযযুগে যুগ ধর্ম নামের প্রচার। সেথিলাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার।" যুগ ধর্ম যুগাবতারের করণীয়। আবার এটা হচ্ছে ধন্য কলি। কারণ প্রতি দ্বাপরে কৃষ্ণ বা প্রতি কলিতে শ্রীচৈতন্য আসেন না। অন্যান্য যুগেতে কৃষ্ণের অংশ বা অংশের অংশ আসেন যুগধর্ম প্রবর্তনের জন্য। কিন্তু এই কলিযুগেতে স্বয়ং অবতারী পুরুষ অবতরণ করেছিলেন। ঠিক সেই দ্বাপরের পরে আগত কলিযুগে স্বয়ং গৌরবর্ণধারী অভিন্ন কৃষ্ণ পীতবর্ণ ধারণ করে যুগ ধর্ম প্রচারের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু ব্রজ প্রেম দান শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তা গৌণ,

বহিরঙ্গ কারণ। নাম দান-রূপ যুগ ধর্ম গৌণ বহিরঙ্গ কারণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাড়ার হুঙ্কারে এ ধরাধামে আগমন বহিরঙ্গ কারণ। গোলোক বৈকুণ্ঠ-বিহারী পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নিজের নিত্য প্রিয় পরিকরজনের আহ্বান ব্যতীত কোথাও লোকলোচনে গোচরীভূত হন না। সামান্য কারণে সহজে তিনি সর্বজনের দর্শন পথে আসেন না। ব্রহ্মাদি দেবগণের কাতর প্রার্থনায় পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ প্রকট ব্রজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শ্রীশান্তিপুর নাথ শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের অকিঞ্চন-ভক্তির প্রভাবে ও করুণ আর্তনাদে প্রেম কল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হয়ে প্রকট লীলা প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য কলিহত সকল জীবের বেদনা নিজের মধ্যে অনুভব করেছিলেন। জীবজগতের জন্য তাঁর অন্তর কেঁদে উঠেছিল। তিনি নামাশ্রয়া অকিঞ্চনা ভক্তির বলে প্রেম-পুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রকট করিয়েছিলেন।

অদ্বৈত-আচার্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর।। —(চৈ.চ.আ.৬/৬)

অদ্বৈত-আচার্য—কোটিব্রহ্মাণ্ডের কর্তা।
আর এক এক মূর্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্তা।। —(চৈ. চ.আ.৬/ ২১)

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন মহাবিষ্ণু সদাশিবের অবতার । সেজন্য তিনি সকল জীবের বেদনা অনুভব করতে সমর্থ ছিলেন। বিশেষতঃ সমগ্র জগৎ কৃষ্ণ ভক্তি শূন্য দেখে কৃষ্ণভক্তি প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীগৌররূপে প্রকট করিয়েছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য নামাশ্রয়া অকিঞ্চনা ভক্তির আচার্য । শ্রীকৃষ্ণকে এ জগতে সকলের নয়নগোচর করার জন্য তিনি সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

"করাইমু কৃষ্ণ সর্ব-নয়নগোচর।
তবে সে 'অদ্বৈত'-নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর।।"—(চৈ.ভ.আ.১১/৬৪)

'শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব সমক্ষে দেখাতে না পারলে আমার নাম ব্যর্থ'— এরকম অভিনব অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা কেউ কখনো শোনেন নি। তিনি তুলসী ও গঙ্গাজলের দ্বারা অকিঞ্চনা ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে করুণ ক্রন্দন করেছিলেন। করুণ ক্রন্দন-সহ শ্রীকৃষ্ণের নাম-গান করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের গৌর স্বরূপে অবতীর্ণ হওয়ার লোভ থাকে। অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়া অদ্বৈত আচার্যের কাতর আহ্বানের অপেক্ষায় ছিলেন। সেই কাতর আহ্বানের ধ্বনি

চতুর্দশ লোক ভেদ করে গোলোক বৃন্দাবনের অপ্রকট প্রকাশে প্রবেশ করেছিল। তা দেখে লীলাসূত্র- ধারিণী যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌর স্বরূপে অবতরণ করার সংকল্প সুদৃঢ় করিয়েছিলেন। যার ফলে প্রেম পুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

কলিযুগে গৌড়োদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতীর্ণ হওয়ার একমাত্র কারণ—"ভক্তের ইচ্ছায় সর্ব অবতার।।" (চৈ.চ.আদি.৩/১১১)। একমাত্র অদ্বৈতাচার্যের আহ্বানে তা সঙ্ঘটিত হয়ে থাকে। প্রিয় পার্ষদের প্রার্থনায় তাঁর আগমন এক অনিবার্য কারণ। সীতানাথ অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। তাঁর কাতর ক্রন্দনে শ্রীগৌরাঙ্গ গোলোকের অপ্রকট প্রকাশকে এই ভূর্লোকে অবতরণ করান। স্বপার্ষদ ও স্বধাম সহ অবতীর্ণ হয়ে নবদ্বীপের প্রকট প্রকাশে প্রেম পুরুষোত্তম রূপে মহাবদান্যতার পরিচয় প্রদান করে নিজের বাঞ্ছা পূরণ করেছিলেন। ঠিক তেমনই অন্তরঙ্গের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে শ্রীল রূপ গোস্বামী নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধার করে বলেছেন—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কিদৃশো বানঁয়েবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ।। —(চৈ.চ.আ.১/৬)

এই ত্রিবিধ বাঞ্ছা যা অন্তরঙ্গ মূল কারণ, তা'র একমাত্র উপায় হলো ব্রজের প্রেমভক্তি সূত্র। ব্রজবিলাসী ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের সঙ্গে নিজেকে সংলগ্ন করে রাখার একমাত্র সূত্র হচ্ছে প্রেমভক্তি। সেই প্রেমভক্তি হচ্ছে 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'। 'সা পরম প্রেম রূপা'। এই সূত্রদ্বয়ের অভিব্যক্ত হয়েছে। সেই অপ্রাকৃত ব্রজ প্রেম ভক্তি-সূত্র বিনা মায়াবদ্ধ জীব শ্রীকৃষ্ণ চরণ কল্পতরুতে বাঁধা হতে পারে না। অর্থাৎ বিমল প্রেম ভক্তিই কৃষ্ণ প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠতম উপায়। "ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান।" "ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।" —এই শ্রুতিবাক্যে তা সূচিত হয়েছে। ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে অবিদ্যাগ্রস্ত অনাদি বহির্মুখ মায়াবদ্ধ ত্রিতাপগ্রস্ত জীব সংসৃতি ঘোর হতে অব্যাহতি পেয়ে অশোক, অভয় ও অমৃতের আধার শ্রীকৃষ্ণের চরণে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করতে পারে না।

বৈধীভক্তি বিধিময়। রাগভক্তি ভাবময়। রাগ-মার্গীয় ভক্তি এ জগতে কেউ

প্রদান করেননি। রাগ-ভক্তির নাম প্রেমভক্তি। প্রেমভক্তির পীঠ একমাত্র ব্রজবন। এই ব্রজভক্তি চতুর্বিধ—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই বস্তু কখনও অর্পিত হয়নি। সেজন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সংকল্প—

যুগধর্ম প্রবর্তাইমু নাম-সংকীর্তন।
চারি ভাব-ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন।।

—(চৈ.চ.আ.৩/১৯)

দাস্যাদি চতুর্বিধ রসে ভক্তির নববিধ অঙ্গ যাজিত হয়। তার মধ্যে শ্রীনাম-সংকীর্তন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যাঙ্গ।

তারমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।।

—(চৈ.চ. অন্ত্য.৪/৭১)

দাস্যাদি ভেদে প্রেম রসাশ্রিতজনের হৃদয় হতে স্বতঃ স্ফুরিত নামই প্রেমরসরঞ্জিত নাম। সেই রকম নাম-সংকীর্তন বলতে প্রেমনাম-সংকীর্তন। প্রেম-সহ নাম-সংকীর্তনই প্রেমনাম সংকীর্তন। শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রজভাবে ভাবিত হয়ে সেইরূপ প্রেমনাম-সংকীর্তন করেন। তাতেই প্রেম নামরস আস্বাদন করেন। তিনি সেই প্রেমনাম সংকীর্তনের জনক।

প্রেম ও নামের মধ্যে পরস্পর পোষ্য-পোষক সম্বন্ধ আছে। প্রেম থাকলে নাম-সংকীর্তন স্বতঃ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়। নাম-সংকীর্তনের প্রভাবে প্রেম পরিস্ফুট হয়। প্রেমনাম-সংকীর্তনই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির 'শ্রী' অর্থাৎ একমাত্র সুগুপ্ত সম্পদ বা ধন। তা 'স্বভক্তিশ্রিয়' বাক্যেতে সূচিত হয়েছে।

ব্রজপ্রেমভক্তি-সূত্র নিত্য কাল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের সঙ্গে দৃঢ় সংলগ্ন। তাঁর একপ্রান্ত অপ্রাকৃত জগতে শ্রীগোবিন্দের পদকমলে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ যদি কৃপা করে তার অপর প্রান্ত ভবসাগরে নিমজ্জমান জীবের হৃদয়ে প্রদান করেন, তবে তা অবলম্বনে মায়াবদ্ধ জীব অনায়াসে পরম শান্তিময় ধামেতে পৌঁছাতে পারে। এই ব্রজ প্রেমভক্তি-সূত্র প্রদান করার অধিকার শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কারোর নেই। প্রেমনাম দান তাঁর করুণা-সংপুটিত। " শ্রীকৃষ্ণাদন্য কোঽবালতাস্বপি প্রেমদো ভবতি।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত প্রেমভক্তিদাতা অন্য কেউ হতে পারেন না। তাঁর অন্য কোনও অবতার তা

প্রদান করতে সমর্থ নন। শ্রীকৃষ্ণ তো প্রেমদাতা, আবার তাঁর শ্রীগৌর স্বরূপে প্রকট লীলা করার আভিমুখ্য কি?

সেই রহস্যের মর্ম এই যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিক সমাজের প্রেমভক্তির বিষয়ালম্বন। প্রেমিক ভক্তজন সেই প্রেমভক্তির আশ্রয়ালম্বন। প্রেমভক্তির দাস্যাদি ভেদ আছে, আশ্রয়ালম্বনেতে অর্থাৎ ভক্তজনের নিকটে। বিষয়ালম্বনে যে ভক্তি তা ভাবময় ভক্তজনের সন্নিধানে তদনুকূলভাবে অভিব্যক্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বিষয় জাতীয় প্রেম সুদাম সুবলাদি সখাদের সন্নিধানে বিশ্রম্ভ-সখ্যের রূপ, নন্দ-যশোদার সন্নিধানে বাৎসল্যরূপ ধারণ করে। তা শ্রীমতীর সন্নিধানে মধুর রসে পরিণত হয়। সুতরাং ভক্তভাব অঙ্গীকার বিনা "চারি ভাব-ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন।।"—এই সংকল্প সিদ্ধ হতে পারেনি। আরোও ভক্তোচিত ব্যবহার, আচরণ, কৃষ্ণ-প্রাপ্তি পিপাসার অভাববশতঃ ভজনহীনের শিষ্য করা সদৃশ, আচরণহীনের প্রেম দান নিরর্থক। তা'তে রসপুষ্টির অভাব। এই জন্য ভেবেচিন্তে স্থির করলেন—

"আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিকাইমু সবারে।।"

—(চৈ.চ. আদি. ৩/২০)

বর্তমান বিবেচনা করতে হবে কোন্ ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করতে হবে। হৃদয়ে ভক্তি থাকলে ভক্তভাব হয়। দাস্যাদি ভেদে ভক্ত ভেদ আছে। ভক্ত সমাজে সকলের হৃদয়ে ভক্তভাব বর্তমান। প্রত্যেক ভক্তের ভক্তিই প্রাপ্ত সম্পদ বা সুগুপ্ত ধন। প্রত্যেক ভক্তই শ্রীগুরু কৃপায় ভক্তিধন লাভ করেন। গুরুর গুরু আছেন, তাঁরও গুরু আছেন। গুরু ধারায় যতদূর অগ্রসর হবেন, দেখতে পাবেন ভক্তি সকলের করুণালব্ধ সম্পত্তি। একজন চরম গুরু কি মিলবে না? একটি চরম ভূমি না মিললে অনবস্থা দোষ থেকে যাবে। চরম গুরুর অনুসন্ধানে পাতঞ্জলি বলেছেন— সর্বেষামপি গুরু কালেনান বছে দ্যাৎ।" "তত্র নিরতিশয় সর্বজ্ঞত্বং বীজম্।" একজন চরম গুরু আছেন, তিনি হচ্ছেন সকলের আদিগুরু। তিনি কালাতীত। তাঁর নিকটে নিরতিশয় জ্ঞানভাণ্ডার আছে। সম্বিৎ সার হ্লাদিনী বৃত্তিই ভক্তি। তাঁর একটা মহাভাণ্ডার আছে।

প্রেম-ভক্তি -প্রবাহ হ্লাদিনী শক্তির একটি বৃত্তি। সুতরাং তার উত্তরণ ভূমি হলো হ্লাদিনী শক্তির মহাভাণ্ডার। সেই হ্লাদিনী শক্তির শ্রীমূর্তি বিগ্রহ হচ্ছেন শ্রীবার্ষভানবী শ্রীরাধা। হ্লাদিনী শক্তির চরম পরিণতি মহাভাব। মহাভাব চিন্তামণি-স্বরূপা

শ্রীবার্ষভানবী শ্রীমতী রাধারাণীই প্রেমভক্তির একমাত্র পরম ভাণ্ডারী। অতএব প্রেমভক্তি মন্দাকিনীর মূল উৎস হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী। অঙ্গীকার করতে হলে তাঁর ভাব অঙ্গীকার্য। রসাস্বাদন চতুর রসিকশেখর ব্রজবিলাসী নাগরেন্দ্র ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ লোভবশতঃ রসের ভাণ্ডার হরণ করে এনেছেন। "কুতুকী রসস্তোমং হৃত্বা"— এই বাক্যে শ্রীরূপপাদ তার সংবাদ দিয়েছেন। "যাহা বৈ গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত"— এই কথাতে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমতী রাধাকে প্রেমভক্তির মহাদেবী অর্থাৎ চরম গুরুপীঠ রূপে অভিব্যক্ত করেছেন। আরোও তাঁর ভাষাতে শ্রীকৃষ্ণোক্তি—

"রাধিকা প্রেমগুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট।।"
—(চৈ.চ.আদি৪/ ১২৪)

" অতএব রাধাভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।"

এ হচ্ছে গৌরাবতারের অন্তরঙ্গ হেতু। অর্থাৎ নিজের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য আস্বাদনের জন্য শ্রীশ্যামসুন্দর রাধাভাব অঙ্গীকার করে শ্রীগৌরসুন্দর হলেন।

(হরিবোল)

শ্রীগৌর লীলার চমৎকারিতা

ইতিপূর্বে আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের অতি গূঢ় লীলা "রসরাজ ও মহাভাবের একীভূত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ" সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করেছি। তাতে আমরা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের প্রণেতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি উদ্ধার করে শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ের প্রতি শ্রীমন্ মহাপ্রভু কৃপা করে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু প্রদর্শন করেছিলেন— তা আমরা আলোচনা করেছি। বিশেষভাবে আমরা এটা জানি যে, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভের মিলিত রসরঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গের নিকটে পূর্ণ-রূপে বিদ্যমান। শ্রীগৌরাঙ্গ রামানন্দ রায়কে 'ভবন মিলনে'র মাধ্যমে প্রথমে রসরাজ ও মহাভাব ভেদে দুইরূপ ও পরে সেই দুইরূপ প্রত্যক্ষে একরূপ হওয়া দেখালেন। এরকম দিব্য চমৎকার দৃশ্য দেখে রামানন্দ রায় মূর্ছিত হয়ে গেলেন এবং তারপর মহাপ্রভুর কর স্পর্শে সচেতন হলেন। যদিও এটা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এক গুরুত্বপূর্ণ লীলা, তথাপি এর অধিকদূর অগ্রসর হলে আমরা দেখতে পাই যে, এই লীলাতে শ্রীবার্ষভানবী দেবী শ্রীরাধারাণীর অসংখ্য বদান্যতা, অপার কারুণ্য ও অনুগত জনবৎসলতাই প্রকাশ পেয়েছে। আমরা যদি প্রাকৃত অপ্রাকৃত সমগ্র সম্পৎ-সম্ভারকে একত্র করি তা হলে সেই সমগ্র সম্পৎ-সম্ভার মাদনাক্ষ মহাধনের এক কণিকার সঙ্গে সমান হয় না, সেই মহাভাব-ধন শ্রীরাধার যথা-সর্বস্ব। শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত লোভবশতঃ সেই মাদনাক্ষ মহাভাবরূপ ধন হরণ করে তাঁর নিজের হৃদয় গুহাতে লুকিয়ে রাখলেন এবং তাঁর (শ্রীরাধার) কান্তি হরণ করে সেই কান্তি দ্বারা নিজের শৃঙ্গার রসরাজ স্বরূপটাকে আচ্ছাদন করে আত্মগোপন-পূর্বক ভক্তভাবে বিভাবিত হয়ে বিপ্রলম্ভ রসাতুর শ্রীগৌর সুন্দর রূপে নিজের নিগূঢ় বাঞ্ছাত্রয়ের পূর্তি সাধন করলেন। সেই বাঞ্ছাত্রয়ের বর্ণনা শ্রীস্বরূপগোস্বামী কড়চায় নিম্নলিখিত শ্লোকেতে প্রদান করেছেন—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা -
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।"—(চৈ.চ.আ. ১/৬)

অর্থাৎ—"শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরকম, আমার অদ্ভুত মাধুরিমা যা শ্রীরাধা

আস্বাদন করেন তা কিরকম, আমার মাধুরিমার অনুভূতি হতে শ্রীরাধার কিরকম সুখের উদয় হয়—এই ত্রিবিধ বাঞ্ছাপূরণের জন্য অত্যন্ত লোভ জাত হওয়ায় শচী গর্ভসিন্ধুতে নিষ্কলঙ্ক গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হলেন।"

উপরোক্ত বাঞ্ছাত্রয়ের পূর্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রেম পুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গ স্বপ্রেমনামামৃত প্রদানের দ্বারা মহাবদান্য লীলাময় হলেন। এই সুগুপ্ত সম্পদ যা তিনি স্বয়ং গৌর অবতারে আস্বাদন করলেন তা তিনি অন্য কোনও অবতারে অযাচিত ভাবে বিতরণ করেননি। এই ধন্য কলি যুগে তিনি অযাচিত ভাবে আপামর চণ্ডাল পর্যন্ত সমস্তকে অকাতরে তা প্রদান করেছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উক্তিতে —

চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান। —(চৈ.চ.আ. ৩/১৪)

বহুদিন হলো আমার প্রতি জগতবাসীর শুদ্ধ প্রেমময়ী সেবা আমি প্রদান করিনি। এরকম প্রেমময়ী সম্বন্ধ ব্যতিরেকে ভৌতিক জগতের স্থিতি অনাবশ্যক।

চিরাদদত্তং নিজ গুপ্তবিত্তং
স্বপ্রেম-নামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে।। —(চৈ.চ.আ. ২৩/১)

অর্থাৎ—"যা বহুকাল পর্যন্ত বিতরিত হয়নি, যেটাকি স্বীয় সুগোপনীয় সম্পত্তি তুল্য, সেই স্বপ্রেম নামামৃত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম সহ শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ নামামৃত আপামর সমস্তকে বিতরণ করলেন, আমি সেই পরম করুণ শ্রীগৌরকৃষ্ণের শরণাপন্ন হই।"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌর স্বরূপে মহাভাবময়ী শ্রীবার্ষভানবী শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-অন্বেষণ লীলার পরম পরাকাষ্ঠা অভিব্যক্ত করেছেন। শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রেম পুরুষোত্তম শ্রীগৌরহরির অবস্থান কালে অন্তলীলাতে মোহনাক্ষ ও মাদনাক্ষ মহাভাবের অনির্বচনীয় চমৎকারিতা পরিস্ফুট হয়েছে। এর সঙ্গে কৃষ্ণ নামানুশীলনের মাধ্যমে কৃষ্ণলীলা-সহ কৃষ্ণপ্রেমের পরম পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শিত হয়েছে।

রসস্বরূপ ও রসরাজ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদন কামনার মূলেতে আছে বিস্ময়। দ্বারকায় স্ফটিক প্রস্তরে নির্মিত মণিময় খম্বাতে (স্তম্ভতে) নিজের প্রতিবিম্ব দেখে

নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছেন ও নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেছেন, "আহা! এই প্রগাঢ় মাধুর্য চমৎকারকারী অবিচারিত অপূর্বচিত্রিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটি কে? এঁকে আমি ক্ষুব্ধ চিত্তে দেখছি এবং রাধিকার মতো এঁকে বলপূর্বক আলিঙ্গন করতে ইচ্ছা করছি।"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উক্তিতেও দেখতে পাওয়া যায়—

"রূপ দেখি' আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।" —(চৈ.চ.মধ্য ২১/১০৪)

"আপন-মাধুর্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন।।
—(চৈ.চ.ম. ৮/১৪৭)

তাই সেই কৃষ্ণ যিনি নিজের রূপ নিজেই দেখে বিমোহিত হয়েছিলেন, তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে বিপ্রলম্ব রসময়ী লীলা আবিষ্কার করে নীলাচলে শ্রীরথাগ্রে গোপী ভাবোন্মত্ত হয়ে নৃত্য করেন, তখন সেই নৃত্য দর্শন করে সমগ্র জগত বিস্মিত হয়েছিল, এমনকি স্বয়ং জগন্নাথও বিস্মৃত হয়েছিলেন, (যেনাসীৎ জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ)। এইজন্য পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আমরা যা প্রকাশ করেছি, রসরাজ ও মহাভাবের একত্র মিলন না হলে এরূপ রস চমৎকারিতা বিশেষ পরম পরাকাষ্ঠা আবিষ্কৃত হয় না। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এইজন্য তিনবার অদ্ভুত শব্দটি প্রয়োগ করে বিপ্রলম্ভ রসাতুর শ্রীগৌর হরির মাধুর্য ও ঔদার্য ভাবের মহিমা ব্যক্ত করেছেন—

অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য-মহিমা।
আপনি আস্বাদি' প্রভু দেখাইলা সীমা।।
অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য—অদ্ভুত-বদান্য।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে নাহি শুনি অন্য।।
সর্ব্বভাবে ভজ, লোক, চৈতন্য-চরণ।
যাহা হৈতে পাইবা কৃষ্ণপ্রেমামৃত-ধন।।
—(চৈ.চ.অন্ত্য ১৭/৬৭-৬৯)

শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্তবগান করে তাঁর দয়ার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপে ব্যক্ত করেছেন—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য মর্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।।

—(শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক স্তব—৮/১৪, চৈ.চ.ম. ১০/১১৯)

"হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য! যা অবহেলাক্রমে সমস্ত খেদ দূর করে, যাতে সম্পূর্ণ নির্মলতা আছে, যাতে পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করে) প্রকাশিত হয়, যার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যা রসবর্ষণ দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যার ভক্তিবিনোদনক্রিয়া সর্বদা শমতা দান করে, মাধুর্য মর্যাদা দ্বারা তোমার অতি বিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হোক্।"

এসব বিষয় অবতারণা করার উদ্দেশ্য হলো শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য লীলা-চমৎকারিতা হৃদয়ঙ্গম করতে হলে গৌর ভক্তের পাদপদ্মতে কৃপাপ্রার্থনা অবশ্য করণীয়। কারণ তাঁদের পাদপদ্ম সেবা ব্যতিরেকে বেদগুহ্য (শ্রুতিও মৃগ্য) শ্রীগৌরকৃষ্ণের পাদপদ্মের সেবা মেলে না। প্রধান বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ এ সম্বন্ধে বলেছেন—

আচার্য ধর্মং পরিচর্য বিষ্ণুং
বিচর্য তীর্থান্ বিচার্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয় পাদসেবাং
বেদাদিদুষ্প্রাপ্রপদং বিদন্তি।।

—(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত শ্লোক-২২)

অর্থাৎ—"বর্ণাশ্রম ধর্ম পরিপালন, শ্রীবিষ্ণুর অর্চন, শত শত বর্ষ ধরে তীর্থ পরিভ্রমণ ও নিখিল বেদ শাস্ত্রের বিচারণ করেও শ্রীগৌরকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্তজনের পাদপদ্ম সেবা ব্যতীত কেউ কখনো বেদাদির দুর্লভপদ অর্থাৎ শ্রীরাধা-গোবিন্দের চিদ্-বিলাস ক্ষেত্র শ্রীধাম বৃন্দাবনের সন্ধান পান না কি জানেন না।"

তাৎপর্য এই যে, শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা কটাক্ষ-লব্ধ ব্যক্তিগণের আনুগত্য ব্যতীত ব্রজের নিগূঢ় প্রেম লাভ হয় না। শ্রীগৌরকৃষ্ণের প্রেমরসময়ী সেবা তাঁর ঐকান্তিক ভক্তজনের পক্ষে সর্বদা সুলভ।

(হরিবোল)

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের দয়া

সাধারণতঃ দয়া বলতে ভৌতিক জগতের লোকেরা কি বুঝে থাকে? বদ্ধজীব নিজের ইন্দ্রিয় ভোগ বাসনার বিচার-বুদ্ধির দ্বারা দয়া শব্দের যে অর্থ কল্পনা করে, সেই দয়া থেকে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া সম্পূর্ণ পৃথক্। বদ্ধজীবদের জড় দেহের সুখ সম্ভোগের জন্য যা আবশ্যক তা যারা প্রদান করতে পারেন, তাদের সেই দয়াকে লোকেরা শ্রেষ্ঠ দয়া হিসাবে বহুমানন-পূর্বক আদর করে থাকেন। জড় দেহের আবশ্যকতা হচ্ছে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন। তাই এ সম্বন্ধে যারা সাধারণ লোকেদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন, তারা বড় দয়ালু বলে বিবেচিত হন। বুভুক্ষু বা দরিদ্রকে অন্নদান করা, রোগীকে ঔষধ ও পথ্য দান করা, অশিক্ষিতকে প্রাকৃত শিক্ষা দান করা ইত্যাদি দানকে এ জগতের লোকেরা সাধারণতঃ দয়া বলে বুঝে থাকে। কিন্তু এরকম দয়ার ফল কতদিন স্থায়ী? যেহেতু জড় শরীরটা ক্ষণকাল স্থায়ী, তাই এরকম দয়ার ফলও ক্ষণকাল স্থায়ী। আমরা তো শরীর নই, আমরা চিদাত্মা।

আত্মা চিরন্তন বস্তু। আত্মার আবশ্যকতা কি? আত্মার প্রসন্নতা কিসে হয়? এ কথা কত জন বোঝে? যাঁরা ভক্ত, মুক্ত জীব ও চিদানুভূতি লাভ করেছেন কেবল তাঁরাই একথা বুঝতে পারেন, অন্যেরা নয়। আত্মার আবশ্যকতা পূরণের জন্য যে ব্যক্তি আবশ্যকীয় বস্তু প্রদান করেন, তিনি যে কি রকম দয়া প্রদর্শন করেছেন তা সাধারণ মানব বা বদ্ধজীব বুঝতে পারবে না। তাঁর দয়া চিরকাল স্থায়ী, তা অস্থায়ী নয়। যেহতু আত্মা চিরন্তন, তাই সেরকম দয়াটাও হচ্ছে চিরন্তন। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের দয়াটাও সেরকম। ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু, জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁকে কেউ জানতে পারবে না বা উপলব্ধি করতে পারবে না। অনুরূপ ভগবানের দয়াটাও অপ্রাকৃত। তা বদ্ধজীবের ভোগবাসনা পরায়ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নয়। বর্তমান আমরা বিচার করব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়াটা কি রকম। শ্রীল রূপগোস্বামী বলেছেন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।

অর্থাৎ—"সকল দাতাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা, যিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে কৃষ্ণ প্রেম লীলা প্রকট করেন, যিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, যাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, যাঁর রূপ গৌরবর্ণ, তাঁকে আমি প্রণাম করি।" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুতে সর্বোত্তম দানশীলতা আছে এবং তিনি হচ্ছেন প্রেমময় বিগ্রহ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দয়া ও শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের দয়া—

শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে—

"এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।

—(ভা. ১/৩/২৮)

কৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ, বিলাস বিগ্রহ-সকল, চতুর্ব্যূহ, তিন পুরুষাবতার, অন্যান্য অবতারগণ—কেউ কৃষ্ণের অংশ, আবার কেউ বা কলা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরতত্ত্ব বস্তু সর্বাবতারী। তিনি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আমরা অঘাসুর, বকাসুরাদির বধের সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মহাবদান্য লীলা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। কিন্তু অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌর সুন্দরের লীলায় তাঁর মহাবদান্য লীলা আমরা বুঝতে পেরেছি।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—

" যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

—(গী-৪/১১)

অর্থাৎ —"আমাকে যে যেভাবে ভজন করেন, আমি তাকে তেমনই ভজন ফল প্রদান করে থাকি।" কর্মীরা কর্মযোগে ইহলোক বা পরলোক সুখভোগের কামনায় শ্রীভগবানের ভজন করে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ তাদেরকে সেই বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে থাকেন। জ্ঞানীরা ইহজগত বা পরজগতের সুখাদি অকিঞ্চিতকর উপলব্ধি করে মুক্তির জন্য ভজন করে থাকেন। শ্রীভগবান তাদেরকে মুক্তিফল প্রদান করে থাকেন। কিন্তু ভগবৎ ভক্তরা নিজের জন্য কিছু কামনা না করে কেবল মাত্র শ্রীভগবানের যাতে প্রীতি হয়, সুখ হয়, সেরকম সেবার জন্য ভজন করে থাকেন। তাঁরা প্রার্থনা করেন।

প্রভু তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহ সুখ, বিদ্যা, ধন, জন।।

নাহি মাগি স্বর্গ আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি'।।
নিজকর্ম-গুণ দোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই।।

—(গীতাবলী- ভক্তিবিনোদ)

শুদ্ধ ভক্তের এরকম প্রার্থনাতে অজিত ভগবান ভক্তের কাছে জিত অর্থাৎ বশীভূত হয়ে তাঁকে সেইরূপ ভজন ফল প্রদান করেন। কিন্তু ঔদার্য বিগ্রহ শ্রীগৌরহরির দয়া এ হতে অধিক উদার। শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় --

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।।

—(চৈ.চ.আদি.৮/ ১৫)

শ্রীগৌরহরি পাত্রাপাত্র বিচার না করে পতিত জনকেই বহ্মার দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করতে কুণ্ঠিত হন্ না।

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ ,বালক, যুবা, সবারে ডুবায়।।
সজ্জন, দুর্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন।।
মায়াবাদী, কর্মনিষ্ঠ, কুতার্কিকগণ।
নিন্দক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম।।
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা-সবারে ছুঁইতে নারিল।।
তাহা দেখি' মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিলুঁ যতন।।
কেহ কেহ এড়াইল, প্রতিজ্ঞা হইল ভঙ্গ।
তা-সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ।।
এত বলি' মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার।।

—(চৈ.চ.আদি. ৭/ ২৫, ২৬. ২৯-৩৩)

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস লীলার তাৎপর্য—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে গৃহস্থ লীলা প্রদর্শন করেছিলেন তা বহু গৃহব্রত লোকের চৈতন্য প্রদান করার জন্য উদ্দিষ্ট ছিল। আবার তিনি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে যে সন্ন্যাসলীলা প্রদর্শন করেছিলেন তাও অচৈতন্য জীবদেরকে চৈতন্য প্রদান করার জন্য উদ্দিষ্ট ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণের প্রাক্কালে তিনি মাতা ও পত্নীকে বলে গেলেন 'কৃষ্ণকেই পুত্র ও পতি বলে জ্ঞান কর'। পুত্র শোক কাতরা জননীকে এবং পতি শোক কাতরা নিরাশ্রয়া পত্নীকে পরিত্যাগ করে তিনি দীন পতিত জীবদের নিত্য কল্যাণ বিধানের জন্য চললেন— তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। যেসব মন্ত্র পড়ে তিনি বিবাহ করেছিলেন, সেসব জাগতিক কর্তব্যভার পরিত্যাগ করে তিনি যে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, তাতে পতিত জীবদের প্রতি তাঁর কি গভীর অনুকম্পা ও দয়া ছিল, তা মূঢ়লোক অবিদ্যাগ্রস্ত লোক বুঝতে পারবে না। সেই জন্য অনেকেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সমালোচনা করে থাকেন। কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করে যে চললেন, তা কেবল কৃষ্ণ কীর্তনের জন্য। অচৈতন্য মানব জাতিকে চৈতন্য প্রদান করার জন্য তিনি এরকম অলৌকিক লীলা প্রকাশ করেছিলেন।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।।

— (বিদগ্ধমাধব ১/২.চৈ.চ.আ.১/৪)

"তোমাদের হৃদয় গুহাতে শ্রীশচীনন্দন উদিত হোন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান হরি। তিনি পূর্বে অন্যান্য অবতারে জগতে যা দান করেছিলেন, সে-সমস্ত দান থেকে সর্ব-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ দান। পূর্বে যা কখনো প্রদান করেন নি, সেরকম অপূর্ব দান জগতে প্রদান করার জন্য তিনি এসেছিলেন।"

যা মানুষ জানে বা জানতে পারে, সেরকম কোনও কথা বলার জন্য শ্রীগৌর সুন্দর আসেননি। আবার যা ভগবানের বিভিন্ন অবতারের দ্বারা কখনো প্রচারিত হয়নি, তা-ই জগতকে প্রদান করার জন্য শ্রীগৌরহরি এসেছিলেন। আমাদের মতো পতিত, পাষণ্ডী, অক্ষজ- জ্ঞান-প্রতারিত ব্যক্তিদেরকে কৃপাপূর্বক চরম মঙ্গল প্রদান করার জন্য তিনি উদ্যত। সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে প্রদান করার জন্য তিনি সর্বদা উদ্গ্রীব।

তিনি আমাদেরকে এক মহাদান প্রদান করতে উদ্যত, যার ফলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু আমাদের করতলগত হয়ে আমাদের নিত্য সেব্যরূপে সর্বদা আমাদের কাছে থাকতে পারবেন। এ হচ্ছে মহাবদান্য মহান দয়ালু শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অপরিসীম দয়া।

শ্রীগৌরসুন্দর সমগ্র জগতটাকে সেই সমগ্র কৃষ্ণ বস্তুটি প্রদান করতে উদ্গ্রীব। কিন্তু বহির্মুখ জগত জ্ঞানের নামে অজ্ঞান, অবিদ্যার আলোকের নামে অন্ধকারের আশ্রয়ে বাস করছে। এ হচ্ছে আমাদের মন্দভাগ্য। একথা আমরা কাকে বলব? কেবল সেই মহাবদান্য, পতিত পাবন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর করুণা ভিক্ষাই করব।

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রাকৃত দয়ার কথা অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।।

—(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকস্তব –৮/১৪,-চৈ.চ.ম. ১০/১১৯)

"হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্যদেব! আপনার যে দয়া হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যে দয়াতে সম্পূর্ণ নির্মলতা বিদ্যমান, যে দয়াতে সমস্ত ইতর বিষয় আচ্ছাদিত হয়ে পরমানন্দ প্রকাশিত হয়, যার উদয়ে সমস্ত শাস্ত্র বিবাদ নিবৃত্তি লাভ করে, যে দয়া রস বর্ষণের দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যে দয়ার ভক্তিবিনোদ-ক্রিয়া সর্বদা সমতা দান করে, মাধুর্য মর্যাদার দ্বারা আপনার অতি বিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হোক্।"

গৌরসুন্দরের দয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোনও যুগে কখনো দৃষ্টি গোচর হয়নি। যে-সব দাতা শিরোমণি এসেছেন এবং তাঁরা যা দান করেছেন তা অপেক্ষা অধিক দান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু করেছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু 'অনর্পিত চির উন্নতোজ্জ্বল প্রেমরস' প্রদান করে মহাবদান্য নামে আখ্যাত হয়েছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়া সবার অনর্থ নিবৃত্তি করিয়ে সবাইকে ভক্তিসিদ্ধান্ত রস প্রাপ্তি করায়। এঁনার দয়ালীলা এমনই বিচিত্র যে তা পাত্রাপাত্র বিচার, আত্মপর দর্শন, দেওয়াদেয়ী বিচার অথবা কালাকালের প্রতীক্ষা করে না। তাঁর শ্রীমুখ হতে

উদ্‌গীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ, তাঁর অপরূপ মাধুরী একবার দর্শন, তাঁর অশোক-অভয়-অমৃত পাদপদ্মে একবার প্রণাম মাত্রই তিনি প্রেমামৃত রস তৎক্ষণাৎ প্রদান করেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমতীরাধারাণীর প্রেমরসাস্বাদনে লুব্ধ হয়ে শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার- পূর্বক জগতে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে বিপ্রলম্ভ ভাবে ভজন শিক্ষা প্রদান করেছেন। এটাই তাঁর অমন্দোদয় দয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

শ্রীগৌর সুন্দরের দয়ালাভ করলে জীবের হৃদয় হতে খেদ-রূপ অনর্থরাশি অনায়াসে দূরীভূত হয়ে হৃদয় নির্মল হয় এবং কৃষ্ণসেবাজনিত পরমানন্দ শুদ্ধ নির্মল হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। যখন একরম হয় তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপায় শুদ্ধ ভক্তি ও প্রেমভক্তি লাভ হয়ে থাকে—

> " চিরদদত্তং নিজ-গুপ্তবিত্তং
> স্বপ্রেম-নামামৃতমত্যুদারঃ।
> আপামরং যো বিততার গৌরঃ
> কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে ।।
>
> —(চৈ. চ. মধ্য. ২৩/১)

অর্থাৎ— "যা বহুকাল ধরে বিতরিত হয়নি, যেটাকি স্বীয় গোপনীয় সম্পত্তি তুল্য, সেই স্বপ্রেম নামামৃত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম সহ শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণনামামৃত আপামর জনসমাজকে যিনি বিতরণ করলেন, আমি সেই পরম করুণ গৌরকৃষ্ণকে শরণাপন্ন হই।"

ভগবান কৃষ্ণ তাঁর গুপ্তবিত্ত কৃষ্ণপ্রেম এপর্যন্ত প্রদান করেননি। শ্রীগৌর অবতারে তিনি তা অকাতরে বিচার-নির্বিশেষে সমস্তকে প্রদান করেন। ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি পিপাসুর যা অলভ্য; কর্মী,জ্ঞানী ও যোগীদের পক্ষে যা দুর্লভ; সেরকম পরম পুরুষার্থ সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম মহাবদান্য শ্রীগৌরাঙ্গ পাত্রাপাত্র স্থানাস্থান ও কালাকালাদির বিচার নির্বিশেষে যেখানে সেখানে যাকে তাকে অকাতরে অযাচিত ভাবে প্রদান করেছেন।—এ হল তাঁর মহান দয়া।

নাম প্রেম বিতরণ লীলাই শ্রীগৌরাঙ্গের মহাবদান্য লীলা। শ্রীনাম সব যুগেতে আছে। শ্রুতি-স্মৃতিতে শ্রীনাম-নামীর অভেদত্ব ও শ্রীনামের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীমন্ নাম মুক্তিদ ও সর্ব অভীষ্টপ্রদ—তা শ্রুতি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই কলিযুগ

ছাড়া অন্য কোনও যুগে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপে নিজের নাম কীর্তন করে নিজের অভিন্ন স্বরূপ শ্রীমন্ নামের পরম রসমাধুরী আস্বাদন মুখে জনসাধরাণকে বিতরণ করেন নি। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনও অবতার কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করতে সমর্থ নন। সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপে নিজের নাম-প্রেম আস্বাদন-পূর্বক নিজেই আপামরকে তা প্রদান করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম-নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে, কৃষ্ণ-প্রেম-প্রদাতারূপে তিনি মহাবদান্য। স্বপ্রেমনামামৃত বিতরণই তাঁর বদান্যতার মহান দয়ার পরিচয়।

> এ মন! গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর।
> হেন অবতার, হবে কি হয়েছে,
> হেন প্রেম পরচার।।
> দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী ,
> প্রাণে না মারিল কারে।
> হরিনাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল,
> যাচি গিয়া ঘরে ঘরে।।
>
> —(প্রকীর্ণক – প্রেমানন্দ)

এটাই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের অপরিসীম দয়া।

(হরিবোল)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত ধর্মই একমাত্র শুদ্ধধর্ম—যুগধর্ম

শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।। —(গী. ৪/৭-৮)

অর্থাৎ—"হে ভরত বংশজ! যেখানে ও যখন ধর্মের গ্লানি দেখা দেয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন আমি অবতরণ করি সাধু ও ভক্তদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"

এটা স্পষ্ট কথা যে, স্বয়ং ভগবান ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য এই ধরাধামেতে অবতীর্ণ হন; কারণ—

"ধর্ম্মমূলংহি ভগবান্ সর্ব্ব বেদময়ো হরিঃ।"
—(ভা. ৭/১১/৭)।

অর্থাৎ—সর্ববেদময় ভগবান্ শ্রীহরিই ধর্মের মূল বা প্রমাণ। আবার শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে—

ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং
ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ।। —(ভা. ৬/৩/১৯)

অর্থাৎ—"বাস্তব সত্য ভাগবত ধর্মটি সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রণীত। এটা কোনও

দেবতা, ঋষি, মুনি, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, মনুষ্য কিংবা অসুর দ্বারা সৃষ্ট নয়।" এই সত্যধর্মটি অতিশয় নির্মল, গুহ্য ও দুর্বোধ্য হলেও তা জীবের মঙ্গলের জন্য শ্রৌত পারম্পর্য-ক্রমে জগতে প্রকাশিত হয়।

এসব শাস্ত্র প্রমাণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ধর্ম কেবল ভগবান দ্বারা প্রণীত হয় ও প্রবর্তিত হয়। এই যে ধর্মের কথা এখানে বলা হয়েছে তা'র নাম ভাগবত ধর্ম, আত্মধর্ম, সনাতন ধর্ম (যেটা কি একমাত্র ধর্ম, জীব মাত্রেরই ধর্ম—জৈব ধর্ম), তা কোনও গোষ্ঠীগত বা সম্প্রদায়গত ধর্ম নয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই যে, ভারতের ধর্মাকাশ যখন নীতি ভ্রষ্টতা ও আচার ভ্রষ্টতায় কলুষিত হতে যাচ্ছিল, ঠিক্ সেই সময় কলিযুগ পাবনাবতারী অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হলেন। যুগধর্ম শ্রীনাম-সংকীর্তন (কলিযুগের যুগধর্ম কিরূপে শ্রীনাম-সংকীর্তন, তা আমরা পরে আলোচনা করব) প্রবর্তন উদ্দেশ্যে ভাগীরথী তীরস্থ শ্রীধাম মায়াপুরে (নবদ্বীপে) মাতা শ্রীশচীদেবী ও পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরকে আশ্রয় করে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৪৮৬ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যার সময়ে চন্দ্রগ্রহণের সময় শ্রীহরি-সংকীর্তনের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি ভক্তাবতার রূপে স্বয়ং ভক্তি আচরণ করে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন। তিনি প্রকট ভগবৎ অবতার রূপে আসেন নি, কিন্তু তিনি যে স্বয়ং ভগবান্ তা শাস্ত্র প্রমাণ থেকে স্পষ্ট প্রতিপাদিত হয়। বৈদিক শাস্ত্রসমূহে ভগবান্ এবং তাঁর অবতারদের সম্বন্ধে স্পষ্ট বর্ণনা আছে। প্রামাণিক গ্রন্থ বা বৈদিক শাস্ত্র হতে প্রমাণ না মিললে কাউকে ভগবান্ কিংবা অবতার-রূপে স্বীকার করা যাবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগের পতিতদেরকে উদ্ধার করার জন্য এসেছিলেন। "ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসূত হৈল সেই।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে স্বয়ং পরমপুরুষ ভগবান্ তা'র ভূরিভূরি শাস্ত্র প্রমাণ আছে। এক্ষেত্রে আমরা কতকগুলি শাস্ত্র প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করেছি। শাস্ত্র চূড়ামণি শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।
—(ভা. ১১/৫/৩২)

অর্থাৎ—"কৃষ্ণবর্ণ ভিতরে রেখে অকৃষ্ণবর্ণে বা গৌরবর্ণে প্রকাশিত হবেন এবং সেই ভগবান অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র, পার্ষদ সহ অবতীর্ণ হয়ে সংকীর্তন যজ্ঞ প্রবর্তন করবেন এবং সেই সংকীর্তন প্রধান যজ্ঞদ্বারা বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তাঁকে আরাধনা করবেন।"

এই মর্মে 'তত্ত্ব সন্দর্ভে' শ্রীল জীবগোস্বামী পাদও শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বলেছেন—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবম্।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ।।

—(তত্ত্বসন্দর্ভ শ্লোক - ২)

অর্থাৎ—"অঙ্গ-উপাঙ্গাদি-বৈভব-লক্ষিত ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, বাহ্যে গৌরস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্যকে কলিযুগে সংকীর্তনাদি অঙ্গের দ্বারা আশ্রয় করি।" আবার ভাগবত মহাপুরাণেও বলা হয়েছে—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।।

—(ভা. ১০/৮/১৩)

অর্থাৎ—গর্গমুনি নন্দমহারাজকে বলছেন,—"হে নন্দ, তোমার পুত্র প্রতিযুগেই স্বীয় শ্রীমূর্তি প্রকট করে থাকেন। পূর্বে এঁর শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিন বর্ণ প্রকটিত হয়েছিল, সম্প্রতি কৃষ্ণবর্ণে প্রকটিত হয়েছেন।" (সত্যযুগে যুগাবতারের বর্ণ শুক্লবর্ণ, ত্রেতা যুগে রক্তবর্ণ, দ্বাপর যুগে কৃষ্ণবর্ণ এবং কলিযুগে পীতবর্ণ)। পীতবর্ণ কলিযুগের জন্য—"পীত বরণ কলি পাবন গোরা।" 'শ্রীচৈতন্য উপনিষদ' নামে একটি উপনিষদ আছে, তাতে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হয়েছে—

জাহ্নবী তীরে নবদ্বীপে গোলোকাখ্যে ধাম্নি গোবিন্দ দ্বিভুজো
গৌরঃ সর্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীতঃ
সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি।

অর্থাৎ—শ্রী ব্রহ্মাজী পিপ্পলাদ মুনির জিজ্ঞাসায় উত্তর দিয়ে বলছেন, "সকলের আত্মাস্বরূপ, মহাপুরুষ, পরমাত্মা স্বরূপ, মহাযোগী, ত্রিগুণাতীত

বিশুদ্ধ সত্ত্বময় দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর স্বয়ং জাহ্নবীতটস্থ গোলোকাখ্য নবদ্বীপ ধামে গৌর সুন্দর রূপে অবতীর্ণ হয়ে জগতে ভক্তি প্রকাশ করবেন।" আবার 'শ্রীমদ্ ভাগবতে'র সপ্তম স্কন্ধে বলা হয়েছে—

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্।।

—(ভা. ৭/৯/৩৮)

অর্থাৎ—"হে ভগবান! আপনি মানব, মানবেতর প্রাণী, দেবতা, ঋষি, জলজীবাদি পরিবারে আবির্ভূত হয়ে বিভিন্ন অবতাররূপে পৃথিবীতে শত্রুদিগকে বিনাশ করেন। এই ভাবে আপনি জগতটাকে দিব্য জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেন। কলিযুগে, হে মহাপুরুষ! আপনি এক ছন্ন অবতার ভাবে প্রকটিত হন। তাই আপনাকে 'ত্রিযুগ' (যিনি কি ত্রিযুগে—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরেই কেবল অবতার নেন) বলে অভিহিত করেছেন।"

যদিও ভগবান কলিযুগে ছন্নাবতার হয়েছেন, অর্থাৎ ভক্তাবতার হয়েছেন, তথাপি শাস্ত্রপ্রমাণ অনুসারে তাঁকে (শ্রীচৈতন্যদেবকে) পরমপুরুষ ভগবান বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

'নারদীয় পুরাণে' বলা হয়েছে যে, কলিযুগে ভগবান ভক্তরূপে অবতীর্ণ হবেন। প্রচ্ছন্ন বিগ্রহ সেই ভক্তাবতারই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

"অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা।।"

আবার 'পদ্মপুরাণে' বলা হয়েছে—

"কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহং মহীতলে।
ভাগীরথীতটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।।"

গরুড়পুরাণে বলা হয়েছে—

"কলৌ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্মসমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ।।"

(এসব হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ)।

আবার 'মুণ্ডক' উপনিষদে আছে—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।।"

অর্থাৎ—"যিনি রুক্ম বর্ণধারী পরমেশ্বর ভগবানকে দেখেন তিনি মুক্ত হয়ে যান।"

শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান সে সম্বন্ধে বহু শাস্ত্র-প্রমাণ আছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে লিখেছেন—

**যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।।**

—(চৈ. চ. আদি ১/৩)

অর্থাৎ—"অদ্বৈতবাদীগণ যাঁকে উপনিষদ বর্ণিত ব্রহ্ম বলে অভিহিত করেন, তা শ্রীচৈতন্যদেবের অঙ্গকান্তি। যোগীগণ যাঁকে পরমাত্মা বলেন, তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অংশবিশেষ এবং ভক্তগণ যাঁকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান বলেন, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নেই।"

এইসব শাস্ত্র প্রমাণ থেকে যদি কেউ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভগবান বলে না জানতে পারল, তা'হলে সে একজন মূর্খ বা মূঢ় ব্যক্তি ছাড়া আর কি হতে পারে। মূঢ় ব্যক্তি বা মূর্খগণ তাঁকে (ভগবানকে) বুঝতে পারবে না। তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভালভাবে জানেন এবং সেজন্য তিনি 'শ্রীমদ্ ভগদ্গীতা'য় বলেছেন—

**অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।।** —(গী. ৯/১১)

অর্থাৎ—"আমি যখন মানুষরূপে এ ধরাধামে অবতীর্ণ হই তখন মূর্খেরা আমাকে উপহাস করে। তারা আমার পরম দিব্য প্রকৃতি এবং সকলের ওপর

আমার যে পরম অধিকার আছে, তা জানে না।"

সবযুগে কিছু না কিছু মূঢ় লোকের সংখ্যা দেখতে পাওয়া যায় ; কিন্তু কলিযুগে মূঢ় বা মুর্খদের সংখ্যা সর্বাধিক। তাই তারা এত শাস্ত্র-প্রমাণ সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে একজন পাগল ব্যক্তি, একজন সাধারণ সন্ন্যাসী বা ধর্মপ্রচারক বলে অভিহিত করে এবং তিনিই উড়িষ্যার অধোপতনের জন্য দায়ী বলে অভিহিত করতে পশ্চাৎপদ হয় না। এ হচ্ছে পরম দুর্ভাগ্যের কথা ও বহির্মুখতার কথা, তা না হলে মূর্খেরা প্রেম পুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গকে এভাবে কেন দোষারোপ করে থাকে? স্বয়ং মহাপ্রভু যখন প্রকট লীলা করেছিলেন, তখন নবদ্বীপেও পাষণ্ডীরা মুসলমান শাসক কাজীর কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। নিমাই পণ্ডিত আমাদের ধর্ম নষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি নিম্ন জাতির মানুষদেরকে নিয়ে সারা রাত্রি ধরে সংকীর্তন করছেন। নিম্ন জাতির মানুষদের আস্পর্ধা বেড়ে যাবে, "আমাদের ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে" ইত্যাদি ইত্যাদি। যা হোক্ শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাদেরকে কৃপা করেছেন। তিনি পাষণ্ডী, সমালোচক, বিধর্মী, ম্লেচ্ছ, যবন সকলকে উদ্ধার করেছেন। তিনি পতিত পাবন, তিনি সকলকে প্রেমধর্মে দীক্ষিত করেছেন। তাই আজও যারা শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভুকে সমালোচনা করছে, তাদের প্রতি সেই করুণাময় মহাপ্রভু কৃপা প্রদর্শন করুন—এটাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকটে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, স্বয়ং ভগবানই ধর্ম প্রবর্তন করেন। কলিযুগের ধর্ম যে হরি সংকীর্তন তা-ও বৈদিক শাস্ত্রতে বর্ণিত হয়েছে। বৃহৎ নারদীয় পুরাণ এবং কলি সন্তরণ উপনিষদে বলা হয়েছে—

**হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।**

—(বৃ. না. পু. ৩৮/১২৬)

কলিযুগে একমাত্র হরিনাম আশ্রয় করতে হবে। হরিনাম-সংকীর্তনই যুগধর্ম।

**কলিযুগে ধর্ম হয়—'হরিসঙ্কীর্তন'।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন।।**

—(চৈ. ভা. আদি ২/২২)

বিভিন্ন যুগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যুগধর্ম নিশ্চিতরূপে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রমাণ দেখুন।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ।।

—(ভা. ১২/৩/৫২)

"সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানযোগাদি ছিল যুগধর্ম, ত্রেতা যুগে যজ্ঞ-কর্মাদি ছিল যুগধর্ম, দ্বাপর যুগে অর্চ্চামূর্তির পরিচর্যাদি ছিল যুগধর্ম কিন্তু এই কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তনই হচ্ছে যুগধর্ম।"

ধর্মের চারিপাদ—তপস্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্য। সত্য যুগে এই চারিপাদ ছিল। কলিযুগে ধর্মের তিনপাদ অর্থাৎ তপস্যা, শৌচ ও দয়া নষ্ট হয়ে গিয়ে একমাত্র সত্য রূপ পদটি রয়েছে। তার কারণ হলো গর্ব, স্ত্রীসঙ্গ ও মাদক দ্রব্য সেবন—এই তিনটি হচ্ছে অধর্মাংশ-পাপ। গর্বের দ্বারা তপস্যা নষ্ট, স্ত্রীসঙ্গাদি ইন্দ্রিয় তর্পণের দ্বারা শৌচাদি ভাব নষ্ট এবং মাদক দ্রব্য সেবনের দ্বারা দয়া নষ্ট হয়, অর্থাৎ জীব নির্দয় হয়। সত্য যুগে তপস্যা, শৌচ ও দয়া সত্যের মর্যাদা রক্ষা করে। তাই সেযুগে ধ্যানযোগাদি তপস্যা সম্ভবপর ছিল। এজন্য ধ্যানযোগ ছিল সত্যযুগের যুগধর্ম।

ত্রেতাযুগে তপস্যা নষ্ট হয়েছিল। কিন্তু জীবগণ শৌচ, দয়া ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। সেইজন্য ধ্যানযোগের পরিবর্তে যজ্ঞাদি সাধন যুগধর্ম হয়েছিল।

পরবর্তী দ্বাপর যুগে তপস্যা ও শৌচ—এই দু'টি পদ ও স্ত্রীসঙ্গের প্রভাবে গর্ব হওয়ায় অর্চামূর্তির পরিচর্যা রূপ দয়া ও সত্য যুগধর্মের সম্মান রক্ষা করেছিল। পরিশেষে কলিকালে অহঙ্কার (বা গর্ব), স্ত্রীসঙ্গ ও মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে তপস্যা, শৌচ ও দয়া নষ্ট হওয়ায় একমাত্র সত্যরূপ হরিনাম যুগধর্ম হয়ে যুগের অমঙ্গল হতে লোকসমাজকে রক্ষা করছে। আবার 'শ্রীমদ্ ভাগবতে' বলা হয়েছে—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্তনেনৈব সর্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে।।

—(ভা. ১১/৫/৩৬)

অর্থাৎ—কলিযুগে কেবলমাত্র হরিনাম সংকীর্তনের দ্বারাই স্বার্থ ও পরমার্থ লাভ হয়। এজন্য গুণগ্রাহী ও সারগ্রাহী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ কলিযুগের প্রশংসা করে থাকেন। এরকম বহু প্রমাণ আছে যে, কলিযুগের ধর্ম হচ্ছে হরিসংকীর্তন এবং তা শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গই প্রবর্তন করেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সংকল্প করেছিলেন—

যুগধর্ম্ম প্রবর্তাইমু নাম সংকীর্তন।
চারি ভাব-ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন।।

—(চৈ. চ. আদি. ৩/১৯)

আবার কথিত আছে—

মধুরং মধুরম্-এতন্ মঙ্গলং মঙ্গলানাং।
সকল নিগম বল্লী সত ফলং চিৎ-স্বরূপম্।।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা।
ভৃগুবর! নরমাত্র তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।।

শ্রীকৃষ্ণ নাম মাধুর্যের নিলয় অর্থাৎ মাধুর্যের পরম পরাকাষ্ঠা তাতেই নিহিত। শ্রীকৃষ্ণ নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম ও পরিকর সমস্তই কৃষ্ণ হতে অভিন্ন, অতএব সেই সমস্ততেও মাধুর্যের পরম পরাকাষ্ঠা আছে। জীবের যত প্রকার মঙ্গলপ্রদ শ্রেয় আছে, সেই সমস্তর মধ্যে পরম শ্রেয়স্কর, পরম মঙ্গলপ্রদ হচ্ছে 'শ্রীকৃষ্ণনাম'। সচ্চিদানন্দ ঘন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ নাম বেদ কল্পবল্লীর প্রকৃষ্ট প্রেমফল, শ্রদ্ধায় বা হেলায় তা একবার মাত্র সংকীর্তন হলে নর-মাত্রকেই পরিত্রাণ করে। অতএব নাম সংকীর্তনই কল্যাণ-কল্পতরু। হরিনাম সংকীর্তন জীবকে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করে।

মুখ্যপথে জীবপায় কৃষ্ণ প্রেমধন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।।

এই সব প্রমাণ থেকে সূচিত হয় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ সংকীর্তনের মাধ্যমে মানব জীবনের অন্তিম সিদ্ধি কৃষ্ণপ্রেম দেওয়ার জন্য এসেছিলেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা প্রবর্তিত ধর্ম (হরিনাম সংকীর্তন ধর্ম) -ই একমাত্র শুদ্ধ ধর্ম ও যুগধর্ম। শ্রীচৈতন্যের কোন ধর্ম নেই—এরকম বলাটা এক পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কি হতে পারে। আজকে শ্রীচৈতন্য দেবের প্রচারিত নির্মল

প্রেমধর্ম সমগ্র পৃথিবীতে প্রচারিত হচ্ছে। আমাদের পরম আরাধ্যতম গুরুদেব শ্রী শ্রীমৎ এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ তা সমগ্র বিশ্বে প্রচার ও প্রসার করেছেন। যারফলে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপিত হয়ে তাঁর শিক্ষা প্রবর্তিত হচ্ছে এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীজগন্নাথের আরাধনা, বিশেষকরে রথযাত্রা পাশ্চাত্য দেশেতে গভীর আধ্যাত্মিক প্রভাব পড়েছে। শ্রীচৈতন্য দেবের প্রচারিত ভাগবত ধর্মের চরমোৎকর্ষতা বিচার করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিগণ এটা যে বৈদিক সিদ্ধান্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এটা ভাবপ্রবণতা নয়—তা তাঁরা উপলব্ধি করেছেন।

বিশিষ্ট দার্শনিক ড. রাধাকৃষ্ণন্ তাঁর মত ব্যক্ত করে বলেছেন যে—তাঁর (শ্রীচৈতন্যর) ধর্মেতে কোনও সংকীর্ণতা ছিল না। একারণে বর্তমান যুগসম্মত এরকম কোনও ধর্মের প্রতিষ্ঠা যদি আপনারা চান যা সামাজিক বৈষম্য দূর করে সাম্যকেই কাম্য করে গ্রহণ করবে, তাহলে তাঁর দ্বারা প্রচারিত সেটাই প্রেম ধর্ম।" শ্রীমন্ মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে বলেছেন—"সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্।" এতে (হরিসংকীর্তনেতে) ব্যক্তি বিশেষ পরিবর্তে সকল আত্মার 'স্নপন' অর্থাৎ স্নিগ্ধতাকে লক্ষ্য করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম অচৈতন্য জীবদেরকে চৈতন্য প্রদান করার জন্য উদ্দিষ্ট।

কৃষ্ণকীর্তন হলে নির্বিশেষবাদীর দুর্বুদ্ধি বিদূরিত হয়ে যথার্থ মুক্তি লাভ হতে পারে— কাশীর মায়াবাদী প্রকাশানন্দ তা'র সাক্ষ্য। কৃষ্ণকীর্তন হলে বিষয়াচ্ছন্ন ব্যক্তিদের যথার্থ সিদ্ধিলাভ হতে পারে—রাজা প্রতাপরুদ্র তার প্রমাণ। উড়িষ্যার মহারাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র একজন চপল মস্তিষ্ক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন না, যিনি বিনা প্রমাণে শ্রীচৈতন্যদেবকে ভগবান বলে গ্রহণ করে শরণাগত হয়ে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণ কীর্তনের দ্বারা গাছ, পাথর, পশু-পক্ষী, স্ত্রী-পুরুষাদি সর্ব জীবের প্রকৃত মুক্তি লাভ হতে পারে। মহাপ্রভু ঝাড়িখণ্ড বনপথে যাওয়ার সময় বৃক্ষলতা, পশুপক্ষীর প্রতিক্রিয়াই তার উদাহরণ। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলের মঙ্গলের জন্য অর্থাৎ উদ্ভিদ, পশু-পক্ষী, মানব প্রত্যেক জাতির মঙ্গলের জন্য এ জগতে এসেছিলেন। সমগ্রজগৎ, সকলবর্ণ, পাপাত্মা, পুন্যাত্মা, সধর্মী, বিধর্মী—সমগ্র বিশ্বের সকল প্রাণী তাদের অভিমান পরিত্যাগ করে শ্রীচৈতন্যদেবের 'অনর্পিত বরদান' গ্রহণ করতে পারবে, কারণ শ্রীমান্ চৈতন্য

মহাপ্রভুর ধর্ম সকলের জন্য উদ্দিষ্ট, তাঁর দ্বারা প্রচারিত প্রেম ধর্ম বেদ প্রতিপাদিত এবং সকল মহাজন ও আচার্যগণের দ্বারা গৃহীত। এর দ্বারা জাতির পতন হয়নি বরং চরম কল্যাণ সাধিত হয়েছে। আমরা অশোক-চক্রটাকে অহিংসা ও শান্তির প্রতীক হিসাবে জাতীয় পতাকাতে চিহ্নিত করেছি। এই অহিংসা ধর্মের দ্বারা কি দেশ সত্তানাশ কবল হতে রক্ষা পায়, না দুর্বল হয়ে যায়? এটা হচ্ছে কেবল এক হাস্যাস্পদ কথা। শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত প্রেমধর্ম অহিংসার বহু উর্ধ্বে অবস্থিত। এর দ্বারা সকল অনর্থের উপশম হয়। এতে দেশ ও জাতি ধ্বংস পায় না। এতে 'বসুধৈব কুটুম্বকং'—এই বিশ্বভাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। এটাই একমাত্র শুদ্ধ ধর্ম। এতে বিশ্বপ্রেমের অভাব নেই। যেমন একশ' টাকার মধ্যে এক টাকাও আছে, ঠিক্ তেমনি কৃষ্ণপ্রেমের মধ্যে প্রকৃত বিশ্বপ্রেম, প্রকৃত দেশপ্রেম প্রভৃতি পূর্ণমাত্রায় আছে। (একথা মূর্খেরা বুঝতে পারে না)। সেজন্য বলা হয়েছে—

> সংসার সিন্ধু তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
> সংকীর্ত্তনামৃতরসে রমতেমনশ্চেৎ।
> প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
> শ্চৈতন্য চন্দ্র চরণে শরণং প্রয়াতু।।
>
> —(শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়)

"যদি সংসার সাগর হতে উত্তীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা থাকে, যদি সংকীর্তনামৃতরস আস্বাদনের জন্য বাসনা থাকে, কিংবা প্রেম-সমুদ্রে অবগাহনের আকাঙ্খা হয়, তা'হলে শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের চরণে শরণ নিন। আজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পঞ্চশততম-বর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে আমরা সকলকে এই নিবেদন করি।

(হরিবোল)

শ্রীগৌরহরির প্রেমনাম সংকীর্তনে বিপ্রলম্ভ রস প্রাধান্যের কারণ

গত ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে আমরা প্রেম পুরুষোত্তম পতিতপাবন শচীনন্দন গৌরহরির শুভ আবির্ভাব তিথি বা মহামহোৎসব পালন করেছি। এই অবসরে শ্রীগৌরহরি-সম্বন্ধে কিছু কথা বলার অভিলাষী হয়েছি। আমরা পূর্ব পূর্ব বছরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে বহু কথা আলোচনা করেছি। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কারণ কি, তা আলোচনা হয়েছে। গৌরই কৃষ্ণ, কৃষ্ণই গৌর। শ্রীগৌর ও কৃষ্ণের মধ্যে কোন ভেদ নেই। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

'নন্দ-সুত' বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি।।

—(চৈ. চ. আদি ২/৯)

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতেও বলা হয়েছে—(৯ম বিভাগ, শ্লোক নং— ১০৮, ১০৯)

"গৌরঃ কোঽপি ব্রজবিরহিণীভাবমগ্নশ্চকাস্তি।"
আবার "সাক্ষাদ্রাধামধুরিপুবপুর্ভাতি গৌরাঙ্গচন্দ্রঃ।।"

তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌর এবং শ্রীগৌরই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ লীলাই গৌরলীলা এবং গৌরলীলাই শ্রীকৃষ্ণ লীলা। যেমন নামী ও নাম তত্ত্বতঃ অভিন্ন হলেও 'পূর্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং' উক্ত হয়েছে, তেমনই ভাববৈশিষ্ট্য-বশতঃ শ্রীগৌরলীলাতে কৃপাবৈশিষ্ট্য ও আস্বাদনবৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে।

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ কারণ আলোচনা করলে আমরা জানতে পারি যে, কৃষ্ণ রাধার ভাব ও কান্তি পরিগ্রহ করে গৌররূপে আবির্ভূত হলেন। তিনিটি বাঞ্ছা—রাধার প্রণয় মহিমা কি রকম ও নিজের অনন্ত মধুরিমার অবগতি (Perception) এবং শ্রীরাধার নিজের অনন্ত মধুরিমা আস্বাদন-জনিত

সুখাতিশয্যার অনুভূতি—এই তিনটি বিষয়ের বাঞ্ছাপূর্তি তাঁর আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ কারণ। গৌরাঙ্গতে রাধাভাবের প্রাধান্য রয়েছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

গৌর অঙ্গ নহে, মোর- রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্র সুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন।।

—(চৈ. চ. ম. ৮/২৮৬)

এটি হতে আমরা জানতে পারি যে, কিভাবে গৌরাঙ্গতে রাধাভাবের প্রাধান্য আছে। শ্রীমতী রাধারাণী যেমন কৃষ্ণ বিরহ অনুভব করেছিলেন, ঠিক তেমনই মহাপ্রভুর অনুভব। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু শ্রী গৌরাঙ্গতে বিপ্রলম্ভ প্রাধান্যের কারণের কথা বলা হয়েছে। শ্রীল-কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধবদর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে।।

—(চৈ. চ. আদি ৪/১০৮)

রাধিকার ভাব-মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর।।
শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা, আর প্রলাপময় বাদ।।

—(চৈ. চ. আদি ৪/১০৬, ১০৭)

এ সমস্ত প্রগাঢ় বিপ্রলম্ভের পরিচয়। এ অবস্থায় শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণ বিরহে করুণ বিলাপ—

কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাঁহা করোঁ, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।।
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক।।

—(চৈ. চ. ম. ২/১৫, ১৬)

তাই গৌরাঙ্গ-স্বরূপে বিপ্রলম্ভ রসাতুর হওয়ার কারণ কি? শ্রীগৌরসুন্দর অন্তর্দশাতে মাদনাক্ষ-মহাভাব সাগরে নিমগ্ন হয়ে প্রেমোৎকণ্ঠার্ত হৃদয়ে অভিন্ন নামী শ্রীমন্ নামের সংকীর্তনে নিরন্তর নামরস আস্বাদন করেন। প্রেমনাম

সংকীর্তন তত্ত্বতঃ ভক্তির 'শ্রী' অর্থাৎ প্রেমভক্তির সার। নাম, নামী অভিন্ন হলেও শ্রীমন্ নাম অধিক কৃপাময়, 'নামৈক শরণে'র সমীপে সত্ত্বের নিজের স্বরূপ-গুণ-লীলা-রস প্রকাশ করেন। শ্রীগৌরহরির অপার করুণার প্রবাহ প্রেমনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে নাম, প্রেমপ্রদান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। মহাবদান্য শ্রী গৌরাঙ্গ বিপ্রলম্ভ রসাতুর হয়ে নাম-প্রেম প্রদান ও প্রেমনাম সংকীর্তন রস আস্বাদন করেছেন। তাঁর বিপ্রলম্ভ রসাতুর হওয়ার কারণ কি, তা আমরা নিম্নে আলোচনা করেছি।

হরি, কৃষ্ণ, রাম—এই সমস্ত নাম নতুন নয়। নাম, নামী অভিন্ন। এটা বেদ-সম্মত। কীর্তন কথাও নতুন নয়। 'সততং কীর্ত্তয়ন্ত মাং'...এটিতে সতত কীর্তনের কথা বলা হয়েছে, নাম ছিল, কীর্তন ছিল। কিন্তু নামের এত মাধুর্য অভিব্যক্ত হয়নি। তাতে যেই মাধুর্য, যেই উন্নত উজ্জ্বল রসের পরিপূর্ণতা তা সুগুপ্ত ছিল। তাঁর সুগুপ্ত মাধুর্য অর্থাৎ নিজের নামে নিজের অভিন্ন স্বরূপের মাধুর্য স্বয়ং নামী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌর-স্বরূপে শ্রীরাধার মাদনাক্ষ মহাভাবে বিভাবিত হয়ে আস্বাদন করলেন এবং সেই প্রেম সর্বত্র নির্বিচারে প্রদান করলেন। করুণার প্রবল প্রবাহে ত্রিজগৎ প্লাবিত হল।

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সবারে ডুবায়।।
সজ্জন, দুর্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন।।
—(চৈ. চ. আদি ৭/২৫, ২৬)

ব্রজে প্রেমের চরম পরিণত অবস্থা—মাদনাক্ষ মহাভাব, সম্ভোগ দশাতে তা মাদনাক্ষ মহাভাব। বিপ্রলম্ভ দশাতে তা মোহনাক্ষ মহাভাব। তার দ্বিবিধ বিভাগ আছে। মাথুর বিরহে মোহনাক্ষ স্তরে দিব্য উন্মাদ অবস্থা আছে। তাতে মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধারাণী দিব্য-উন্মাদ গ্রস্থ হন বিপ্রলম্ভ রসাতুরী শ্রীরাধা অন্তরের বেদনা-ভাব কাতর উৎকণ্ঠাময় বিয়োগে করুণ ক্রন্দন সহ হরি, কৃষ্ণ, রাম নামের কীর্তন করেন। এতে ব্রজের চরম মাধুর্য ও পরম উজ্জ্বল রস পরিপূর্ণভাবে আছে প্রেমনাম সংকীর্তন জননী বা মূর্ত বিগ্রহ শ্রীমতী রাধারাণী। তিনি স্বগহণে বিপ্রলম্ভ রসাতুরী হয়ে প্রেমনাম সংকীর্তন প্রেমরসের পূর্ণতা আস্বাদন করেন। শ্রীরাধা বিপ্রলম্ভ রসের সাগরে নিমগ্ন হয়ে বিরহ বেদনায়

ব্যথিত হয়ে থাকেন। বিরহ ব্যথা যত তীব্র অন্তরের প্রাপ্তি তত নিবিড়, তত গাঢ়, তত সুমধুর। অপ্রাপ্তির আর্তনাদ যতই চরমে উপনীত, অন্তরে দুইয়ের মিলন তত গাঢ়তম। অন্তরে সুগুপ্ত রসরাজ, বাহ্যে হা প্রাণপ্রেষ্ঠ, হা কৃষ্ণ, হা হরে, হা রাম বলে উচ্চারণ করতে করতে রোরুদ্যমানা শ্রীরাধার বিপ্রলম্ভময়ী মূর্তি—এটাই শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে সেই ভাব প্রকাশিত হয়েছে।

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।।

অর্থাৎ—"ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আমার নিমেষ সদৃশ অতি অল্পকালও 'যুগ'-বৎ বোধ হচ্ছে, চক্ষুদ্বয় মেঘের মতো অশ্রুবর্ষণ করছে, এবং সমস্ত জগৎ শূন্য-প্রায় বোধ হচ্ছে। "শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ'-সম!
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন।।
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন।।
—(চৈ. চ. অন্ত্য ২০/৪০, ৪১)

শ্রীরাধা এই সুতীব্র বিরহ ভাবে বিভাবিতা হয়ে প্রেম নাম সংকীর্তন করেন, সেই সংকীর্তনে তাঁর অন্তরের করুণ ক্রন্দন ধ্বনি শ্রীনাম সহ নিনাদীত হচ্ছে। শ্রীমন্ নাম—মিলনের বন্ধু, বিরহের সেতু। উভয় রসে নাম আস্বাদ্য।

প্রেম পুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হয়ে বিপ্রলম্ভ রসসাগরে নিমগ্ন হন। উচ্চস্বরে অত্যন্ত করুণ ক্রন্দনের ন্যায় কণ্ঠে বিলাপ করে হরিনাম সংকীর্তন করেন। তাঁর তিনটি বাঞ্ছা পূর্তির আস্বাদন স্বরূপই প্রেমনাম সংকীর্তন বিপ্রলম্ভ ভাবেই এই প্রেমরস অত্যধিকভাবে আস্বাদিত হয়। এ জগতে শ্রীগৌরাঙ্গ তা অভিব্যক্ত করেছেন। গৌরাঙ্গ নিজেই বিপ্রলম্ভভাবে নাম-সংকীর্তন করে নামরস আস্বাদন করেন এবং অকাতরে নির্বিচারে তা সমস্তকে প্রদান করে মহাবদান্য অবতার হয়েছেন।

(হরিবোল)

শ্রীচৈতন্য চরণাশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা কি?

বর্তমান সমগ্র বিশ্বে শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পঞ্চশততম বর্ষ পূর্তি উৎসব পালিত হচ্ছে। এই অবসরে শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দরকার এবং লোক সমাজে তা'র প্রচারও দরকার। কোন একটি প্রবন্ধে আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত ধর্মই একমাত্র শুদ্ধধর্ম বলে প্রকাশ করেছিলাম। তাই সেই মর্মে আজ অন্য এক লেখা প্রকাশ করেছি, যাতে এটা সময়োপযোগী আবশ্যক।

এই ভৌতিক জগতে সকলেই প্রায় মায়া কবলিত বদ্ধজীব, ভগবানকে ভুলে গিয়ে ত্রিতাপে দগ্ধীভূত হচ্ছে ; প্রতিক্ষণে প্রতি মুহূর্তে সকলেই নানা অভাব বোধে রয়েছে। যত প্রকার জড় বিজ্ঞানের গবেষণা তথা উদ্ভাবন করা হলেও অভাব দূরীভূত হচ্ছে না। এর কারন কি? কত জন এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছেন ? প্রকৃতপক্ষে খুব কম লোক এর প্রকৃত কারণ জানার জন্য প্রয়াসী হন। যাঁরা এ বিষয়ে প্রয়াসী হন তাঁরাই হচ্ছেন বুদ্ধিমান লোক, বিবেকীলোক এবং তাঁরাই হচ্ছেন ভগবানের যথার্থ ভক্ত। যে পর্যন্ত জীব কৃষ্ণ-চেতনশীল না হচ্ছে এবং তার স্বরূপ স্থিতি (জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণ দাস)-তে না আসছে, সে পর্যন্ত এ অভাববোধ মিটবে না। কারণ প্রথম কথা আমাদেরকে জেনে রাখতে হবে যে, আমরা হচ্ছি দিব্য আত্মা, ভগবানের নিত্য সনাতন অংশ, আমরা দেহ বা শরীর নই। এ কথা গীতা, ভাগবত প্রভৃতি বৈদিক শাস্ত্র-আদিতে বলা হয়েছে। জড় শরীরের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের ক্ষুধা জড় শরীরধারী প্রত্যেক জীবের রয়েছে এবং থাকবে। তাই যখন আমরা শরীর ধারণা হতে উর্ধ্বে আত্মধারণা বা ভগবৎ চেতনার স্থিতিতে আসব, তখন আমরা চিন্তা করব আত্মার আবশ্যকতা কি? যখন আমরা আত্মার আবশ্যকতা সম্পর্কে জানব এবং তা পাবো তখন আর অভাব বোধ থাকবে না। শ্রীমদ্ ভাগবতে

বলা হয়েছে—"যতো ভক্তিরধোক্ষজে... যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।" (ভা. ১/২/৬)। যাতে আত্মার প্রসন্নতা হয়, তা হচ্ছে অধোক্ষজের প্রতি প্রেমভক্তি। এটাই হচ্ছে আত্মার আবশ্যকতা। এটা না পাওয়া পর্যন্ত অভাব বোধ থাকবে। এই কৃষ্ণ প্রেম-ভক্তিকেই বলা হয় পরম পুরুষার্থ, যা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের উর্ধ্বে। এটাই কেবল মানব জীবনেই লভ্য। তাই মানুষের প্রকৃতপক্ষে এটাই দরকার করে। এই প্রেমভক্তিই আমাদের একমাত্র গুপ্ত সম্পত্তি ও অমূল্য ধন। এই ধন প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত সকলের অভাব বোধ থাকবে এবং এটার অভাবে সকলেই দরিদ্র।

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
'দাস' করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন।।"
—(চৈ. চ. অন্ত্য ২০/৩৭)

এটাই হচ্ছে ভগবানের কাছে প্রার্থনা। এই প্রেমধন প্রদান করেছেন কে ? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পাবো শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকটে, যিনি অকাতরে অযাচিতভাবে পতিত পামর সমস্তকেই এই কৃষ্ণ-প্রেমধন বিতরণ করে গিয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণব্রহ্ম, পরিপূর্ণ বস্তু। তাঁর মাধুর্য অনুপম, অসমোর্ধ্ব, পূর্ণ মাধুর্য। তা যখন আস্বাদিত হয়, তখন আর কোন অভাববোধ থাকে না। শব্দ, স্পর্শ,রূপ, রস, গন্ধের যে ক্ষুধা ত্রিজগতে সবার আছে তা'র পরিতৃপ্তি একমাত্র এই পূর্ণ বস্তুর আস্বাদনে, অন্যত্র নয়। সেই পূর্ণব্রহ্ম নিখিল মাধুর্যের নিলয় কৃষ্ণ কেবল প্রেম-ভক্তিতেই লভ্য। প্রেমেতে তিনি বাঁধা। এই প্রেম-ভক্তি প্রদান করেছেন শ্রীচতন্য মহাপ্রভু। এই অব্যভিচারিণী প্রেম-ভক্তিই হচ্ছে প্রয়োজন তত্ত্ব। কেবল প্রেম দ্বারা যে সেবা, সেই "কেবলাভক্তিই হচ্ছে অব্যভিচারিণী প্রেমভক্তি, এটাই পরম প্রয়োজন। এই প্রেম, প্রেম-পুরুষোত্তম গৌরাঙ্গই প্রদান করেছেন। তাঁর চরণাশ্রয় না হলে এটা মিলবে না (তাই এঁনাতেই রয়েছে প্রয়োজনীয়তা)। ভক্তভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরহরি মহাবদান্য লীলাতে সেই চরম কল্যাণপ্রদ ভজন প্রণালী কৃষ্ণনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে দর্শিয়েছেন (প্রদর্শন করেছেন)। এটাই তাঁর ঔদার্যের পরাকাষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।।
—(চৈ. চ. আদি ৮/১৫)

অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য—অদ্ভুত-বদান্য।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে নাহি শুনে অন্য।।
সর্ব্বভাবে ভজ, লোক, চৈতন্য-চরণ।
যাহা হৈতে পাইবা কৃষ্ণপ্রেমামৃত ধন।।
—(চৈ. চ. অন্ত্য ১৭/৬৮, ৬৯)

প্রেম পুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গের নাম-প্রেম-বিতরণ লীলাই হচ্ছে মহাবদান্য লীলা। শ্রীনাম সব যুগে আছে। শ্রুতি-স্মৃতিতে শ্রীনাম-নামীর অভেদত্ব ও শ্রীনামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য যুগেতেও যুগাবতার দ্বারা নাম প্রচারিত হয়েছে। শ্রীমন্ নাম মুক্তিদ ও সর্বাভীষ্টপ্রদ। এটা শাস্ত্রেতে আছে। কিন্তু এই কলিযুগ ব্যতীত অন্য কোন যুগে স্বয়ং ভগবান পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ স্বরূপে নিজে নিজের নাম কীর্তন করে নিজের অভিন্ন স্বরূপ শ্রীনামের পরম রসমাধুরী আস্বাদন মুখে জন সাধারণকে বিতরণ করেন নি। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন অবতার কৃষ্ণ প্রেম প্রদান করতে সমর্থ নন। সেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌর স্বরূপে নিজের নাম-প্রেম আস্বাদন-পূর্বক নিজে আপামরকে প্রদান করেছেন।

কলিযুগে "হরের্নামৈব কেবলম্", অর্থাৎ একমাত্র হরিনাম আশ্রয় করতে হবে, এটা বেদের সিদ্ধান্ত। বিশেষতঃ কলিযুগে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্তনে সর্বার্থ সিদ্ধ হয়। শ্রীমদ্ ভাগবতে তা'র প্রমাণ দেওয়া হয়েছে—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্তনেনৈব সর্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে।।
—(ভা. ১১/৫/৩৬)

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।।
—(ভা. ১২/৩/৫১)

এক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানের কথা, তা হচ্ছে এই যে, কেবল মাত্র হরি, রাম, কৃষ্ণ এই নাম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত নাম শ্রীকৃষ্ণ প্রেমপ্রদ, অন্যান্য অংশ ও প্রভাবাদিগত নাম প্রেমপ্রদ নন, কেবল মুক্তিপ্রদ। কলিতে সেই কৃষ্ণ নাম সংকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। কলিযুগে শ্রীগৌর মুখোদ্‌গীর্ণ 'হরেকৃষ্ণ' নামের অক্ষরে বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের একত্রিকরণ আছে। বিরহ-মিলনের একত্র সমাবেশ

একমাত্র গৌরাঙ্গ স্বরূপে। রসরাজ মহাভাবের মিলিত অঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গতে বিরহ-মিলনের অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের মিলিতাঙ্গ, তাঁর ভাবকান্তিতে ক্রিয়া-মুদ্রাতে অভিব্যক্ত হয়। গৌর লীলাতে ভগবান স্বপ্রেম নামামৃত প্রদানের দ্বারা মহাবদান্য লীলাময় হয়েছেন।

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং
স্বপ্রেম-নামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে।।
—(চৈ. চ. ম. ২৩/১)

"যা বহুকাল যাবৎ বিতরণ হয়নি, যা স্বীয় সুগোপণীয় সম্পত্তি তুল্য, সেই স্বপ্রেম নামামৃত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম সহ শ্রীকৃষ্ণ হতে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ নামামৃত আপামর জনসমাজকে যিনি বিতরণ করলেন সেই পরম করুণ শ্রীগৌরকৃষ্ণের চরণে আমি শরণাপন্ন হই।।"

শ্রীকৃষ্ণ নামানুশীলনের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণ লীলা সহ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের পরম পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শিত হয়েছে। সেই মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা শ্রীগৌরহরিই আমাদের একমাত্র পরম আরাধ্য ও পরমাশ্রয়।

প্রেমপুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গ মহাবদান্য, কারণ তিনি অযাচিতভাবে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেছেন। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-পিপাসুদের যা অলভ্য, কর্মী-জ্ঞানী-যোগীদের পক্ষে যা দুর্লভ এরকম পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণ প্রেম-ভক্তি মহাবদান্য শ্রীগৌরাঙ্গ পাত্রাপাত্র, স্থানাস্থান এবং কালাকালাদির বিচার নির্বিশেষে যে কোনও স্থানে যাকে তাকে অকাতরে অযাচিতভাবে প্রদান করেছেন। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতে শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী এ বিষয়ে সূচনা দিয়েছেন—

"পাত্রাপাত্র-বিচারণাং ন কুরুতে ন স্বং পরং বীক্ষ্যতে
দেয়াদেয়বিমর্শকো ন হি ন বা কালপ্রতীক্ষঃ প্রভুঃ।
সদ্যো যঃ শ্রবণেক্ষণ-প্রণমন- ধ্যানাদিনা দুর্লভং
দত্তে ভক্তিরসং স এব ভগবান্ গৌরঃ পরং মে গতিঃ ।।
—(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৭/৭৭)

অন্তর্ধ্বান্তচয়ং সমস্তজগতা-মুন্মূলয়ন্তী হঠাৎ
প্রেমানন্দরসাম্বুধিং নিরবধি প্রোদ্বেলয়ন্তী বলাৎ।
বিশ্বং শীতলয়ন্ত্যতীব বিকলং তাপত্রয়েণানিশং
যুষ্মাকং হৃদয়ে চকাস্তু সততং চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা।।

—(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৩/১৭)

অর্থাৎ—" যে চৈতন্য চন্দ্র চন্দ্রিকা জীব-হৃদয়ে অজ্ঞান তমোরাশি অকস্মাৎ বিনাশ করে, প্রেমানন্দ রস-সাগরকে নিরন্তর উচ্ছলিত করে এবং ত্রিতাপ-সন্তপ্ত বিশ্বকে অনুক্ষণ স্নিগ্ধতা প্রদান করে অর্থাৎ সুশীলত করে, সেই চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা আমাদের হৃদয়ে ক্ষণকাল মাত্র দীপ্ত হোক। তাহলে জীবন চরিতার্থ হবে, মানব জন্মের সার্থকতা হবে।"

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদি-নক্র-মকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বনম্।।

—(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৬/৫৪)

অর্থাৎ—"হে চৈতন্যচন্দ্র! আমি সংসার দুঃখ সাগরে পতিত। আমার হস্ত পদাদি দুর্বাসনা-রূপ দৃঢ় শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ। আমি অবলম্বনহীন, আমি কাম ক্রোধাদি রূপ নক্র (কুমীর) মকর দ্বারা কবলিত, আমাকে চরণ-তরণীতে আশ্রয় দিন।"

মহাবদান্য প্রেম পুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গ একমাত্র কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন-পূর্বক আপামরকে বিতরণ করেছেন। শ্রীগৌর মুখোদ্‌গীর্ণ নামের বৈশিষ্ট্যও প্রবোধানন্দ সরস্বতী নিম্নমতে ব্যক্ত করেছেন—

স্বাদং স্বাদং মধুরিমভরং স্বীয় নামাবলীনাং
মাদং মাদং কিমপি বিবশীভূতবিশ্রস্তগাত্রঃ।
বারম্বারং ব্রজপতিগুণান্ গায়গায়েতি জল্পন্
গৌরো দৃষ্টঃ সকৃদপি ন বৈর্দুর্ঘটা তেষু ভক্তিঃ।।

—(শ্রীচৈত্যচন্দ্রামৃত ৫/৩৩)

অর্থাৎ—"যিনি 'হরেকৃষ্ণ' 'হরেকৃষ্ণ' স্বীয় নামাবলীর রস-মাধুর্য-আতিশয্য

বার বার আস্বাদনে উত্তরোত্তর প্রমত্ত হয়ে কোনও অনির্বচনীয় ভাবে বিবশ ও স্খলিত গাত্র হন্ এবং যিনি সমস্তকে আহ্বান করে বৃন্দাবন চন্দ্রের গুণাবলী 'গান কর', 'গান কর'—এরূপ বারংবার বলছেন সেই গৌর সুন্দরকে যারা একবারও মাত্র দর্শন করেনি তাদের ভক্তি লাভের সম্ভাবনা নেই।" তাই প্রেম পুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণাশ্রয় ছাড়া প্রেমনাম সংকীর্তনাত্মক শ্রেষ্ঠতম ভক্তি যোগের অধিকার আর কারোর মেলেনি। বেদে বা বৈদিক শাস্ত্রসমূহে নামের মহিমা-কথা বর্ণনা আছে কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যেপর্যন্ত না এলেন সেপর্যন্ত এটা জীব-চরিতগত বা প্রকাশের বিষয় হয়নি। তাই শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতে বলা হয়েছে—

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণ পথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবন বিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরম রস-চমৎকার-মাধুর্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকুরুণয়া সর্বমাবিশ্চকার।।

—(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১০/১৩০)

অর্থ্যাৎ—"'প্রেম'-নামক পরম-পুরুষার্থ কথা কে শুনেছিল? কেই বা শ্রীমন্ নামের মহিমা জানত? কারই বা শ্রীধাম বৃন্দাবনের গহন-মহামাধুরী কদম্বে প্রবেশ ছিল? কেই বা পরম চমৎকার অধিরূঢ় মহাভাব-মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীমতী রাধারাণীকে উপাস্য বস্তু রূপে জানতো? একমাত্র মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই ঔদার্য লীলা প্রকট করে এই সমস্ত প্রকাশ করেছেন।"

মহাবদান্য প্রেমকল্পতরু, প্রেম পুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গই একমাত্র কৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা। তিনি স্বচরণে শরণাগত জনকেই কৃষ্ণ প্রেমধন প্রদান করেন, এটা সুনিশ্চিত। তিনি বিচার নির্বিশেষে নাম-প্রেমধন বিতরণ করেন। তাই একমাত্র তাঁর চরণাশ্রয় কর।

"উত্তর অধম কিছুনা বাছিল যাচিয়া দিলেক কোল।
কহে প্রেমানন্দ এহেন গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরিয়া বোল।।"
"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ রে।।"

(হরিবোল)

শ্রীক্ষেত্র ও শ্রীগৌর সুন্দর

শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের মহিমা

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহিমা বর্ণনা করার পূর্বে সর্বপ্রথমে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে তাঁর কৃপাশীর্বাদ কামনা-পূর্বক প্রার্থনা করি—

দেব দেব জগন্নাথ প্রপন্নার্ত্তিবিনাশন।
ত্রাহিমাং পুণ্ডরিকাক্ষ পতিতং ভব সাগরে।।
নমস্তে জগদাধার জগদাত্মন্নমোঽস্তু তে।
কৈবল্য ত্রিগুণাতীত গুণাঞ্জন নমোঽস্তু তে।।
করুণামৃতপাথোধিসুধাম্নে নমো নমঃ।
দীনোদ্ধারৈকগুহ্যায় কৃপাপাথোধয়ে নমঃ।।
পরিত্রাহি জগন্নাথ দীনবন্ধো নমোঽস্তু তে।
নিস্তীর্নোঽহং ভবাম্বোধিং প্রাপ্যত্বাং তরণীং সুখাম্।।

নীলাদ্রিবিহারী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহিমা অবর্ণনীয়। তাঁকে যত বর্ণনা করলেও তিনি অনন্ত। তাঁর মহিমা বর্ণনা করে কেউ শেষ করতে পারেন না। তবে আমরা ষড়্-গোস্বামীর মধ্যে অন্যতম শ্রীল সনাতন গোস্বামীর দ্বারা বিরচিত শ্রীবৃহদ্ ভাগবতামৃতে 'শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহিমা' সম্বন্ধে বর্ণনা হতে কিছু উদ্ধার করতে প্রযত্ন করেছি।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের 'দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে' বলা হয়েছে যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাত্রীরা এই পুরুষোত্তম ধামে বিভিন্ন সময়ে এসে থাকেন। তাঁদের মধ্যে ভারতের দক্ষিণ দেশ থেকে আগত কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সাধু তীর্থযাত্রী শ্রীগোপকুমারকে (শ্রীগোপকুমার সম্বন্ধে বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো) তাঁদের নিজেদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি প্রদান করতে গিয়ে বললেন লবণসমুদ্রতীরে নীলাচলে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে, দারুবিগ্রহরূপে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বিরাজ করছেন। সঙ্গে তাঁর বড় ভাই শ্রীবলদেব ও ছোট বোন শ্রীসুভদ্রাদেবীও বিদ্যমান আছেন। ভক্তজনের সেবা গ্রহণ করার জন্য সর্বদাই অপেক্ষারত।

শ্রীজগন্নাথদেব হচ্ছেন মহা বিভূতিশালী, আবার খুব ভক্তবৎসল। তিনি উৎকল রাজ্য স্বয়ং পালন করে থাকেন। তিনি স্বমহিমা স্বয়ং প্রকাশ করেছেন। স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মীদেবী তাঁর ভোগ সামগ্রী প্রস্তুত কার্যে নিযুক্তা আছেন। পরম দয়াল প্রভু শ্রীজগন্নাথদেব স্বয়ং সেই ভোগ-সামগ্রী ভোজন করেন এবং অবশিষ্ট প্রসাদ নিজ ভক্তদেরকে প্রদান করেন। প্রভুর ঐ প্রসাদ মহাপ্রসাদ নামে সমগ্র বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তা হচ্ছে দেবদুর্লভ বস্তু। সেই মহাপ্রসাদ যে কোন ব্যক্তি এমনকি একজন চণ্ডাল স্পর্শ করলেও তা দূষিত হয় না। এজন্য এই মহাপ্রসাদ যে কোন ব্যক্তি স্পর্শ করতে পারেন এবং পৃথিবীর যে কোন স্থানে নিয়ে গিয়ে নির্বিচারে সকল লোক সেবন করতে পারেন, 'যত্র কুত্রাপি বা নীতমবিচারেণ ভুজ্যতে।' (বৃ. ভা. ২/১/১৬২)।

আবার সেই সাধুরা এই ধামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অধিক বর্ণনা দিতে গিয়ে শ্রীগোপকুমারকে বললেন—অহো! সেই ধামের মহিমা আমরা আর কি বর্ণনা করব? যেখানে একটি গর্দভ প্রবেশ করলে চতুর্ভুজত্ব প্রাপ্ত হয় (অহো! তৎক্ষেত্রমাহাত্ম্যং গর্দভোঽপি চতুর্ভুজঃ)। সেই ক্ষেত্রে যে কোন জীব প্রবেশ করলেই তার আর পুনর্জন্ম হয় না ('যত্র প্রবেশমাত্রেণ ন কস্যাপি পুনর্ভবঃ')। সেই কমলনেত্র ভগবানকে দর্শন করলেই জন্মের সফলতা লাভ হয়।

গোপকুমার বললেন—সেই সাধুদের কাছ থেকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এই প্রকার অদ্ভুত মহিমা তিনি নিজে শ্রবণ করেছিলেন, যা তিনি পূর্বে কখনই শোনেননি। তাই তাঁকে দর্শন করার জন্য তাঁর (গোপকুমার) অত্যন্ত বলবতী ইচ্ছা জাত হয়েছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে 'জগন্নাথ' 'জগন্নাথ' এই নাম সম্যক্ কীর্তন করতে করতে উৎকলদেশের অভিমুখে যাত্রা করলেন। অল্পকালমধ্যেই তিনি শ্রীক্ষেত্রে এসে পৌছিলেন। সেখানকার অধিবাসীদেরকে তিনি দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন এবং তাঁদের কৃপায় শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করলেন।

তারপর তিনি দূর হতেই শ্রীপুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন করলেন, যা বিশাল-নয়নকমল যুগল দ্বারা সুশোভিত এবং ললাটে মণিময় তিলক বিরাজিত রয়েছে (মণিপুড্রভালঃ)। নবমেঘবিনিন্দিত তাঁর অঙ্গের কান্তি, অরুণ অধরে প্রকাশিত মৃদুহাস্যরূপ চন্দ্রিকা রমণীয় মুখমণ্ডলকে আরও রমণীয় করে সকলের প্রতি প্রভুবরে অনুগ্রহ প্রকাশ করছে।

তারপর নিজের অধিক অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে গোপকুমার বললেন— "দেবমন্দিরের ভিতরে জগন্নাথদেবের একেবারে নিকটে যাবার আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রেমোচ্ছ্বাসের জন্য যেতে পারলাম না। আমার দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে কাঁপতে লাগল, চোখ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল, যার ফলে আমি আর কিছু দেখতে পেলাম না। বড় কষ্টে আমি গরুড় স্তম্ভ পর্যন্ত এলাম। তারপর আমি দেখতে পেলাম ভগবান্ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব পরিধানে দিব্যবস্ত্র, অলঙ্কার, মালা ও চন্দনাদি দ্বারা উত্তমরূপে বিভূষিত হয়েছেন। তাঁকে দর্শন করে আমার মন ও লোচন আনন্দ বর্ধিত হয়েছিল। তিনি বহু প্রকার মনোহর মহা-মহাভোগ সব ভোজন করে সুন্দর সিংহাসনের উপর সুশোভিত আছেন। তাঁর সম্মুখে প্রণাম, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও স্তুতি পরায়ণ দর্শকদের প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করছেন। আমি শ্রীজগন্নাথদেবের এরকম মহামহিমার বিষয় দর্শন করে ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি যখন সংজ্ঞা লাভ করলাম, তখন আবার আমার চোখদুটি খুলে তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য দর্শন করে উন্মত্তের ন্যায় তাঁকে ধরবার জন্য সবেগে জগন্নাথদেবের দিকে ধাবিত হলাম। তখন আমি এরূপ বলতে বলতে ধাবিত হয়েছিলাম,—" আজ আমি তাঁকে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেছি, যাঁকে এতদিন দেখবার ইচ্ছা করেছিলাম। অহো, আজ আমার জন্ম সফল হ'ল, আজ আমার জীবন সার্থক হ'ল, আজ আমি নিজ প্রভু জগদীশ্বরকে প্রাপ্ত হ'লাম। " প্রভুকে আলিঙ্গন করার জন্য যেই আমি অগ্রসর হতে লাগলাম, সেই সময় দ্বারপাল আমাকে বেত্রাঘাত করে ভিতরে যাওয়াটা নিবারণ করল। ঐ নিবারণ প্রভুর কৃপা বলে মেনে নিলাম। তারপর যখন আমি মন্দিরের বাইরে এলাম, তখন অযাচিতভাবে মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হলাম। তখন ঐ মহাপ্রসাদ সত্বর ভোজন করে আমি আবার শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করলাম। সারাদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকন করে এরূপ আত্মহারা হয়েছিলাম, যা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম।

আবার পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অবস্থানকালেও আমি বহু সাধু-মহাত্মাদের সঙ্গে নব নব যাত্রা উৎসব দর্শন করে আমার কতকাল যে গত হয়ে গিয়েছিল, তা আমি জানতেই পারিনি। সেই আনন্দে আমি ব্রজভূমির বিচ্ছেদ-জনিত যে দুঃখ তা ভূলে গিয়েছিলাম। শ্রীজগন্নাথদেব তাঁর সেবকদের প্রতি বিশেষ কৃপা ছিল এবং তিনি তাঁদেরকে বিবিধ সেবার আদেশ দিতেন, তা আমি স্বয়ং অনুভব

করতাম। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শন ছাড়া আর কিছু দর্শন করতে আমার কিছুতেই রুচি হতো না।

যখন আমার কোন শারীরিক বা মানসিক দুঃখ উপস্থিত হতো, তখন কমলনেত্র শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে আমি সবকিছু ভুলে যেতাম। এইভাবে বহুদিন সেইস্থানে পরমসুখে বাস করেছিলাম। শ্রীক্ষেত্রে একদিন হঠাৎ শ্রীগুরুদেবের দর্শন হলো, যিনি আমাকে বৃন্দাবনে মন্ত্র প্রদান করেছিলেন। শ্রীগুরুদেব আমাকে বললেন,—"এই মন্ত্র তোমার সমস্ত কামনা পূরণ করবে, তুমি ঐ মন্ত্রজপকে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা বলেই জানবে।" অতএব এটিতে এই শিক্ষা আছে,—যেই সংকল্প নিয়ে দীক্ষা মন্ত্র জপ করা যায়, সেই সংকল্প পূর্ণ হয়। আবার শ্রীদীক্ষামন্ত্রসহ ভগবৎ প্রাপ্তির সংকল্প তথা শ্রীভগবানের চিন্তা অর্থাৎ তাঁর রূপ-গুণ-লীলার চিন্তন আবশ্যক।

শ্রীগুরুদেব অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার পর আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করায় খুব শান্তি পেলাম। কিছুদিন পর আবার আমার মনে যখন সেই ব্রজভূমি- দর্শন করার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠা জাত হতো, তখন শ্রীজগন্নাথদেবের মহিমায় শ্রীক্ষেত্রের উপবনশ্রেণী দেখলে শ্রীবৃন্দাবন, সমুদ্র দেখলে শ্রীযমুনা এবং চটক পর্বত দেখলে গোবর্ধন বলে স্ফূর্তি হতো।

নিজের অনুভূতি প্রদান করতে গিয়ে শ্রীগোপ কুমার বললেন,— শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব নিজের প্রিয় সেবকদের সঙ্গে কখন কখন হাস, পরিহাস করেন এবং কখন কখন তাঁদের সঙ্গে প্রেমক্রীড়াও করেন।

যখন শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে নামসংকীর্তন, স্তোত্রপাঠ এবং গীতবাদ্য আদি হতো, তখন তা শ্রবণ করে আমার মধ্যে ব্রজভূমির স্মৃতি জাত হতো এবং ব্রজ মণ্ডলে যাওয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠতাম, কিন্তু সাধুদের সঙ্গ প্রভাবে তথা কমলনেত্র শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন প্রভাবে আমার সব দুঃখ দূর হয়ে যেতো এবং তখন আর অন্য কোনও স্থানে যেতে ইচ্ছা হতো না।

নীলাচল পর্বত শিখরে অবস্থিত শ্রীমন্দিরের রত্নসিংহাসনে বিরাজিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহিমা বর্ণনা করে গোপকুমার বলতে লাগলেন,—"আমি একদিন শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার জন্য প্রাতঃকালে শ্রীপ্রভুর (শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের)

কাছ থেকে আজ্ঞা আনতে গেলাম। কিন্তু তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করা মাত্রই আমি সবকিছু ভুলে গেলাম। এইভাবে আমার এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো। একদিন মথুরা হতে আগত কয়েকজন যাত্রীর মুখে শ্রীমথুরার বিবরণ সকল ভালভাবে শ্রবণ করলাম। সেই সকল বৃত্তান্ত শুনে আমার বড় শোক জাত হলো এবং তারপর দুঃখাতুর হয়ে রাত্রিতে যখন আমি শুয়ে পড়লাম, তখন ভক্ত-দুঃখে দুঃখী শ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নে আমাকে নিম্ন প্রকারে আজ্ঞা প্রদান করলেন।

ভো গোপনন্দন ক্ষেত্রমিদং মম যথা প্রিয়ম্।
তথা শ্রীমথুরাঽথাসৌ জন্মভূমির্বিশেষতঃ।।
বাল্যলীলাস্থলীভিশ্চ তাভিস্তাভিরলঙ্কৃতা।
নিবসামি যথাত্রাহং তথা তত্রাপি বিভ্রমন্।।

—(বৃ.ভা. ২/১/২১৬-২১৭)

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বললেন—"হে গোপকুমার! এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র আমার যেরূপ প্রিয়, মথুরাও আমার সেরূপ প্রিয়। বিশেষতঃ শ্রীমথুরা হচ্ছে আমার জন্মভূমি। তাই সেই ভূমি এ ক্ষেত্র অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয়। সেই মথুরা মণ্ডল আমার বহু প্রকার বাল্যলীলা দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে। আমি এখানে যেমন বাস করছি, সেখানেও সর্বদা তেমনই বাস করে থাকি। অতএব তুমি কেন দোলায়মান-চিত্ত হয়ে অনুতাপ করছ? তুমি সেখানে যাও। সময় হলে সেখানে তুমি নিশ্চয় আমাকে গোপকুমার অর্থাৎ মদনগোপাল রূপে দর্শন করতে পারবে। প্রাতঃকালে যখন শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করতে এলাম, তখন শ্রীজগন্নাথদেবের পূজারী আমাকে প্রভুর আজ্ঞামালা দিলেন। আমি সেই মালা কণ্ঠে ধারণ করে মন্দিরের চূড়াস্থিত শ্রীনীলচক্র (সুদর্শন চক্র) দর্শন ও প্রণাম করে ঐ স্থান হতেই এই মথুরামণ্ডলে এসে উপস্থিত হলাম।

এইভাবে মথুরাতে আসবার পর শ্রীগোপকুমার দ্বারকাপুরী অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে শ্রীনারদ মুনিকে কোনও এক পরিপ্রেক্ষিতে সাক্ষাৎ করায় শ্রীনারদ মুনি গোপকুমারকে পুনর্বার পুরুষোত্তম ধামে যাত্রা করার জন্য উপদেশ প্রদান করে বললেন—"হে গোপকুমার! এই দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করে সেই ধাম (পুরুষোত্তম ধাম) প্রাপ্তি দুর্লভ, তথা এখানে তার প্রাপ্তি সাধন দুঃসাধ্য।

একে তুমি ধ্রুব সত্য বলে জেনো। আমি এ বিষয়ে এক হিতোপদেশ দিচ্ছি, তা শ্রবণ করো। এই দ্বারকাপুরী থেকে কিছু দূরে অবস্থিত শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র, যাকে তুমি প্রথমে দর্শন করেছ, সেখানে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব জীউ এবং শ্রীসুভদ্রাদেবী নিত্য বিরাজমান। সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোবর্ধন, বৃন্দাবন ও যমুনাতীরে যে যে ক্রীড়া অর্থাৎ লীলা করেছিলেন, সেখানে অর্থাৎ সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সুভদ্রা ও বলরামের সঙ্গে শ্রীপুরুষোত্তম ঠিক তেমনই নর্মক্রীড়া প্রীতির সঙ্গে আচরণ করেন।

কিন্তূপদেশং হিতমেকমেতং মত্তঃ শৃণু শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যম্।
ক্ষেত্রং তদত্রাপি বিভাত্যদূরে পূর্বং ত্বয়া যদ্ভুবি দৃষ্টমস্তি।।
তস্মিন্ সুভদ্রা-বলরাম-সংযুতস্তং বৈ বিনোদং পুরুষোত্তমো ভজেৎ।
চক্রে স গোবর্ধনবৃন্দকাটবী কলিন্দজা-তীরভুবি স্বয়ং হি যম্।।
সর্বাবতারৈকনিধানরূপস্তত্তচ্চরিত্রাণি চ সন্তনোতি।
যস্মৈ চ রোচেত যদস্য রূপং ভক্তায় তস্মৈ খলু দর্শয়েত্তৎ।।
শ্রীকৃষ্ণদেবস্য সদা প্রিয়ংতৎ ক্ষেত্রং যথা শ্রীমথুরা তথৈব।
তৎ পারমৈশ্বর্য -ভরপ্রকাশ-লোকানুসারি-ব্যবহাররম্যম্।।

—(বৃ. ভা. ২/৫/২-৯-২১২)

সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সর্ব অবতারের কারণ স্বরূপ, তিনি সব অবতারের লীলা প্রদর্শন করেছেন। যে ভক্তের যে স্বরূপ দর্শন করতে অভিলাষ হয়, তাঁকে তিনি সেই রূপেই দর্শন দেন। সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র মথুরাপুরী সদৃশ শ্রীকৃষ্ণের সদা প্রিয়। যদিও সেখানে তাঁর পরম ঐশ্বর্যরাশি প্রকাশিত হয়েছে, তথাপি লোকব্যবহার অনুসারে তা শ্রীমথুরাপুরী সদৃশ রমণীয়। হে গোপকুমার! তুমি সেই ক্ষেত্রে যাও। যদি তাঁকে (শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে) দর্শন করে তোমার তৃপ্তিলাভ না হয়, তথাপি তুমি সেখানে অবস্থান করে তোমার নিজ ইষ্টদেব প্রাপ্তির সাধন সম্পাদন করো। সেই সাধন শ্রীগোপীপ্রাণনাথ-পাদপদ্মযুগলের প্রতি যে প্রেম, অর্থাৎ ব্রজবাসীদের যে প্রেম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আছে, সেই প্রেমের অনুগত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করাটাই হচ্ছে একমাত্র সাধন। এ ছাড়া অন্য কিছু সাধন নেই।

শ্রীগোপকুমার সম্বন্ধে সম্যক্ সূচনা

পুরাকালে প্রাগ্জ্যোতিষপুরে (আসাম প্রদেশে) কোন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি শাস্ত্রের কোন তাৎপর্য জানতেন না। তিনি বহুধন প্রাপ্তির কামনায় প্রতিদিন শ্রদ্ধাসহকারে সেখানকার কামাখ্যাদেবীর পূজা করতেন। দেবী ঐ ব্রাহ্মণের পূজার সন্তুষ্ট হয়ে স্বপ্নে তাঁকে দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র প্রদান করে বললেন, এই মন্ত্রের প্রভাবে তুমি শ্রীমদন গোপালের পাদপদ্ম লাভ করবে। তারপর ব্রাহ্মণ সেই গোপাল মন্ত্র জপ করতে করতে তাঁর ধনকামনা নিবৃত্তি হলো এবং তিনি হৃদয়ে অপার আনন্দ অনুভব করলেন। তারপর তিনি কাশী পরিভ্রমণ করতে গিয়ে সেখানে শ্রীবিশ্বনাথ মহাদেবকে দর্শন করলেন। যেহেতু তিনি তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাই কাশীতে বসবাসকারী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীরা, যাঁরা মোক্ষকে শ্রেয়স্কর মনে করেন, তাঁদের মতবাদ গ্রহণ করে দ্বন্দ্বে পড়লেন, এবং তিনি কি করবেন কি না করবেন—এই চিন্তা করে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। সেইদিন রাত্রে তিনি নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে শ্রীবিশ্বনাথজী কামাখ্যা দেবীর সঙ্গে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বললেন—"আরে-রে মূর্খ, তুই সেই সন্ন্যাসীদের কথা শুনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিস্ না। তুই শীঘ্র শ্রীমথুরামণ্ডলে গমন কর, সেখানে শ্রীবৃন্দাবনে গেলে তোর জীবন সার্থক হবে।" তারপর তিনি 'মথুরা' 'মথুরা' বলে কীর্তন করতে করতে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগে এসে পৌছিলেন। সেখানে তিনি মাঘমাসে প্রাতঃস্নানের জন্য সমাগত শত শত সাধুকে দেখতে পেলেন এবং সেখানে চারিদিকে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুপূজা-মহোৎসব দর্শন করলেন। তাঁদেরকে শ্রীবিষ্ণুপূজার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁদের দ্বারা ভর্ৎসিত হয়ে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, আমার উপাস্য দেব কে এবং কোথায় বাস করেন—এরূপ চিন্তা করতে করতে তিনি নির্জন স্থানেতে গিয়ে নিজের সেই গোপাল-মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। কিন্তু ইষ্ট দর্শনের আশায় তিনি শোক করতে করতে নিজের ভোজনাদিও ভুলে গেলেন এবং সেই অবস্থায় শুয়ে পড়লেন; তখন স্বপ্নে শ্রীমাধব এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"হে ব্রাহ্মণ! তুমি উমাপতি শ্রীবিশ্বেশ্বরের কথা স্মরণ করে শীঘ্র যমুনাতীর-পথে সেই শ্রীবৃন্দাবনে গমন করো। আমার প্রসাদে তুমি সেখানে অপার আনন্দলাভ করবে। পথে কোথাও কোন প্রকার বিলম্ব করো না।"

অতঃপর সেই ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে শয্যা হতে উঠে হৃষ্টচিত্তে যমুনাতীরপথে হাঁটতে হাঁটতে শ্রীমথুরা-পুরীতে পৌছে সেখানে বিশ্রাম-ঘাটে যমুনা নদীতে স্নান করলেন। তারপর তিনি মথুরা হতে শ্রীবৃন্দাবনে পৌছে সেখানে নিজ মন্ত্র জপকালে ধ্যানাবস্থায় গো-গোপী-গোপাদি শ্রীভগবৎ পরিকর সকলকে প্রায়ই দর্শন করে অপার আনন্দ লাভ করলেন। যখন তিনি সেই গো-ভূষিত বৃন্দাবনে কাউকেও দেখতে না পেয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে কেশীতীর্থের পূর্বদিকে রোদন-ধ্বনি শুনতে পেলেন। তারপর ঐ রোদনধ্বনি লক্ষ্য করে সেদিকে গমন করে এক কদম্বনিকুঞ্জের অভ্যন্তরে এক অতি সুকুমার সুন্দর গোপবেশধারী কিশোরমূর্তি গোপবালককে দেখতে পেলেন। তখন তিনি নিজের ইষ্টদেব ভ্রমে সেই সুকুমার বালকটিকে মহানন্দে 'হে গোপাল, হে গোপাল' বলে উচ্চস্বরে আহ্বান করে প্রণাম করবার জন্য ভূমিতে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। তখন সেই সর্বজ্ঞশিরোমণি গোপকুমার বাহ্য দৃষ্টি লাভ করে তাঁকে (ব্রাহ্মণকে) মথুরোদ্ভব, কামাখ্যা দেশবাসী ও শ্রীমদনগোপালোপাসক ব্রাহ্মণ জেনে কুঞ্জ হতে বাইরে এলেন এবং তাঁকে নমস্কার করে ভূমিতল হতে উঠিয়ে আলিঙ্গন করে নিজের কাছে বসালেন। তখন শ্রীব্রাহ্মণ বললেন,—"হে গোপকুমার! আমি গঙ্গাতীর, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে বহুবিধ সাধ্য ও সাধনের কথা শ্রবণ করে এরূপ সংশয়াকুল হয়ে পড়েছি যে, কোন্‌টি আমার সাধ্য ও কোন্‌টী আমার সাধন তা'র কিছুই নির্ণয় করতে পাচ্ছি না। তাই এ জন্ম আমার বিফল মনে করে মৃত্যু কামনা করছি, কিন্তু শ্রীকামাখ্যাদেবী শ্রীবিশ্বেশ্বর শিব ও শ্রীমাধবের কৃপায় এ পর্যন্তও জীবন ধারণ করে রয়েছি। তাঁদের কৃপাতেই আজ আমি নিজ ইষ্টদেব সদৃশ সর্বজ্ঞ ও দয়ালু আপনাকে এই স্থানে প্রাপ্ত হয়ে অতি আনন্দিত হয়েছি। কৃপা করে আপনি আর্ত আমাকে সংশয়-সাগর হতে পরমার্থ উপদেশ দিয়ে উদ্ধার করুন।"

আমরা পূর্বে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহিমা সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করেছি। তার মধ্যে আমরা শ্রীগোপকুমারের উক্তি বিচার করলে জানতে পারি যে, শ্রীজগন্নাথদেবের মহিমাতে পুরীর উপবনশ্রেণী দেখলে শ্রীবৃন্দাবন, সমুদ্র দেখলে শ্রীযমুনা এবং চটক পর্বত দেখলে গোবর্ধন বলে স্ফূর্তি হতো। পক্ষান্তরে, তিনি ব্রজভূমির উপস্থিতি অনুভব করতেন। পাঁচশ' বছর পূর্বে শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই পুরুষোত্তম ধামে তাঁর অন্ত্যলীলা প্রদর্শন কালে ঠিক ঐ রকম দর্শন করেছিলেন।

বিশেষ করে পুরুষোত্তম ধামে অবস্থানকালে জগন্নাথবল্লভ উদ্যান দর্শনে শ্রীবৃন্দাবন, সমুদ্র দর্শনে শ্রীযমুনা এবং চটক পর্বত দর্শনে শ্রীগোবর্ধনের স্ফূর্তি হয়েছিল। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেই সমস্ত লীলা সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করতে প্রয়াস করেছি।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীশচীমাতার অনুরোধক্রমে শ্রীক্ষেত্রে তথা শ্রীপুরুষোত্তম ধামে অবস্থান করলেন। কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনাকারিণী শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করে তিনি সর্বদা কৃষ্ণ-বিরহ-ভাবে অধীর হয়ে চতুর্দিকে তাঁকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। একদা বৈশাখ মাস পূর্ণিমা রাত্রিতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু জগন্নাথ বল্লভ উদ্যানে প্রবেশ করে মহাভাবাবেশে দশ প্রকার চিত্র জল্পোক্তি প্রকাশ করেছিলেন। তা ছিল ভাবের চরম স্থিতি। বৃন্দাবন জ্ঞানে তিনি সেই উদ্যানে শুক, শারী, পিক, ভৃঙ্গাদির সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। প্রতিটি তরুলতার নিকটে তিনি কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ লাভ করে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। রাধারাণী যেমন বৃন্দাবনের কুঞ্জের মধ্যে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করে তাঁর অদর্শনে মূর্চ্ছিত হতেন, ঠিক্ তেমনি মহাপ্রভুর অবস্থা হয়েছিল। অকস্মাৎ তিনি এক অশোক তরুর মূলে কৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে সেই দিকে ধাবিত হলেন, কিন্তু কৃষ্ণ হেসে সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। এইভাবে প্রথমে কৃষ্ণকে পেয়ে এবং তারপর তাঁকে হারিয়ে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধে প্রলুব্ধা হয়ে শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর সখীকে যা বলেছিলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাধার ভাবে বিভাবিত হয়ে সেই শ্লোকটি পড়ে বিলাপ করতে লাগলেন। গোবিন্দ লীলামৃতের (৮/৬) শ্লোকটি উদ্ধার করে তিনি দিব্যভাবাবেশ স্থিতিতে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃ পরিমলোর্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ
স্বকাঙ্গ নলিনাষ্টকে শশিযুতাজ্জগন্ধপ্রথঃ।
মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধিচর্চার্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাম্।।

—(চৈ. চ. অন্ত্য ১৯/৯১)

অর্থাৎ—"যিনি মৃগ-মদ-জয়ী স্বীয় বপু গন্ধের তরঙ্গের দ্বারা সমস্ত রমণীদের চিত্ত আকৃষ্ট করেন, যিনি নিজের অষ্ট-অঙ্গে অষ্টপদ্ম-যুক্ত এবং কর্পূর-যুক্ত পদ্ম-

গন্ধ প্রচার করেন, এবং যিনি—মৃগনাভি-কর্পূর-চন্দন-অগুরু-সুগন্ধের দ্বারা চর্চিত, হে সখী! সেই মদনমোহন আমার নাসাস্পৃহা বৃদ্ধি করছেন।"

এইরূপে ভাবাবেশে রাত্রি শেষ হলো। স্নানকৃত্য সম্পন্ন করে জগন্নাথকে দর্শন করলেন। দৈন্য, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দ্বারা মহাপ্রভু সময় সময় স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের সঙ্গে স্বরচিত শিক্ষাষ্টক শ্লোক আস্বাদন করে রাত্রি যাপন করেন। কখনও কখনও গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণকর্ণামৃত ও শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্লোক আস্বাদন করে বিরহ দশাতে নব-নবায়মান-ভাব উদিত হয়। কেবল যে জগন্নাথ বল্লভ উদ্যান দর্শনে তাঁর এ রকম মহাভাবের উদ্রেক হয়েছিল তাই নয়, সমুদ্র দর্শনেও তাঁর অনুরূপ ভাব প্রকাশ পেয়েছিল।

শরৎকালে রাত্রির চন্দ্রকিরণ অতি উজ্জ্বল। মহাপ্রভু সেই রমণীয় রাত্রিতে তাঁর ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে ভাগবত শ্লোক পড়তে পড়তে উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমণ করছিলেন। এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে সেই জ্যোৎস্নাবিধৌত রজনীতে তিনি হঠাৎ আইটোটা থেকে সমুদ্র দেখলেন। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় সমুদ্রের তরঙ্গ ঝলমল করায় মন প্রফুল্লিত হচ্ছিল। মহপ্রভু সেই সময় ভাবাবেশে সমুদ্রকে যমুনা নদী বলে ভুল করে সকলের অলক্ষ্যে ছুটে গিয়ে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিলেন। সমুদ্রে পড়া মাত্রই তিনি মূর্চ্ছিত হলেন। তাঁর সমুদ্রে এ প্রকার অবস্থার এক মাধুর্যময় বর্ণনা প্রদান করে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর প্রণিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে অন্ত্যলীলায় বর্ণনা করেছেন—

চন্দ্রকান্ত্যে উছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে,—যেন 'যমুনার জল'।।
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাঞা চলিলা।
অলক্ষিতে যাই' সিন্ধু জলে ঝাঁপ দিলা।।
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা, কিছুই না জানে।
কভু ডুবায়, কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে।।
তরঙ্গে বহিয়া ফিরে,—যেন শুষ্ক কাষ্ঠ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট?

—(চৈ. চ. অন্ত্য ১৮/২৭-৩০)

এভাবে মূর্চ্ছিত অবস্থায় সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে কোণার্ক অভিমুখে

চললেন।

এদিকে স্বরূপ দামোদর প্রমুখ ভক্তরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখতে না পেয়ে ইতস্তত ভ্রমণ করতে করতে তাঁকে খুঁজতে লাগলেন। এইভাবে খুঁজতে খুঁজতে রাত্রি শেষ হয়ে গেল কিন্তু কোথাও তাঁকে পেলেন না। তখন সবাই তাঁর অন্তর্দ্ধানের কথা চিন্তা করলেন। তাঁরা মহাপ্রভুর বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে পুনর্বার খুঁজতে লাগলেন। এমন সময় স্বরূপ দামোদর দেখতে পেলেন যে, একটি জেলে কাঁধে জাল নিয়ে অদ্ভুত ভাবাবেশে 'হরি, হরি' বলে নাচতে নাচতে আসছে। সেই জেলেটির ঐরকম ভাবাবেশ অবস্থা দেখে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

সেই জেলেটি তখন উত্তর দিলো, "আমি যখন জলে জাল ফেলেছিলাম তখন একটি মৃতদেহ আমার জালে ধরা পড়ে। আমি তাঁকে একটি বড় মাছ ধরা পড়েছে বলে মনে করে অনেক যত্ন সহকারে জাল টেনে তুললাম, কিন্তু যখন সেই মৃতদেহটিকে জাল থেকে ছাড়াচ্ছিলাম তখন আমার তাঁর অঙ্গ স্পর্শ হওয়া মাত্রেই সেই মৃতদেহটি ভূত রূপে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করল। সেইজন্যে আমার শরীরে এই সমস্ত অশ্রু কম্পাদি বিকার হয়েছে। সেই ভূতটি গোঁ-গোঁ শব্দ করছে। আবার সেই জেলেটি আরও বলে চল্লেন, "আমি যদি মরে যাই, তাহলে আমার স্ত্রী-পুত্র বাঁচবে কেমন করে ? তাই আমি ওঝার কাছে যাচ্ছি ভূত ছাড়াবার জন্যে। আমি প্রতিরাত্রে মাছ ধরার জন্য একা নির্জন স্থানে ঘুরে বেড়াই, নৃসিংহদেবকে স্মরণ করার ফলে ভূত-প্রেত আমার কিছু করতে পারে না। কিন্তু কি আশচর্য! এই ভূতটি নৃসিংহ-মন্ত্র উচ্চারণ করলে দ্বিগুণ শক্তিতে চেপে ধরে। আমি আপনাদের নিষেধ করছি, আপনারা ওদিকে যাবেন না। যদি যাবেন তাহলে সেই ভূতটি আপনাদের সকলের ঘাড়ে চাপবে। জেলের মুখে সেকথা শুনে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী সব কিছু বুঝতে পারলেন, এবং তখন তিনি সুমধুর স্বরে সেই জেলেটিকে আশ্বাসন দিয়ে বললেন, "আমি একজন খুব বড় ওঝা। কি করে ভূত ছাড়াতে হয় তা আমি জানি। তুমি কোন ভয় পেয়ো না। তুমি যাঁকে ভূত বলে মনে করছ, তিনি ভূত নন। তিনি পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। প্রেমাবিষ্ট হয়ে তিনি সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন এবং তুমি তাঁকে তোমার জাল দিয়ে ধরে জল থেকে উঠিয়েছ। কেবল তাঁর স্পর্শের ফলে তোমার সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত হয়েছিল। তুমি কোথায় তাঁকে

উঠিয়েছ তা আমাকে দেখাও।"

সেই জেলেটি তখন বললেন, "মহাপ্রভুকে আমি বহুবার দেখেছি; কিন্তু এটি তিনি নন। এর আকার অত্যন্ত বিকৃত। স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তাকে বুঝিয়ে বললেন যে, "ভগবৎ প্রেমে আবিষ্ট হওয়ার ফলে তাঁর দেহে ঐরকম অবস্থা হয়ে থাকে।" তা শুনে সেই জেলেটি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তখন সমস্ত ভক্তদের নিয়ে মহাপ্রভুকে দেখাল। স্বরূপ দামোদর গোস্বামী মহাপ্রভুর ভিজা কৌপীন খুলে শুষ্ক কৌপীন পরালেন। ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্তন করতে লাগলেন, এবং স্বরূপ গোস্বামী উচ্চৈঃস্বরে মহাপ্রভুর কাণে কৃষ্ণনাম করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভুর কাণে সেই শব্দ প্রবেশ করায় অর্ধবাহ্য দশা হ'ল। ভাবাবেশে তখন তিনি স্বরূপকে বলতে লাগলেন,"আমি কালিন্দী (যমুনা)দেখে বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম এবং সেখানে গিয়ে আমি দেখলাম ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করছেন। আমি তীরে দাঁড়িয়ে সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণের সেই বিচিত্র জলকেলি দেখছিলাম। তোমরা কেন আমাকে এখানে নিয়ে এলে?" স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তখন সমস্ত ঘটনা শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে বললেন। তারপর তিনি যখন সেইস্থান হতে মহাপ্রভুকে গম্ভীরায় ফিরিয়ে নিয়ে এলেন তখন সবাই প্রত্যাবর্তন করলেন।

একদিন সমুদ্রে স্নান করতে যাওয়ার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চটক পর্বত দেখে তাঁর বৃন্দাবনের গোবর্দ্ধন জ্ঞান হলো। তৎক্ষণাৎ তিনি ভাগবতে শ্রীগোবর্ধন সম্বন্ধে বর্ণিত 'হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্যো'—শ্লোকটি বলতে বলতে বায়ুবেগে চটক পর্বতের দিকে ছুটে চললেন। তাঁর দেহে অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকার সমূহ প্রকাশ পেলো। রাস্তার মধ্যে হঠাৎ ভাবাবেশে স্তম্ভিত হওয়ার ফলে তাঁর আর চলার শক্তি রইল না। মূর্চ্ছিত হয়ে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। চটক পর্বত দর্শনে শ্রীমন্ মহাপ্রভু গোবর্ধন ভ্রমে গিরিরাজের স্তুতি-উন্মুখী হয়ে যে শ্লোকটি আবৃত্তি করেছিলেন, তা স্বয়ং গোপিকাদের উক্তি। শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধ থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধার করে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণ-স্পরশ-প্রমোদঃ।

মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয় সূযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ।।

অর্থাৎ—"হে অবলাগণ! যেহেতু এই গোবর্ধন পর্বত কৃষ্ণ বলরামের চরণ স্পর্শ লাভ করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে গাভী এবং গোপগণের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামকে পানীয় জল ও খাদ্য—ঘাস-কন্দমূল ইত্যাদির দ্বারা তর্পণ করেছেন, সেইহেতু এই পর্বত হরিভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

উক্ত ভাবে ভাবাবেশ অবস্থায় তিনি সর্বদা বৃন্দাবন স্মরণ করতেন। বৃন্দাবনের তরু, লতা, নদী প্রভৃতি কৃষ্ণের লীলা-স্থান স্মরণ করে ঠিক্ অনুরূপ ভাবের বিকার ঘটিয়ে তিনি মূর্ছিত হয়ে যেতেন। চটক পর্বত দর্শনে তাঁর মূর্ছিত অবস্থায় স্বরূপাদি ভক্তরা তাঁকে কৃষ্ণনাম শুনিয়ে চেতনা করিয়েছিলেন। ঐভাবে মহাপ্রভু সর্বদা (রাত্রিদিন) কৃষ্ণ বিরহে আবিষ্ট থাকতেন। কখনও কখনও অন্তর্দশা ও কখনও কখনও বাহ্যদশায় অবস্থান করে অভ্যাসবশতঃ স্নান-পান-ভোজনাদি করতেন।

কখনো কখনো পুষ্পোদ্যানে কৃষ্ণকে খোঁজেন। গোপীভাবে বিভাবিত হয়ে কখনও কখনও তিনি কৃষ্ণরূপ দর্শন করতেন তো, কখনো কখনো অকস্মাৎ বচন মাধুর্য শ্রবণ করতেন। আবার কখনও কখনও কৃষ্ণের সঙ্গলাভ অথবা কৃষ্ণের অঙ্গ গন্ধলাভ অথবা কৃষ্ণের অধর স্পর্শ অনুভব করতেন। এই সকল অবস্থায় তিনি স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায়ের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে রোদন করতে করতে বলতেন, "আমি কি করবো ? আমি কোথায় যাবো? কোথায় গেলে আমি কৃষ্ণকে পাবো? দয়া করে তোমরা দু'জনে আমাকে সে উপায় বলো।" এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিনের পর দিন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী এবং রামানন্দ রায়ের সঙ্গে বিলাপ করতেন। তাঁরা দু'জন অর্থাৎ স্বরূপ দামোদর গোস্বামী ও রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাব অনুসারে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কবিতা, শ্রীগীতগোবিন্দের গান অথবা কৃষ্ণকর্ণামৃতাদির শ্লোক পাঠ করে তাঁকে আনন্দ দান করতেন। যার ফলে তিনি সখীদের কিঙ্করী অভিমানে নিরন্তর কৃষ্ণলীলা দর্শন করতেন।

একদিন শ্রীমন্ মহাপ্রভু সমুদ্রে স্নান করতে যাওয়ার সময় হঠাৎ একটি পুষ্পোদ্যান দর্শন করায় অপ্রাকৃত ভ্রম-বশতঃ বৃন্দাবন বলে মনে হয়েছিল।

সখীভাবে বিভাবিত হয়ে পুষ্পোদ্যানের প্রতিটি তরুলতার নিকটে শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ একটি কদম্ব বৃক্ষের তলায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে তাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ভাবাবেশে ভূমিতে পড়ে গেলেন। সেই সময় স্বরূপ দামোদর প্রমুখ সমস্ত ভক্তরা তাঁকে চেতনা ফিরিয়ে আনলেন। তখন মহাপ্রভু উঠে বসে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করে বলতে লাগলেন, "আমার কৃষ্ণ কোথায় গেলো? আমি কেন আর সেই মুরলী বদন কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছি না?" কিছুক্ষণ পরে তিনি বাহ্য জ্ঞান লাভ করে ভক্তদের সঙ্গে স্নানাদি ক্রিয়া শেষ করলেন।

এইভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভু কখনো কখনো গো-গোষ্ঠে তো, কখনো কখনো ভাবোন্মাদবশতঃ গম্ভীরার মধ্যে দেওয়ালে মুখ ঘষার ফলে গভীর ক্ষত হওয়ায় রক্তাপ্লুত অবস্থায় কৃষ্ণ বিরহে রোদন করতেন। শ্রীমন্দিরে প্রবেশকালে তিনি গরুড় স্তম্ভের পিছনে দাঁড়িয়ে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে এরূপ ভাববিহ্বল হয়ে পড়লেন যে, তিনি আর স্পষ্টভাবে জগন্নাথ উচ্চারণ করতে না পেরে জ-জ..., গ-গ... করতে করতে মূর্চ্ছা হয়ে নীচে পড়ে গেলেন। তবে সেখানে উপস্থিত শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহতে আনা হ'ল। সেখানে তিনি নিজের চেতনা ফিরে পাওয়ার পর সেই শ্যামসুন্দর কৃষ্ণের বিরহে বিলাপ করতে লাগলেন। বিরহ-বিধুরা গোপীদের মতো তিনি সেই মুরলীধারী কৃষ্ণকে খুঁজতে লাগলেন। আবার গরুড় স্তম্ভের পিছনে দাঁড়িয়ে শ্রীজগন্নাথকে শ্যামসুন্দর রূপে দর্শন করে নিজের প্রাণপ্রিয়কে সম্মুখে প্রাপ্ত হয়ে রাধারাণীর মতো দিব্য ভাবে আবিষ্ট হতেন। কেবল তাই নয়, দীর্ঘ আঠার বছর কাল পুরুষোত্তম ধামে অবস্থানকালের মধ্যে তিনি অনেক দিব্য অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করেছিলেন। সে সব হচ্ছে অনন্ত ও অপার।

(হরেকৃষ্ণ)

প্রেমপুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গ

প্রেমপুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের দু'টি কারণ রয়েছে। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ কারণ। বহিরঙ্গ কারণ যুগধর্ম প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রেম দান। এটি জীবজগতের জন্য; কিন্তু নিজের ত্রিবিধ বাঞ্ছা পূরণই হচ্ছে অন্তরঙ্গ কারণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ বাঞ্ছা নিজলীলায় অপূরণীয় ছিল। সেই ত্রিবিধ বাঞ্ছা পূরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে এসেছিলেন। ত্রিবিধ বাঞ্ছা হলো, যথা—(ক) শ্রীরাধার প্রেম কি রকম? (খ) শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব মাধুরিমা যা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন তা কি রকম? এবং (গ) শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব মাধুরিমা আস্বাদন করে শ্রীরাধা যে সুখ লাভ করেন সেই সুখই বা কি রকম? তা কৃষ্ণ কেমন করে জানবেন? সেজন্য আত্মারাম আপ্তকামের লোভ।

কিন্তু এই ত্রিবিধ বাঞ্ছা শ্রীমতী রাধারাণী সহ সম্পর্কিত। কৃষ্ণ বহু যত্ন করেও এই ত্রিবিধ বাঞ্ছা পূর্তির জন্য সফল হতে পারেন নি। তার জন্য হৃদয়ে তাঁর বহু ক্ষোভ জন্মেছিল। অন্তরের অশেষ লোভে লালায়িত হয়ে ভাবলেন 'কি করি'? 'কি ভাবে তা পূরণ করবো?' এইভাবে অন্তরের ক্ষোভ অসহনীয় হওয়ায় অবশেষে শ্রীমতী রাধারাণীর কান্তি ও ভাব অঙ্গিকার করে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দর রূপে প্রকট হয়ে নিজের ত্রিবিধ বাঞ্ছা পূরণ করেন। তবে সেই রাধার প্রেম কি, যা লাভের জন্য সর্বরসময় রসিক শেখর ব্যাকুল? সেটাই হচ্ছে এখানে আলোচ্য বিষয়।

শ্রীরাধার প্রেমের শক্তির নিকটে শ্রীকৃষ্ণ অধীন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন, ''মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।'' হে ধনঞ্জয় (অর্জুন), আমার থেকে কেউ বড় নন, অথবা আমার সঙ্গে কেউ সমান নন। তিনিই হচ্ছেন পরমপুরুষ ভগবান্। আবার তিনি হচ্ছেন শ্রীরাধাপ্রেমের অধীন। এই দুই বিপরীত ভাব (লক্ষণ) এখানে লক্ষ্য করা যায়। আবার কখন কখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাণীর পদধূলি কামনা করে থাকেন।

''দেহি পদ-পল্লব মুদারম্।'' শ্রীরাধাপ্রেমে তিনটি অদ্ভুত শক্তি দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, শ্রীমতী রাধারাণীর শুদ্ধপ্রেমে কৃষ্ণ কি করম পাগল। ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণ যিনি হচ্ছেন পূর্ণব্রহ্ম, স্বরাট, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ তিনি কেমন করে পাগল হলেন? দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেম অনুভব করতে পারেন নি, যদিও তিনি হচ্ছেন স্বয়ং সর্বজ্ঞ। তৃতীয়তঃ, শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেম পরস্পর বিপরীত দু'টি বস্তুর মিশ্রণ। পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি হচ্ছেন স্বয়ং পূর্ণ, সর্বজ্ঞ, স্বরাট তিনি কেনই বা পাগল হবেন? যদি তিনি পাগল হন তবে তার কারণ কি? এটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয়। কোন ব্যক্তির পাগল হওয়ার তিনটি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ, যদি ব্যক্তিটি কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ওপর অত্যধিক ও অতি গভীরভাবে চিন্তা করে, তবে সে পাগল হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ব্যক্তির কোন কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট শক্তি (ক্ষমতা) রয়েছে। যদি ক্ষমতা বহির্ভূত কাজ সে বার বার করার জন্য চেষ্টা করে, তবে শেষে সে পাগল হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ চল্লিশ ওয়াট্ (watt) বাল্ব্ (bulb) -এর ক্ষমতা চল্লিশ ওয়াট্ (watt), কিন্তু একশ' ওয়াট্ (watt) বিদ্যুৎশক্তি তারের সঙ্গে যোগ করলে বাল্ব্ (bulb) ক্ষমতা শক্তি হারাবে, তখন আর আলোক প্রদান করতে পারবে না। তৃতীয়তঃ, যদি কোন ব্যক্তির জ্ঞান মায়া দ্বারা আবৃত হয়ে যায় তার তখন আর ভালমন্দ বিচার করবার শক্তি থাকে না, তখন সে পাগল হয়ে যায়। তা হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত কারণের জন্য পাগল হন কি? তা আমাদের এখানে আলোচনা করা উচিত, নচেৎ আমরা তত্ত্ব ভ্রমে পড়ব। যদি কোন ব্যক্তি কোন বিষয় বস্তুর ওপর অত্যধিক ও গভীরভাবে চিন্তা করে, তাহলে সে পাগল হয়ে যায়। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমপুরুষ। তিন হচ্ছেন স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম। সকল জীবজগত তাঁর চিন্তা করেন, ধ্যান করেন। সবাই তাঁর তত্ত্ব আলোচনা করেন, তাঁর গুণগান করেন। সকল জীব জগৎ তাঁর চিন্তায় মগ্ন। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ হচ্ছেন আত্মারাম, আপ্তকাম, পরমানন্দ-স্বরূপ। তবে এটা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কিভাবে সম্ভব যে তিনি কেন কোন বিষয় বস্তুর ওপর অতি গভীরভাবে চিন্তা করবেন? তা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

> কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে।
> পূর্ণানন্দ-পূর্ণরস রূপ কহে মোরে।।
> আমা হইতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
> আমাকে আনন্দ দিবে—ঐছে কোন্ জন।।
> আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ।
> সেইজন আহ্লাদিতে পারে মোর মন।।
>
> —(চৈঃ চঃ আঃ ৪/২৩৮-২৪০)

উপরোক্ত ভগবানের উক্তি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণনা করেছেন। এক সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরে বিবেচনা করেন,—"সকলেই বলে যে, আমি পূর্ণ আনন্দ এবং পূর্ণ রসের মূর্ত বিগ্রহ। সমস্ত জগৎ আমার থেকে আনন্দ লাভ করে। এমন কেউ কি আছে যে, আমাকে আনন্দ দান করতে পারে? যদি কেউ আমার থেকে শত শত গুণে অধিক গুণী হয় তবে সেই কেবল আমাকে আনন্দিত করতে পারে।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত আনন্দের উৎস। সমস্ত মুখ্য ও গৌণ আনন্দের তিনিই একমাত্র অধিকারী। তাই সমস্ত ভক্ত রস আস্বাদনের জন্য তাঁর ধ্যান করেন। তবে তিনি কিই বা চিন্তা করবেন। অতএব প্রথম কারণ কৃষ্ণের জন্য উপযুক্ত নয়। দ্বিতীয়তঃ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরাট, সর্বশক্তিমান, সকল শক্তির আধার। তিনি হচ্ছেন অনন্ত। তাঁর শক্তিও অনন্ত। যিনি অনন্ত, তাঁর শক্তির বাইরে আবার কি থাকতে পারে? তাই এ কারণটিও কৃষ্ণের জন্য প্রযুজ্য নয়। তৃতীয়তঃ, ব্যক্তি অজ্ঞান, মায়ামোহিত হলে পাগল হয়। এই অজ্ঞান মায়াসৃষ্ট। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মায়াধীশ। তিনি হচ্ছেন সৎ, চিৎ, আনন্দময়। চিদ্ অর্থ জ্ঞানময়। তিনি হচ্ছেন পূর্ণ জ্ঞানময়, তাই তাঁর নিকটে অজ্ঞানতাই বা এল কোথা থেকে? জীব হচ্ছে মায়াবশ, সে অণু আর ভগবান্ হচ্ছেন মায়াধীশ, তিনি বিষ্ণু। তবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাগল হলেন কেমন করে? যদিও উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে আমরা বলতে পারি যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাগল নন্, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পাগল। এটি এক অতি আশ্চর্যের বিষয়। তবে তার কারণ কি হতে পারে? তা হচ্ছে শ্রীমতী রাধারাণীর বিশুদ্ধ প্রেম। সেইপ্রেম এমনই যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তা'কে অতুলনীয় বলে বর্ণনা করেছেন।

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত।।
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল।।
রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি —শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট।।

—(চৈঃ চঃ আঃ ৪/১২২-১২৪)

অর্থাৎ— ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—"আমি হচ্ছি পরম আনন্দময়, পরমসত্য ও সমস্ত রসের উৎস। কিন্তু রাধিকার প্রেম আমাকে উন্মত্ত করায়। রাধারাণীর

প্রেমে যে কত শক্তি আছে, তা আমি জানি না। সেই প্রেম আমাকে সর্বদা বিহ্বল করে। রাধিকার প্রেম আমার গুরু, আর আমি তার শিষ্য নর্তক। তার প্রেম আমাকে সর্বদা নব নব নৃত্যে প্রবৃত্ত করে।" তবে সর্বজ্ঞ কৃষ্ণ রাধাপ্রেম সম্বন্ধে অজ্ঞ। তিনি সর্বজ্ঞ, স্বরাট। যাঁর নিকটে সকল জীব আশ্রয় করে তিনি আবার রাধারাণীর পাদপদ্ম কামনা করেন। তিনি হচ্ছেন রাধারাণীর প্রেমের শিষ্য। গুরু যেমন শিষ্যকে নির্দেশানুসারে পরিচালিত করেন, ঠিক্ তেমনই রাধাপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণ (শিষ্য) পরিচালিত হন। তবে কৃষ্ণ কি পাগল? তা কি সত্য? শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নলিখিত ভাবে উল্লেখ করেছেন। "সর্বশক্তি সর্বসুখ পরিপূর্ণ সত্যস্বরূপ নিত্যজ্ঞানাদিময় অব্যয়ং কদাচিৎ দরতিভয়া রাধা প্রাঙ্গণ কেতো নিহৃতিয়তিষ্ঠামি কদাচিৎ রাধাসঙ্গসুখাসয়া। তদাগমন পথানং পশ্যামি কদাচিৎ দদর্থং ছদ্মবেশীভবামি কদাচিৎ লতায়োং তদ্ভান্তে ভবামি ত্যাধিকং তৎ প্রেমেব মরয়তি।" এটি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ- নিঃসৃত বাণী। আমি হচ্ছি সর্বশক্তিমান, পূর্ণ আন্দস্বরূপ, পূর্ণজ্ঞানময়, তথাপি আমি রাধাপ্রেমে পাগল। রাধপ্রেমে পাগল হয়ে আমি কি করি, তা আমি জানি না।

কখনো কখনো শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর শাশুড়ী-বাড়ীর উঠানের কুলগাছের মূলে সারা রাত কাটাতেন। কারণ রাধারাণীর শাশুড়ী জটিলাকে দেখে কৃষ্ণ ভয় করে এরকম করতেন। তবে এটা পাগলামি নয় কি? সময় সময় বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করে রাধারাণীর যাওয়া- আসার পথে রাধার দর্শনের জন্য বসে থাকতেন। সময় সময় রাধারাণীর শরীর স্পর্শ করার জন্য শাড়ী পরে নাপিতানী বেশে রাধারাণীর গৃহে আগমন করে বলতেন—"রাধে! আমি তোমার জন্য অতি সুন্দর সুগন্ধ আলতা এনেছি, তুমি তোমার পা দেখাও, আমি তোমার পায়ে লাগিয়ে দিব।" তবে এটা পাগলামি নয় কি? আবার কখনো কখনো মালিনী বেশে কৃষ্ণ সুন্দর সুন্দর ফুলের মালা নিয়ে রাধারাণীর গৃহে আগমন করে বলতেন,—"রাধে! আমি তোমার জন্য এই সুন্দর ফুলের মালাটি এনেছি, এসো আমি তোমাকে গলায় পরিয়ে দিই।" অনেক সময় যখন শ্রীরাধা যমুনায় স্নান করার ঘাটে স্নান করতেন, তখন শ্রীমতী রাধারাণীর কুঙ্কুম ও ফুলের স্পর্শলাভের কামনায় যমুনার নীচে স্নানকরার ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ স্নান করতেন। এই সমস্ত শ্রীরাধাপ্রেমের লক্ষণ কৃষ্ণকে পাগল করাতেন। কখনো কখনো শ্রীমতী রাধারাণীকে না পেয়ে বিরহে কাঁদতে কাঁদতে কুঞ্জে কুঞ্জে খুঁজে বেড়াতেন।

কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে।
রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে।।
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রাধে রাধে।
তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে।।
রাধে বৃন্দাবন বিলাসিনি রাধে রাধে।
রাধে কানুমনোমোহিনি রাধে রাধে।।
রাধে অষ্টসখীর শিরোমণি রাধে রাধে।
রাধে বৃষভানুনন্দিনী রাধে রাধে।।

শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে ডাকতেন, "হে রাধে তুমি কোথায়? তোমার প্রেমের কাঙ্গাল তোমাকে ডাকছে, দয়াকরে দর্শন দিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা কর।"

নিয়ম করে সদাই ডাকে রাধে রাধে।
একবার ডাকে কেশীঘাটে
আবার ডাকে বংশীবটে রাধে রাধে।।
একবার ডাকে নিধুবনে।
আবার ডাকে কুঞ্জবনে রাধে রাধে।।
একবার ডাকে রাধাকুণ্ডে,
আবার ডাকে শ্যামকুণ্ডে রাধে রাধে।।
একবার ডাকে কুসুমবনে,
আবার ডাকে গোবর্দ্ধনে রাধে রাধে।।
একবার ডাকে তালবনে,
আবার ডাকে তমালবনে রাধে রাধে।
মলিন বসন দিয়ে গায়,
ব্রজের ধূলায় গড়াগড়ি যায় রাধে রাধে।।
মুখে রাধা রাধা বলে,
ভেসে নয়নের জলে রাধে রাধে।
বৃন্দাবনে কুলিকুলি
কেঁদে বেড়ায় রাধা বলি রাধে রাধে।।

এইভাবে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, নিধুবন, কুঞ্জবন ইত্যাদি লীলা স্থানগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ

রাধাকে খুঁজতেন। শ্রীমতী রাধারাণীর অদর্শনে ব্রজের ধূলায় গড়াগড়ি দেওয়ায় তাঁর বসন মলিন হয়ে যেতো। মুখে রাধারাণীর নাম উচ্চারণ করার সময় চোখের জলে সারা শরীর আদ্র হয়ে যেতো। এইভাবে কাঁদতে কাঁদতে বৃন্দাবনে রাধারাণীকে খুঁজে বেড়াতেন। আবার বলতেন—

'দেখা দিয়া রাধে রাখহ প্রাণ'।
বলিয়া কাঁদয়ে কাননে কান।।
বলে তুঁহু বিনা কাহার রাস?
তঁহু লাগি মোর বরজ-বাস।।

"হে রাধে! তুমি আমাকে দেখা দাও, আমার প্রাণ রক্ষা কর। তুমি ছাড়া কেমন করে রাস নৃত্য হবে? তোমার জন্যেই তো আমি ব্রজভূমিতে আছি।" এইভাবে বলতে বলতে প্রতিটি কাননে কেঁদে কেঁদে খুঁজে বেড়াতেন। এ থেকে স্পষ্ট সূচিত হচ্ছে যে, শ্রীরাধারাণীর বিশুদ্ধ প্রেম কৃষ্ণকে পাগল করাতেন। তাই রাধা হচ্ছেন প্রেমগুরু, আর শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁর শিষ্য। পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেম আস্বাদন করে শতগুণ আনন্দ আস্বাদন করতেন।

নিজ-প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ।।
—(চৈঃ চঃ আঃ ৪/১২৬)

রসময়, রসিকশেখর রাধাপ্রেম আস্বাদনের জন্য অতি ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। হৃদয়ে লোভ জাত হতো। তা তিনি কেমন করে লাভ করবেন তার জন্য চিন্তা করতেন।

বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ।।
আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায়।।
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়।।
এত চিন্তি' রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়তে প্রেম-লোভ ধক্‌ধকি।।
—(চৈঃ চঃ আঃ ৪/১৩৩-১৩৬)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বিষয় বিগ্রহ, আর সকল ভক্ত হচ্ছেন আশ্রয় জাতীয়। আশ্রয় জাতীয় ভক্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হচ্ছেন শ্রীমতী রাধিকা। ভক্ত (আশ্রয়) ভগবানের (বিষয়) সেবা করে যে আনন্দ পান্ তা ভগবান্ কেমন করে জানবেন।

ভক্ত-প্রেমার যে দশা, যে গতি প্রকার।
যত দুঃখ, যত সুখ, যতেক বিকার।।
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে।
ভক্তভাব অঙ্গীকরে তাহা আস্বাদিতে।।
—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮/১৬,১৭)

অতএব ভগবান্ ভক্তভাব অঙ্গীকার করে শ্রীগৌররূপে তা আস্বাদন করলেন। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন রসের আশ্রয় আর কৃষ্ণ হচ্ছেন বিষয়। বিষয় জাতীয় আহ্লাদ অপেক্ষা আশ্রয় জাতীয় আহ্লাদ কোটিগুণ অধিক। আশ্রয়ের (রাধা) অখণ্ড সুখ দর্শনে বিষয়ের (শ্রীকৃষ্ণের) আশ্রয় হওয়ার লোভ। আশ্রয়ের রসসৌখ বিষয়ের রসসৌখ্য অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক থাকা অনুভব করে তা আস্বাদন করার জন্য বিষয়-বিগ্রহ (শ্রীকৃষ্ণ) একান্ত উৎকণ্ঠিত। আশ্রয় জাতীয় ভাব অঙ্গীকার করে শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপে আবির্ভূত হলেন।

আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে।।—(চৈঃ চঃ আঃ ৩/২০)

অর্থাৎ—শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় ভাব (ভক্তভাব) -এ আবির্ভূত হলেন। যেহেতু শ্রীরাধা হচ্ছেন প্রেমগুরু, তা অনন্ত ও অসীম। যা অসীম তাকে কিরূপে সীমাবদ্ধ করা যাবে? যদি কোন বস্তুর নির্দিষ্ট সীমা থাকে তবে তাকে বৃদ্ধি করা যাবে। যদিও শ্রীরাধারাণীর বিশুদ্ধপ্রেম অসীম, তথাপি তা প্রতি মুহূর্তে নিত্যবর্ধনশীল। এটাই হচ্ছে রাধাপ্রেমের দুই বিপরীত ভাব। শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রবাহের দুই পার্শ্বে বিরহ ও মিলন। বিরহ অবস্থায় তীব্রযন্ত্রণা ও মিলন অবস্থায় অমৃতের আস্বাদন।

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরবচর্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ।।
—(দানকেলিকৌমুদী, শ্লোক নং-২)

অর্থাৎ— শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেম বিভু, গুরু এবং এটি প্রতি মুহূর্তে বিবর্ধনশীল। যদিও রাধা প্রেম-গুরু, তথাপি শ্রীমতী রাধারাণীর নিকটে গুরুতা নেই। গুরুতা বিনা রাধা হচ্ছেন গুরু। এই রাধাপ্রেম বিশুদ্ধ এবং বক্র স্বভাব সম্পন্ন, কিন্তু এতে কপটতা (ছলনা) নেই। এটি যদিও বিশুদ্ধ তথাপি প্রতি মুহূর্তে বক্রভাব। এটাই হচ্ছে এই প্রেমের দুই বিপরীত ভাব। ''কৃষ্ণ বন্দে জগৎ গুরু''। শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন জগতের গুরু। কিন্তু সেই জগৎগুরু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর পাদপদ্ম উপাসনা করেন।

তবে এটির দুই বিপরীত ভাব। অতএব যদি গুরু-পরম্পরায় আমরা সর্বোচ্চ স্তরে যাব তাহলে আমরা দেখতে পাবো শ্রীমতী রাধারাণীই গুরু ভূমিকায় শীর্ষ স্থানেতে রয়েছেন।

''যাবৈ গুরু অস্তি নাহি শুনিশ্চয়''।

সেই রাধা প্রেম কৃষ্ণকে পাগল করে। কিন্তু সেই রাধারাণীর ভাব কি? তিনি বলতেন—

দূরে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ
সেহ মোর নাহি কৃষ্ণ পায়।
নাহি কৃষ্ণ-প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব।।

''শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমার প্রেমগন্ধ নেই। আমি প্রেমধন বিহীন। আমার প্রেমধনহীন জীবন বৃথা। শুদ্ধ প্রেমের সম্বন্ধ বহু দূরে। কপট প্রেমের গন্ধ আমার নিকটে নেই। শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা, সেবন করে আমার ইন্দ্রিয় বৃথা। সেগুলি পাষাণ, শুষ্ক কাষ্ঠ সদৃশ হয়েছে। সেই সমস্ত ব্যাপারে উদাসীন হয়ে কেমন করে আমি দেহ ধারণ করতে সমর্থ হব।'' এই সমস্ত উক্তিতে শ্রীমতী রাধারাণীর দীনতা, গর্ব, দম্ভহীনতা দৃষ্ট হয়।

শ্রীরাধাপ্রেম বিষ ও অমৃত এই দুই বিপরীত বস্তুর মিলন।

বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুদ চরিত।।
এই প্রেমা-আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু-চর্বণ,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।

সেই প্রেমা যাঁর মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন।।

—(চৈ. চ. ম. ২/৫০-৫১)

শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমের স্বভাব এমনই যা বাইরে কালকূট সর্পের বিষের মতো জ্বালাময় কিন্তু অন্তরে অতি আনন্দময়। এই প্রেমের আস্বাদন ঠিক্ তপ্ত ইক্ষুচর্বন করার মতো। যার স্বাদ মিষ্টতা কিন্তু চর্বণে মুখ জ্বলে। তাই এই প্রেম অর্থাৎ ভগবৎ-প্রেম যিনি আস্বাদন করেছেন তিনি তার বিক্রম সম্বন্ধে অবগত। তা বিষ এবং অমৃতের মিলনের মতো। 'বিদগ্ধমাধবে' বলা হয়েছে—

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ।।

শ্রীমতী রাধারাণীকে পৌর্ণমাসী বলছেন, — "হে সুন্দরী, কৃষ্ণের প্রতি তুমি যে প্রেম বৃদ্ধি করছ তা স্বভাবজাত অর্থাৎ স্বাভাবিক নয়, তা বক্রতা সম্পন্ন। তুমি কেন তাঁকে ভালবাস? যদিও শ্রীমতীর বিশুদ্ধ প্রেম মাদক নয়, তবুও তা মাদকতা সৃষ্টি করে। যদিও তা প্রেম-অগ্নি নয়, তবুও তা ভীষণ জ্বালা করে। যদিও তা অস্ত্র নয়, তবুও তা হৃদয়কে বিদ্ধ করে। শ্রীমতী রাধারাণীর এ রকম বিশুদ্ধ প্রেমে লোভাতুর হয় বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর অন্তর প্রদেশ থেকে মাদনাক্ষ-মহাভাব-ধন হরণ করে আশ্রয় জাতীয় ভাব অঙ্গীকার করে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে এসে সেই প্রেম আস্বাদন করেছিলেন।

(হরেকৃষ্ণ)

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীজগন্নাথ
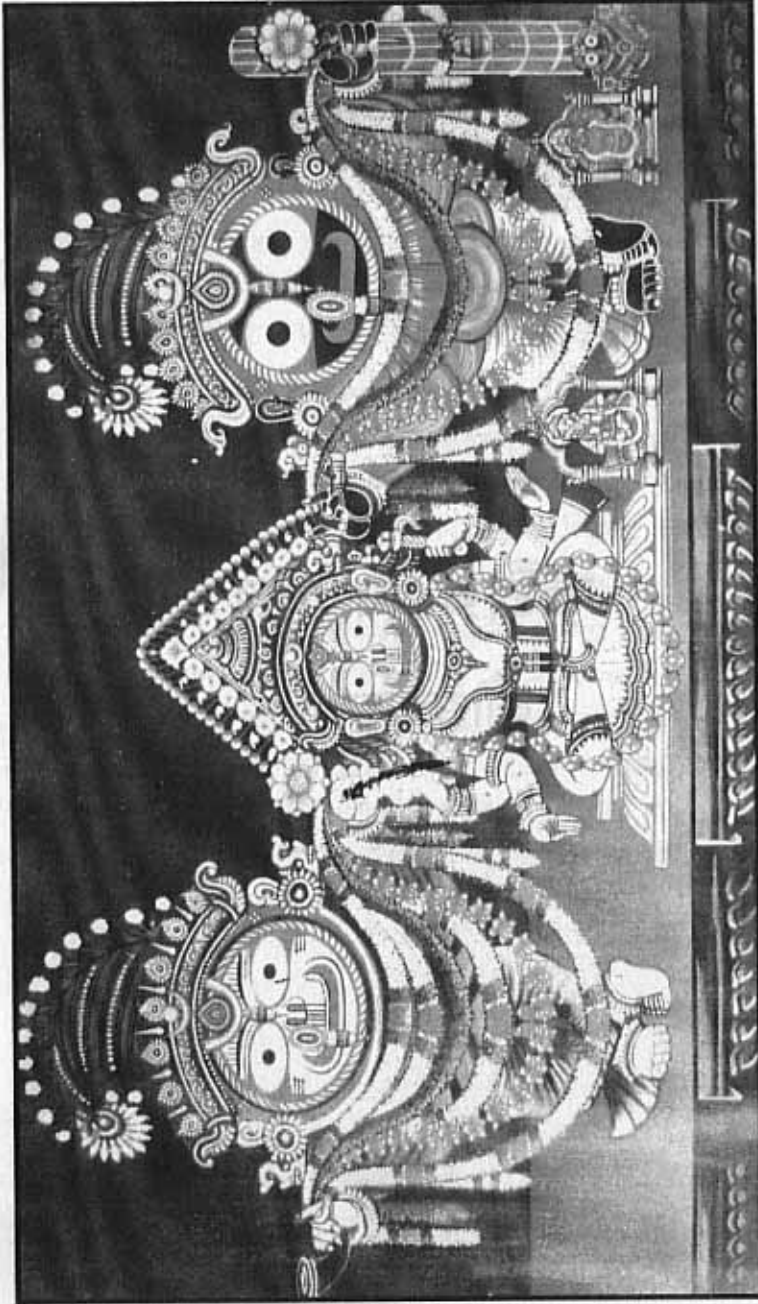
নীলাচল পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা মহারানী

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রী নীলমাধব

শ্রীজগন্নাথদেবের প্রকট সম্বন্ধে কত কিংবদন্তী ও কত শাস্ত্রীয় উক্তি—এই উভয় প্রকার বিবরণী লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তবে ভগবান্ ভক্তের বাঞ্ছা পূরণের জন্য উক্ত রূপ ধারণ করে শ্রীক্ষেত্রে বিরাজমান করছেন। শ্রীনারদমুনির প্রার্থনানুসারে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ এই কলিযুগে দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ রূপে শ্রীক্ষেত্রে পূজিত হচ্ছেন। শ্রীব্রহ্মার প্রথম পরার্ধে শ্রীচতুর্ব্যূহ ভগবান্ শ্রীনীলমাধব মূর্তি রূপে শঙ্খক্ষেত্র নীলাচলে পতিত জনকে কৃপা বিতরণ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দ্বিতীয় পরার্ধে মনুসন্ধি এক যুগ পরে সত্যযুগ আরম্ভ হয়। সেই সময় শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন নামে একজন সূর্যবংশীয় পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা মালবদেশে অন্তর্ভূক্ত অবন্তী নগরে রাজত্ব করতেন। তিনি ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন। ভগবান্ দ্বারা প্রেরিত একজন বৈষ্ণব সেই সময় রাজসভায় উপস্থিত হয়ে কথা প্রসঙ্গক্রমে শ্রীনীলমাধবের কথা জ্ঞাপন করলেন। এ সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে রাজা বিভিন্ন দিকে ব্রাহ্মণদেরকে শ্রীনীলমাধবের অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করলেন। সবাই বিফল মনোরথ হয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন, কিন্তু কেবল রাজপুরোহিত শ্রীবিদ্যাপতি বহুস্থান ভ্রমণ করতে করতে অবশেষে এক শবর পল্লীতে এসে উপস্থিত হলেন।

শবর পল্লীতে উপনীত হয়ে তিনি বিশ্বাবসু নামে এক শবরের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। গৃহস্বামীর ললিতা নাম্নী এক কন্যা ছিল। কিছু সময় পর গৃহস্বামী শবর গৃহেতে প্রত্যাবর্তন করে সেই ব্রাহ্মণ অতিথিকে সেবা করার জন্য কন্যাকে আদেশ করলেন। তারপর সেখানে অবস্থানকালে শবরের বিশেষ অনুরোধক্রমে তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বিদ্যাপতি প্রতিদিন লক্ষ্য করতেন, ভক্ত শবর প্রত্যহ রাত্রে বাইরে কোথায় যান এবং তারপর দিনের বেলায় মধ্যাহ্ন সময়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। যখন তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন তখন সেই সময় শবরের শরীরে কর্পূর কস্তুরী, চন্দনাদির গন্ধে গৃহটি সুবাসিত হয়ে ওঠে। বিদ্যাপতি তাঁর পত্নী ললিতাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতা প্রতিরাত্রে বাইরে কোথায় যান, কিন্তু ললিতা

প্রথমে ইতস্তত করে নীরব রইল, কারণ তার পিতা শ্রীনীলমাধব সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলতে নিষেধ করেছিলেন। তখন বিদ্যাপতি বললেন,— "তুমি যদি তোমার পিতার আরাধ্য সম্বন্ধে কিছু না বল, তাহলে আমি আত্মহত্যা করব।" ললিতা বিধবা হয়ে যাওয়ার ভয়ে তার পিতার আরাধ্য শ্রীনীলমাধব সম্বন্ধে সব তথ্য স্বামীকে বলল।

শ্রীনীলমাধবের অনুসন্ধানের জন্য শ্রীবিদ্যাপতির আনন্দের সীমা রইল না। পিতার আদেশ লঙ্ঘন করে ললিতা পতিকে শ্রীনীলমাধবের কথা জানালেন। শ্রীবিদ্যাপতি প্রভু শ্রীনীলমাধবের দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। অবশেষে কন্যার বিশেষ প্রার্থনানুসারে বিশ্বাবসু বিদ্যাপতির চোখ বেঁধে তাঁকে শ্রীনীলমাধবের দর্শনের জন্য নিয়ে গেলেন। বিশ্বাবসুর কন্যা ললিতা স্বামীর বস্ত্রাঞ্চলে কিছু সর্ষে বেঁধে দিয়েছিল। বিদ্যাপতি পথের মধ্যে সেগুলি নিক্ষেপ করতে করতে চললেন। বিদ্যাপতি যখন শ্রীনীলমাধবের নিকটে উপস্থিত হলেন, তখন বিশ্বাবসু বিদ্যাপতির চোখের বন্ধন খুলে দিলেন। বিদ্যাপতি শ্রীনীলমাধবের অপূর্ব শ্রীমূর্তি দর্শন করে আনন্দে নৃত্য ও স্তব করতে লাগলেন। বিশ্বাবসু বিদ্যাপতিকে শ্রীনীলমাধবের নিকটে রেখে কন্দমূল ও বনফুল আদি পূজার উপকরণ আহরণার্থে অন্যত্র গমন করলেন। ইত্যবসরে ব্রাহ্মণ দেখলেন একটি কাক নিকটস্থ একটি কুণ্ডে পতিত হওয়া মাত্রেই প্রাণত্যাগ করল এবং তারপর চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করে (সাযুজ্যমুক্তি) বৈকুণ্ঠ লোকে গমন করল। তা দেখে বিদ্যাপতি সেই বৃক্ষে আরোহণ করে কুণ্ডেতে পতিত হয়ে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার জন্য চেষ্টা করলেন। সেই সময় আকাশবাণী হ'ল—"হে ব্রাহ্মণ! তুমি যেহেতু শ্রীনীলমাধবকে দর্শন করেছ, তাই তা সর্বপ্রথমে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে জানাও।" প্রতিদিনের মতো শবর বনফুল ও কন্দমূল নিবেদন করে শ্রীনীলমাধবের পূজা আরম্ভ করলেন। তখন শ্রীনীলমাধব বিশ্বাবসুকে বললেন, "আমি এতদিন তোমার প্রদত্ত বনফুল ও বনফল গ্রহণ করেছি, বর্তমান আমার ভক্ত শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ প্রদত্ত রাজসেবা গ্রহণের অভিলাষ হয়েছে।

শ্রীনীলমাধবের পূজা কার্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় শবর নিজের জামাতা বিদ্যাপতিকে গৃহেতে আবদ্ধ করে রাখলেন। ললিতার বার বার প্রার্থনায় বিশ্বাবসু ব্রাহ্মণকে মুক্ত করে দিলেন। তারপর বিদ্যাপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজার নিকটে উপস্থিত হয়ে শ্রীনীলমাধবের কথা জ্ঞাপন করলেন। রাজা মহানন্দে বহুলোককে সঙ্গে নিয়ে শ্রীনীলমাধবকে আনার জন্য অভিযান শুরু করলেন। বিদ্যাপতির নিক্ষিপ্ত সর্ষে

থেকে উৎপন্ন গাছগুলি তাঁদের পথ প্রদর্শক হলো। তারপর শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সৈন্যসামন্ত সহ সেই স্থানে উপস্থিত হলেন, কিন্তু শ্রীনীলমাধবকে দেখতে না পেয়ে সৈন্যসামন্ত দ্বারা শবরপল্লী অবরোধ করলেন। উভয়ের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হল, শেষে আকাশবাণী হল - "হে রাজা! এ যুদ্ধ বন্ধ কর। শবরকে ছেড়ে দাও। নীলাদ্রি পর্বতের উপর একটি মন্দির নির্মাণ কর। সেখানে দারুব্রহ্মরূপে আমার দর্শন পাবে। কিন্তু নীলমাধবরূপে আর আমাকে দর্শন পাবে না।" তারপর শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীমন্দির নির্মাণার্থে 'বউলমালা' নামক স্থান থেকে পাথর এনে শঙ্খনাভিমণ্ডলে একটি মন্দির নির্মাণ করলেন এবং 'রামকৃষ্ণপুর' নামক একটি গ্রাম স্থাপন করলেন। শ্রীমন্দিরটি মাটির ভিতর ৬০ হাত এবং মাটির উপর ১২০ হাত উঁচু করা হল। মন্দিরের উপর একটি কলস (কলসী) এবং তার উপর একটি চক্র স্থাপিত হল এবং মন্দিরটিকে সুবর্ণে মণ্ডিত করা হলো।

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীব্রহ্মার দ্বারা শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করবার অভিলাষ করে ব্রহ্মলোকে গমন করলেন এবং ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হয়ে ব্রহ্মার অপেক্ষায় বহুকাল অতিবাহিত হওয়ার ফলে ইতিমধ্যে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন নির্মিত মন্দির সমুদ্রের বালুকা দ্বারা আবৃত হয়ে গেল। সেই সময় সুরদেব এবং তারপর গালমাধব প্রভৃতি রাজা সেখানে রাজত্ব করেছিলেন, গালমাধব বালুকার অভ্যন্তর হতে এই মন্দির উদ্ধার করলেন। তারপর শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার কাছ থেকে নিজের রাজ্যেতে প্রত্যাবর্তন করে উক্ত মন্দির তাঁর বলে দাবী করলেন। গালমাধবও এ মন্দির নিজকৃত বলে দাবী করলেন, কিন্তু মন্দিরের নিকটবর্তী কল্পবটস্থিত ভূষণ্ড কাক যিনি যুগ যুগান্তর ধরে শ্রীরাম নাম কীর্তন করে সেখানে অবস্থান করে সমস্ত ঘটনা অবলোকন করেছিলেন তিনি বললেন—এ মন্দির শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের, তাঁর অনুপস্থিতিতে তা বালুকা দ্বারা আবৃত হয়ে গিয়েছিল। গালমাধব তা উদ্ধার করেছেন। শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা শ্রীব্রহ্মাকে এই পরম মুক্তিদায়ক ক্ষেত্র ও শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রার্থনা করলেন।

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা শ্রীনীলমাধবকে দর্শন না পেয়ে অনশন ব্রত অবলম্বন করে প্রাণ ত্যাগের সংকল্প নিয়ে কুশ শয্যায় শয়ন করলেন। তখন শ্রীজগন্নাথ ঠিক্ তেমনি স্বপ্নেতে তাঁকে বনললেন, "তুমি চিন্তা কর না, সমুদ্রের 'বাঙ্কী মোহনা' নামক স্থানে দারুব্রহ্ম রূপে ভাসতে ভাসতে এসে আমি উপস্থিত হব।" রাজা সৈন্যসামন্ত সহ সেই নির্দিষ্ট দিনে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মাঙ্কিত শ্রীদারুব্রহ্ম দর্শন করলেন। রাজা বহু বলবান্ হস্তী প্রভৃতি নিযুক্ত করেও

সেই দারু উত্তোলন করতে পারলেন না। তখন শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে স্বপ্নেতে জানালেন "আমার পূর্বসেবক বিশ্বাবসুকে এখানে নিয়ে এস, আর একটি সুবর্ণ রথ দারুব্রহ্মের সম্মুখে স্থাপন কর।" রাজা সেই স্বপ্নাদেশানুসারে কার্য শুরু করলেন। বিশ্বাবসু এসে দারুব্রহ্মের এক দিকে ও বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ অপর দিকে ধরলেন। তখন চতুর্দিকে সমস্ত ভক্ত হরিকীর্তন করতে লাগলেন। রাজা শ্রীদারুব্রহ্মের শ্রীচরণ ধারণ করে রথে আরোহণের জন্য প্রার্থনা করলেন। শ্রীদারুব্রহ্মকে রথে আরোহণ করিয়ে রাজা তাঁকে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গেলেন। তকন ব্রহ্মা যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। শ্রীনৃসিংহদেব ভাবী বেদীতে অবস্থান করলেন, যে স্থানেতে বর্তমান মন্দির আছে সে স্থানেতে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মুক্তিমণ্ডপের সংলগ্ন পশ্চিম দিকে যে নৃসিংহদেব বিরাজমান আছেন তিনি হচ্ছেন আদি নৃসিংহদেব।

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীদারুব্রহ্মকে শ্রীমূর্তিরূপে প্রকট করার জন্য বহু দক্ষ শিল্পীকে আহ্বান করলেন, কিন্তু কেউ দারুব্রহ্মকে স্পর্শ করতে পারলেন না। তাদের যন্ত্রপাতি সব খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়ে গেল। অবশেষে ভগবান্ স্বয়ং অনন্ত মহারাণা নামে আত্মপরিচয় দিয়ে একজন বৃদ্ধ শিল্পীরূপে ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়ে একুশ দিনের মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করে শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত করাবেন—এই প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং অন্য যে সমস্ত কারিগর রাজার আহ্বানে এসেছিলেন, তারা সেই বৃদ্ধ সূত্রধরের উপদেশানুসারে রাজা তাদের দ্বারা তিনটি রথ নির্মাণ করলেন। সেই বৃদ্ধ কারিগর দারুব্রহ্মকে শ্রীমন্দিরের ভিতর রেখে দ্বাররুদ্ধ করে একাকী অবস্থান করতে লাগলেন এবং একুশ দিন পূর্বে কখনই দ্বার উন্মোচন করবেন না—রাজাকে সেইভাবে প্রতিজ্ঞা করালেন। কিন্তু দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পর কারিগরের যন্ত্রপাতির শব্দ শুনতে না পেরে রাজা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। মন্ত্রীর বার বার নিষেধ সত্ত্বেও রাজা রাণীর পরামর্শানুসারে বলপূর্বক স্বহস্তে শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মোলন করলেন। ভিতরে প্রবেশ করে তিনি আর কারিগরকে সেখানে দেখতে পেলেন না। কেবল তিনটি দারুব্রহ্ম প্রকটিত হয়ে রয়েছেন। নিকটে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, শ্রীমূর্তির শ্রীহস্তের অঙ্গুলি-সমূহ ও শ্রীপাদপদ্ম প্রকাশিত হয়নি। বিচক্ষণ মন্ত্রী তখন রাজাকে জানালেন যে, সেই বৃদ্ধ কারিগর আর কেউ নন স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ।

রাজা নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এক সপ্তাহের পূর্বে শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মোলন করেছিলেন। তাই রাজা নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী জ্ঞানে প্রাণত্যাগ করবার সংকল্প নিয়ে কুশ শয্যায় শয়ন করলেন। অর্ধরাত্রে শ্রীজগন্নাথ রাজাকে স্বপ্নেতে দেখা দিয়ে বললেন,— "আমি এই রূপে দারুব্রহ্ম আকারে শ্রীপুরুষোত্তম নামক শ্রীনীলাচলে

নিত্য অধিষ্ঠিত আছি। এই প্রপঞ্চে আমি আমার শ্রীধাম সহ চব্বিশ অর্চ্চাবতার রূপে অবতীর্ণ হই। আমি প্রাকৃত হস্তপদ আদি রহিত হয়ে অপ্রাকৃত হস্তপদ আদি দ্বারা ভক্তের প্রদত্ত সেবা উপকরণ গ্রহণ করি এবং ভূ-মঙ্গলার্থে বিচরণ করি। আমি লীলা মাধুরী প্রকট করার জন্য এই রূপে প্রকাশিত হয়েছি। আমার মাধুর্য রসের ভক্তরা আমাকে শ্রীশ্যামসুন্দর মুরলীবদন রূপে দর্শন করেন। আমার ঐশ্বর্য সেবায় যদি তোমার অভিলাষ হয়, তাহলে তুমি স্বর্ণ অথবা রৌপ্য নির্মিত হস্তপদাদি দ্বারা আমাকে সময় সময় ভূষিত করতে পার, কিন্তু জেনে রাখো আমার শ্রীঅঙ্গ সমস্ত ভূষণের ভূষণ।"

শ্রীজগন্নাথদেব মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও ভক্তির প্রভাবে স্বায়ম্ভুব মনুর দ্বিতীয় উপরার্ধে আবির্ভূত হয়ে বেদপতি ব্রহ্মার দ্বারা শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। দ্বিতীয় মনু স্বারোচিজের প্রথম সত্যযুগে শ্রীজগন্নাথের কাষ্ঠ বপু ধারণ হয়েছিল। কাষ্ঠ বপু ধারণ ও শ্রীমন্দির নির্মাণ হতে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা আর রত্নসিংহাসনে বিজয় সময়ের মধ্যে প্রায় ১৫ কোটি ৩৪ লক্ষ মানব বর্ষ (সৌরবর্ষ) অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর শ্রীজগন্নাথ ঈষৎ হাস্য করে বললেন,—হে রাজা! যে-ই বিশ্বাবসু আমাকে নীলমাধব রূপে পূজা করেছিল তার বংশধরেরা যুগে যুগে আমার দক্ষিণ সেবক নামে পরিচিত হয়ে সেবা করবে। বিদ্যাপতির ব্রাহ্মণ পত্নীর গর্ভজাত বংশধরেরা আমার অর্চক হবে এবং বিদ্যাপতির শবরী-গর্ভজাত সন্তানেরা আমার ভোগ রন্ধন কার্য করবে। তারা সুয়ার (সপকার) নামে খ্যাত হবে। শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীজগন্নাথ দেবকে বললেন, আপনার কাছে আমার প্রার্থনা "প্রত্যহ এক প্রহর অর্থাৎ তিন ঘন্টা আপনার শ্রীমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ থাকবে, আর জগৎবাসী সকলের দর্শনের জন্য অবশিষ্ট সময় আপনার শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। সারাদিন আপনার ভোজন চলতে থাকবে, কখনই আপনার হস্ত কমল শুষ্ক হবে না। শ্রীজগন্নাথ 'তথাস্তু' বলে সম্মতি দিলেন এবং বললেন, এখন তুমি তোমার নিজের জন্য কিছু বর প্রার্থনা কর। তখন রাজা বললেন, "আপনি আমাকে এই বর দিন যাতে কোন ব্যক্তি আপনার শ্রীমন্দির নিজের সম্পত্তি বলে দাবী করতে না পারে, তাই আমি নির্বংশ হতে চাই।" শ্রী জগন্নাথ 'তথাস্তু' বলে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হলেন। এইভাবে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রা মহারাণী নীলাচলে নিত্য অবস্থান করছেন।

(হরে কৃষ্ণ)

ব্রজেন্দ্রনন্দনই স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ

শ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রায় শ্রীজগন্নাথ দেবকে যে ভাবে দর্শন করতে হয় তা শ্রীমন্ মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন। একজন শুদ্ধভক্ত কেমন করে ভক্তিভাবে ভাবিত হয়ে শ্রীজগন্নাথ দেবকে স্তুতি করেন, তাঁর গুণগান করেন, তা শ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন। রথের উপর শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রাকে দর্শন করে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বহু স্তুতি করলেন। শ্রীজগন্নাথ যেহেতু ভাই ও বোনের সঙ্গে ছিলেন, সেহেতু শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁকে কেবল বৃন্দাবনস্থিত কৃষ্ণ স্বরূপে দর্শন করেননি, গোপীভাবে ভাবিত হয়ে শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথকে তাঁর মৌলিক রূপ যা শ্রীবৃন্দাবনস্থিত ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম-রূপে দর্শন করার জন্য আকাঙ্খা করতেন। তা ঠিক্ শ্রীমন্ উদ্ধবের সম্মুখে কৃষ্ণবিরহে শ্রীমতী রাধারাণীর ভ্রমরের সঙ্গে অব্যবস্থিত চিত্তে বার্তালাপের মতো ছিল। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের ভাবে উন্মত্ত এবং দিনরাত তিনি অস্থির মতিতে থাকতেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বরূপদামোদরকে গান করার জন্য আদেশ দিলেন। স্বরূপ দামোদর প্রভুর মনের ভাব জেনে নিম্নলিখিতভাবে গান করতে লাগলেন—

"সেইত পরাণ নাথ পাইনু।
যাহা লাগি' মদন দহনে ঝুরি'গেনু।।" —(চৈ. চ. ম. ১/৫৫)

অর্থাৎ—"যাঁর অনুপস্থিতিতে আমি কাম বাণে দগ্ধীভূত হয়ে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিলাম। সেই প্রাণনাথকে এখন আমি পেয়েছি।" এই সঙ্গীতটি পবিত্র কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমতী রাধারাণীর মিলনের সূচনা প্রদান করছে। এক সময় সূর্যপরাগের সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বড় ভাই ও ছোট বোনের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে যান এবং ব্রজপুর হতে গোপগোপীরাও সব পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে এসেছিলেন, কারণ সূর্যপরাগের সময় পুণ্যতীর্থ ভূমিতে দান, হোম, পরিক্রমা করাই হচ্ছে শাস্ত্রের নির্দেশ। সেই কুরুক্ষেত্রে শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই সময় শ্রীমতী রাধারাণী বৃন্দাবনের লীলা স্মরণ করে উপরোক্ত পদটি গান করেছিলেন। এখন আমি আমার প্রাণনাথকে পেয়েছি, তাঁর বিরহে আমি কন্দর্পবাণে দগ্ধীভূত হয়ে

বিরহব্যথা অনুভব করে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিলাম, এখন আমি আমার জীবন ফিরে পেয়েছি।

শ্রীস্বরূপ দামোদর খুব উচ্চৈঃস্বরে উক্ত পদটি গান করছিলেন। সেই সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবার দিব্য আনন্দে বিভাবিত হয়ে তালে তালে নাচতে লাগলেন। ধীরে ধীরে শ্রীজগন্নাথের রথ এগিয়ে চল্ল, আর সেই সাথে সাথে শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি রথাগ্রে নৃত্য করতে করতে চল্লেন। শ্রীজগন্নাথের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সমস্ত ভক্তরা নৃত্য ও কীর্তন করছিলেন। সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কীর্তনীয়াদের সঙ্গে শোভাযাত্রার পিছনে চলে গেলেন।

শ্রীজগন্নাথের উপর নয়ন এবং হৃদয় নিবিষ্ট করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজের হাতের ভঙ্গি দ্বারা সেই গীতের বিষয় বস্তু প্রদর্শন করতে লাগলেন। শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভু নাটকীয় ভঙ্গীতে নৃত্যগীত পরিবেশন করার সময় মাঝে মাঝে শোভাযাত্রার পিছনে থেকে যাচ্ছিলেন, তখন শ্রীজগন্নাথদেব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন। আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন আবার সামনে চলে আসছিলেন তখন শ্রীজগন্নাথদেবের রথ ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল। এইভাবে আগে কে যাবেন, তারজন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীজগন্নাথদেবের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা চলল, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এতই শক্তিশালী ছিলেন যে, তিনি শ্রীজগন্নাথদেবকে তাঁর রথের উপর অধিষ্ঠিত রেখেছিলেন।

বৃন্দাবনে ব্রজগোপিকাদের সঙ্গ ত্যাগ করে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দ্বারকা লীলাবিলাস করতে গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলদেব ও সুভদ্রা তথা দ্বারকার অন্যান্য অধিবাসীদের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে যান, তখন ব্রজবাসীদের সঙ্গে পুনরায় তাঁর সাক্ষাৎ হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন 'রাধাভাবোদ্যুতি সুবলিত', অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে আস্বাদন করার জন্য শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব এবং অঙ্গকান্তি অঙ্গীকার করেছেন। শ্রীজগন্নাথদেব হচ্ছেন স্বয়ং কৃষ্ণ, আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে গুণ্ডিচা মন্দিরে নিয়ে যাওয়া এবং শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাওয়ার লীলার সঙ্গে তুলনীয়। শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথপুরী—দ্বারকাপুরী রূপে বিবেচনা করা হয়েছে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরম ঐশ্বর্য উপভোগ করেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে নীলাচল (দ্বারকাপুরী) হতে কৃষ্ণগতপ্রাণ গ্রামবাসিদের দ্বারা পরিপূর্ণ একটি সাধারণ

পল্লী বৃন্দাবনে (সুন্দরাচলে) নিয়ে যাচ্ছিলেন। বৃন্দাবন যেমন মাধুর্য লীলার পীঠস্থান, তেমনি শ্রীক্ষেত্র হচ্ছে ঐশ্বর্য লীলার পীঠস্থান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে রথের পিছনে ফেলে চলে যাওয়া সূচিত করছিল যে, শ্রীজগন্নাথদেব (যিনি হচ্ছেন স্বয়ং কৃষ্ণ) ব্রজবাসীদের ভুলে গেছেন। কৃষ্ণ যদিও ব্রজবাসীদের এড়িয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি তাঁদের ভুলে যেতে পারেন নি।

এইভাবে অতুল ঐশ্বর্য-মণ্ডিত রথযাত্রায় তিনি বৃন্দাবন ধামে ফিরে যাচ্ছিলেন। শ্রীমতী রাধারাণীর ভূমিকায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরীক্ষা করছিলেন, কৃষ্ণ এখনও ব্রজবাসীদের মনে রেখেছেন কি না! শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন রথের পিছনে চলে যাচ্ছিলেন, তখন শ্রীজগন্নাথদেব (যিনি হচ্ছেন স্বয়ং কৃষ্ণ) শ্রীমতী রাধারাণীর মনোভাব বুঝতে পারছিলেন ; তাই শ্রীজগন্নাথদেব, নৃত্যরত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে পড়ে শ্রীমতী রাধারাণীকে জানিয়ে দিচ্ছিলেন যে, তিনি তাদের ভুলে যান নি। এইভাবে শ্রীজগন্নাথদেব তাদের রথের সামনে ফিরে আসার প্রতীক্ষা করছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেম ব্যতীত তিনি তৃপ্ত হতে পারেন না। এইভাবে শ্রীজগন্নাথদেব যখন দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন, তখন শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে বিভাবিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সামনে আসছিলেন। তখন শ্রীজগন্নাথদেব আবার ধীরে ধীরে চলতে শুরু করছিলেন। এটি ছিল শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমের প্রতিযোগিতা। শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রীতিভাব এবং শ্রীমতী রাধারাণীর প্রতি শ্রীজগন্নাথদেবের প্রীতিভাবের মধ্যে প্রতিযোগিতা চল্‌ছিল। এই প্রতিযোগিতায় রাধারাণীর ভাবে বিভাবিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হয়েছিল।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন নাচছিলেন তখন তাঁর ভাবান্তর হচ্ছিল এবং তিনি তখন দু'হাত তুলে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করতে লাগলেন।

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবা-রোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।।

"কৌমার অবস্থায় যিনি রেবা নদীর তীরে আমার চিত্ত হরণ করেছিলেন, তিনি এখন আমর পতি হয়েছেন। এখন সেই চৈত্রমাসের জ্যোৎস্নালোকিত রজনীতে

সেই প্রস্ফুটিত মালতী পুষ্পের সৌরভও রয়েছে,— আর সেই মধুর সমীরণ কদম্ব কানন থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। সুরতব্যাপার লীলাকার্যে আমি সেই নায়িকাও উপস্থিত; তথাপি আমার চিত্ত এ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়ে রেবা নদীর তীরে বেতসী তরুতলের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হচ্ছে।" এই শ্লোকটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বার বার আবৃত্তি করছিলেন। কিন্তু শ্রীস্বরূপ দামোদর ছাড়া কেউই তা'র অর্থ বুঝতে পারছিলেন না। পূর্বে যেমন ব্রজগোপিকারা কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেয়ে অতি আনন্দিতা হয়েছিলেন, তেমনই শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গোপীভাবের উদয় হ'ল। গোপীভাবাবিষ্ট হওয়ায় তিনি স্বরূপ দামোদরকে দিয়ে একটি ধুয়া গাইয়েছিলেন। অবশেষে শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে আবিষ্ট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে বললেন, "তুমি সেই কৃষ্ণ, আর আমি সেই রাধা। আগের মতো আবার আমাদের মিলন হয়েছে। কিন্তু তবুও আমার মন বৃন্দাবনের জন্য আকুল হয়ে উঠেছে। তুমি দয়া করে বৃন্দাবনে তোমার শ্রীপাদপদ্ম যুগল প্রকাশিত কর অর্থাৎ তুমি আবার বৃন্দাবনে চলো। এই কুরুক্ষেত্রে এত লোকের ভিড়, এত হাতী, এত ঘোড়া, এবং রথের এত শব্দ। কিন্তু কুঞ্জলতা পরিবেষ্টিত বৃন্দাবনে ফুলের বন, আর সেই বন ভ্রমরের গুঞ্জন আর পাখীর কাকলীতে পরিপূর্ণ। এই কুরুক্ষেত্রে তোমার পরণে রাজবেশ, আর তোমার সঙ্গে রয়েছে সমস্ত ক্ষত্রীয় বীর যোদ্ধারা ; কিন্তু বৃন্দাবনে তোমার গোপবেশ, আর তোমার সঙ্গী কেবল মুরলী। ব্রজে তোমার সঙ্গে যে সুখ আমি আস্বাদন করি, সে সুখ-সমুদ্রের এক কণাও এখানে নেই। তাই তোমাকে আমি অনুরোধ করি —তুমি আমাকে নিয়ে আবার বৃন্দাবনে লীলাবিলাস করো, তাহলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। সেইভাবে আবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আরো অনেক শ্লোক আবৃত্তি করলেন, কিন্তু সেই সমস্ত শ্লোকের অর্থ কেউ-ই বুঝতে পারছিল না। তারপর অন্য একটি শ্লোক—

আহুশ্চ তে নলিন-নাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ।।

—(ভা. ১০/৮২/৪৯)

গোপিকারা বললেন, "হে প্রিয়তম কৃষ্ণ! আপনার নাভিদেশ কমল পুষ্পের মতো। আপনার পাদপদ্ম সংসার কূপে পতিত জীবদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। বিশিষ্ট

মুনি ঋষি তথা অষ্টাঙ্গযোগী এবং মহান জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতেরা আপনার পাদপদ্ম সর্বদাই ধ্যান করে থাকেন। যদিও আমরা গৃহকর্মে লিপ্ত সাধারণ নারী, তথাপি আমরা আপনার পাদপদ্ম সর্বদাই আমাদের হৃদয়ে ধারণ করতে ইচ্ছা করি।''

অন্যের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।।
—(চৈ. চ. ম. ১৩/১৩৭)

শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে বিভাবিত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন— ''অন্য লোকের মন এবং হৃদয় হচ্ছে এক অর্থাৎ অন্য লোকের মনই হৃদয় ; কিন্তু আমার মন বৃন্দাবন থেকে পৃথক নয়। আমার মনই বৃন্দাবন অর্থাৎ আমার মন ও বৃন্দাবনকে 'এক' বলেই আমি জানি। বৃন্দাবনই তোমার প্রিয় স্থান। তাই কৃপা করে আমার মন রূপ বৃন্দাবনে তোমার পাদপদ্ম স্থাপন করবে কি ? যদি করবে তাহলে আমি জানব যে আমার প্রতি তোমার পূর্ণ কৃপা আছে।'' হে আমার প্রিয়তম প্রভু, ''কৃপা করে আমার সত্য নিবেদন শোন। বৃন্দাবন আমার গৃহ, এবং সেখানে আমি তোমার সঙ্গ-সুখ কামনা করি। কিন্তু তা (তোমার সঙ্গ-সুখ) যদি না পাই, তাহলে আমার পক্ষে জীবন ধারন করা বড়ই কষ্টকর হবে।''

হে আমার প্রিয়তম কৃষ্ণ! ''তুমি যখন মথুরায় ছিলে, তখন আমাকে জ্ঞানযোগ তথা ধ্যানযোগ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উদ্ধবকে পাঠিয়েছিলে। এখন তুমিও সেই একই উপদেশ দিচ্ছ। কিন্তু আমার মন তা কিছুতেই মেনে নিতে পাচ্ছে না। আমার হৃদয়—প্রেমময়, তাতে জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগের স্থান নেই। তা জেনেও আমাকে তোমার এরকম উপদেশ দেওয়া উচিত নয়।''

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতে লাগলেন,— আমি তোমার থেকে মন উঠিয়ে নিয়ে বিষয়ে লাগাতে চাইলেও তা করতে পারি না। অতএব তোমার প্রতি এইরকম অনুরাগ যখন আমার স্বভাব, তখন আমাকে ধ্যান শিক্ষা দেওয়া—কেবল লোক হাস্যকর মাত্র। তাই আমাকে এই প্রকার শিক্ষা দেওয়া তোমার পক্ষে আদৌ উচিত হয়নি। গোপীরা যোগেশ্বর নয় যে, তারা তোমার পাদপদ্মের ধ্যান করে এবং তথাকথিত যোগীদের অনুকরণ করে আনন্দ লাভ করবে। তাই গোপীদের ধ্যানযোগ

শিক্ষা দেওয়া এক প্রকার কপটতা মাত্র। যখন তাদেরকে যোগাভ্যাস করতে বলা হয় তখন তারা আদৌ সন্তুষ্ট নয়, বরং তাতে তারা তোমার ওপর আরও রোষ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতে লাগলেন,—''তোমার বিরহ সমুদ্রে পতিতা গোপীদের, তোমাকে সেবা করার ঐকান্তিক বাসনারূপ তিমিঙ্গিল (সুবৃহৎ মৎস্য বিশেষ) তাদের অবিরত গিলছে। সেই তিমিঙ্গিলের মুখ থেকে তুমি তাদের উদ্ধার কর। তাদের কোন শরীর ধারনা নেই বা ভৌতিক জীবন ধারা নেই। তারা কেন মুক্তিকাঙ্খী হবে ? যোগী ও জ্ঞানীদের অভিপ্সিত মুক্তি গোপীরা কখনই চায় না, কারণ তারা নিত্যসিদ্ধ তাই সংসারকূপ বলে তাদের কিছুই নেই।''

এটা বড় বিচিত্র কথা যে, তুমি তোমার পিতামাতাকেও ভুলে গেলে? এমনকি যমুনা-পুলিন, গিরি-গোবর্ধন এবং রাসাদিক লীলা প্রদর্শিত কুঞ্জবনকেও ভুলে গেলে? হে কৃষ্ণ! তুমি সমস্ত সদ্‌গুণে পরিপূর্ণ। তুমি সুশীল, উদার তথা কৃপাময়। তোমাতে কোন দোষ ত্রুটি নেই তা আমি জানি। এটি কেবল আমার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি আমার নিজের দুঃখের কথা ভাবি না, কিন্তু তোমার বিহনে ব্রজেশ্বরী মা যশোদার বিষর্ণ বদন এবং ব্রজজনদের হৃদয় বিদীর্ণ হওয়া দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে, তুমি কেন তাঁদেরকে এমন দুঃখ দিচ্ছ। পরন্তু তুমি ব্রজবাসীদের বিচ্ছেদের দ্বারা কখনও মৃতবৎ কর, আবার কখনও সঙ্গদানে জীবিত কর, কিন্তু কেন যে দুঃখ সহ্য করার জন্য জীবিত রাখ, তা বুঝতে পারি না।

ব্রজবাসীরা তোমাকে ব্রজ থেকে পৃথক স্থানে সৈন্য-সামন্ত পরিকরবর্গসহ রাজবেশ দেখতে চায় না। তারা ব্রজভূমি ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারে না, অথচ তোমাকে না দেখেও মৃতবৎ হয়ে পড়ে; অতএব তাদের অবস্থা কি হতে চলেছে জান কি? হে কৃষ্ণ, তুমি ব্রজের জীবন। তুমি ব্রজরাজ নন্দ মহারাজের প্রাণধন। তুমি ব্রজের একমাত্র সম্পদ। তোমার মন কৃপার্দ্র, তুমি এসে ব্রজবাসীদের প্রাণ বাঁচাও, দয়া করে তুমি তোমার শ্রীপাদপদ্ম ব্রজে উদয় করাও। শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণ-বিরহে তাঁর নিজের দুঃখের কথা ব্যক্ত করেন নি। তিনি বৃন্দাবনে অন্য সকলের অবস্থা—মা যশোদা, নন্দমহারাজ, গোপবালক, গোপিকা, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, যমুনা-পুলিন, যমুনার জল প্রভৃতি সকলের কৃষ্ণ-বিরহের কথা বর্ণনা করে শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পার উদয় করাবার চেষ্টা করেছেন। শ্রীমতী রাধারাণীর এই ভাব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুতে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাই তিনি শ্রীজগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে

ফিরে যাবার জন্য আহ্বান করেছিলেন। আর সেটাই হচ্ছে শ্রীজগন্নাথদেবের রথে করে গুণ্ডিচা মন্দিরে গমনের তাৎপর্য।

শ্রীমতী রাধারাণীর বাণী শুনে, তাঁর প্রতি ব্রজবাসীদের গভীর প্রেম স্মরণ করে শ্রীকৃষ্ণের দেহ ও মন ভাবে ব্যাকুলিত হ'ল। ব্রজবাসীদের প্রেমের মহিমা শ্রবণ করে তিনি নিজেকে তাঁদের কাছে 'ঋণী' বলে মনে করে, শ্রীমতী রাধারাণীকে যেভাবে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, তা হ'ল এই যে, "হে প্রাণপ্রিয়ে রাধে, দয়া করে আমার সত্য বচন শুন। তোমাদের সকলের কথা স্মরণ করে আমি দিন রাত রোদন করি। আমার এই দুঃখের কথা কেউ জানে না। সমস্ত ব্রজবাসীরা—আমার মাতা, পিতা, সখাগণ, এরা সকলেই আমার প্রাণসম। তার মধ্যে ব্রজগোপীরা সাক্ষাৎ আমার জীবনস্বরূপ, আর তুমি স্বয়ং আমার জীবনের জীবন।" তোমাদের সকলের প্রেম আমাকে বশীভূত করেছে, আমি কেবল তোমারই অধীন। তাই তুমি আমার নিত্য প্রিয়া, এবং আমার বিরহে তুমি যে এক মুহূর্ত কালও জীবন ধারণ করতে পার না, তা জেনে আমি প্রতিদিন ব্রজে এসে তোমার সঙ্গে ক্রীড়া করে আবার যদুপুরীতে ফিরে যাই। তাই তুমি বৃন্দাবনে সবসময় আমার উপস্থিতি অনুভব কর। যদু বংশীয়দের শত্রু, কংসের সমস্ত দুষ্ট অনুচরদের আমি সংহার করেছি। কেবলমাত্র দুই চার জন এখনও বাকী আছে, তাদের মেরে আমি শীঘ্রই বৃন্দাবনে ফিরে আসব। আমি সেই সমস্ত শত্রুদের কবল থেকে ব্রজবাসীদেরকে সুরক্ষা দিতে চাই। সেইজন্য আমি এই রাজ্যে থাকি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার এই রাজপদের প্রতি আমি সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি যে আমার রাজপদে অধিষ্ঠিত থেকে আমার স্ত্রী-পুত্রদের রক্ষণাবেক্ষণ করি, তা কেবল যাদবদের সন্তুষ্ট করার জন্য।

তোমার প্রেমের গুণ আমাকে সর্বদা বৃন্দাবনে আকর্ষণ করে। তোমার প্রেমের গুণে আকর্ষিত হয়ে আমি দশ-বিশ দিনের মধ্যেই বৃন্দাবনে ফিরে আসব; এবং পুনরায় বৃন্দাবনে এসে, তোমার এবং অন্য সমস্ত ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে, দিন-রাত আমি লীলা-বিলাস করব। শ্রীমতী রাধারাণীকে একথা বলে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ফিরে যাবার জন্য অত্যন্ত সতৃষ্ণ হয়ে শ্রীমতী রাধারাণীকে একটি শ্লোক শোনালেন।

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ।।

—(ভ. ১০/৮২/৪২)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—"ভক্তিই আমাকে লাভ করবার একমাত্র উপায়। হে আমার প্রিয় ব্রজবালাগণ, আমার প্রতি তোমাদের যে শুদ্ধ প্রীতি, সেটাই তোমাদের কাছে ফিরে যাওয়া আমার একমাত্র কারণ।"

এইভাবে শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভু রথযাত্রায় শ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করেছিলেন এবং গোপীভাবাবিষ্ট চিত্তে শ্রীজগন্নাথদেব (শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ) নীলাচলরূপ কুরুক্ষেত্র হতে সুন্দরাচলরূপ বৃন্দাবনে রথ টেনে টেনে আনছিলেন। তাই শ্রীজগন্নাথদেবকে রথে এইভাবে দর্শন করা উচিত, যার ফলে আর পুনর্জন্ম হবে না। শ্রী ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই শ্রীজগন্নাথদেবের মূল স্বরূপ।

(হরেকৃষ্ণ)

শ্রীমহাভাব প্রকাশ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরম প্রেমপূর্ণ ব্রজপুর ত্যাগ করে দ্বারকায় অবস্থান করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্রজবাসীদের জীবন মৃতাবস্থা। প্রাণ থাকার সত্ত্বেও নিষ্প্রাণ অবস্থা। এই বিরহ সাগরে ব্রজবাসীরা ভাসছেন, কিন্তু আনন্দ উৎসবে মুখরিত দ্বারকাপুরীতে এত সুন্দর রাজকীয় পরিপাটির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেও ব্রজবাসীদের কথা ভুলতে পাচ্ছেন না। এমনকি নিদ্রিত অবস্থায় ব্রজজনের কথা বলে প্রলাপ করছেন। বিশেষকরে রাধে রাধে বলে প্রলাপ করছেন। বহুবার এভাবে প্রলাপ করায় দ্বারকার পাটরাণীদের কর্ণগোচর হওয়ায় অষ্ট-পাটরাণী চিন্তায় বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ সুধর্মা সভায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হবার সময় রুক্মিণীদেবী এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, "আমার এখন সভায় যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, তুমি এ সম্বন্ধে রোহিণী মাতাকে জিজ্ঞাসা কর।" তারপর অতি উৎসাহের সহিত রুক্মিণীদেবী অষ্টপাটরাণী সহ একান্তে রোহিণীমাতাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। "হে মাতা! আমরা মন-প্রাণ দিয়ে সর্বদা ষোড়শ-উপচারে তাঁর সেবা করছি, কিন্তু একবারও তিনি আমাদের কথা বলে আনন্দিত হন নি, আর সেই গোপী, সেই রাধা তাঁরা কারা যে, তাঁদের কথা বলে সর্বদা আত্মহারা হচ্ছেন, এমনকি স্বপ্নেও চিন্তা করছেন। রোহিণী মাতা বললেন, তুমি যা জিজ্ঞাসা করছ তা অতি গূঢ় তথা সুন্দর কথা, কিন্তু সেই ব্রজ কথায় এমনই আকর্ষণ আছে যে, তা শ্রীকৃষ্ণের কর্ণগোচর হওয়া মাত্রেই সে এ স্থানে এসে পৌঁছে যাবে। তার উপস্থিতিতে কিভাবে তার ব্রজপুরের কাহিনী বর্ণনা করব ? তাই তোমাদের মধ্যে একজন দ্বারদেশে পাহারা দাও, যাতে কৃষ্ণ-বলরাম এ স্থানে আসতে না পারে। কিন্তু কে দ্বারদেশে পাহারা দেবে ? কোন রাণী এ কাজ করতে রাজী হলেন না। কারণ সবাই ব্রজলীলা কাহিনী শুনতে আগ্রহী ছিলেন। তাই সবাই মিলে সুভদ্রাকে দ্বারদেশে পাহারা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুভদ্রা

তাতে সম্মত হয়ে ব্রজলীলা বর্ণিত সভাগৃহের দ্বারদেশে দুই হস্ত প্রসারণ পূর্বক দ্বার অবরুদ্ধ করে দণ্ডায়মান হলেন। রোহিণী মাতা সহ রাণীরা প্রাসাদের মধ্যে অবস্থান করলেন। রোহিণী মাতা ব্রজলীলা বর্ণনা আরম্ভ করলেন—

রাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জকুটীর।
গোবর্ধন-পর্বত, যামুনতীর।।
কুসুমসরোবর, মানসগঙ্গা।
কলিন্দনন্দিনী বিপুলতরঙ্গা।।
বংশীবট, গোকুল, ধীরসমীর।
বৃন্দাবন-তরুলতিকা-বাণীর।।
খগমৃগকুল, মলয়-বাতাস।
ময়ূর, ভ্রমর, মুরলী, বিলাস।।
বেণু, শৃঙ্গ, পদচিহ্ন, মেখমালা।
বসন্ত, শশাঙ্ক, শঙ্খ, করতালা।।
যুগলবিলাসে অনুকূল জানি।
লীলা-বিলাস-উদ্দীপক মানি।।
এ সব ছোড়ত কঁহি নাহি যাঁউ।
এ সব ছোড়ত পরাণ হারাঁউ।।
চম্পক, বকুল, কদম্ব, তমাল।
মাধবী, মালতী, কুঞ্জবিশাল।।
ভকতিবিনোদ কহে, শুন কান।
তুয়া উদ্দীপক হামারা পরাণ।।

ব্রজপুরের এ সুন্দর পরিবেশ। দ্বারকাপুরীতে ব্রাহ্মণগণের বেদ মন্ত্র দ্বারা দ্বারকাধীশের স্তব, কিন্তু ব্রজপুরে বনিতাগণের মানের ভর্ৎসনা ব্রজরাজ নন্দনের বেদ মন্ত্রের স্তব। রোহিণী মাতা ব্রজপুর আর দ্বারাকার এক তুলনাত্মক বর্ণনা প্রদান করলেন।

এখানকার শোভা রাজপ্রাসাদ, আর ব্রজ কুঞ্জলতায় সুশোভিত। এখানে ভেরী তূরীর ভয়ানক গর্জন, আর গোপে রাখালরাজের মোহন বংশীর স্বর। দ্বারকায় সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাজি, আর ব্রজপুরে যমুনার ধীর সমীরণ। চারিদিকে সমুদ্র পরিবেষ্টিত এই দ্বারকা নগরী, আর ফল ফুল লতাকুঞ্জ, শুক

শারী পরিপূর্ণ গোপপুরী। এখানে দাস-দাসী, আর ব্রজে সখা-সখী। এখানে ঐশ্বর্যময় দ্বারকাপুরী, আর সেখানে মাধুর্যময় ব্রজপুরী। জনকলরবে পরিপূরিত সেই গোপনগরী। এখানে অষ্ট পাটরাণী, আর সেখানে অষ্টসখী। এখানে প্রতিবেশী শত্রুদের রণঝঙ্কার, আর ব্রজে ব্রজরাজ নন্দনের সেবা করার জন্য সখীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দ্বারকাবাসীদের ভাব—'আমরা কৃষ্ণের', আর ব্রজের ভাব—'কৃষ্ণ আমাদের'।

নন্দবাবা পাদুকা আনার জন্য কৃষ্ণকে আদেশ করেন, কিন্তু বসুদেব কৃষ্ণকে অন্তরে প্রণাম জানান। যশোমতী রজ্জু দিয়ে বন্ধন করেন, দেবকী স্নেহে কৃষ্ণকে কোলেতে ধরতে অর্থাৎ ধারণ করতে ভয় করেন। সুদামা সুবলাদি সখারা শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করেন, কিন্তু দ্বারকায় উদ্ধবাদি সখারা প্রভুজ্ঞানে আদেশ বহন করেন। গোপে বিশ্রম্ভ ভাব, কিন্তু এখানে সম্ভ্রম ভাব। ব্রজবাসীদের প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ। রাজা নন্দ থেকে আরম্ভ করে যশোদা গোপ, গোপী, গাভী, বৎসা, পশু, পক্ষী, তরু, তৃণ, লতা, পর্বত সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধানে মগ্ন। সবার হৃদয়ে কৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগ। নন্দরাজ কৃষ্ণকে লালনপালনে বহু তাড়না করেন, দুগ্ধ-পোষ্য বালক, চঞ্চলমতি, ক্ষুধা-পিপাসাতুর, চোর, মিথ্যাচারি, লোভি আদি শুশ্রুজ্ঞানে শাসন করেন। কিন্তু দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণের পূজা। যাঁর পদধূলি ব্রহ্মা, শিব কামনা করে থাকেন, তিনি নন্দবাবর পাদুকা বহন করেন। ভক্ত যেমন ভগবানের সেবার জন্য ব্যাকুল, ঠিক্ তেমনি ভগবান্ ভক্তের সেবা করার জন্য অধীর। রোহিণীমাতা এসব বিষয়ে বর্ণনা করার মধ্যবর্তী সময়ে রাম-কৃষ্ণ দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হয়ে গেছেন।

"মদ্ ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ।"

রোহিণীমাতা আরো বর্ণনা করে বললেন,—একদিন নারদ দ্বারকায় পৌঁছে দেবকী-বসুদেবের নিকটে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে পণের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বন্দীশালায় আবির্ভাবের পর পুত্র শোকাতুর বসুদেব, "যজ্ঞ করে এক লক্ষ দুগ্ধবতী গাভী দান করব", এই পণ করেছিলেন। নারদ মুনি পূর্বের পণের কথা মনে করিয়ে দেওয়া মাত্রেই প্রভাস ক্ষেত্রে এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজনের জন্য স্থির করলেন।

তারপর দেবকী, বসুদেব ও কংস মাতা পদ্মা নারদকে ত্রিপুরে সর্বত্র নিমন্ত্রণের জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু গোপপুরকে নিমন্ত্রণ করলেন না। নারদ

মুনি সর্বত্র বিচরণ করে নিমন্ত্রণ করে সারার পর অবশেষে ব্রজপুরে প্রবেশ করলেন। কুঞ্জলতা, ময়ূর, শুক, যমুনাতীরের মৃদু সমীর এরূপ এক মনোরম পরিবেশ দর্শন করে নারদ আত্মহারা হয়ে গেলেন। সহাস্য বদনে গোপরাজার রাজভবনে প্রবেশ করে নন্দরাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। মুনিবরকে দেখে যশোদা রাণী শ্রদ্ধায় তাঁর পাদপদ্ম পূজা করে কুশল জিজ্ঞাসা করে উত্তম আরামদায়ক আসনে বসিয়ে দধি-দুগ্ধ-পরমান্নের দ্বারা সযত্নে নারদকে সন্তুষ্ট করলেন।

নারদ দ্বারকার সন্দেশ সেখানে কীর্তন করলেন। দ্বারকার নাম শোনার মাত্রই যশোমতী অতিকাতর হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মুনিবর! আমার কানাই নীলমণি কেমন আছে ? নারদ যশোমতীর হৃদয়ের করুণ বেদনা অনুভব করে বললেন, "কানাই! কার কথা তুমি বলছ? তুমি যার জন্য এত কাতর হয়ে ক্রন্দন করছ সে কি তোমার আত্মীয়? এ কথা শ্রবণ করার মাত্রই হৃদয়ের গভীর বেদনা গোপন করে যশোমতী বললেন, সে আমার একমাত্র গলার মালা, আমার নয়নতারা, আমার জীবনের জীবন। নারদ বললেন, তাহলে কানাই কি তোমার পুত্র? সত্যি আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি কি......। ঠিক আছে, সে যদি তোমার পুত্র তবে সেই রাজরাজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আজ দ্বারকাপুরীতে ত্রিভুবনের সাধু-সন্ত দেবতাদের উপস্থিতিতে এক মহান প্রভাস যজ্ঞের অয়োজন করছেন। ত্রিভুবনে সকলকে নিমন্ত্রণ করার জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন, কিন্তু কই তোমাদের কথা তো আমাকে তিনি বলেন নি ?

এ কথা শ্রবণ করে যশোমতীর হৃদয় বিদীর্ণ হলো। অতি দুঃখে অসহ্য বোধ করে ফোঁস ফোঁস করে ক্রন্দন করতে লাগলেন। নন্দরাজাকে যশোমতী বেদনাভরা হৃদয়ে বলে উঠলেন, তুমি জান! আমাদের কানাই প্রভাস যজ্ঞের আয়োজন করছে, সকল মুনি ঋষি দেবতাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছে, কিন্তু আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করেনি। যশোমতীর হৃদয়ের ভাব বুঝতে পেরে নন্দ মহারাজ বললেন, পুত্র কি পিতাকে নিমন্ত্রণ করে? সরল কানাই আমাদের উপস্থিতির অপেক্ষায় বসে থাকবে। তাই আমাদেরকে বহুবিধ দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে সেখানে যথাশীঘ্র উপস্থিত হওয়া উচিত। কানাই আমাদেরকে দেখে খুব খুশী হবে। নন্দরাজার এই প্রবোধন বাণীতে যশোমতী প্রাণ ফিরে পেলেন। নন্দরাজা এ সংবাদ সমগ্র ব্রজে প্রচার করলেন। উপানন্দ-সহ নন্দ-যশোমতী, গোপ-

গোপী, রাধারাণী, দধি-দুগ্ধ-মাখন-সর ইত্যাদি নিয়ে প্রভাস ক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

এদিকে শ্রীনারদ প্রত্যাবর্তন করে কংসের মাতা পদ্মাকে জানালেন যে, তিনি ত্রিভুবনে সকলকে নিমন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু হে মাতা! ত্রিভুবনে সকল স্থান ভ্রমণ করার পর কিন্তু আমি একস্থানে নিমন্ত্রণ করার জন্য গিয়েছিলাম, সেখানকার রাজারাণী দেবতাদের দ্বারা পূজ্য। তাঁদের ব্যবহার আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না। সে-স্থানের নাম আমার মনে নেই, কিন্তু সে-স্থানের নিকটে যমুনা নদী আছে। পদ্মা এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অস্থির হয়ে ক্রোধে কাঁপতে লাগলেন। বলে উঠলেন, "নারদ! তুমি সেস্থানে কেন গিয়েছিলে? সব পণ্ড হয়ে গেলো। আমাদের কৃষ্ণের গ্রহ খারাপ পড়লো। সেটা গোপপুর, নন্দরাজার বাসগৃহ, তার নিষ্ঠুরতা কি তোমার জানা নেই? অবোধ কৃষ্ণকে সে কত প্রহার করেছে। দুই হাতে দড়ি নিয়ে কটিদেশ বন্ধন করেছে। সেই নন্দরাজা এত কৃপণ যে আমার কৃষ্ণকে গোচারণের জন্য পাঠিয়েছিল। তাদেরকে আমি খুব ভালভাবে জানি। তুমি তাদের প্রশংসা আমার সামনে গান করছ? শ্রীনারদ পদ্মার ক্রোধ দেখে সমবেদনায় বললেন, "মা! সেটা যে গোপপুর বলে তা আমি জানতাম না, জানলে কি আমি সেস্থানে যেতাম। বর্তমান নিশ্চিত ভাবে তাঁরা এই যজ্ঞস্থলে আসবেন, কিন্তু উপায় কি করা যাবে তাই বলুন।"

পদ্মার ক্রোধ দেখে দেবকী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "মাতা! যজ্ঞস্থলে শত শত প্রহরী ঘিরে থাকবে, যাতে ব্রজ-বাসীরা সেস্থানে প্রবেশ করতে পারবে না। এই কথা শুনে পদ্মা খুশী হয়ে প্রহরীদেরকে ডেকে বললেন, "তোমরা যজ্ঞস্থল এমন ভাবে ঘিরে থাকবে যাতে গোপপতি সহ গোকুলবাসীরা সেখানে প্রবেশ করতে না পারে।"

এদিকে নন্দ-উপানন্দের সঙ্গে ব্রজবাসীরা আনন্দে কীর্তন করতে করতে প্রভাস ক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করলেন। "বহু দিন পর আমরা এ চোখে কানাইকে দেখব।" এই আশায় অনেক পথ হাঁটতে হাঁটতে এলেও পথশ্রমে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েননি, বরং মহা আনন্দ-তরঙ্গে ভাসছিলেন। দ্বারকাপুরীতে পদ্মাবতী সারারাত অনিদ্রায় ছিলেন। অতি সকাল সকাল উঠে দেবকীকে বললেন, "বধূ! চল আমরা শীঘ্র যজ্ঞস্থলে যাই, কারণ সেই ব্রজবাসীদের প্রতি আমার কোন বিশ্বাস নেই।" দুই রাজমাতা অতি প্রত্যুষে সেখানে উপস্থিত হয়ে

যজ্ঞস্থলের দ্বারদেশে অবস্থান করতে লাগলেন। নন্দ যশোদা সহ ব্রজবাসীরা অতি উল্লাসিত চিত্তে যজ্ঞস্থলের দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হলেন। সম্মুখে তাঁদেরকে দেখে পদ্মা ক্রোধান্বিত হয়ে বহু কুবাক্য প্রয়োগ করলেন। "তুমি জাতিতে গোয়ালা, তাই অবোধ অজ্ঞান বালকের মতো কাজ করেছ। তোমার লজ্জা করে না কৃষ্ণকে দেখতে এসেছ? যমুনাতে ডুবে মরার জন্য কি জল নেই? সামান্য মাখনের জন্য আমার কৃষ্ণকে কত দুঃখ দিয়েছ, কত প্রহার করেছ, উপরন্তু দড়ি দিয়ে বন্ধন করেছ। আমার কৃষ্ণকে কোন শিক্ষা দীক্ষা দিয়েছ কি? অভুক্ত উপবাস অবস্থায় তাকে বনেতে গাই চরাবার জন্য পাঠিয়েছিলে। তোমার দুর্গুণ আর কত গাইব।" পদ্মার মুখে এরূপ কর্কশ বাণী শ্রবণ করে যশোমতী কাঠের পুতুলের ন্যায় দণ্ডায়মান হয়ে রইলেন। নন্দরাজা সহ গোপবাসীরা দুঃখে মুহ্যমান। গোপবাসীদের এরূপ মুহ্যমান অবস্থায় দেবকী আশ্বস্ত প্রদান করে পদ্মাকে বললেন, মাতা! যা হোক তাঁরা আমাদের অতিথি, আমাদের মুনিবর তাঁদেরকে আমন্ত্রণ করেছেন। অতিথি বিমুখ হলে সর্ব অমঙ্গল হয়। আবার এই ব্রজবাসীদের স্বভাব অতি সরল। সাধুদের মতো সব সহ্য করছেন, কিন্তু কখনই প্রত্যুত্তর দেন না। তাই আমি নিবেদন করি কৃষ্ণকে এস্থানে আনা যাক্ কিন্তু গোপবাসীরা সেই যজ্ঞ স্থানেতে যাবেন না।

দেবকীর এই বাক্য শ্রবণ করে পদ্মা তাঁর বুদ্ধিকে প্রশংসা করে তাঁর সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন। পদ্মা তারপর কৃষ্ণকে ডেকে আনার জন্য নারদকে অনুরোধ করলেন। নারদ তখন বললেন, মাতা এ সুভক্ষণে জনসাধারণদের আগে ডাকাটা অনুচিত। ত্রিভুবনের রাজা, প্রজা, মুনি-ঋষিরা যজ্ঞ দর্শন করছেন, তাই এ সময়ে আমি কখনই তাঁকে ডাকতে পারব না। পদ্মা তখন অন্য উপায় না পেয়ে দেবকীকে বললেন, বধূমাতা ! তুমি 'কৃষ্ণ' নাম ধরে ডাক, তাহলে সে আর বিলম্ব না করে এস্থানে এসে পৌঁছে যাবে। দেবকী উচ্চস্বরে বহুবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ডাকলেন, কিন্তু কৃষ্ণের কানে তাঁর ডাক প্রবেশ করল না। নারদ তখন বললেন, মা! কি অবিচার প্রভুর। তিনি কি কিছু শুনতে পান নি? তারপর নারদ যশোমতীকে বললেন, তুমি কানুর জন্য কাঁদছিলে তো, তুমি এইবার ডাক, তুমি ডাকলে যদি কৃষ্ণ এসে যান তাহলে তোমার সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। দেবকীও সেই কথা বললেন, দিদি তুমি এবার কৃষ্ণকে ডাক। ব্রজবাসীদের মনে এক মহা আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। কৃষ্ণ যশোমতীর ডাক

শুনে নিশ্চয় এস্থানে দৌড়ে আসবেন। তারপর নন্দরাণী ডাকলেন কানু.....কানু......নীলমণি......। যজ্ঞস্থলে কৃষ্ণের কানে এই মৃদু সুমধুর বাণী যেই প্রবেশ করল, কৃষ্ণ তখন চিন্তা করলেন এ তো আমার মা'র করুণ স্বর। তখন কুশাদি যজ্ঞোপকরণ দূরে ঠেলে দিয়ে মা, ...মা, ...বলে এক গোবৎসার মতো যজ্ঞস্থল থেকে ধাবিত হয়ে নন্দরাণীর কোলেতে এসে উঠলেন। তা দেখে ব্রজবাসীদের তাপিত প্রাণ হরিচন্দন-বিন্দু সদৃশ শীতল হয়ে গেল। যশোমতীর কোলেতে অবস্থান করে কানু দেখলেন মাতা দেবকী অধোবদনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মাতার মনে দুঃখ দেখে কৃষ্ণচন্দ্র নন্দরাণীকে ছেড়ে দেবকীর কোলে উঠলেন। দুই মাতার কোলে উঠতে দেখে নারদ অতি চুতরতার সহ জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু দুই মাতার একটি পুত্র তা কিরূপ সম্ভব? আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না প্রভু! প্রকৃতপক্ষে আপনি কার পুত্র?" যাঁর স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হবে তিনিই প্রকৃত পক্ষে আপনার মাতা। এ কথা শোনার সাথে সাথে যশোমতীর স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে লাগল। নন্দরাণীর বাৎসল্যের সীমা কেই বা বর্ণনা করতে পারে? রোহিণী মাতা এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যশোদা মাতার মহিমা, যা শ্রবণ করে অষ্ট পাটরাণী মনপ্রাণে কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ চিন্তা করতে লাগলেন। পূর্ববৎ রাম-কৃষ্ণ দ্বারদেশে উপস্থিত হয়ে ব্রজলীলা কাহিনী শ্রবণ করছেন এবং উভয়ের মাঝে সুভদ্রা দুই পার্শ্বে হস্ত প্রসারণ করে দণ্ডায়মান হয়েছেন। ভক্তের মহিমা, ভক্তির মহিমা, ধামের মহিমা, ভক্তিরসের মহিমা শ্রবণ করে শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রেম জাত হল। সেই সাথে বড়ভাই বলরাম ও ছোট ভগ্নী সুভদ্রার মধ্যে সেই মহাপ্রেম জাত হল। হস্তপদ সঙ্কুচিত, চক্ষু বিস্ফারিত, শ্রীকরপল্লব সঙ্কুচিত গৌরবে আনন্দিত। এই মহাভাব অবস্থায় শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রা মহারাণী দণ্ডায়মান। যেহেতু সুভদ্রা দুই ভাইকে ভিতরে প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য দুই পার্শ্বে হস্ত প্রসারণ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাই তাঁর হস্ত দু'টি দৃশ্যমান হয়নি।

এমন সময় নারদমুনি সেখানে উপস্থিত হয়ে এই অপরূপ রূপ দর্শন করে অতি আনন্দে বললেন "প্রভু! বহু যুগে বহু রূপ দর্শন করেছি, কিন্তু একি অপরূপ রূপ আপনার।" তারপর প্রভুকে নিম্নলিখিতভাবে স্তুতি করলেন—

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।

ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।।

—(ভা. ১২/১৩/১)

শ্রীনারদ মুনির স্তব ধ্বনি শ্রবণ করে রোহিণী মাতা জানতে পারলেন যে, রামকৃষ্ণ দ্বারদেশে উপস্থিত হয়ে গেছে, তাই অষ্ট পাঠরাণীকে বললেন আমি আর অধিক বর্ণনা করতে পারব না। তারপর নারদ মুনির স্তব ধ্বনিতেও শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা মহারাণীর মহাভাবাবস্থা ভঙ্গ হলো। পূর্ববৎ হস্ত-পদ- নেত্র উন্মীলিত করে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রা মহারাণী সেই অপরূপ রূপ লুকাতে চেষ্টা করলেন। শ্রীনারদমুনি বললেন, "প্রভু আমার কাছে আপনি আর এই অপরূপ রূপ লুকাতে পারবেন না, আমি এটি দর্শন করেছি। প্রভু আপনার শ্রীচরণ কমলে আমার এইটুকু প্রার্থনা আপনি এই পতিতপাবন রূপে শ্রীক্ষেত্র নীলাচলে কলিযুগে বিরাজমান করুন।" শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'তথাস্তু'। শ্রীভগবানের লীলা নিত্য। অতএব শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা মহারাণীর মহাভাবের প্রকাশ রূপই হচ্ছে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রা মহারাণীর রূপ, যা আজ আমরা শ্রীক্ষেত্রে দর্শন করছি। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীজগন্নাথ, শ্রীকৃষ্ণ লীলাই শ্রীজগন্নাথ দেবের লীলা।

শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অতি প্রিয় পার্ষদ শ্রীপাদ কানাই খুঁটিয়া মহাশয় "শ্রীজগন্নাথ মহাভাব" নামক একটি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি মহাপ্রভুর অতি নিজ জন। শ্রীজগন্নাথের দর্শনে বিরহকাতর হয়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মহাভাবে শ্রীমন্দিরের পাষাণ যখন বিগলিত হয়েছিল, সেই সময় শ্রীপাদ কানাই খুঁটিয়া উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল দেবকী নন্দন দাস 'বৈষ্ণব বন্দনায়' তাঁর সম্বন্ধে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করেছেন—

কানাই খুঁটিয়া বন্দে বিশ্বপরচার।
জগন্নাথ, বলরাম দুই পুত্র যার।।

লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহাভাবাবস্থা হচ্ছে শ্রীজগন্নাথ, তা তিনি অতি সুন্দরভাবে সেই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সেই তথ্য সংক্ষিপ্তভাবে প্রদান করা হলো।

(হরেকৃষ্ণ)

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা-বিরহ-বিধুর রূপ—শ্রীজগন্নাথ

দ্বাপর যুগের কথা। কংস অক্রূরকে পাঠিয়ে কৃষ্ণ-বলরামকে ব্রজভূমি থেকে মথুরাতে নিয়ে গেল। কৃষ্ণ বলরাম মথুরাতে মল্লদেরকে বিনাশ করে অবশেষে কংসকেও বিনাশ করলেন। কিন্তু তারপর কৃষ্ণ যা কথা দিয়ে এসেছিলেন যশোদা মাতা, নন্দমহারাজ, গোপ-গোপীদের ও সর্বশেষে শ্রীমতী রাধারাণীকে বৃন্দাবনে ফিরে আসার জন্য, সেকথা আর তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। তিনি বহু দিন বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরাতে থেকে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ছাড়ার পর থেকে ব্রজগোপীরা, বিশেষ করে তাঁর তীব্র বিরহ-বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে পাগলিনীপ্রায় হয়ে গেছেন। তাঁরা জীবন ধারণ করে থাকলেও মৃতবৎ প্রতীয়মান হয়েছেন। কেবল গোপীরা যে বিরহ ব্যথা অনুভব করেছিলেন তাই নয়, শ্রীকৃষ্ণেরও ব্রজভূমির, ব্রজের গোপ-গোপীদের স্মৃতি জাগ্রত হয়েছিল এবং সেই সাথে তাঁদের সঙ্গে পুনর্বার মিলন হওয়ার আশায় তাঁর হৃদয়ও উদ্বেলিত হয়ে পড়েছিল। তাঁর মধ্যে বিরহের বেদনাও অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। তাই তিনি প্রিয় ভক্ত উদ্ধবকে প্রীতির সন্দেশ দিয়ে বিরহ-বিধুরা গোপ-গোপীদের কাছে পাঠালেন।

দীর্ঘদিনের অণুপস্থিতিতে ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে কাতর। শ্রীকৃষ্ণও ব্রজ-বিরহে মর্মাহত। ব্রজজনদের কাতরতার কথা ভেবে তিনি অধিক ব্যথাও অনুভব করেছেন। কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে এসেছেন, তা সত্য। কিন্তু তিনি নিজের প্রাণাধিক প্রিয় ভক্তদের মুখগুলি ভুলতে পারেন নি। বর্তমান পরিপ্রেক্ষীতে মথুরা ছাড়াও সম্ভব নয়। ঠিক তেমনি ব্রজজনের পক্ষে তাঁদের অতিপ্রিয় ব্রজভূমি ছাড়াও সম্ভব নয়। তবে উভয় পক্ষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের একমাত্র উপায় হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে সংবাদ অথবা বার্তা প্রেরণ। এ কাজ আবার অন্য কেউ করতে পারবে না। এটা কেবল একান্ত অনুগত নিজজনের দ্বারাই করা হয়ে থাকে। তবে মথুরাতে কৃষ্ণের প্রিয়ব্যক্তিদের মধ্যে শিরোমণি হচ্ছেন একমাত্র উদ্ধব। শ্রীমদ্ ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে স্বয়ং কৃষ্ণ তা স্বীকার করেছেন—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্।।

—(ভা. ১১/১৪/১৫)

তাই একমাত্র যোগ্যতম ব্যক্তি উদ্ধবকে প্রেরণ করতে স্থির করলেন। তাঁকে কাছে টেনে এনে কৃষ্ণ অতি করুণ স্বরে বললেন—

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নৌপ্রীতিমাবহ।
গোপীনাং মদ্ বিয়োগাধিং মৎ সন্দেশৈর্বমোচয়।।

—(ভা. ১০/৪৬/৩)

অর্থাৎ—"উদ্ধব! তুমি ব্রজেতে যাও। সেখানে গিয়ে আমার পিতামাতা, ব্রজেশ্বর-ব্রজেশ্বরীর প্রীতিবিধান কর.....। একথাও বলিও যে তাঁরা যেমন আমার জন্য ব্যাকুল, আমিও তাঁদের জন্য ব্যাকুল।" পিতামাতার কথা বলে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের কথা বলছেন এবং উদ্ধবের হাতে সন্দেশ পাঠাচ্ছেন। এটি হচ্ছে তাঁদের জন্য পরম সান্ত্বনা বাক্য। গোপীদের তীব্র কৃষ্ণানুরাগের কথা স্বয়ং কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন—(শ্রীমদ্ ভাগবতে দশম স্কন্ধে বর্ণনা আছে)।

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামের দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ।
যে ত্যক্তলোকধর্মাশ্চ মদর্থে তান্বিভর্ম্যহম্।।

—(ভা. ১০/৪৬/৪)

ব্রজের গোপীরাই প্রকৃতপক্ষে মন্মনস্কা ও মৎপ্রাণা। শ্রীকৃষ্ণই তাঁদের প্রাণ। তাঁদের যাবতীয় চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনার্থে। এইজন্য তাঁরা সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাঁদের মন, প্রাণ সর্বদাই কৃষ্ণেতে নিবিষ্ট এবং কৃষ্ণের মনও ব্রজদেবীদের প্রতি আবিষ্ট। তাঁরা কৃষ্ণের প্রাণ আবার কৃষ্ণই তাঁদের প্রাণ। "মদ্ অন্যৎ তে ন জানন্তি, নাহং তেভ্যো মনাগপি।" অর্থাৎ "কৃষ্ণ ছাড়া তাঁরা কিছু জানেন না, আবার তাঁদের ছাড়া কৃষ্ণ কিছু জানেন না।" কৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন, "এই ব্রজললনারাই আমার প্রাণ স্বরূপ। আমি তাদেরকে পরিত্যাগ করে মথুরাতে আছি। কোনও প্রকার কার্যে আমার উৎসাহ নেই কিংবা আনন্দ নেই। কেবল কর্তব্য বোধে তা সব করে চলেছি। কিন্তু আমার মন প্রাণ পড়ে

রয়েছে ব্রজে।" আবার সেই শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে তিনি বলছেন—

"যে ত্যক্ত লোকধর্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্।"

যাঁরা আমার জন্য লৌকিক ভাল-মন্দ, ধর্মাধর্ম ত্যাগ করেছেন, তাঁদেরকে আমি সর্বদা হৃদয়ে ধারণ করে থাকি। যিনি যেভাবে আমার ভজন করেন, আমি তাঁকে সেইভাবে ভজন করি। কৃষ্ণ বিরহে জর্জরিতা গোপীরা বিরহ উৎকণ্ঠায় বিহ্বল হয়ে ঘন ঘন মূর্চ্ছা হয়ে যাচ্ছেন। বস্তুতঃ মূর্চ্ছা দশাই তাঁদের প্রাণ রক্ষা করে। এভাবে বহু প্রবোধন দিয়ে কৃষ্ণ উদ্ধবকে প্রেরণ করলেন ব্রজভূমিতে। উদ্ধব ভাবতে লাগলেন—যাঁদের জন্য স্বয়ং কৃষ্ণ এত কাতর, স্বয়ং কৃষ্ণের প্রতি তাঁরা যে কত প্রেমময়ী......তা তিনিও জানতে পাচ্ছেন না। প্রীতির সহজ প্রভাবে নীতির শক্ত বন্ধন বাধা সৃষ্টি করছে। পূর্ণানন্দ ভগবান্ কৃষ্ণের বিলাপ, ভগবানের ভক্তবিরহ। এটাই মাধুর্য রসের ঘনায়িত মূর্তি— শ্রীজগন্নাথ। শ্রীমতী রাধারাণী গোপীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তাঁর বিরহে বিধুর হয়ে কৃষ্ণ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছেন। দৈব দ্বারা প্রেরিত হয়ে কিছু সময়ের মধ্যে সেখানে মহর্ষি নারদ ও তাঁর সঙ্গে উদ্ধব উপস্থিত হলেন। তাঁরা ভগবানের অতি প্রিয়। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধা-বিরহ-বিধুর হয়ে একটি চরম রহস্য উদ্ঘাটন করতে চলেছেন। তাঁরা কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়লেন কিভাবে কৃষ্ণের সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনবেন। ইতিমধ্যে বলরাম নিজে প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। তাঁরা তিনজন যুক্তি করে একটি সমাধানের পন্থা নির্ণয় করলেন। বর্তমান যদি নারদ মুনি তাঁর বীণাযন্ত্রে সুর ধরে ব্রজের মহিমা কীর্তন করেন, তাহলে কৃষ্ণ নিশ্চয় খুব শীঘ্র জেগে উঠবেন। নারদের মনে এ কথাটা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করল। কিন্তু তিনি বিচক্ষণতার সহ বিচার করে বললেন, যেই মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ জেগে উঠবেন, সেই মুহূর্তে তিনি সমস্ত প্রকার অনুরোধ উপেক্ষা করে নিশ্চয় সঙ্গে সঙ্গে ব্রজের অভিমুখে ছুটবেন। অতএব আগে থেকে দারুককে ডেকে রথ প্রস্তুত করে রাখা উচিত। উদ্ধব এরপর অধিক গভীর ও বিচক্ষণতা সহ বিচার করে বললেন, অবশ্য এ রকম উপায়টি ঠিক্। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি যা বুঝেছি তা হচ্ছে এই যে, ব্রজেতে যে অবস্থা কৃষ্ণ যদি সেখানে যান ও ব্রজের আর্তনাদ শোনেন, তাহলে তিনি সে সব সহ্য করতে পারবেন না। যার ফলে পরিস্থিতি অধিক জটিল হয়ে উঠবে। তখন আর তাঁকে ফিরে পাওয়ার কোন উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। এইভাবে কিছুক্ষণ আলোচনা হওয়ার পর

নারদ উদ্ধবকে বললেন, " উদ্ধব, তুমি সব সময় কৃষ্ণের দূত হিসাবে ব্রজেতে গিয়ে কৃষ্ণের সংবাদ পরিবেশণ করে থাকো। তাই তুমি সবার আগে ব্রজেতে গিয়ে সমস্ত ব্রজবাসীদেরকে জানিয়ে দাও যে, দ্বারকা থেকে কৃষ্ণ ব্রজ অভিমুখে যাত্রা করেছেন।" উদ্ধব কিন্তু এসব কথা শুনে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, "হে মুনিশ্রেষ্ঠ। আপনার আদেশ পালন করা আমার পক্ষে কিছু আপত্তি নেই।" তবে এটা খুব পরিতাপের বিষয় এই যে, এক মসয় আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতে অবস্থান কালে তাঁর দূত রূপে আমাকে ব্রজেতে পাঠিয়েছিলেন। তখন আমি তাঁদেরকে কি বলে সান্ত্বনা দিব এই নিয়ে আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। কেননা আমার প্রভুর বিরহে তাঁদের যে মর্মন্তুদ অবস্থা হয়েছিল, তা দেখে আমি তাঁদেরকে কেবল এই মাত্র বলেছিলাম, "আমি শীঘ্র ফিরে গিয়ে কৃষ্ণকে ব্রজভূমিতে ফিরে আসার জন্য সবিনয় অনুরোধ করব। কিন্তু তা আজ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারেনি। আজ যদি পুণর্বার সেই একই প্রকার কথা বলতে শুরু করি, তাহলে কেউ আর আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। বরং আমাকে প্রতারক বলে ভর্ৎসনা করবেন।" তাঁর এই সমস্ত কথা বিচার করে সবাই প্রভু বলরামকে যাওয়ার জন্য নিবদেন করলেন।

শ্রীবলরাম খুব মর্মবেদনাভরা ভাষায় বললেন, "দেখ নারদ, আমি সবার আগে ব্রজেতে যেতাম। আমি তোমাদের অপেক্ষা করতাম না। কিন্তু একটু বিচার করে দেখ, তোমাদের প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র 'যাব', 'যাব' বলে কেবল সময় অতিবাহিত করতে দেখে আমি নিজে ব্রজবাসীদের পরিস্থিতি চিন্তা করে তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারব বলে এই আশা নিয়ে ব্রজে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁদেরকে কৃষ্ণ-বিরহে মৃত-প্রায় অবস্থা দেখে, "কৃষ্ণ শীঘ্র এসে পৌছে যাবে।" এই বলে কত বুঝিয়েছিলাম। এমনকি মা যশোদার চরণ স্পর্শ করে বলে এসেছিলাম, "মা, আমি খুব শীঘ্র দ্বারকায় পৌছে তোমার কৃষ্ণ যাতে ব্রজে আসার কালবিলম্ব না করে তার ব্যবস্থা করব।" এই আশ্বাসনাভরা কথায় বিশ্বাস করে মা যশোদা সহ সমস্ত ব্রজবাসী কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে তার আসার দিনটির দিকেই চেয়ে বসে রয়েছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কৃষ্ণের দেখা নেই। তাই হে সর্বজ্ঞ নারদ! তুমি বল, আমি বর্তমান ব্রজেতে গিয়ে মা যেশোদাকে কিছু বললে তিনি কি আর আমাকে বিশ্বাস করতে পারবেন? তাই ব্রজবাসীদের কৃষ্ণ বিরহে এরকম অবস্থা, আবার কৃষ্ণ আগমনে অতিশয় বিলম্ব, তাতে বলরাম

কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। এ রকম অবস্থায় বুদ্ধিমতী সুভদ্রা আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, ''আপনারা চিন্তা করবেন না, আমি আগে ব্রজে যাচ্ছি।'' আমি নারী জাতি। আমার কথাতে তাঁদের বিশ্বাস জাত হবে। আমি ব্রজে গিয়ে মা যশোদার কোলে বসে তাঁর চোখের জল মুছে দেব। আর বলব, 'মাগো', তোমার কৃষ্ণ এই এসে গেল। আমরা ভাই বোন দুজনে একসঙ্গে দ্বারকা থেকে রওনা দিয়েছি। তবে পথে কৃষ্ণকে আপ্যায়ন করার জন্য কত রাজা মহারাজারা তোরণ রচণা করেছেন, অগণিত দেবতুল্য নর-নারীগণ পূজার উপকরণ নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাই দাদার আসতে একটু দেরী হচ্ছে দেখে, আমি উৎকণ্ঠায় আগে থেকে ছুটে এসেছি তোমাকে এই শুভ সংবাদ দেবার জন্য। অনুরূপ আমি প্রতিটি গোপীদের কাছে গিয়েও সান্ত্বনা দেব, পুরুষ জাতি স্বাভাবিক ভাবেই একটু কুটীল, ব্রজের জনগণ সরল, সুতরাং আমার মতো নারীর কথা তাঁরা বিশ্বাস করবেন এবং রাজা উজিরেরা যেমন কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করার জন্য প্রস্তুত হন, অনুরূপ ব্রজবাসিগণও তাঁদের দুঃখ ভুলে গিয়ে কৃষ্ণ আগমন মহোৎসব অনুষ্ঠান করবেন।''

এই প্রস্তাবকে তিনজনই সমর্থন দিলে রথের সাজনীর ব্যবস্থা করার আদেশ দেওয়া হলো। তখন বলদেবও চিন্তা করে দেখলেন বিশেষ করে ব্রজের প্রতি তার অনুরাগ আছে এবং ভাই কানাইকে ছেড়ে থাকেন কি করে; সুতরাং তিনিও মনস্থ করলেন সুভদ্রার সঙ্গে একটি রথে তিনিও ব্রজে রওনা দেবেন। তখন পর পর তিনখানি রথ সাজান হলো। উদ্ধব ও নারদ কথা দিলেন যে, পরের রথে তাদের পশ্চাতে পশ্চাতে তারা কৃষ্ণকে পাঠাচ্ছেন। তখন কাল বিলম্ব না করে বলরাম এবং সুভদ্রাদেবী স্ব স্ব রথে ব্রজপথে যাত্রা শুরু করলেন।

এখন নারদ তাঁর বীণাযন্ত্রে ব্রজগোপীদের প্রেমবার্তা কীর্তন শুরু করে দিলেন। যে মুহূর্তে ঐ অপ্রাকৃত ধ্বনি কৃষ্ণের কর্ণে ঝঙ্কৃত হলো সেই মুহূর্তে তিনি কেবল জেগে উঠলেন না, ঝম্প দিয়ে উঠে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা হয়ে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন—'কে আমার সেই মোহন মুরলী হরে নিল?' এ গোপীদের কাজ। এই কথা বলে যেই গোপীদের অন্বেষণে ধাবিত হবেন, ঠিক তখনই উদ্ধবকে দেখে বললেন তুমি এখন এই ব্রজে কেন? পরক্ষণে নারদকে দেখেই চিন্তা করলেন ঋষিপ্রবর নারদ যখন এখানে তখন এটা কী ব্রজ নয়? তখন উভয়ে

বললেন, প্রভু আপনি তো ব্রজে গমন করবেন বলেই রথ দাঁড়িয়ে আছে, রথে চড়ুন। তখন রাধার ভাবে বিভাবিত মাতালের ন্যায় টল্‌মল্‌ করতে করতে উভয়ের সাহায্য নিয়ে রথে চড়ে বসলেন। দারুক নারদের নির্দেশ পেয়ে বায়ুবেগে রথ চালন শুরু করে দিলেন।

এদিকে বলভদ্রের রথ ব্রজসীমানায় প্রবেশ করা মাত্রেই বলভদ্র ব্রজের চরম নিষ্পন্দ রূপ দর্শন করলেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকলেন, এখনও কি ব্রজবাসীদের প্রাণ আছে। এই দুই ভাবের সমাবেশে দেখা গেলো তিনিও অষ্টসাত্ত্বিক বিকার স্বরূপ মহাভাবের পরাকাষ্ঠায় পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেলেন। অন্তরের ভাব দেহে প্রকাশ পেলো, কারণ দেহ-দেহী অভেদ। অষ্টসাত্ত্বিক বিকারটা অন্তরের (আত্মার)। জীবের সিদ্ধ ভূমিকায় আত্মার যে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার তা যেমন সিদ্ধ অবয়বে প্রকাশ পায়। তাই শ্রীবলদেবের অন্তরের ভাবটি তাঁর চিদানন্দ দেহে যে অপ্রাকৃত স্বরূপটি গ্রহণ করল, ঠিক সেই রূপেই তাঁকে আমরা শ্রীনীলাচলে জগন্নাথের বিগ্রহের সঙ্গে বলরামকে দেখি। ঠিক সেরকম সুভদ্রা দেবীরও আর মা যশোদার নিকট যাওয়া হলো না। তাঁরও পরিস্থিতি হলো অনুরূপ। এ এক বৈচিত্র্যময় সর্বতোভাবে অবিজ্ঞাত অপ্রাকৃত স্বরূপ-মাধুরীতে ব্রজরস মাধুরিমা সমুদ্রে অবগাহন। এদিকে শ্রীমতী রাধিকা তাঁর অধিরূঢ় মহাভাবের উদ্‌ঘুর্ণার ও পরাকাষ্ঠা পর্যায়ের এমন অবস্থায় পৌঁছিয়েছেন যে দেহে প্রাণ আছে কি নেই তাও সন্দেহ-জনক হয়ে উঠেছে। তখন সমস্ত ব্রজই চরম উৎকণ্ঠিত। তাঁর প্রিয় অষ্ট-সখিগণ তাঁর সন্নিকটে থেকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অধোমুখে বসে আছেন, যেন মনে হচ্ছে তাদের দেহে প্রাণ নেই। ললিতা বিশাখা অত্যন্ত অধীর হয়ে পড়লেও দুই কর্ণে 'কৃষ্ণ' মন্ত্র কীর্তন করে শোনাচ্ছেন, আর মাঝে মাঝে তুলিকা দিয়ে দেখছেন, অতীব ক্ষীণ নিঃশ্বাস তখনও তুলিকাতে স্পন্দন আসছে কি না। এমন অবস্থায় সারা ব্রজ ছুটে এসেছে শ্রীমতীর নিধুবনকুঞ্জে। শ্রীমতী ললিতার হস্তে মাথা রেখে শায়িত।

ঠিক এমনি সময়েই শ্রীকৃষ্ণের রথ এসে পৌছাল ব্রজে। শ্রীকৃষ্ণ রথ থেকে লম্ফ দিয়ে ব্রজ ভূমি স্পর্শ করলেন। এখন যেন আবার যোগমায়া বিশেষ লীলাপুষ্টি এমনভাবে করে চললেন, যেন শ্রীকৃষ্ণ দৈবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্খলিত পদে উপস্থিত হলেন সেই নিধুবনে। আর তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, 'হে

রাধে, দেহি পদ-পল্লব মুদারম্।' তখনই দেখা গেল তাঁর সেই চরম বৈচিত্র্যময় রূপ—সেই রাধার বিরহভাব-স্বরূপ নিয়ে প্রকাশিত হলো। হয়ে গেল হস্তপদ যেন কূর্মের মতো অন্তর্গত, আর তাঁর বিস্ফারিত নেত্রে শ্রীরাধার প্রতি ঈক্ষণ করেই তিনি সংজ্ঞা হারা হলেন। এ যেন রাধাভাবসিন্ধুতে ভাসমান।

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শ করে যে বায়ু প্রবাহিত হলো, তা শ্রীমতীর অঙ্গ স্পর্শ করলে তা যেন মৃতদেহে সঞ্জীবনী রূপে কাজ করল। এদিকে সেই মুহূর্তে শ্রীমতী ললিতা শ্রীমতী রাধিকার কর্ণে মৃদু মৃদু স্বরে শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্তা জানিয়ে দিলে, তা মৃতপ্রায় শ্রীমতীর হৃদয়ে জীবনীশক্তির স্পন্দন জাগাল। শ্রীমতী আস্তে আস্তে চোখ খুলেই প্রাণবল্লভকে দর্শন করা মাত্রই তাঁর সবকিছু বিরহ বেদনা ভুলে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের তখন সেই প্রায় সংজ্ঞাহারা অবস্থা দেখে শ্রীমতী তাঁর প্রিয়সখী বিশাখাকে নির্দেশ দিলেন শ্রীকৃষ্ণের সাহচর্যার্থে; বিশাখা জানেন কী সঞ্জীবনী ঔষধ এখন প্রয়োগ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে মৃদুস্বরে রাধানাম জপ করতে থাক্‌লে শ্রীকৃষ্ণ আস্তে আস্তে চক্ষু উন্মীলন করলেন। শ্যামের নয়নদ্বয় শ্রীমতীর নয়নে দৃষ্টি রেখে উভয়েই পূর্বস্মৃতি ভুলে গেলেন, কোথায় শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাবাস আর কোথায় শ্রীমতীর এ বিরহ সন্তাপ। উভয়ে দেখলেন কুঞ্জে নৈশলীলার পর সুখশয্যায় শায়িত শয়ন নিদ্রা ব্রাহ্ম-মুহূর্তে কক্‌খটির শব্দে ভঙ্গ হলো। পীতাম্বরধারী তখন শ্যামসুন্দর ত্রিভঙ্গ মুরারীরূপে শ্রীহস্তদ্বয়ের অঙ্গুলি মুরলীছিদ্রে নিক্ষেপ করে শ্রীমুখে মুরলী যোজনা করেছেন। আর নীলাম্বর-পরিহিতা শ্রীমতী তাঁর সর্ব-মাধুর্যে মণ্ডিত হয়ে শ্যামের বামে দণ্ডায়মানা। ললিতা সুন্দরী পঞ্চ-প্রদীপে আরতী করতে থাকলে, বিশাখার সুললিত কীর্তন এবং মৃদঙ্গ বাদন অবলম্বন করে অন্যান্য নর্মসখিগণ যুগল মিলনের মহিমা কীর্তন শুরু করে দিলেন। আহা! কোথায় গেল সেই বিরহের পঠভূমিকা। এই বিরহে মিলন আর মিলনে বিরহ, রসরাজ মহাভাবের মাধুর্যলীলার নিত্যস্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বক্রকটাক্ষে অনঙ্গ বাণে শ্রীমতীর বক্ষ বিদীর্ণ করে আর একদিকে শ্রীমতীর মুখপদ্ম মধু পান করতে করতে এখন উভয়ে বসেছেন দিব্যরত্ন সিংহাসনে। তাঁর মধুরিমা স্খলিত ভাষায় বললেন,'হে রাধে, তত্ত্বতঃ আমাদের উভয়ের বিরহ কোথায়?' তবে, সম্ভোগের পরাকাষ্ঠা, বিশেষ করে

তোমার ভাবের অসমোর্ধ্বত্ব পরিচয় দিতে গিয়ে এই বিরহের রেখাপাত জানবে। তবে আমার প্রতি তোমার যে ভালবাসা সেই গভীর সমুদ্ররূপ তোমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পৌঁছাবার জন্যই আমার যে রূপ পরিগ্রহ, সেই রূপটির পরিচিতির জন্য আমি নিত্যকালের জন্য শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ বিগ্রহরূপে প্রকটিত থাকব। আর তোমার ভাব-মাধুর্য ও রূপ অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আমি সেই স্বরূপটি উপলব্ধি করার যত্ন নেব।

আর ভাই বলরাম এবং ভগিনী সুভদ্রা যাঁরা বিরহের পর মিলনের সহায়ক হয়েছেন এবং ব্রজে প্রবেশ করেই তাঁদের যে স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে তাঁদেরকেও আমি সঙ্গে নেব। সুতরাং রাধা-প্রেম-রসসমুদ্রে ভাসমান তিন খণ্ড কাষ্ঠ (দারু) রূপে আমি রূপ পরিগ্রহ করে, শ্রীক্ষেত্রে নীলাচলে শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত থাকব। আর আমার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপটি হবে বিরহের পর যে মিলন।

(হরেকৃষ্ণ)

শ্রীজগন্নাথের দর্শন কিভাবে সম্ভব

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ। তিনি ৫০০ বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়ে শ্রীজগন্নাথের সেবা কিভাবে করা যায় তা তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন। শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার পূর্বদিন স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গুণ্ডিচা মার্জন করতেন। শ্রীজগন্নাথ নীলাচল হতে রথে আরোহণ করে গুণ্ডিচা মন্দিরে যান। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে উপবেশন করবেন তাই মার্জন আবশ্যক। এই লীলার রহস্য এই যে, যদি কোন সৌভাগ্যবান্ জীব তঁর নিজের হৃদয় সিংহাসনে শ্রীজগন্নাথদেবকে বসাতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্বপ্রথমে তাঁর হৃদয়ের মল ধৌত করা উচিত। শ্রীজগন্নাথদেবের উপবেশনের যোগ্য স্থান করা উচিত। হৃদয়টিকে নির্মল, শান্ত এবং ভক্তিতে পূর্ণ করা আবশ্যক।

যদি কোন ভক্ত তাঁর হৃদয়কে বিশুদ্ধ করতে চান্, তাহলে তাঁকে অবশ্যই ভগবানের লীলা কাহিনী শ্রবণ ও কীর্তন করা উচিত। এই পন্থাটি অতি সরল পন্থা। কৃষ্ণ নিজেই হৃদয় পরিষ্কার করতে সাহায্য করেন, কেন না তিনি তো সেখানে বসে রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ জীবের হৃদয়ে বসে থাকতে চান, এবং তিনি জীবকে পরিচালনা করতে চান। তবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেভাবে গুণ্ডিচা মন্দির পরিষ্কার করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে আমাদেরকেও হৃদয় পরিষ্কার করতে হবে। এইভাবে আমরা শান্ত এবং ভক্তিযোগে স্থির হতে পারব। যদি হৃদয় ময়লাতে পূর্ণ থাকে অর্থাৎ হৃদয় যদি অন্যাভিলাষে পূর্ণ থাকে তাহলে সেই হৃদয়ে পরমপুরুষ ভগবান্ উপবেশন করবেন না। তাই হৃদয় সর্বদা সমস্ত প্রকার তথাকথিত ধ্যান-ধারণা হতে জাত কামনা থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদ তাঁর ভক্তিরসামৃত সিন্ধু নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— "অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞান কর্মাদ্যনাবৃতম্।"

এক কথায় হৃদয়ে অন্য কোন প্রকার উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়। ব্যক্তির ভৌতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করা উচিত নয়। আবার শুষ্কমনন, সকামকর্ম, কৃচ্ছ্র-সাধন প্রভৃতি নিকৃষ্ট পন্থার দ্বারা ভগবান্‌কে জা-‌তে চেষ্টা করা উচিত নয়।

এই সমস্ত কার্যকলাপ স্বতঃস্ফূর্ত ভগবদ্ভক্তির প্রতিবন্ধক। এইগুলি যতক্ষণ হৃদয়ে বর্তমান থাকে, ততক্ষণ হৃদয় কলুষিত আছে বলে বুঝতে হবে। এবং তাই তা শ্রীকৃষ্ণের বসবাসের উপযুক্ত স্থান নয়। আমাদের হৃদয় যতক্ষণ বিশুদ্ধ না হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা সেখানে ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি না।

ভৌতিক কামনার অর্থ এই ভৌতিক জগতটাকে উপভোগ করা। আজকাল এটাকে আর্থিক উন্নতি বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর্থিক উন্নতির অবাঞ্ছিত কামনা কাঠ-কুটা, ধূলিমাটি'র মতো হৃদয়ে জমাট বেঁধে থাকা ময়লা রূপে বিচার করা হয়। যদি কেউ সর্বদা ভৌতিক কার্যে লিপ্ত থাকে তবে তার হৃদয় সর্বদা অস্থির হবে। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের বর্ণনানুযায়ী—

"সংসার বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায়।"

পক্ষান্তরে, ভৌতিক ঐশ্বর্য কামনা ভক্তিযোগ মার্গের প্রতিবন্ধক। পুণ্যকর্মের জন্য প্রচেষ্টা এবং ভৌতিক জগতে সুখে বাস করবার চেষ্টা এসব ভৌতিক উপভোগের অন্তর্ভুক্ত। ভৌতিক লাভ ভৌতিক দোষযুক্ত ধূলির মতো। যখন এই ধূলিরাশি সকাম কর্মফলরূপ ঘূর্ণিবাত্যা দ্বারা উত্তেজিত হয় তখন তা হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে দেয়। এইভাবে হৃদয়-দর্পণ ময়লাতে ভরপুর হয়ে থাকে। পুণ্য ও পাপ কর্ম করবার অনেক কামনা থাকে, কিন্তু লোকেরা জানতে পারে না কিভাবে জন্ম-জন্মান্তর ধরে সেগুলি তাদের হৃদয় দূষিত করে রেখেছে। যে ব্যক্তি সকাম কর্মফলের উপভোগ কামনা ত্যাগ করতে পারে না বুঝতে হবে যে সে ভৌতিক দোষদুষ্ট হয়েছে। কর্মীরা সাধারণতঃ মনে করে থাকে যে, সকাম কর্মের প্রতিক্রিয়া অন্য এক কর্মদ্বারা প্রতিহত করা যায়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সেটা একটি ভুল ধারণা। যদি কেউ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়, তবে সে তার নিজের কার্যের দ্বারা ঠকামিতে পড়ে। এই প্রকার কর্মকে হস্তীস্নানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। হস্তী অতি পরিষ্কার ভাবে নদীতে স্নান করে, কিন্তু যখন সে নদী হতে উপরে উঠে আসে তখন সে তার শরীরে আবার ধূলা মাটি মাখে। যদি কেউ তার পূর্ব-জন্মের সকাম কর্মফলের জন্য দুঃখভোগ করে থাকে, তবে সে পুণ্যকর্মানুষ্ঠান করে তার দুঃখ দূর করতে পারবে না। কেবল কৃষ্ণ চেতনাহি একমাত্র পন্থা যা'র দ্বারা দুঃখ-যন্ত্রণা উপশম করা যেতে পারে। যখন কেউ

কৃষ্ণ-চেতনা গ্রহণ করে এবং ভগবানের দিব্যনাম, রূপ, লীলা শ্রবণ কীর্তন আদি ভক্তিযোগে নিযুক্ত হয়ে যায়, তখন তার হৃদয় শোধন হতে শুরু হয়।

শুষ্ক মনন, নির্বিশেষ বা নিরাকার চিন্তন, অষ্টাঙ্গ যোগ এবং তথাকথিত ধ্যান এসব ধূলামাটির সঙ্গে তুলনীয়। এগুলি কেবল হৃদয়ে অশান্ত খাদ সৃষ্টি করে। এগুলির দ্বারা কেউ ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারে না কিংবা ভগবানকে হৃদয়ে বসাবার জন্য একবারও সুযোগ দিতে পারে না। কখনও কখনও যোগী এবং জ্ঞানীরা প্রারম্ভে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন তাদের বিভিন্ন প্রকার যোগ সাধনার উপায় বলে ধরে নিয়ে থাকে। কিন্তু যখন ভুলবশতঃ তারা ভাবে যে তারা বদ্ধ অবস্থা হতে মুক্ত হয়ে গিয়েছে, তখন তারা কীর্তন বন্ধ করে দেয়। ভগবানের স্বরূপ দর্শন কিংবা ভগবানের নাম যে আমাদের অন্তিম লক্ষ্য, তা তারা জানে না। সেই হতভাগ্য ব্যক্তিরা ভক্তিযোগ কি তা জানে না। তাই পরমপুরুষ ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারে না। ভগবদ্ গীতায় তাদেরকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।।
—(গী. ১৬/১৯)

"যারা ঈর্ষান্বিত , দুষ্ট এবং নরাধম তাদেরকে আমি এই ভৌতিক সংসারে বার বার বিভিন্ন অসুর যোনিতে জন্ম দিই।" অসুরেরা সর্বদাই ভগবৎ বিদ্বেষী, তাই তারা অতি বদমাস্ এবং দুষ্ট প্রকৃতি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই নিজে আচরণের মাধ্যমে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে এই সমস্ত আবর্জনা ধূলামাটি ভালভাবে পরিষ্কার করে বাইরে ফেলে দিতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মন্দিরের বর্হিভাগও পরিষ্কার করেছিলেন, যাতে এই সমস্ত ধূলামাটি আবার ভিতরে এসে জমা না হয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, যদিও অনেক সময় ব্যক্তির সকাম কর্মযোগ কামনা দূরীভূত হয়ে গেলেও কখনও কখনও সকাম কর্মফল ভোগের সূক্ষ্ম কামনা হৃদয় মধ্যে থেকে যায়। কেউ মনে করতে পারে যে, ভক্তির উন্নতির জন্য ব্যক্তি যে কোন ধান্ধা বা ব্যবসা করতে পারে; কিন্তু সংক্রমণ এত প্রবল যে এটা পরবর্তী সময়ে ভুল বুঝাবুঝি রূপ নেয়।

এটিকে কুটিনাটি (দোষ দেখা) ও প্রতিষ্ঠাশা (সম্মান, খ্যাতি, উচ্চ আসন লাভ করবার কামনা) বলা হয়। জীবহিংসা, নিষিদ্ধাচার কাম এবং লোকপ্রিয়তা নামে পরিচিত হয়। 'কুটিনাটি' শব্দটির অর্থ কপটতা। উদাহরণ স্বরূপ কেউ হরিদাস ঠাকুরের অনুকরণ করতে গিয়ে এক নির্জন স্থানে বাস করতে পারে। কারও সুখ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট কামনা থাকতে পারে, পক্ষান্তরে লোকে তাকে হরিদাস ঠাকুর বলে মনে করবে যেহেতু সে নির্জন স্থানে বাস করছে। এসব হচ্ছে ভৌতিক কামনা। একথা নিশ্চিত যে, এক কনিষ্ঠ ভক্ত সাবধান না হলে কামিনী-কাঞ্চনরূপ জড় বাসনার দ্বারা আক্রান্ত হওয়াই স্বাভাবিক। তার ফলে হৃদয় পুনরায় ময়লা, আবর্জনায় ভরপুর হয়ে কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে। অবশেষে সে বড় 'ভক্ত' অথবা 'অবতার' সাজবার অভিলাষ পোষণ করে।

'জীবহিংসা' শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির প্রচার বন্ধ করে দেওয়া। ভগবানের বাণী প্রচারকে বলা হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ 'পরোপকার'। যারা ভগবদ্ভক্তির মহিমা সম্বন্ধে অজ্ঞ, প্রচারের মাধ্যমে তাদের সে সম্বন্ধে শিক্ষা দান করা অবশ্য কর্তব্য। কেউ যদি ভগবানের বাণী প্রচার বন্ধ করে দিয়ে কেবল নির্জন স্থানে বসে থাকে, তাহলে সে জড় জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে। কেউ যদি মায়াবাদীদের সঙ্গে আপোষ মেলামেশা করতে ইচ্ছা করে, তাহলে সেও ভৌতিক কর্মে লিপ্ত হচ্ছে বলে বুঝতে হবে। ভক্তের পক্ষে কখনই অভক্তদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। পেশাদারী গুরু ভেল্কিবাজী দেখিয়ে চমৎকার যাদুকর বলে খ্যাতি লাভ করতে পারে, কিন্তু সেসব ধূলিমাটি হৃদয়ের ময়লার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাই ব্যক্তির সাধন বিধি পালন করা উচিত। মাছ, মাংস, দ্যূতক্রীড়া, অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ কামনা করা উচিত নয়।

আমাদেরকে বাস্তবিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দু-দু'বার মন্দিরের সর্বত্র মার্জন ও প্রক্ষালন করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় বার মার্জন অতি নিখুঁত ছিল। এটির অর্থ ভক্তিপথের সমস্ত প্রকার প্রতিবন্ধক হটিয়ে দূরে ফেলে দেওয়া উচিত। তিনি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে মন্দির পরিষ্কার করেছিলেন এবং তারপরও যদি কোথাও কোন সূক্ষ্ম দাগ লেগে থাকে, সেজন্য তিনি নিজের পরিধেয় শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা ঘষে শ্রীমন্দির ও ভগবানের সিংহাসন মার্জন করেছিলেন। শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভু নিজে দেখাতে চেয়েছিলেন যে শ্রীমন্দির

স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ নির্মল হওয়া উচিত। ভক্তিযোগের অর্থ হল ভৌতিক দোষ থেকে জাত সমস্ত প্রকার উদ্বিগ্ন হতে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করা। পক্ষান্তরে মনকে শান্ত রাখবার এটা হচ্ছে একটি উপায়। যখন কেউ ভক্তিযোগ ছাড়া অন্য আর কিছু কামনা করে না, তখন তার মনে শান্তির উদ্রেক হয় এবং হৃদয় পরিষ্কার হয়ে যায়। যদিও অনেক সময় মন থেকে সমস্ত ময়লা বিদূরিত হয়ে যায়, তথাপি কখনও কখনও নির্বিশেষ নিরাকারবাদ, প্রতিষ্ঠাশা, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কামনা সূক্ষ্মভাবে থেকে যায়। এগুলি শুভ্র বস্ত্রের মসীবিন্দু সহ তুলনীয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এগুলিকেও পরিষ্কার করার জন্য ইচ্ছা করেছিলেন। কিভাবে আমাদের হৃদয়-মার্জন করতে হয় তা শ্রীমন্ মহাপ্রভু আচরণের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছিলেন। হৃদয় মার্জিত হয়ে গেলে আমরা ভগবান শ্রীজগন্নাথকে সেখানে বসার জন্য আহ্বান করতে পারব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণের মাধ্যমে প্রত্যেক ভক্তকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা যাঁরা প্রচার প্রসার করছেন তাঁরা এক প্রকার গুরু দায়িত্ব বহন করছেন। মন্দির মার্জনের সময় মহাপ্রভু স্বয়ং কাউকে প্রশংসা করেছিলেন তো আর কাউকে পবিত্র ভর্ৎসনা করেছিলেন। তাই যাঁরা আচার্য রূপে কার্য করছেন, তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, তাঁরা কিভাবে নিজের আচরণ দ্বারা ভক্তদের শিক্ষা দেবেন। যাঁরা মন্দির মধ্যস্থিত আবর্জনারাশি দূরে ফেলে দিয়ে মন্দির মার্জন করছিলেন তাঁদের ওপর শ্রীমন্ মহাপ্রভু খুব প্রীত হয়েছিলেন এবং সেটাকে অনর্থ নিবৃত্তি বলা হয়। অর্থাৎ হৃদয়ের সমস্ত অনাবশ্যক পদার্থ দূরে হটিয়ে দিয়ে হৃদয়কে নির্মল রাখা। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা মন্দির মার্জনের উদ্দেশ্য আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন কিভাবে হৃদয় শোধন করে শান্ত ও নির্মল করতে হয়, যার ফলে তা শ্রীভগবান্ জগন্নাথের বসতির যোগ্য স্থান হতে পারে। সেই সময় শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করা জীবের পক্ষে সম্ভব, তা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

(হরে কৃষ্ণ)

❋❋❋

ভাগবত পরম্পরা ও শ্রীজগন্নাথ

ভারত ভূমিতে উৎকল প্রদেশে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র বিরাজিত। এই শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র তথা শ্রীক্ষেত্রে বিরাজিত পরংব্রহ্ম দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রা দেবীর লীলা অতি সুগুপ্ত। শ্রীক্ষেত্রে বিরাজিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সেবা অতি বিচিত্রময়। তাই সাধারণ লোকেরা এই সেবা সম্বন্ধে অবগত নয়। তারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীজগন্নাথের মধ্যে ভেদ দর্শন করে। এমনকি বহু তথাকথিত পণ্ডিতেরাও মত প্রদান করেছে যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীজগন্নাথের অংশ অথবা কলা। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এই লৌকিক মত গ্রহণীয় নয়। শ্রীকৃষ্ণই—শ্রীজগন্নাথ, শ্রীজগন্নাথই—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। ভিন্ন ভিন্ন যুগে পরংব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ কেবল। হল-মূষল-ধারী বলরামই বলদেব, ভগ্নী সুভদ্রা এবং অনুজ চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ নিজে শ্রীজগন্নাথ স্বরূপে বিদ্যমান। শ্রীজগন্নাথ দেবের চলন্তি প্রতিমা (অর্চ্চাবিগ্রহ) শ্রীমদন-মোহন। অতএব শ্রীমদনমোহনই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ, তা স্বতঃ প্রকাশিত। যদি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীজগন্নাথের অংশ অথবা কলা, তবে মূল বিষয়-বিগ্রহের কাছে অংশ অথবা কলা কিভাবে প্রতিনিধিত্ব করবেন। তাই জগন্নাথই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং জগন্নাথ। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাবিলাস জগন্নাথেতেই বিদ্যমান। ভক্তের সমস্ত সেবা জগন্নাথ, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে স্বীকার করনে। ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথকে প্রাণপ্রিয় শ্যামসুন্দর রূপে স্বীকার করেছেন। কোন ভক্তের কাছে জগন্নাথ রূপে তো, কোন ভক্তের কাছে কৃষ্ণস্বরূপে। তাই এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান করা অপরাধ মাত্র।

শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথ 'গোপাল মন্ত্রে' আরাধিত হন। যদি শ্রীজগন্নাথ কৃষ্ণ নন, তবে তাঁকে গোপাল মন্ত্রে অর্থাৎ কৃষ্ণমন্ত্রে কেন আরাধনা করা হচ্ছে? কেউ প্রশ্ন করতে পারেন শ্রীভগবানের বহু নাম আছে, সেই বহু নামের মধ্যে যে কোন নাম ধরে তাঁকে ডাকলে তিনি তা শোনেন। কিন্তু আমাদের জানা উচিত শ্রীভগবানের পুত্র শ্রীব্রহ্মাজী শ্রীজগন্নাথেব সেবা কিভাবে সম্পাদন করবেন

তারজন্য প্রার্থনা করেছিলেন। শ্রীজগন্নাথ তাঁকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপ প্রদর্শন করে 'গোপাল মন্ত্রে' সেবা করার জন্য আদেশ প্রদান করেছিলেন। তাই পরম্পরানুসারে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের সেবা ও পর্বপর্বাণিগুলি ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীল ব্যাসদেবের রচিত 'শ্রীমদ্-ভাগবত' ও 'শ্রীকৃষ্ণ-লীলা চরিত'-গ্রন্থ অবলম্বনে পালিত হচ্ছে। দোলযাত্র, ঝুলন যাত্রা এই সমস্ত উৎসব বৃন্দাবনে পালিত হয়। ঝুলন যাত্রা উৎসবে ব্রজবাসীরা বিশেষ করে সখিগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীমতী রাধারাণীকে ঝুলন দোলায় বসিয়ে ঝোলান। তবে এই সমস্ত উৎসব শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে পালিত হওয়ার যথার্থতা কি আছে, তা আমাদের জানা উচিত। ঠিক্ তেমনই গ্রীষ্ম ঋতুতে বৃন্দাবনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শরীরে চন্দন লেপন করে যমুনাতে জল-বিহার করেন। সখা সখীরা ব্রজরাজ নন্দনের প্রীতিবিধানের জন্য বাদ্যগীত সহ রাত্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-কিরণে যমুনার শীতল জলে নৌকা বিহার করেন। ঠিক্ তেমনই অভিন্ন ব্রজ শ্রীক্ষেত্রে শ্রীমদনমোহনের চন্দন যাত্রা উৎসব পালিত হয়।

তবে কারোর মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, শ্রীজগন্নাথের কাছে শ্রী ও ভূশক্তি কেন পূজিত হচ্ছেন ? যেহেতু শ্রীজগন্নাথ রাধা-বিরহ-বিধুর এবং শ্রীক্ষেত্রে মাধুর্য, ঐশ্বর্য দ্বারা আচ্ছাদিত; তাই শ্রীমতী রাধারাণীর ঐশ্বর্যের বিস্তার-স্বরূপ 'শ্রী' শক্তি ও 'ভূ' শক্তি শ্রীজগন্নাথের কাছে বিদ্যমান। শ্রীমতী রাধারাণীর উপস্থিতিতে শ্রীজগন্নাথ বিরহ-বিধুর হবেন কিভাবে ? লীলা পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের 'দামোদর লীলা'ও শ্রীমন্দিরে কার্তিক মাসে পালিত হয়। ভবমোচনকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যশোদামাতা বন্ধন করেছিলেন। যিনি ভববন্ধন মোচনকারী তাঁকে আবার কে বন্ধন করবে ? তা কল্পনার অতীত। এই সমস্ত পূর্বলীলাগুলি শ্রীক্ষেত্রে দর্শন করে শ্রীজগন্নাথ আনন্দিত হচ্ছেন। জড় জগতে কোন ব্যক্তি যদি নাটকে অভিনয় করে এবং পরে তার অভিনয় যদি সে চলচিত্রের মাধ্যমে দর্শন করে, তাহলে সে খুব্ আনন্দিত হয়। অনুরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রেমিক ভক্তের সঙ্গে যে সমস্ত লীলা করেছিলেন সেই সমস্ত দিব্যলীলাগুলি স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ-স্বরূপে দর্শন করে আনন্দিত হচ্ছেন। প্রভুর প্রীতি-হাস্য প্রেমিকভক্ত প্রেমনেত্রেই দর্শন করেন।

আবার কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, প্রভু শ্রীজগন্নাথের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ লীলা

ছাড়াও অন্যান্য লীলা সব দেখতে পাওয়া যায়; যথা—নাগার্জ্জুন বেশ, গজানন বেশ ইত্যাদি। শ্রীজগন্নাথ বিভিন্ন ভক্তের সেবা অঙ্গীকার করে এইভাবে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। ঠিক্ যেমন একজন যাদুকর, নিজেকে কেবল বিভিন্ন রূপে বিস্তার করেন, কিন্তু তাঁর আসল রূপ হচ্ছে একজন মানব। ঠিক্ তেমনই শ্রীজগন্নাথ বিভিন্ন ভক্তকে আশ্রয় করে কেবল ভিন্ন ভিন্ন লীলাসব বিস্তার করেন ম্যাত্র, কিন্তু তাঁর স্বয়ং মূলরূপ শ্রীনন্দনন্দন রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ। তা'র প্রমাণ স্বয়ং ভক্তাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আচরণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেছেন, এবং স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ তা লীলার মাধ্যমে প্রদর্শন করেছেন। উৎকলের গজপতিরাজা শ্রীপুরুষোত্তম দেবের পরিণয়ের প্রস্তাব শ্রীকাঞ্চি রাজকুমারীর সঙ্গে হয়েছিল, কিন্তু কাঞ্চিরাজ তা'তে অসম্মত প্রকাশ করেছিলেন। কারণ শ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রায় গজপতির ছেরা-পহঁরা সেবা কাঞ্চিরাজ হীনদৃষ্টিতে দর্শন করে শ্রীগজপতির সেই সেবা এক চণ্ডালের কাজের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তাতে গজপতি ক্ষুব্ধ হয়ে কাঞ্চিরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ ও অগ্রজ বলদেব, কৃষ্ণ বলরাম রূপে উভয়েই দুই ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে কাঞ্চি রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। পথে দুই প্রভু তৃষ্ণার্ত হওয়ায় শ্রীজগন্নাথ নিজের অঙ্গুরী (আংটি)-টা বন্ধক দিয়ে 'মাণিক' নাম্নী গোয়ালিনীর কাছে দই খেয়েছিলেন। কিন্তু মাণিক অঙ্গুরী অর্থাৎ আংটিটার বদলে অর্থ কামনা করায় দুই প্রভু বলেছিলেন, 'আমাদের রাজা' পিছনে সৈন্য-সামন্ত সহ আসছেন, তুমি এই অঙ্গুরী (আংটি)টা তাঁকে দিয়ে অর্থ চেয়ে নেবে।

তারপর গোয়ালিনী গজপতি রাজার আগমনের অপেক্ষায় সেখানে বসে রইলেন। রাজার আগমনে গোপালিনী সেই অঙ্গুরী (আংটি)-টা রাজাকে প্রদান করলেন। শ্রীপুরুষোত্তমদেব প্রভুর সেই আংটিটা দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। মাণিক গোপালিনী দুই প্রভুর অঙ্গ-ভঙ্গিমা ও রূপ রাজার কাছে বর্ণনা করলেন। রাজা সেই উপমা থেকে বুঝতে পারলেন যে, "প্রভু শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলদেব—কৃষ্ণ ও বলরাম রূপে কাঞ্চি অভিমুখে গমন করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন।" সুতরাং এইভাবে প্রভুর বহু দিব্য লীলা থেকে স্পষ্ট সূচনা পাওয়া যায় যে, প্রভু শ্রীজগন্নাথ হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীরসরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীজগন্নাথকে এই স্বরূপে সেবা করলে প্রভুর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রীতিবিধান হয়। প্রভু স্বয়ং তা তাঁর প্রিয় ভক্ত

শ্রীজয়দেব গোস্বামীর মাধ্যমে প্রমাণিত করিয়েছেন।

শ্রীল জয়দেব গোস্বামীর দশ অবতার স্তোত্র রচনাতে বঙ্গ দেশের রাজা তাঁকে রাজ পণ্ডিত পদে নিযুক্ত করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু শ্রীল জয়দেব গোস্বামী তাতে সম্মত হননি। তারপর রাজা শ্রীজয়দেব গোস্বামীর জন্য স্বতন্ত্র স্থানে একটি স্বতন্ত্র ভজনকুটীর নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। রাজার অনুরোধক্রমে শ্রীল জয়দেব গোস্বামী সেখানে বাস করলেন। এমনকি কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর প্রেমপুরুষোত্তম শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল জয়দেব গোস্বামীকে শ্রীক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। তারপর শ্রীল জয়দেব গোস্বামী শ্রীক্ষেত্রে আগমন করলেন। শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভু যদিও সেই সময়ে ধরাধামেতে অবতীর্ণ হননি, তথাপি প্রেমিক ভক্ত শ্রীজয়দেবের কাছে আবির্ভূত হয়ে শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে লীলা বিস্তারের সূচনা প্রদান করেছিলেন। তারপর শ্রীল জয়দেব গোস্বামী শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের নির্দেশানুসারে পদ্মাবতীর পাণি গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান কালে তিনি সর্বদাই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দিব্যলীলা চিন্তনে মগ্ন থাকতেন। তা'র বর্ণনা-স্বরূপ তিনি তখন সংস্কৃতে 'গীত-গোবিন্দ' সংগীত রচনা আরম্ভ করেছিলেন। এই সংগীত রচনা সময়ে এক বিচিত্র লীলা রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছিল। "শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতী রাধারাণীর মানভঞ্জনের জন্য বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও শ্রীমতী রাধে মানবতী হয়েছেন। শেষে নিরুপায় হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমতী রাধারাণীর পাদপদ্মে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে তাঁর চরণ মস্তকে ধারণ করার জন্য প্রার্থনা করেন।" এই পদটি রচনা করতে গিয়ে শ্রীল জয়দেব গোস্বামী অন্তরে দ্বিধাপ্রকাশ করেছিলেন, পদটি না লিখে স্নান করার জন্য মহোদধিতে গমন করেছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীজয়দেব গোস্বামীর রূপ ধারণ করে পদ্মাবতীর কাছে এসে গীত গোবিন্দের রচনা পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে "দেহি পদ-পল্লব মুদারম্" অসম্পূর্ণ পদটি লিখে দিলেন এবং তারপর পদ্মাবতীর কাছে কিছু প্রসাদ গ্রহণ করে চলে গেলেন। এদিকে প্রকৃত শ্রীজয়দেব গোস্বামী স্নান সমাপন করে ফিরে এসে পদ্মাবতীর কাছে প্রসাদ সেবন করতে গেলে পদ্মাবতী আশ্চর্য হয়ে পূর্বের সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। তারপর শ্রীল জয়দেব গোস্বামী শ্রীগীত-গোবিন্দের অসম্পূর্ণ পদটির সম্পূর্ণ রচনা দেখে জানতে পারলেন প্রভু নিশ্চিত এই পদটি পূরণ করে দিয়েছেন। শ্রীগীতগোবিন্দ রচনা সমাপ্ত হওয়ার পর শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রতিদিন শ্রীমন্দিরে তা গান

করতেন। শ্রীল জয়দেব গোস্বামীর এই সঙ্গীত সর্বত্র প্রচারিত হতে লাগল। এক সময় এক কৃষকের গৃহিণী বাগানে বেগুন তোলার সময় 'শ্রীগীত গোবিন্দে'র সঙ্গীত গান করছিলেন। শ্রী জগন্নাথ সেখানে উপস্থিত হয়ে গীতগোবিন্দ শ্রবণ করছিলেন। প্রভু তা শ্রবণ করে এমনই বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন যে বেগুন গাছের কাঁটায় তাঁর দেহের উত্তরী জড়িয়ে রইল এবং প্রভু সেই অবস্থায় মন্দিরে ফিরে গেলেন। সেবকেরা প্রভুর দেহে উত্তরী দেখতে না পেয়ে অনুসন্ধান করতে লাগলেন কিন্তু পেলেন না। পরিশেষে প্রভু স্বপ্নের মাধ্যমে সব কথা ব্যক্ত করলেন। তারপর থেকে অদ্যাবধি শ্রীমন্দিরে প্রতিদিন শ্রীগীতগোবিন্দ গান করা হচ্ছে। এ থেকে স্পষ্ট সূচনা পাওয়া যায় যে শ্রীজগন্নাথই হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, যিনি শ্রীমতী রাধারাণীর বিচ্ছেদে অসহ্য বিরহ যন্ত্রণা অনুভব করে থাকেন, তা শ্রীল জয়দেব গোস্বামীর মাধ্যমে স্বীকার করেছেন।

(হরে কৃষ্ণ)

নব বৃন্দাবন

শ্রীজগন্নাথ জগতের নাথ, জগতপতি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন,—

"অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" —(গী. ৯/২৪)
"ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম।"—(গী. ৫/২৯)

অর্থাৎ—"আমিই সর্বযজ্ঞের উপভোগকারী, আমিই মহেশ্বর।" সেই শ্রীকৃষ্ণই জগন্নাথ। "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর এবং অন্য সকলেই তাঁর সেবক। "হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধি-শিব-সুরেশ-প্রণমিতঃ।" অর্থাৎ—"ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-প্রণমিত শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব।" অন্য সকলেই শ্রীজগন্নাথের অধিন তত্ত্ব। এক কথায় ব্রহ্মা-শিব আদি দেবতারাও শ্রীজগন্নাথের আদেশ পালন করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং অভিন্ন জগন্নাথ। ৫০০ বছর পূর্বে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। রথ যাত্রার সময় তিনি শ্রীজগন্নাথের রথাগ্রে নৃত্য করতেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নৃত্য দেখে শ্রীজগন্নাথ আনন্দিত তথা বিস্মৃত হতেন। শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতীর সঙ্গে যখন মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন ব্রহ্মানন্দ ভারতী শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে বলেছিলেন—"আমি এখন দুই জগন্নাথকে দেখছি।" সচল জগন্নাথ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও অচল জগন্নাথ শ্রীক্ষেত্রবিহারী জগন্নাথের অর্চাবিগ্রহ। তবে সেই জগন্নাথ কে তা আমাদের বোঝা উচিত। ভগবান্ ভগবদ্গীতায় বলেছেন—

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।।
—(গী. ৭/২৫)

"আমি সকলের কাছে প্রকাশিত হই না। আমি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকি। মূঢ় ব্যক্তিরা আমাকে জানতে পারে না।" তবে ভগবানকে বুঝতে পারা বা জানতে পারা সহজ কথা নয়। ভগবান সকলের কাছে প্রকাশিত হন্ না।

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।।
—(ভা. ১০/১৪/২৯)

যাঁরা ভগবানের লেশমাত্র কৃপা লাভ করেছেন, তাঁরাই কেবল এ তত্ত্ব জানেন।

ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর- তত্ত্ব জানিবারে পারে।।
—(চৈ. চ. ম. ৬/৮৩)

তাই শ্রীজগন্নাথকে জানতে হলে শ্রীজগন্নাথের কৃপা আবশ্যক। তা নাহলে কেউ তাঁকে জানতে পারবে না। চিরদিন এরকম মানসিক জল্পনা-কল্পনা করে চললেও ভগবানকে জানতে পারবে না।

'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ', 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি,' 'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য'।

একমাত্র ভক্তিবলেই শ্রীজগন্নাথকে জানতে পারা এবং উপলব্ধি করতে পারা সম্ভবপর হয়ে থাকে। ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করবার সরল পন্থা প্রদর্শন করে গেছেন। শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা সমগ্র বিশ্বে পালিত হচ্ছে। অগণিত নর-নারী ভক্তসজ্জন জগন্নাথের রথযাত্রা উৎসবে যোগ দিয়ে জগন্নাথকে দর্শন করে জগন্নাথের রথ টেনে দিব্য আনন্দ লাভ করেন।

সংসার-সর্পদষ্টানাং মূর্চ্ছিতানাং কলৌযুগে।
ঔষধং ভগবন্নাম শ্রীমদ্বৈষ্ণব সেবনং।।
বিষয়াবিষ্ট মূর্খাণাং চিতসস্কারমৌষধম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-ভোজনম্।।

অর্থাৎ—সংসার রূপ ভুজঙ্গদষ্ট মায়া-মূর্চ্ছাগ্রস্ত জীবদের পরম ঔষধ হচ্ছে শ্রীহরিনাম কীর্তন এবং বৈষ্ণব সেবন। বিষয়াবিষ্ট মূর্খ ব্যক্তিদের চিত্ত শুদ্ধির একমাত্র ঔষধ সুদৃঢ় বিশ্বাসে গুরুসেবা এবং বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট ভোজন। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উল্লেখ করেছেন—

এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি'।।

ভবরোগের নিরাকরণের জন্য ভগবানের নামকীর্তনই একমাত্র ঔষধ। তাই এই নাম কীর্তন করে শ্রীজগন্নাথের কৃপা লাভের জন্য বারংবার প্রার্থনা করতে হবে।

বন্দে শ্রীকরুণাসিন্ধুং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুম্।
কৃপাং কুরু জগন্নাথ! তব দাস্যং দজস্ব মে।।

"করুণাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি, হে জগন্নাথ কৃপা করে আমাদেরকে তোমার দাসত্ব প্রদান কর।"

দাস্যং তে কৃপয়ানাথ! দেহি দেহি মহাপ্রভো।
পতিতানাং প্রেমদাতাহস্য হেতো যাচে পুনঃ পুনঃ।।

"হে মহাপ্রভু! আপনি পতিত অধমদেরকে প্রেম দান করুন। বারংবার আপনার চরণে আমার এই প্রার্থনা আমাদেরকে দাসত্ব প্রদান করুন।"

সংসার সাগরে মগ্নং পতিতং ত্রাহিং মাং প্রভো।
দীনোদ্ধারো সমর্থস্ত্বেমতন্তে শরণং গতঃ।।

"হে প্রভু! আমি সংসার সাগরে নিমজ্জিত, আমি পতিত, আপনি দীনহীনকে উদ্ধার করতে সমর্থ। নিজ করুণা-বশে আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন। আমি আপনার চরণে শরণাগত হলাম।" এটি জগন্নাথের কাছে কৃপার জন্য প্রার্থনা। শ্রীজগন্নাথ পতিতপাবন, মহাকরুণাময়। তিনি তাঁর শ্রীমূর্তি প্রকাশ করে জগদ্বাসীকে দর্শন দিচ্ছেন। উৎফুল্ল বদনে গোল গোল আঁখি মেলে চেয়ে রয়েছেন। সেই ভাবে যিনি তাঁকে (জগন্নাথকে) দর্শন করবেন তাঁর জীবন ধন্য হবে। শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা উৎসবে প্রতিবছর শ্রীজগন্নাথ বড়ভাই বলদেব ও ছোট বোন সুভদ্রাকে নিয়ে রথযাত্রা করছেন। রথযাত্রায় শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথকে কুরুক্ষেত্র-রূপ নীলাচল হতে সুন্দরাচল-রূপ বৃন্দাবনে স্বসম্মানে স্বাগত জানিয়ে টেনে নিয়ে যাবার লীলারহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অতি প্রিয় পার্ষদ শ্রীল রূপগোস্বামীর 'ললিত মাধব' গ্রন্থে এক বিশেষ লীলা রহস্য দেখতে পাওয়া যায়। তবে শ্রীজগন্নাথাষ্টকের প্রথম শ্লোকে বৃন্দাবন চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রই স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ বলে প্রতিপাদিত হয়েছেন। আমরা প্রথম শ্লোকে দেখব যে শ্রীকৃষ্ণই শ্রীজগন্নাথ।

"কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন-সঙ্গীত-তরলো
মুদাভীরী-নারী-বদন কমলাস্বাদ-মধুপঃ।
রমা-শম্ভু-ব্রহ্মামরপতি-গণেশার্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।।"

"যিনি কখনও কখনও যমুনা-তীরস্থ বনমধ্যে সঙ্গীত করতে করতে ভ্রমরের মতো আনন্দে ব্রজগোপীদের মুখারবিন্দের মধুপান করেন এবং লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও গনেশ প্রভৃতি দেবদেবীগণ যাঁর চরণ-যুগল অর্চনা করে থাকেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন পথের পথিক হোন।" এ থেকে স্পষ্ট সূচিত হচ্ছে কৃষ্ণই জগন্নাথ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পর বৃন্দাবনের অধিবাসী তথা গোপগোপী গোপাঙ্গনা সমেত শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণ বিরহে মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। অনেকের মনে এই প্রশ্ন আসে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতে গেলেন, সেখানে রাজা হলেন। দ্বারাকাতে আবার ষোল হাজার একশ আট রাণীকে বিবাহ করলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধভূমিতে গীতোপদেশ শিক্ষা দিলেন, তবে কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা শ্রীমতী রাধারাণী সহ গোপীদের কি দশা হয়েছিল?

অক্রূর ব্রজ হতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গেলেন। কৃষ্ণ-বিরহে ব্রজবাসীদের বিরহ যন্ত্রণা অতি অসহ্য, বিশেষ করে শ্রীমতী রাধারাণীর অবস্থা অতি শোচনীয়। তা দর্শন করে পৌর্ণমাসী দেবী (যোগমায়া) বললেন—

অহহ! অদ্বীপে ক্ষিপতী সমস্ত-জগতীমস্তোক-শোকাম্বুধৌ-
রাধা সম্ভৃত-কাকুরাকুলমসৌ চক্রে তস্য ক্রন্দনং।
যেন স্যন্দন-নেমি-নির্মিত-মহাসীমন্ত-দম্ভাদিদং
হা সর্বং সহয়াপি নির্ভরমভূদ্দূরাদ্বিদীর্ণং ভূবা।।

—(ললিতমাধব ৩য় অঙ্ক ২৩ শ্লোক)

অর্থাৎ—"হায়! শ্রীরাধা কাকুতিমিনতি করে উচ্চৈঃস্বরে এরকম রোদন করছেন যে, যার ফলে সমস্ত জগৎ নিরাশ্রয় শোকসাগরে নিমগ্ন হচ্ছিল বলে মনে হচ্ছিল। পরন্তু এত কষ্ট! অধিক আর কি বলব, রথচক্রে নির্মিত খাতছলে পৃথিবীও বহু দূর ব্যাপী বিদীর্ণ হয়ে গেলেন। পৃথিবী মাতা এই বিরহ সহ্য করতে পারলেন না। এইভাবে শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণের বিরহে উন্মত্ত হয়েছেন।" উন্মত্ত রাধিকা বিলাপ করছেন—

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব সখি চন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্ত্র-মুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্র নীলদ্যুতিঃ।
ক্ব রাসরস-তাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি-
নির্ধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্বিধিং।।
—(ললিত মাধব ৩য় অঙ্ক ২৫ শ্লোক)

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীমতী রাধারাণী অসহ্য বিরহ যন্ত্রণা অনুভব করে সখী বিশাখাকে বলছেন,—"হে সখি! নন্দকুল চন্দ্রমা কোথায়? সেই ময়ূর পুচ্ছের দ্বারা অলঙ্কৃত কৃষ্ণ কোথায়? যাঁর মুরলীধ্বনি কামিনী-আকর্ষণ বিষয়ে মন্ত্র-স্বরূপ তিনি কোথায়? যাঁর অঙ্গকান্তি ইন্দ্রনীলমণির মতো, তিনি কোথায়? যিনি রাসরসে নৃত্য করে থাকেন, তিনি কোথায়? যিনি আমার জীবন রক্ষার ঔষধি-স্বরূপ, তিনি কোথায়? এবং যিনি আমার সুহৃত্তমরূপে অমূল্যরত্ন, তিনি কোথায়? হায়! হায়! বিধাতা, তোমাকে ধিক্।" তারপর শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রাণসখী বিশাখা সহ কালিন্দীতে ঝাঁপ দিলেন। কালিন্দী (যমুনা) তখন তাঁর পিতা সূর্যদেবের হাতে শ্রীমতী রাধারাণীকে প্রদান করলেন। সূর্যদেবও তখন তাঁর প্রধান ভক্ত সত্রাজিতের হাতে শ্রীমতী রাধারাণীকে প্রদান করলেন। সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামা। রাধারাণী তখন সত্যভামার শরীরে আবিষ্ট হলেন।

সত্রাজিতের কন্যারূপে শ্রীরাধা সর্বদা অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে ক্রন্দন করতেন। তারপর সূর্যদেবের উপদেশানুসারে সত্রাজিত শ্রীসত্যভামারূপী রাধাকে দ্বারকাপুরীতে প্রেরণ করলেন। রুক্মিণী শ্রীসত্যভামারূপী রাধাকে দেখে অতি আদরে রাজপ্রাসাদে রাখলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় রাজপ্রাসাদ ছেড়ে কিছু দিনের জন্য অন্যত্র গমন করেছিলেন। শ্রীদ্বারকাপুরীতে শ্রীবিশ্বকর্মা এক নববৃন্দাবন রচনা করেছিলেন। সেই নববৃন্দাবনে তিনি শ্যামসুন্দরের এক বিগ্রহও নির্মাণ করেছিলেন। সত্যভামারূপী রাধা দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে অসহ্য বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন। তাই বিরহ প্রশমিত করার জন্য নব বৃন্দাবনে গমন করলেন। যখন শ্যামসুন্দরের সেই বিগ্রহ প্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি বললেন—"সোহয়ং জীবিত বন্ধুর-ইন্দু-বদনে।" অর্থাৎ—"আমি এখন আবার আমার হৃদয়ে প্রভুকে লাভ করলাম।" এইভাবে তিনি প্রতিদিন তিলক, সুগন্ধ চন্দন, ফুলের মালা আদি নানা পূজা উপকরণ নিয়ে সেই বিগ্রহটিকে পূজা করতে

লাগলেন।

পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর বিচ্ছেদে অসহ্য বিরহ বেদনা অনুভব করছিলেন। সেই বিরহ বেদনার উপশমের জন্য শ্রীবিশ্বকর্মার নির্মিত নববৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ গমন করলেন। একদা শ্যামসুন্দর তাঁর সখা মধুমঙ্গল সহ নববৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন। প্রবেশমাত্র তিনি নিজের এক সুন্দর বিগ্রহ দেখতে পেলেন। তিনি তখন অতি আশ্চর্য হয়ে বল্লেন—

"কথম্ অরণ্য বেশ ধারিণী হারিণীয়ং মদঙ্গ প্রতিমা।"

অর্থাৎ—"হে সখা মধুমঙ্গল! এই ঘোর অরণ্যের মধ্যে এই বিগ্রহ কিরূপে এল?" নিশ্চিতভাবে একে বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ কি না জানেন? তারপর বললেন, মধুমঙ্গল কে প্রতিদিন এই বিগ্রহ পূজার্চ্চনা করছেন? মনে হচ্ছে তিনি প্রতিদিন এখানে পূজার্চ্চনা করার সময় চক্ষু হতে অশ্রু বিসর্জ্জন করছেন। তা এখানে স্পষ্টভাবে সূচিত হচ্ছে। সাক্ষাৎ সঙ্গলাভের আশায় শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের সহায়তায় সেই বিগ্রহ (কৃষ্ণবিগ্রহ) কুঞ্জ হতে দূরে অন্যত্র লুকিয়ে রেখে বিগ্রহের স্থানে স্বয়ং দণ্ডায়মান হয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে সত্যভামারূপী শ্রীরাধা সেই নববৃন্দাবনস্থ শ্রীবিগ্রহ (কৃষ্ণ)-কে পূজা করার জন্য এলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখতে পেলেন যে, সত্যভামারূপী শ্রীরাধা তাঁর সখীদের সঙ্গে পূজা করতে লাগলনে। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামারূপী শ্রীরাধাতে শ্রীমতী রাধারাণীকে দর্শন করলেন। তারপর পরম বিস্ময় সহকারে বললেন। "হন্ত হন্ত! কথং সৈবেয়ং মে প্রাণবল্লভা রাধা।" "আহা! আমার প্রাণবল্লভা রাধা এখানে।" কারণ শ্রীকৃষ্ণ জানেন শ্রীরাধা কালিন্দীতে ঝাঁপ দিয়েছেন, তিনি আর এ জগতে নেই। কিন্তু "ইনি আমার প্রাণবল্লভা রাধা। ওহো! আমার সুখের জন্য বিশ্বকর্মা এই নববৃন্দাবন নির্মাণ করেছেন, নতুবা এই দ্বারকায় রাধারাণী থাকবেন কিভাবে?" কিন্তু ইনি তো রাধা বিগ্রহ নন, ইনি তো স্বয়ং শ্রীরাধে। অনুরূপ সত্যভামারূপী রাধা প্রতিদিন বিগ্রহকে পূজা করেন, কিন্তু আজ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের স্থানে দণ্ডায়মান আছেন। যখন শ্রীমতী তাঁকে দর্শন করলেন, তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন ইনি তো আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ, ইনি তো বিগ্রহ নন। তারপর তিনি হাত জোড় করে বললেন—

"অয়ি প্রতিবিম্ব! অপি কিং তব বিম্বস্য কৃষ্ণস্যেতার্থঃ কল্যাণং।"

অর্থাৎ—"হে প্রতিবিম্ব! তোমার স্বীয়-বিম্ব সেই পদ্মলোচনের সব কুশল তো?" দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—

"অয়ি মায়াযন্ত্রময়ি রাধিকে! সত্যমিদানীমেব কৃষ্ণঃ ক্ষেমী, যদিয়ং সর্বমুদ্রয়া তাং লোকত্তরামনু কুর্বতীত্বমস্য ক্ষেমং পৃচ্ছসি।।"

অর্থাৎ—"হে মায়াযন্ত্রময়ি রাধিকে। সত্যিই এখন কৃষ্ণ কল্যাণযুক্ত আছেন, যেহেতু তুমি শ্রীরাধার অনুকরণ করে কৃষ্ণের কুশল জিজ্ঞাসা করছ, কিন্তু রাধা কোথায়?" তারপর সত্যভামারূপী শ্রীরাধা তাঁর সখীকে বলছেন—"সখী! বিশ্বকর্মা কি আশ্চর্য প্রতিমা নির্মাণ করেছেন। এই প্রতিমা কি সুমধুর কথা বলছেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে ভাবতে লাগলনে—"অহো! **গন্ধর্ব্বপুরানুকারিণোঽপি মায়া গন্ধর্ব্বনাট্যস্য কাপি চির-চমৎকারিতা, যদত্র মমাপ্যবাধিতেব রাধা প্রতিভাসতে।"**

অর্থাৎ—"অহো! বিশ্বকর্মা মায়া-দ্বারা এমন নাট্য রচনা করতে দক্ষ যে এখানে এরকম এক চমৎকার নব-বৃন্দাবন রচনা করেছেন, যেখানে আমি শ্রীরাধাকে দর্শন করতে পেলাম।" তারপর সত্যভামারূপী শ্রীরাধা বললেন—"আহা! গোবিন্দের উৎকৃষ্ট সৌরভ যেমন নাসা উন্মত্ত করে, তেমনি প্রতিমার সৌরভ এতে বিদ্যমান। তাঁর ঘনশ্যাম কান্তি যেমন নেত্র আকর্ষণ করে, তেমনি এর ঘনশ্যাম কান্তিও নেত্র আকর্ষণ করছে এবং তাঁর যেমন মৃদুস্বর কর্ণদ্বয়কে চঞ্চল করতো, এর স্বরও তেমনি কর্ণরসায়ন করছে। সে যা হোক, এই প্রতিমূর্তি কিভাবে গোবিন্দের স্বভাব প্রাপ্ত হলো।" পুনরায় খেদোক্তি করে বলতে লাগলেন—"**অয়ি কৃষ্ণপ্রতিমে! এষা চাটু-কোটিভির্ভিক্ষ্যতে রাধা, এবমেব জঙ্গমী-ভূয় চিরং সুখাপয় সন্তাপজর্জ্জরং দীনায়া লোচনং।।"**

"হে কৃষ্ণ প্রতিমে! এই রাধা কোটি কোটি চাটু-সহকারে ভিক্ষা করছে যে, তুমি সচেতনভাবে অবলম্বন করে এই দুঃখিনীর সন্তাপ-জর্জ্জরিত লোচনদ্বয়কে আনন্দিত কর।" শ্রীমতী রাধারাণীর এ বিরহ প্রার্থনা শ্রবণ করা মাত্র শ্রীকৃষ্ণের চোখ হতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল। তা দেখে সত্যভামা রূপী রাধা তৎক্ষণাৎ অশ্রুধারা নিজের আঁচল দিয়ে পুঁছে দিলেন এবং কিছু বুঝতে

পারলেন না যে প্রকৃতপক্ষে তিনি কৃষ্ণ, না বিশ্বকর্মা দ্বারা নির্মিত প্রতিমা। তারপর যোগমায়া শক্তি দ্বারা সকল ব্রজবাসীরা দ্বারকাস্থ নববৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

"প্রাণেশ্বরি রাধে! প্রার্থয়স্ব কিমতঃপরং প্রিয়ং করবাণি।।"

অর্থাৎ—"হে প্রাণেশ্বরি রাধে ! দয় করে বল, আমি তোমার কি আনন্দবিধান করতে পারি?" শ্রীমতী রাধারাণী বললেন—

যা তে লীলাপদ - পরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সম্বীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণুর্বিহারং।।

—(ললিতমাধবে ১০ অ. ৩৮ শ্লোক)

"হে চতুর চঞ্চল-স্বভাব কৃষ্ণ! আমার এই প্রার্থনা সম্প্রতি একবার মাত্র তুমি মথুরামণ্ডলের মধ্যভাগস্থিত ব্রজধামে গমন কর। বৃন্দাবনে এখনও তোমার খেলা, লীলা স্থান-সব শোভাবর্ধন করছে। মাধুর্যে ভরা ব্রজসৌন্দর্য অনুপম। একবার সেই স্থানে চল, আমরাও তোমার সঙ্গে যাবো। আমরা তোমাকে গোপীভাবে ঘিরে রয়েছি। এখন তুমি পূর্বের মত বেণু বাদন করো।"

তোমার চরণ মোর ব্রজপুরঘরে।
উদয় করয়ে যদি, তবে বাঞ্ছা পূরে।।
সেই ভাব, সেই কৃষ্ণ, সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ।।

—(চৈ. চ. ম. ১/৮২, ৮০)

শ্রীমতী রাধারাণীর এই সকল অনুরোধ প্রার্থনা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—

"প্রিয়ে ! তথাস্ত্ব"

শ্রীমতী রাধে তখন জিজ্ঞাসা করলেন—"কথম্বিঅ।" অর্থাৎ—"কিভাবে তা এখন সম্ভব হবে।" শ্রীকৃষ্ণ কিছু উত্তর না দিয়ে দক্ষিণ দিকে চেয়েরইলেন। যেন কারও অপেক্ষায় রইলেন। ঠিক্ সেই সময় গর্গমুনি-সূতা গার্গী ও

যশোদাগর্ভসম্ভূতা বিন্ধ্যবাসিনী যোগমায়া দেবী এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। যোগমায়া বললেন—

"সখি রাধে! মাত্রসংশয়ং কৃথাঃ, যতো ভবত্যঃ
শ্রীমদ্‌গোকুলে তত্রৈব বর্ত্তন্তে, কিন্তু ময়ৈব কাল-
ক্ষেপার্থমন্যথা প্রপঞ্চিতং, তদেতন্মনস্যনুভূয়তাং,
কৃষ্ণোঽপ্যেষ তত্র গত এব প্রতীয়তাং।।"

"হে রাধে! সংশয় কর না, যেহেতু তোমরা আমরা সবাই সেই শ্রীমান্ গোকুলেই বিরাজ করছি, কিন্তু আমি কালক্ষেপণের জন্য অন্য প্রকারে লীলা বিস্তার করেছি, এটা মনেতে নিশ্চয় জেনো এবং শ্রীকৃষ্ণও সেই স্থানে গমন করে সেখানে রয়েছেন।"

পুনরায় শ্রীরাধা বললেন,—(হাসতে হাসতে)

"বহিরঙ্গজনালক্ষ্যতয়া শ্রীগোকুলমপি স্বস্বরূপৈরলঙ্কর বামেতি।।"

"বহিরঙ্গ জনের অলক্ষ্যে গোকুল বৃন্দাবনে রসরাজ মহাভাব স্বরূপে নিত্যলীলা করে বৃন্দাবনকে অলঙ্কৃত করা আবশ্যক।" শ্রীকৃষ্ণ এর উত্তরে বললেন,—"প্রিয়ে! তথাস্তু।"

অর্থাৎ—ব্রজবিলাস নিত্য, এই সমস্ত কথায় রাধা বিস্ময়ান্বিত হলেন। অর্থাৎ যোগমায়ার অচিন্ত্য বিচিত্র ক্রিয়ায় শ্রীরাধে বিস্মিত হলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে নেওয়ার জন্য অতি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তাই রথযাত্রা হচ্ছে সেই রাধাভাব উৎসব। নীলাচল ধাম হতে বৃন্দাবন যাত্রা। শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে বিভাবিত হয়ে মহাপ্রভু এই রথযাত্রার রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। অতএব শ্রীগোপীভাবাপন্ন ভাবে শ্রীজগন্নাথের দর্শন সম্ভব এবং রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীজগন্নাথ)-কে সেই ভাবে রথে করে টানতে টানতে নেওয়া উচিত। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্তরাই প্রকৃতপক্ষে রথযাত্রা পালন করছেন।

(হরে কৃষ্ণ)

***

রথযাত্রা

রথযাত্রা মহোৎসব পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র পরিপালিত হচ্ছে। ঐ দিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বড় ভাই বলরাম (বলদেব) সহ ছোট বোন সুভদ্রাকে নিয়ে রথে শুভারোহণ করেন। তাই কেমন করে ভক্তিসহকারে ভক্তিযোগ প্রণালীতে এই উৎসব করা যায় তা তিনি স্বয়ং প্রকাশ করেছেন। শ্রীজগন্নাথদেব স্বয়ং কৃষ্ণ, যিনি ৫০০ বছর পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়ে স্বীয় ভক্তিযোগ শিক্ষা দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্, অভিন্ন কৃষ্ণ; কিন্তু তিনি নিজে ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার করেছিলেন। কারণ, তাঁর শিক্ষা ছিল—"আপনি আচরি' ভক্তি শিখাইমু সবারে।" "আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়।" তাই সেইজন্য মহাপ্রভু স্বয়ং এসে ভক্তি আচরণ করে শিক্ষা দিলেন, যিনি স্বয়ং ভগবান্। সেই ভগবান্ স্বয়ং জগন্নাথ, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই চৈতন্য ঈশ্বর। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথের কাছে রইলেন। "দারুব্রহ্ম সমীপস্থ সন্ন্যাস গৌর বিগ্রহ"।—তাঁর আবির্ভাব সম্বন্ধে এই ভবিষ্যত বাণী ছিল । তাঁর রূপ গৌর বিগ্রহ। এ সম্বন্ধে ভূরিভূরি শাস্ত্র প্রমাণ আছে। তিনি কেবল ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন। যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ, তত্ত্বদৃষ্টি লাভ করেছেন, শাস্ত্র চক্ষু বা দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরাই কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জানেন—তিনি কিরূপে ভগবান্, তিনি কিরূপে স্বয়ং কৃষ্ণ। কিন্তু তিনি ভক্তিভাব অঙ্গীকার করেছিলেন। তাই কেউ যদি তাঁকে ভগবান্ বলতেন, তখন তিনি বিরক্ত হয়ে কানে আঙুল দিয়ে কান বন্ধ করতেন, আর বলেতেন,—'না'।

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি-র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি-র্নো বনস্থো যতি-র্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়ো-র্দাস-দাসানুদাসঃ।।
—(পদ্যাবলী ৬৩ শ্লোক)

এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি এসেছিলেন। জীবের স্বরূপ কি তা তিনি

প্রকাশ করেছেন। "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্-দাস-দাসানুদাসঃ"।—গোপীভর্ত্তুঃ যে কৃষ্ণ, তাঁর পদকমলে আশ্রিত দাসের অনুদাস আমি।" তাই "জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।"—ভক্তিযোগ মাধ্যমে এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি এসেছিলেন। সেজন তিনি স্বয়ং আচরণ মাধ্যমে ভক্তির বিভিন্ন অঙ্গ শিক্ষা দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণনা আছে—সনাতন গোস্বামীকে তিনি সাধন ভক্তির বিভিন্ন অঙ্গ শিক্ষা দিয়েছেন। ৬৪ অঙ্গের কথা তিনি বলেছেন। তার মধ্যে তিনি বলেছেন, এই যে ভগবানের মহোৎসব—"কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন। জন্ম-দিনাদি-মহোৎসব লঞা ভক্তগণ।।" এটা ভক্তির একটি অঙ্গ। বৈষ্ণব বা ভক্ত কৃষ্ণদাস,—কৃষ্ণের জন্য অখিল চেষ্টা তার। তাই "জন্ম-দিনাদি-মহোৎসব লঞা ভক্তগণ।"—উৎসবের দিনে ভক্তদের নিয়ে উৎসব করতে হবে। সাধনভক্তির একটি অঙ্গ, তা মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন, যিনি হচ্ছেন স্বয়ং জগন্নাথ। সেজন্য বৈষ্ণব ও ভক্তগণ এই উৎসব পালন করেন।

বদ্ধজীব জড় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভগবানকে দর্শন করতে পারে না। কারণ ভগবানের রূপ হচ্ছে—সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ কারণম্।।" তাই সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহকে দর্শন করতে হলে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়, সচ্চিদানন্দময় ইন্দ্রিয় দরকার। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তুমি তাঁকে দর্শন করতে পারবে না। কৃষ্ণ কৃপাময়, তাই বদ্ধজীবের জন্য তিনি অর্চাবিগ্রহ হয়েছেন। ভগবানের অর্চাবতার যা দেবালয়ে অর্চনা করা হয়। নাম, রূপ, বিগ্রহ তিন চিদানন্দময়। ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ এবং ভগবানের বিগ্রহ তিন চিদানন্দময়। তাতে কোন ভেদ নেই। 'তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন 'চিদানন্দ-রূপ'।।" যে ভেদ দেখে, সে পাষণ্ডী, সে নারকী। পূজিত বিগ্রহে ভক্ত প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

> "ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্ত জনে।
> চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে।।
> জীবন্যাস করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজ্য হয়।
> 'জন্ম মাত্র এ চারি ঈশ্বর, বেদে কয়।।"
>
> —(চৈ. ভা. ম. ২১/৮১-৮২)

শ্রীমূর্তি বা বিগ্রহ গড়া হয়েছে। তাতে জীবন্যাস করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হলে তা পূজ্য হবে, তা চিদানন্দময় হবে। ভক্ত প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলে অর্চাবতার অর্চনা বা সেবা গ্রহণ করবেন। বদ্ধজীব তাঁকে দেখতে পারবে না। তাই তার জন্য অর্চাবতার হয়েছেন। ভগবানের এক কৃপাময় অবতার তিনি। তিনি সর্বজ্ঞ হয়েও অজ্ঞ প্রায়। অর্চাবতারকে আধ্যক্ষিকেরা দেখতে পারে না বা জানতে পারে না। আধ্যক্ষিকদের মতে—এঁরা কাষ্ঠ, পাষাণের মূর্তি পূজা করছেন, এঁরা প্রতিমা পূজা করছেন। তাই বলা হয়েছে—"অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী-গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।।" এই শ্লোকটি পদ্মপুরাণে অন্তর্গত। শ্লোকটিতে অর্চাবতার সম্বন্ধে বলা হয়েছে। যে অর্চাবতারকে কাষ্ঠ, পাষাণের মূর্তি বলে সে হচ্ছে পাষণ্ডী, নারকী। যাঁর সেই দিব্য চক্ষু আছে, তিনিই দেখছেন চিদানন্দময় সেই মূর্তিকে, তিনি কিরূপে প্রেমিক ভক্তের সেবা গ্রহণের জন্য অর্চাবতার হয়েছেন। তিনি সর্বশক্তিমান্ হয়েও অশক্ত প্রায়। তিনি সর্বশক্তিমান্, কিন্তু অর্চাবতারে হয়েছেন নিঃশক্তিক। ভক্ত তাঁকে উঠাবেন, তাঁকে স্নান করাবেন, শৃঙ্গার করাবেন, তাঁকে পূজার্চনা করবেন, ভোগ অর্পণ করবেন, তাঁকে খাইয়ে দেবেন, শয়ন দেবেন, জাগাবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সেবা স্বীকারের জন্য তিনি সর্ব-শক্তিমান হয়েও অশক্ত প্রায়। জগন্নাথের উৎসব আমরা করছি। তাঁকে দোলায় বসিয়ে আনছি। তারপর রথের ওপরে তাঁকে উঠিয়ে বসাচ্ছি। যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান্, জগতের নাথ, তিনি তো আপে আপে চলতে পারতেন। না, তিনি ভক্তের সেবা অঙ্গীকার করেছেন। তিনি সকলের রক্ষক। কিন্তু ভক্তকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে মন্দিরে সেবা গ্রহণ করার জন্য বিরাজমান হয়েছেন। ভক্ত তাঁকে রক্ষা করবেন। ভক্ত তাঁর সম্পত্তির সুরক্ষা দেবেন। চোর, দস্যুরা এসে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে শ্রীবিগ্রহ ও তাঁর অলঙ্কারাদি চুরী করে নিচ্ছে। সেক্ষেত্রে আধ্যক্ষিকেরা বলছে—তিনি তো সর্বশক্তিমান্, তিনি কেন নিজেকে রক্ষা করলেন না ? না, সর্বশক্তিমান হয়েও তিনি নিঃশক্তিক। কারণ ভক্ত তাঁকে রক্ষা করবেন, ভক্ত তাঁর স্বামী। তিনি রাত্রে জাগরণ থেকে ভগবানের সম্পত্তি, তাঁর শ্রীবিগ্রহ, তাঁর উপভোগ সামগ্রী আদি জাগ্রত প্রহরীরূপে জাগছেন ও রক্ষা করছেন। এ হ'ল অর্চাবতারের বিশেষত্ব। আধ্যক্ষিকেরা তা বুঝতে পারে না।

অর্চাবতার প্রেম সমাধিযুক্ত মহাভাগবতদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর লোকহিতার্থে বাইরে প্রকাশিত হয়েছেন। সেজন্য বলা হয়েছে—"কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে।" ভাগবতে বলা হয়েছে, "অহং ভক্ত পরাধীনো..।" ভক্ত-বাৎসল্য ভগবানকে আবার বলা হয়েছে—"বিষ্ণু যদি হৃদয়ন যস্য প্রণয় রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিং ছদ্ম...।" অর্থাৎ সেই প্রেমিক ভক্ত তাঁর প্রণয় রজ্জু দ্বারা তাঁকে (ভগবানকে) বেঁধে রেখেছেন। তাঁর হৃদয় ভগবান্ ত্যাগ করেন না। সেই প্রেমিক ভক্ত তাঁর হৃদয়ের দেবতাকে কারিগরকৃত মূর্তির মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। "জীবন্যাস করিলে শ্রীমূর্তি পূজ্য হয়।" ভক্ত তাঁর হৃদয়ের ধনকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আহ্বানে ভগবান্ আসেন ও স্বরূপ প্রকট করেন, প্রকাশমান হন। "ভক্তেচ্ছা উপান্তরূপায় পরমাত্মনে নমোস্তুতে।" তাই প্রেমিক ভক্তের ইচ্ছায় তিনি স্বরূপ প্রকট করেন। যখন ভক্ত তাঁর হৃদয়ের ধনকে বিগ্রহ মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ভগবান্ অবতরণ করেন। তখন তিনি পূজ্য হন। মহাভাগবতগণ যে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ স্বরূপ দর্শন করেন, তা তাঁরা বাইরে প্রকট করেন, অর্চাবতার মধ্যে প্রকটিত করান। যাঁরা অন্তঃ সাক্ষাৎকার করছেন অর্থাৎ অন্তর্বহিঃ দর্শন করছেন তাঁরাই এ ধরাধামে ভগবানকে অবতরণ করিয়ে থাকেন। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে—

> প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
> সন্তঃ সদৈবহৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি
> যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
> গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।
> —(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩৮)

'ভক্তি বিলোচনেন'—ভক্তের চক্ষু প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত। তিনি তাঁর চোখে কৃষ্ণপ্রেম রূপ অঞ্জন লাগিয়েছেন। তিনি ভক্তি চক্ষু লাভ করেছেন। আবার তিনি সেই শ্যামসুন্দর রূপ দেখছেন। "কন্দর্প কোটি কমনীয় বিশেষ শোভং..।" কোটি কন্দর্পের রূপকে ধিক্কার করছে যে শ্যামসুন্দর রূপ, তাঁকে তিনি হৃদয়ের মধ্যে দেখছেন, বাইরেও দেখছেন। তাই যাঁরা অন্তঃ সাক্ষাৎকার, তাঁরা বহিঃ সাক্ষাৎকার রূপ ভগবৎ অনুভব করে থাকেন। তাঁরা তাঁদের হৃদয়েব ধনস্বরূপ শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন— যাঁরা প্রেমিকভক্ত। তা না

হলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে পারে না কি শ্রীমূর্তি পূজ্য হতে পারে না। মায়াবাদী বা অন্য কেউ প্রতিষ্ঠা করবে তো, সে বিগ্রহ পূজ্য হবে না। তাঁদের কাছে ভগবান্ অবতরণ করবেন না। কল্পিত প্রতিমা প্রতীক সকল মূর্তি পদবাচ্য নন্। যে কোন ব্যক্তি শ্রীনারায়ণ, কৃষ্ণ, গৌরসুন্দরের নিত্য বাস্তব অপ্রাকৃত রূপ কল্পনা করে অঙ্কন করলে যে তা পূজ্য হয়ে যাবে তা নয়। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ তাঁর পূজা করেন না। তা অর্চাবতার রূপে গণ্য হন না। "শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী। মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা।।" প্রেম সমাধি যোগে মহাভাগবত প্রেমিকভক্তগণের হৃদয়ের শ্রীমূর্তি অনুরাগ সহকারে, প্রেমের আহ্বানে, ভক্তের আকুল আহ্বানে অবতরণ করেন। তারপর তিনি অর্চাবতার রূপে পূজিত হন। আধ্যক্ষিকেরা এটি বুঝতে পারে না। শ্রীজগন্নাথের শ্রীমূর্তি সম্বন্ধে আধ্যক্ষিকেরা নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা করে থাকে। কেউ কেউ জগন্নাথকে কৃষ্ণ হতে ভিন্ন বলে মনে করে থাকে। সে সম্বন্ধে নানা প্রকার কল্পিত কাব্য-কবিতা, কল্পিত সন্দর্ভ, কল্পিত প্রবন্ধাদি রচনা করেছে এবং তার বয়ানও করছে। কিন্তু ভগবানকে কে জেনেছে ? কার কাছে তিনি প্রকাশিত হয়েছেন ? সেজন্য গীতায় ভগবান্ বলেছেন—"নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।।" "মূঢ় বা মূর্খ লোক আমাকে জানতে পারে না। আমি তাদের কাছে প্রকাশিত হই না।" কিন্তু ভক্তের কাছে তিনি প্রকাশিত হয়ে থাকেন। যিনি কৃষ্ণ-প্রেম-রূপ অঞ্জন চোখে লাগিয়েছেন, তাঁর কাছে ভগবান্ নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেন না। সেজন্য যাদের জ্ঞানের ঔদ্ধত্য আছে, যা কুন্তীদেবী শ্রীমদ্ ভাগবতে বলেছেন—

> "জন্মৈশ্বর্যশ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
> নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্।।"
> — (ভা. ১/৮/২৬)।

অর্থাৎ—হে কৃষ্ণ! যার জন্মের অর্থাৎ উচ্চকুলের আভিজাত্য আছে ; উচ্চ কুল বংশ জাত বলে গর্ব আছে, ঐশ্বর্য, ধনধান্য প্রচুর পরিমাণ যার আছে, তার গর্ব আছে। 'শ্রুত' মানে খুব বিদ্যাধ্যয়ন করেছে, জড় বিদ্যায় খুব পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে, তাই পাণ্ডিত্যের গর্ব আছে এবং 'শ্রী' বা 'সৌন্দর্যে'র জন্য রূপের গর্ব আছে, সেই প্রকার অহঙ্কারে গর্বিত, স্পর্ধিত ব্যক্তিদের কাছে আপনি দৃষ্টিগোচর হন্ না। সেই প্রকার গর্বিত, অহঙ্কারী ব্যক্তি যদি দর্শন করতে

যায় মন্দিরে, তবে তারা কখনও ভগবানের সেই মাধুর্যময় মূর্তি, সেই অর্চাবিগ্রহে কিরূপে প্রকটিত হয়েছেন, তা দর্শন করতে পারবে না। তাদের গোচরীভূত হন না সেই ভগবান্। সেজন্য অকিঞ্চন, নিষ্কিঞ্চন হতে বলা হয়েছে। অকিঞ্চন, নিরভিমান, নিষ্কাম ভক্ত, যাঁর কোন কামনা নেই তিনিই ভগবৎ দর্শনের যোগ্য ব্যক্তি। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে—"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।" অর্থাৎ সেই নিষ্কাম ভক্ত অকিঞ্চন ভক্ত 'উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।' শ্রীমন্ মহাপ্রভুও সেই একই শিক্ষা প্রদান করেছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।"

স্বয়ং ভগবান, স্বয়ং জগন্নাথ এসে শিখিয়েছেন কিরূপে তুমি হরিভজন করলে ভগবানকে দর্শন করতে পারবে। অর্থাৎ তুমি তৃণ হতে নিজেকে হীন মনে করবে, কোন গর্ব-দম্ভ অভিমান প্রকাশ করবে না, সর্বদা নিরভিমান। তারপর 'তরোরিব সহিষ্ণুনা'। বৃক্ষ হতে আরও সহিষ্ণু হবে। কৃষ্ণ অধিষ্ঠান জেনে অন্য সকলকে সম্মান করবে, নিজে কোন সম্মানের দাবী করবে না, সতত হরি কীর্তনে রত থাকবে। তাহলে সেই ভগবান্ তোমার দৃষ্টি গোচর হবেন, নচেৎ 'জন্মৈশ্বর্যশ্রুতশ্রী'-তে যাদের ঔদ্ধত্য আছে, তারা জগন্নাথ সম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনা করে থাকে। কিন্তু জগন্নাথ যে সেই শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ, তা তারা দর্শন করতে পারে না। কিন্তু লোকেরা এরূপ অবিদ্যাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে, তারা জগন্নাথাষ্টক গান করছে, কিন্তু জগন্নাথ যে কে তা তারা জানতে পারে না। সেই জগন্নাথষ্টক শ্রীমন্ মহাপ্রভু গান করেছিলেন—

কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন-সঙ্গীত-তরলো
মুদাভীরী-নারী-বদন-কমলাস্বাদ-মধুপঃ।
রমা-শম্ভু-ব্রহ্মামরপতি-গণেশার্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।।

অর্থাৎ—"যিনি কখনও কখনও যমুনা-তীরস্থ বনমধ্যে সঙ্গীত গান করতে করতে ভ্রমরের মতো আনন্দে ব্রজগোপীদের মুখারবিন্দের মধু পান করেন এবং লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও গণেশ প্রমুখ দেবদেবীগণ যাঁর চরণ-যুগল অর্চনা করে

থাকেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন্।"

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটীতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে।
সদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন-বসতি লীলা-পরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।।

অর্থাৎ—"যিনি বাম হস্তে বেণু, শিরে শিখিপুচ্ছ, কটিতটে পীতাম্বর ও নয়ন-প্রান্তে সহচরগণের প্রতি কটাক্ষ ধারণ ক'রে সর্বদা শ্রীবৃন্দাবনে বাস ও লীলা করছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন্।"

মহাম্ভোধেস্তীরে কনক-রুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ-বলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রা-মধ্যস্থঃ সকল-সুর-সেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।।

"যিনি মহাসমুদ্রের তীরে কনকোজ্জ্বল-নীলাচল-শিখরে প্রাসাদাভ্যন্তরে বলিষ্ঠ সহোদর শ্রীবলদেব সহ সুভদ্রাকে মধ্যে স্থাপনপূর্বক অবস্থান করছেন এবং সমস্ত দেবগণকে যিনি স্বীয় সেবা করবার সুযোগ প্রদান করেছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন্।"

কৃপা-পারাবারঃ সজল-জলদ-শ্রেণিরুচিরো
রমা-বাণী-রামঃ স্ফুরদমল-পঙ্কেরুহ-মুখঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা-গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।।

"যিনি দয়ার সাগর, সজল জলধরের মতো যাঁর অঙ্গকান্তি, যিনি লক্ষ্মী-সরস্বতীর সঙ্গে বিহার করছেন, যাঁর বদনমণ্ডল অমল কমলের ন্যায় শোভা পাচ্ছে, যিনি সমস্ত দেবগণের আরাধ্য-ধন এবং বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্রসমূহ যাঁর চরিত্র গান করছেন, সেই জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন্।

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিত-ভূদেব-পটলৈঃ
স্তুতি-প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।

দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকল-জগতাং সিন্ধু-সদয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।।

অর্থাৎ—"রথে আরোহণ ক'রে গমন করতে থাকলে পথিমধ্যে ব্রাহ্মণগণ যাঁর স্তব করতে থাকেন এবং সেই স্তব শ্রবণ ক'রে যিনি পদে পদে প্রসন্ন হন, যিনি দয়ার সাগর, যিনি নিখিল জগতের বন্ধু এবং যিনি সমুদ্রের প্রতি সদয় হয়ে তদুপকূলে বিরাজ করছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন্।"

পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়-দলোৎফুল্ল-নয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিত-চরণোঽনন্ত-শিরসি।
রসানন্দী রাধা-সরস-বপুরালিঙ্গন-সুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।।

অর্থাৎ—"যিনি পরমার্চনীয়, পরব্রহ্ম, যাঁর নেত্রযুগল নীল-কমলদলের ন্যায় উৎফুল্ল, যিনি নীলাচলে অবস্থান করছেন, যিনি অনন্তের শিরে পদার্পণ ক'রে রয়েছেন, যিনি প্রেমানন্দময় এবং যিনি শ্রীরাধিকার রসময়-দেহালিঙ্গনসুখে সুখী, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন্।"

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনক-মাণিক্য-বিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকল-জন-কাম্যাং বরবধূম্।
সদা কালে কালে প্রমথ-পতিনা গীত-চরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।।

অর্থাৎ—"আমি রাজ্য চাই না, স্বর্ণ-মাণিক্যাদি বৈভব চাই না, সর্বজনের স্পৃহণীয় সুন্দরী নারীও চাই না, কেবল এই চাই যে, প্রমথনাথ মহাদেব সর্বক্ষণ যাঁর চরিত্র গান করেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন্।"

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে!
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে!
অহো দীনেঽনাথে নিহিতচরণো নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।।

"হে সুরপতে! অতি শীঘ্র আমাকে এ অসার সংসার থেকে উদ্ধার কর; হে

যদুপতে! আমার দুঃসহ পাপভার বিমোচন কর। অহো! দীন ও অনাথ ব্যক্তিগণকে যিনি নিশ্চিতরূপে নিজ শ্রীচরণ সমর্পণ ক'রে থাকেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন, পথের-পথিক হোন।"

এই আটটি শ্লোক জগন্নাথাষ্টক। এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিক হচ্ছে কৃষ্ণ ও জগন্নাথ অভিন্ন। সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ।

জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
সর্বপাপ-বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।।

ইতি শ্রীগৌরচন্দ্র মুখপদ্ম বিনির্গতং শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকং সম্পূর্ণং। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই জগন্নাথাষ্টক গান করেছিলেন। সেই জগন্নাথদেবের এই রথযাত্রা মহোৎসব এখন পৃথিবীতে সর্বত্র পালিত হচ্ছে।

আমাদের পরমারাধ্যতম গুরুদেব শ্রী শ্রীমদ্ এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অতি প্রিয় ভক্ত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ সর্বত্র জগন্নাথকে প্রকট করেছেন। পরম ভাগবত, মহাভাগবত, তাঁর হৃদয়ের ধনকে তিনি প্রকট করেছেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীজগন্নাথ, তিনি ভক্তবাৎসল্য স্বীকার করে সর্বত্র প্রকটিত হয়েছেন। সেই জগন্নাথদেবের এই রথযাত্রা সম্বন্ধে পৃথিবীর সর্ব প্রাচীনতম শাস্ত্র বেদেতে বর্ণনা আছে। 'রথ' শব্দটি তাতে উল্লেখ আছে। কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়, ৩য় বল্লীর—৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৯ম মন্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে, এ শরীরটাকে রথের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।।
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।।
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ।।
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।।

বেদে বিষ্ণু ও সূর্যের রথের কথাও দেখতে পাওয়া যায়। কঠোপনিষদের

(১/৩/৩) মন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে—"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।" এই শরীরটাই হচ্ছে রথ এবং আত্মা হচ্ছে রথী। 'বুদ্ধিং তু সারথিং' অর্থাৎ বুদ্ধি হল সারথি। 'মনঃ প্রগ্রহমেব চ'—মন হচ্ছে লাগাম। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু-- ইন্দ্রিয়গুলি হল অশ্ব। 'বিষয়াংস্তেষু গোচরান্'—ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়বস্তুগুলি অশ্বরূপী ইন্দ্রিয়গুলির দৃষ্টিগোচর না হয়, সেজন্য রথী-রূপী আত্মার নির্দেশে সারথি-রূপী বুদ্ধি সেই মনোরূপী অশ্বগুলির লাগাম শক্ত করে ধরেছে। 'দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ' অর্থাৎ এই অশ্বগুলি খুব দুষ্টু। সেজন্য গীতায় ভগবান বলেছেন, "ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথিনী"—ইন্দ্রিয়গুলি খুব দুর্দান্ত বলবান্। সেগুলি সংযম করা উচিৎ। লাগাম দ্বারা যদি তাদেরকে ঠিকভাবে ধরবে তো, তবে তারা সোজা চলবে, বড় দাণ্ডে (খুব চওড়া রাস্তায়) সোজা গতি করবে। তারপর বলা হয়েছে—'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্'—অর্থাৎ সেই বিষ্ণু যিনি একমাত্র লক্ষ্যস্থল, তাঁর দিকে তাকাবে। এইজন্য লাগাম ধরে সেই ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

আবার রথযাত্রার ইতিহাস যদি আমরা দেখি, তাহলে এর ঐতিহাসিক বর্ণনাও আছে। খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতাব্দীতে প্রাচীন দ্রাবিড়ের সর্ব-দক্ষিণ অংশ পাণ্ড্যদেশে 'পাণ্ড্য বিজয়' বা 'পাণ্ডু বিজয়' নামে জনৈক মহা পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। সেই পাণ্ড্য বিজয়ের একজন বিষ্ণুভক্ত পুরোহিত ছিলেন। তার নাম দেবেশ্বর। তাঁর উপদেশানুসারে পাণ্ড্যরাজ সনাতন ধর্মের পুনঃ প্রবর্তন করেন। বৈষ্ণবরাজ পাণ্ডু বিজয় বৌদ্ধদের কবল থেকে শ্রীজগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা— এই বিগ্রহত্রয়কে উদ্ধার করে তাঁদেরকে রথে আরোহণ করিয়ে পুরীর পূর্ব-উত্তর ভাগে 'সুন্দরাচল' নামে এক নির্জন উপবনে সংরক্ষণ করেছিলেন। এ হল খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতাব্দীর কথা। রাজা পাণ্ড্য বিজয় কিছুদিন পরে সেই তিনটি বিগ্রহ পুনরায় শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্দিরে এনে সেখানে স্থাপন করেন। বর্তমান রথযাত্রার দিনে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার রথারোহণ কার্যকে 'পাণ্ড্য বিজয়' বা 'পাণ্ডু বিজয়' বা 'পহণ্ডি বিজে' বলে অভিহিত করা হয়েছে। রাজা পাণ্ড্য বিজয়ের মন্ত্রী ছিলেন দেবেশ্বর। দেবেশ্বরের পুত্র ছিলেন দেবতনু। তিনি ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করে 'আদিবিষ্ণু স্বামী' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। সেই আদিবিষ্ণু স্বামী রুদ্র সম্প্রদায়ের আচার্য। তিনি অষ্টোত্তরশত ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসী ছিলেন।

ভবিষ্য পুরাণেও উল্লেখ আছে—সত্য যুগে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু সহস্র বছর পূর্বে প্রহ্লাদ মহারাজ প্রথমে মহাবিষ্ণুর রথ টেনে ছিলেন। তারপর দেবতা , সিদ্ধ, গন্ধর্বগণও সেই রথযাত্রার অনুষ্ঠান করেছিলেন। অতি প্রাচীনকালে কোন কোন স্থানে কার্তিক মাসে শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা অনুষ্ঠানের কথা শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু আষাঢ় মাসে পুষ্যা নক্ষত্রযুক্তা শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতেই শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার বিধি। রথযাত্রার পূর্ব দিনটিকে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন লীলা বলা হয়। ঐ দিনে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদের স্বীয় ভক্তদের সঙ্গে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন লীলা প্রকাশ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, ভগবানকে হৃদয় মন্দিরে বসাতে হলে সেখানে কোনও প্রকার কামনা-বাসনারূপী আবর্জনা রাখলে ভগবান সেখানে অবস্থান করবেন না। কপটতা, ভোগ-মোক্ষ কামনা, যশাকাঙ্খা এগুলি হল ময়লা। এগুলি হচ্ছে হৃদয়ের আবর্জনা। এগুলি পরিষ্কার করতে হবে। এ হল গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন লীলার বৈশিষ্ট্য। এই লীলার তাৎপর্য হল বিশুদ্ধ হৃদয় হচ্ছে প্রভু বা স্বামী শ্রীজগন্নাথদেবের উপবেশনের যোগ্য স্থান। তাই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবস্থান কালে বৈষ্ণবদের সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজে ঝাড়ু দিয়ে আগে বাইরে পরিষ্কার করলেন। ঘাস, লতাদি গাছ যা ছিল সুন্দরাচল মন্দিরে সেগুলি পরিষ্কার করেন। তারপর অতি সুন্দরভাবে ভিতর পরিষ্কার করেন, যাতে সামান্য একটু ময়লা কোথাও না থাকে। এটির তাৎপর্য হল, হৃদয় সিংহাসন অতি সুন্দরভাবে পরিষ্কার করলে শ্রীজগন্নাথদেব সেখানে অবস্থান করবেন।

আবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি স্বয়ং ভগবান জগন্নাথ, তিনি রথযাত্রার তাৎপর্য কি তা প্রদর্শন করেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব নিজে শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রে সূর্যপরাগের সময়ে সমাগত বিরহ-বিধুরা গোপ-গোপীদের বিরহ ভাবে বিভাবিত হয়ে নীলাচল রূপ কুরুক্ষেত্র হতে সুন্দরাচল রূপ বৃন্দাবনে শ্যামসুন্দর শ্রীজগন্নাথদেবকে গান গেয়ে গেয়ে নিয়ে যেতেন। ভাগবতে উল্লেখ আছে—সূর্যপরাগ হয়েছিল। সূর্যপরাগ হলে তীর্থস্থানে যাত্রা করতেন। তাই কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে যাদবগণ গিয়েছিলেন, এবং গোপ-গোপাঙ্গনাগণও সেখানে এসেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে তাঁদের সকলের মিলন হয়েছিল। তবে কৃষ্ণ গোপপুর ত্যাগ করে মথুরাতে এসে কংসকে বধ করলেন। তারপর তিনি

দ্বারকাতে রাজা হলেন। তিনি দ্বারকাধীশ হয়ে থেকে গেলেন, আর ব্রজেতে ফেরেননি। গোপিগণ কৃষ্ণের জন্য বিরহ-বিধুরা হয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাধাভাব অঙ্গীকার করেছেন। তাই বিরহ-বিধুরা ভাব। তাই যখন কুরুক্ষেত্রে মিলন হয়েছিল, তখন সেখানে গোপ-গোপিগণ এসেছিলেন, কৃষ্ণ বলরাম এসেছিলেন এবং যাদবগণও এসেছিলেন। তাই সেটাই হল রথযাত্রা। তাই তিনি বিরহ -বিধুরা গোপ-গোপিগণের ভাবে বিভাবিত হয়ে নীলাচল রূপ কুরুক্ষেত্র হতে সুন্দরাচল রূপ বৃন্দাবনে সেই শ্যামসুন্দর জগন্নাথকে গান গেয়ে গেয়ে নিয়ে যেতেন। তাই তিন গোপীভাবে বিধুরা, রাধা ভাবে বিধুরা হয়ে গেয়েছেন—

''সেই ত' পরাণনাথ পাইনু।
যাঁহা লাগি' মদন-দহনে ঝুরি' গেনু।।''

এভাবে তিনি গান গেয়েছিলেন। বিরহ-বিধুরা হয়েছেন মদন দহনে। মদন পীড়া দিচ্ছেন তাঁকে। তাই সেই পরাণনাথকে আজ তিনি খুঁজে পেয়েছেন। আবার গান গেয়েছেন—''যাঁহা লাগি' মদন দহনে ঝুরি' গেনু।'' এভাবে বিভাবিত হয়ে তিনি টানতে টানতে নিয়ে যেতেন শ্যামসুন্দরকে। তাই এইভাবে রথের দড়ি ধরে টানতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজজন গোপ-গোপীদেরকে বিরহ সাগরে নিক্ষেপ করে দ্বারকাতে রাজা হয়েছিলেন। গোপ-গোপীদের সহজ সম্পদ বৃন্দাবনের ফল-মূল, কিশলয়, যমুনা নদী, কদম্ব কানন, ময়ূর ও গোধন। তাঁরা কৃষ্ণের রাজবেশ দেখতে চান্ না, চান্ গোপবেশ। সেই গোপবেশ, মাধুর্যময় বেশ। কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের ঐশ্বর্যের ব্যবহার নেই। দূর্-দূর্ ভাব নেই। কৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁদের অতি নিকটতম, নিজজন। রাজা কিন্তু ঐশ্বর্যের অধিকারী, তাই সেখানে সম্ভ্রম আছে। তাঁর কত প্রতিহারী, সুরক্ষক আছেন। কিন্তু ব্রজজনের কাছে, গোপগোপীদের কাছে সেসব কথা নেই। এ হচ্ছে শ্রীচৈতন্যদেবের বিরহ-বিধুরা গোপীভাব। এই গোপীভাবে বিভাবিত হয়ে রথস্থিত জগন্নাথদেবকে তিনি বলতেন—

আহুশ্চ তে নলিন-নাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ।।-(ভা. ১০/৮২/৪৮)

শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধের এই শ্লোকটি শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভু গান করতেন। বিশেষ করে যখন রথের সম্মুখে নৃত্য করে রথের দড়ি ধরে টানতেন, তখন উক্ত শ্লোকটি তিনি গান করতেন। যেভাবে গোপীরা প্রার্থনা সুরে বলেছিলেন—''হে নলিননাভ শ্রীকৃষ্ণ! আপনার পাদপদ্ম-যুগল অগাধ-বোধ বিশিষ্ট, অর্থাৎ অনন্ত। ব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণ সর্বদা হৃদয়েই আপনাকে ধ্যান করে থাকেন। সংসার-কূপে পতিত জীবদের উত্তরণের একমাত্র অবলম্বন-স্বরূপ আপনার পাদপদ্ম। গৃহসেবিনী, আমাদের মনে সর্বদা আপনার সেই পাদপদ্মযুগল উদিত হোক্।'' এই প্রার্থনা গান করেছিলেন গোপীভাবে বিভাবিত হয়ে শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভু। এভাবে তিনি শ্যামসুন্দরকে এসো এসো বলে টানতে টানতে নিয়ে চলেছেন বৃন্দাবন অভিমুখে। নীলচল-রূপী কুরুক্ষেত্র হতে সুন্দরাচল-রূপী বৃন্দাবনে উক্তভাবে গান করতে করতে টেনে নিয়ে চলেছেন—

অন্যের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি।
তাহাঁ তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।।
তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ, অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায়।।
তুমি-ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন,
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ্।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি' জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাও নিজ-পদ।।
—(চৈ.চ.ম. ১৩/১৩৭, ১৪৬, ১৪৭)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

এখানে 'হরা' অর্থাৎ, শ্রীমতী রাধারাণীকে বলা হয় 'হরা'। সম্বোধনে 'হরে'। আবার গোপিগণ কৃষ্ণকে অপহরণ করে এনেছিলেন বলে তাঁদেরকেও 'হরা'

বলা হয়। কুরুক্ষেত্রে যাদবদের কাছ থেকে তাঁকে (কৃষ্ণকে) অপহরণ করে এনেছিলেন বলে তাঁর (শ্রীমতী রাধারাণীর) নাম 'হরা'। তাই প্রেম-বিবশ হয়ে সেই জগন্নাথ, শ্যামসুন্দর চলে এলেন বৃন্দাবনে। এ হ'ল রথযাত্রা। গোপী-প্রেম-বাধ্য সেই শ্যামসুন্দর। প্রকৃত তত্ত্বটা না জেনে মনোধর্মীরা বহু অপসিদ্ধান্ত, অশাস্ত্রীয় কথা বলছে ও লোকসমাজে প্রচার করে জনসমাজকে বিভ্রান্ত করছে। আসল কথাটা শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজে দেখিয়েছেন। গোপীপ্রেমে উদ্বুদ্ধ শ্যামসুন্দর চলে এসেছেন। তাঁকে তাঁর (গোপীরা) টানতে টানতে নিয়ে এসেছেন। কেউ তাঁদেরকে আটকাতে পারেন নি।

'বিষ্ণুধর্ম'তেও এই পবিত্র উৎসবের তিথি নির্ণয় করা হয়েছে।

আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যা সংযুতা ।
তস্যাং রথে সমারোপ্য রামং মাং ভদ্রয়া সহ ।।
যাত্রোৎসব প্রবৃত্ত্যাথ প্রাণয়েচ্চ দ্বিজান্ বহূন্।
রিষাভাবে তিথৌ কার্য্য সদা সা প্রীতয়ে মম ।।
সপ্তাহং সরিতস্তীরে মম যাত্রা ভবিষ্যতি ।
অষ্টমে দিবসে সর্বান্ রথান্ মাল্যৈর্বিভূষয়েৎ।।
নবম্যা মানয়েদ্দেবাং স্তেষু প্রীতঃ সমৃদ্ধিবান্ ।
দক্ষিণাভিমুখী যাত্রা বিষ্ণোরেষা সুদুর্ল্লভা।।
যথা পূর্বা তথা চেয়ং তে দ্বে মুক্তি প্রদায়িকে।।

অর্থাৎ—আষাঢ় মাসের পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। ঐ তিথি আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি পুষ্যা নক্ষত্র যুক্ত হলে প্রকৃষ্ট হয়। শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীবলরামের সঙ্গে শ্রীজগন্নাথদেবকে রথে আরোহণ করিয়ে এই উৎসব করতে হয়। যদি ঐ তিথিতে পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ না হয়, তা হলেও উক্ত তিথিতেই এর অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। এ স্থলে কেবল তিথিরই প্রাধান্য, অধিকান্তু নক্ষত্রযোগ হলে বিশিষ্ট গুণ হয় মাত্র। উক্ত দিনে নানাবিধ উৎসব ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয়। শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীবলরামের সঙ্গে শ্রীজগন্নাথদেবকে রথে আরোহণ করিয়ে যাত্রা করা বিধেয়। এভাবে সব করতে হয়। এই ভাব যদি তোমার নেই, তবে সেই ভাব বিনোদিয়া, "ভাবেতে নিকট অভাবেতে দূর"। ভাব যদি নেই, তবে সেই জগন্নাথ কাষ্ঠ, প্রতিমা হয়ে যায়। তারপর রথটি সাত দিন নদীতীরে রেখে,

অষ্টম দিনে নানাপ্রকার ভূষণাদি-দ্বারা সজ্জিত করে নবম দিনে পুণর্যাত্রা করতে হয়। শ্রীবিষ্ণুর দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা অতি দুর্লভ ও মুক্তি-প্রদায়ক। দ্বিতীয়া তিথিতে যাত্রা করলে, নবম দিনে পুনর্যাত্রার সময়ে তা একাদশী তিথিতে পড়ে। সে সম্বন্ধে পদ্ম পুরাণের প্রমাণও দেওয়া হয়েছে—

আষাঢ়স্য দ্বিতীয়ায়াং রথং কুর্যাদ্বিশেষতঃ।
আষাঢ়শুক্লৈকাদশ্যাং জপ-হোম-মহোৎসবম্।।
রথস্থিতং ব্রজন্তং তং মহাবেদীমহোৎসবে।
যে পশ্যন্তি মুদা ভক্ত্যা বাসস্তেষাং হরেঃ পদে।।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং প্রতিজ্ঞাতং দ্বিজোত্তমাঃ।
নাতঃ শ্রেয়ঃপ্রদো বিষ্ণোরুৎসবঃ শাস্ত্রসম্মতঃ।।

অর্থাৎ—"আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা করে বিশেষতঃ শুক্লা একাদশীর দিনে পুনর্যাত্রা করতে হয়। ঐ দিন জপ ও হোমাদি-মহোৎসব বিধেয়। এই মহোৎসবে যাঁরা শ্রদ্ধা ও আনন্দ-সহকারে বিষ্ণুকে রথে বা গমন সময়ে দর্শন করেন, তাঁদের বিষ্ণুলোকে বাস হয়ে থাকে। অতএব হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করে প্রতিজ্ঞা করছি যে, এই শ্রীবিষ্ণুর উৎসব শাস্ত্রসম্মত এবং এটি অপেক্ষা পরম মঙ্গলপ্রদ আর কিছুই নেই।" "সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং প্রতিজ্ঞাতং দ্বিযোত্তমাঃ। নাতঃ শ্রেয়ঃপ্রদো বিষ্ণোরুৎসবঃ শাস্ত্রসম্মতঃ।।" এটি তিন বার সত্য করে বলা হয়েছে। আবার "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে"—সাধারণতঃ হিন্দুদের মধ্যে এ কথাটি খুব প্রচলন আছে ।

শ্রীজগন্নাথদেবই হচ্ছেন শ্যামসুন্দর—যদি এই প্রকৃত সত্য কথাটা না বুঝবে তা হলে কিছু লাভ নেই। তিনি গোপীদের হৃদয়ের প্রাণধন। তিনি রাধাবল্লভ, রাধার হৃদয়সর্বস্ব সেই গোবিন্দ। তিনি রাধিকাপরদেবতা। তিনি রাধারাণীর হৃদয়ের ধন। তিনি গোপীনাথ, গোপীজনবল্লভ, শ্যামসুন্দর। তা স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যিনি স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেব, তিনি আচরণ করে দেখিয়েছেন। তাই এই ভাবটি জাগ্রত করে ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে তাঁকে আনতে না পারলে তো, তা প্রকৃত রথযাত্রা উৎসব নয়। যাঁদের এই ভাব আছে, যে ভাব শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভু প্রকাশ করেছিলেন, তাঁরাই শ্রীজগন্নাথদেবের ঐ মূর্তিতেই শ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ দর্শন করবেন। নচেৎ অন্যেরা দর্শন করতে পারবে না।

রাধার একমাত্র হৃদয়ের ধন সেইগোবিন্দ। তিনি রাধার অনুগত জনকেই কেবল দর্শন দেন, অন্য কাউকে দর্শন দেন না। যারা গোবিন্দ দর্শনের অনধিকারী তারা দর্শন করুক প্রকাশ বিগ্রহ বলদেবকে। তাতে অযোগ্য হলে চতুর্ব্যূহ দর্শন করুক। তাতে অযোগ্য হলে বৈভব দর্শন করুক। তাতে অযোগ্য হলে গোবিন্দের সর্বাপেক্ষা দয়াময় পতিতপাবন অবতার অর্চা বিগ্রহকে দর্শন করুক। এভাবে ক্রম দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ বিগ্রহ বলতে বুঝতে হবে যিনি স্বয়ং দর্শন দিয়ে অন্যের দর্শন যোগ্যতা প্রদান করেন। তুমি জগন্নাথের সেই শ্যামসুন্দর রূপ দেখবে। এ যোগ্যতা যিনি দান করেন তিনি হচ্ছেন প্রকাশ বিগ্রহ। তিনি হচ্ছেন বলরাম, বলদেব। বলদেব আগে এসেছেন। বলদেবের প্রকাশ বিগ্রহ হচ্ছেন শ্রীগুরু পাদপদ্ম। সেই গুরুদেবের কৃপা, বলরামের কৃপা হলে আমরা সেই জগন্নাথের শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করতে সক্ষম হবো।

গৌরসুন্দর জগন্নাথের সেই বংশীবদন শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করেছিলেন। যখন তিনি সন্ন্যাস নিয়ে এসেছিলেন, তখন আঠার নালা হতে তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এলেন। অন্যেরা পিছনে রয়ে গেলেন। তিনি জগন্নাথের মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। দেখলেন আহা আমার হৃদয়ের ধন শ্যামসুন্দর। জগন্নাথদেবেতে এই শ্যামসুন্দর রূপ দেখে তাঁকে আলিঙ্গন করার জন্য দৌড়ে গিয়ে মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে গেলেন। এই রূপ গৌরসুন্দর দর্শন করেছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব আর কাউকে এই শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করিয়েছেন কি? আর কাউকে করান নি। সেই রাধার ভাব, কান্তি নিয়ে যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যিনি শ্রীচৈতন্যদেব, তাঁকেই তিনি দর্শন দিয়েছিলেন। সেই শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং আচরণ করে শিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে ভগবানকে (জগন্নাথকে) দর্শন করতে হয়। অতএব মহাপ্রভুর আনুগত্যে মার্জিত চিত্ত, সেবাগত প্রাণ হলে সেই জগন্নাথকে দর্শন করতে পারবে। সেই শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ রূপ দর্শন লাভ সম্ভব। নচেৎ এটি সম্ভব নয়, মার্জিত চিত্ত হয়ে এইভাবে উদ্বুদ্ধ হলে এটা সম্ভব হবে। তা নাহলে তুমি 'সিম্বলাইজ্‌ড্ ফিগার্ দেখবে।

আধ্যক্ষিকদের নানা কথা, নানা জল্পনা-কল্পনা। সেই জগন্নাথের হাত নেই, পা নেই ইত্যাদি নানা কথা। সেই জগন্নাথ আবার কৃষ্ণ হতে ভিন্ন। এদিকে আবার জগন্নাথাষ্টক গান করছে, তাতে বর্ণনা রয়েছে, রাধার অঙ্গকান্তি যিনি উপভোগ করেছিলেন, যমুনা-পুলিনে গোপীদের মুখপদ্ম রসাস্বাদন করেছিলেন,

সেই জগন্নাথ স্বামী আমার নয়ন-পথগামী হোন্। তাই তিনি কৃষ্ণ হতে ভিন্ন হলেন কিরূপে? আবার সঙ্গেতে জ্যেষ্ঠ ভাই ও ভগ্নী আছেন। কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভাই হচ্ছেন বলরাম ও ভগ্নী হচ্ছেন সুভদ্রা। যে দেবকীর কন্যা হচ্ছেন সুভদ্রা, সেই বসুদেব দেবকীর পুত্র হচ্ছেন কৃষ্ণ। বসুদেব ও তাঁর অন্য এক পত্নী রোহিণীর পুত্র হচ্ছেন বলরাম। তাই সেই কৃষ্ণ কিরূপে জগন্নাথ থেকে ভিন্ন হলেন। এ অবিদ্যাটা এত জোর, আধ্যক্ষিকতা এত প্রবল যে, এসব সত্ত্বেও এটা তাদের বোধগম্য হচ্ছে না। জগন্নাথকে এরা বুঝতে পাচ্ছে না। এটা বড় দুঃখের কথা।

আবার 'স্কন্দ পুরাণে'র উত্তর খণ্ডে বর্ণনা আছে—শ্রীজগন্নাথদেবের এপ্রকার বিগ্রহ কেন হয়েছে সে সম্বন্ধে বৈদিক সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে, তা আলোচ্য বিষয়। কৃষ্ণ তাঁর সমস্ত লীলাখেলা সমাপন করে গোকুল হতে মথুরাতে চলে এলেন কংসকে বধ করার জন্য। তাঁর অনুপস্থিতিতে রাধারাণী ও গোপীরা কৃষ্ণ বিরহে সতত কৃষ্ণকে চিন্তা করতে লাগলেন। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে একমাত্র কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ। এদিকে কৃষ্ণ ষোল সহস্র মহিষীদের সহ দ্বারকার রাজা হলেন। কিন্তু তাঁর সেই গোপলীলা, ব্রজলীলা সর্বদাই স্মরণ হতে লাগল। তাই তিনিও রাধা তথা গোপিকাদের বিরহে রাধা, রাধা, রাধা হতেন। একদিন সকল রাণী চিন্তা করলেন আমারা সর্বদাই কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত আছি। কিন্তু কৃষ্ণ আমাদের চিন্তা না করে সর্বদা রাধে, রাধে হচ্ছেন। এর রহস্যটা কি জানতে হবে। তাই তাঁরা রোহিণীমাতাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। আবার এক্ষেত্রে রস বিচারের কথা আছে, এঁরা হলেন লক্ষ্মী—ঐশ্বর্যময়ী। কিন্তু রাধা প্রভৃতি গোপিকারা হচ্ছেন মাধুর্যময়ী। এই রহস্য ভেদ আছে। লক্ষ্মী হাজার হাজার বছর কঠিন তপস্যা করে রাস লীলাতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই কৌতুহলবশতঃ তাঁরা রোহিণীমাতাকে জিজ্ঞেস্ করলেন কৃষ্ণ যে সবসময় রাধা রাধা হচ্ছেন, সেই রাধাতত্ত্বটা আমাদেরকে একটু বলুন। এত ঐশ্বর্য তাঁর, আমরা তাঁর এত সেবা করে মন হরণ করছি, তথাপি তিনি রাধা রাধা হচ্ছেন। তাই তাঁরা রাধাতত্ত্ব অথবা বৃন্দাবনের মাধুর্যময় ভাবটা জানার জন্য জিজ্ঞেস্ করলেন। রোহিণীদেবী এসব শুনে বললেন, দেখ একে তো ভাষায় প্রকাশ করা কষ্টকর ব্যাপার, এটা অচিন্ত্য প্রকাশ ভাব। এটা অপ্রাকৃত লীলা কাহিনী। তবে তোমাদের জিজ্ঞাসার জন্য আমি কিছু বলব। কিন্তু একটা আশঙ্কা অথবা ভয়

হচ্ছে, সেই কৃষ্ণ বলরামের কথা এরূপ মাধুর্যময় যে তা বর্ণনা করার সাথে সাথে তারা যেখানে থাক না কেন এই দিব্য কথায় আকৃষ্ট হয়ে এখানে দৌড়ে আসবে। কারণ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ কথা, লীলা, গুণ, বৈশিষ্ট্য, পরিকরাদি সব কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। তাই তারা উপস্থিত হয়ে গেলে আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না এবং রসভঙ্গও হবে। তাই এর জন্য এক উপায় করা যাক্, তারা যাতে আলোচনাক্ষেত্রে না আসতে পারে তা'র জন্য একটা বিরাট প্রকোষ্ঠের মধ্যে এই আলোচনার ব্যবস্থা হোক্। কেবল তাই নয়, সেই প্রকোষ্ঠের মুখশালায় এমন একজন প্রহরী থাকা উচিত, যে কৃষ্ণ-বলরামকে এর মধ্যে প্রবেশ করতে দেবে না। সকলের মনে আশঙ্কা তথা আগ্রহ সৃষ্টি হল। এদিকে কৃষ্ণলীলাগুণ কাহিনী শ্রবণের জন্য ব্যাকুলতা। ওদিকে পহরী হয়ে তাঁদের গতিরোধ করবার নিষ্পত্তি। সকল লক্ষ্মী সমস্বরে বললেন তিনি আমাদের পতি, তিনি আমাদের প্রভু। তাঁকে আমরা কিরূপে প্রতিরোধ করব। পরিশেষে নিষ্পত্তি হল, এই সুভদ্রা ভগ্নী দুই ভাইয়ের অতি আদরের ভগ্নী। তাঁরা আমাদের সকলের অপেক্ষা তাঁকে অধিক ভালবাসেন। তাই তিনি যদি প্রহরী হয়ে জাগবে, তবে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তারপর নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুভদ্রা বাধ্য হয়ে দ্বার জাগবার জন্য গেলেন। তাঁকেও সতর্ক করে দেওয়া হল, কৃষ্ণ-বলরামের আসার সূচনা পাওয়ার সাথে সাথে তিনি যেন রোহিণী মাতাকে খবর দেন, যার ফলে তিনি আলোচনা বন্ধ করে দেবেন। কারণ সে-সময় যে পরিস্থিতি উপস্থিত হবে তা কে সামলাবে ?

তারপর আলোচনা আরম্ভ হল। রোহিণী মাতা কৃষ্ণের জন্ম হতে আরম্ভ করে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরামের সঙ্গে তাঁর বাল্যলীলা, গো, গোবৎসা-লীলা তথা কৃষ্ণের গোপ-লীলাদি অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করতে লাগলেন। আমরা তো পূর্বে বলেছি, কৃষ্ণ ও তাঁর কথা অভিন্ন। কৃষ্ণের সবকিছু অপ্রাকৃত, দিব্য। তা'র ব্যাখ্যা করছেন নিজে রোহিণী মাতা। তাই সকলে দিব্য ভাবে বিভাবিত হলেন, এবং তাঁদের অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদি পরিস্ফুট হল। বক্তা, শ্রোতা সকলেই দিব্যভাবে মগ্ন রইলেন। নিজে সুভদ্রার অবস্থাও তদ্রূপ। সকলের একমাত্র ধ্যান রোহিণী মাতার আলোচনা ওপর। এমন সময় কৃষ্ণ-বলরাম নিজেদের লীলা, গুণ, কাহিনী বর্ণনার আভাস পেয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে গেলেন। আলোচনা চলা প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করতে পাচ্ছেন না। দ্বারে পাহারা

দিচ্ছেন অতি আদরের ভগ্নী সুভদ্রা। নিজেদের দিব্য গুণাবলী শ্রবণ করার জন্য উভয়ে ব্যগ্র। তাই নিরুপায় হয়ে ছোট ভগ্নীর দুই পাশে প্রসারিত দুই হাত দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে দুইভাই সেই পবিত্র লীলা শ্রবণ করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দিব্য ভাবের উদ্রেক হল। এই ভাবাবেশ অবস্থায় ভাই, ভগ্নী সকলের বিস্ফারিত নেত্র। উপরন্তু হস্ত, পদ সঙ্কুচিত হয়ে যেতে লাগল এবং দুই ভায়ের পোষাকের মধ্যে সুভদ্রার হাত দুটি লুকিয়ে গেল। এমন অবস্থায় নারদ মুনি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। দূর হতে এই প্রকার দিব্য ভাবাবেশ অবস্থায় ভগ্নী সহ দুই ভাইকে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দে অধীর হয়ে স্তব গান করতে লাগলেন। নারদ মুনির আগমনে দুই ভাই প্রকৃতিস্থ হয়ে ভাব সম্বরণ করে পুনর্বার পূর্বাবস্থায় ফিরে এলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে নারদ মুনি বর যাচ্ঞা করলেন,—প্রভু! আমি অপানার এই যে ভাবাবেশ মূর্তি-ত্রয় দর্শন করলাম, তা যেন কলিযুগে পূজা পান্। ভগবান তাতে 'অস্তু' করলেন এবং সেই দিন হতে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার এই ভাবাবেশ মূর্তিত্রয় দারুব্রহ্মরূপে উৎকলের পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পূজিত হয়ে আসছেন। তাই এক্ষেত্রে বিচার্য, সেই কৃষ্ণ কিরূপে জগন্নাথ হতে ভিন্ন হলেন। যারা মূঢ়, তারা এইভাবে ভেদভাব দেখে। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বদর্শী সাধু এতে কোন ভেদ দেখেন না। এ হল সেই জগন্নাথ দেবের উৎপত্তি তথা পবিত্র রথযাত্রা মহোৎসব সম্বন্ধে বৈদিক সিদ্ধান্তমূলক প্রমাণ। এটি পাঠ করলে পাঠকের মন হতে সকল প্রকার সংশয় দূর হয়ে যাবে এবং তিনি তখন জানতে পারবেন যে জগন্নাথ ও কৃষ্ণ ভিন্ন নন্, এক।

তাই এ হল প্রকৃত রথযাত্রার তাৎপর্য। আমরা যদি এটা না জেনে, কেবল পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করলে কি হবে ? তাই এসব তত্ত্ব-বিচারানুসারে জানতে হবে। ভগবান্ কৃষ্ণ যা গীতাতে বলেছেন—"ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।" আমাকে যিনি 'তত্ত্বতঃ' অর্থাৎ যথার্থরূপে জানতে পারবেন তাঁর সেই জন্মটা শেষ জন্ম। তাঁর সেই শরীর ত্যাগের পর আমার কাছে অর্থাৎ আমার ধামেতে ফিরে আসবেন। কিন্তু যে এসব তত্ত্ববিচারানুসারে না জানবে তার পতন হবে। তাই ভগবানের এই দিব্য আবির্ভাব তথা লীলা, গুণ, কাহিনী তত্ত্ববিচারানুসারে বিচার্য।

(হরে কৃষ্ণ)

শ্রীক্ষেত্র মাহাত্ম্য

লবণ সমুদ্রের উপকূলে নিত্য-অধিষ্ঠিত পতিতপাবন শ্রীঅর্চাবতার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুরী এবং তার পারিপার্শ্বিক পুণ্যক্ষেত্রসমূহ অনাদিকাল হতে 'শ্রীক্ষেত্র মণ্ডল' নামে প্রচারিত আছে। সুপ্রাচীন পৌরাণিক সাহিত্য এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রাচীন গৌড়ীয় সাহিত্যে এই পরম তীর্থ 'শ্রীক্ষেত্র', 'পুরী', 'পুরুষোত্তম', 'শ্রীজগন্নাথ', 'নীলাচল' প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশিবকে বলেছেন—

সেহ বারাণসী-প্রায় সুরম্য নগরী।
সেইস্থানে আমার পরম গোপ্যপুরী।।
সেই স্থান শিব, আজি কহি' তোমা' স্থানে।
সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহ নাহি জানে।।

—(চৈ. ভা. অন্ত্য ২/৩৬৬-৬৭)

অর্থাৎ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশিবকে সেই শ্রীক্ষেত্রে প্রেরণ করলেন। অতএব এই ক্ষেত্রের মহিমা স্কন্দ পুরাণ, পদ্ম পুরাণাদি বহু গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীপদ্ম পুরাণে, যথা—

লবণাম্ভোনিধেস্তীরে পুরুষোত্তম- সংজ্ঞকম্।
পুরং তদ্‌ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ স্বর্গাদপি সুদুর্ল্লভম্।।

"লবন সমুদ্র-তটস্থ পুরুষোত্তম ক্ষেত্র অবস্থিত। সেই ক্ষেত্রবাসীরা সকলেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সেই ক্ষেত্র স্বর্গের থেকেও সুদুর্লভ।"

স্বয়মস্তি পুরে তস্মিন্ যতঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ।
পুরুষোত্তমমিত্যুক্তং তস্মাত্তন্নামকোবিদৈঃ।।

"আমি ক্ষেত্রে (পুরীতে) সর্বদা অবস্থান করি। তাই সেই ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র বলে বিখ্যাত।"

ক্ষেত্রং তদ্দুর্ল্লভং বিপ্র সমন্তাদ্দশযোজনম্।
তত্রস্থা দেহিনো দেবৈর্দৃশ্যন্তে চ চতুর্ভুজাঃ।।

"সেই ক্ষেত্র অত্যন্ত দুর্লভ। সেই ক্ষেত্র দশ যোজন বিস্তৃত। সেখানে অবস্থানকারী সকল জীব চতুর্ভুজাকার।"

প্রবিশন্তস্তু তৎক্ষেত্রং সর্ব্বে স্যুর্বিষ্ণুমূর্ত্তয়ঃ।
তস্মাদ্বিচারণা তত্র ন কর্ত্তব্যা বিচক্ষণৈঃ।।

"সেক্ষেত্রে প্রবেশ করা মাত্র ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর মতো রূপ লাভ করে। সেই ক্ষেত্র সম্বন্ধে বুদ্ধিমান ব্যক্তির কিছু সন্দেহ করা উচিৎ নয়। সেটি সাক্ষাৎ ভুবন মঙ্গল ক্ষেত্র।"

চণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং গ্রাহ্যং তত্রান্নমগ্রজৈঃ।
সাক্ষাদ্বিষ্ণুর্যতস্তত্র চণ্ডালোঽপি দ্বিজোত্তমঃ।।

"সেই ক্ষেত্রে চণ্ডাল দ্বারা স্পর্শ অন্ন আদরের সঙ্গে গ্রহণীয়। কারণ সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণু যেহেতু সেখানে উপস্থিত আছেন, তাই সেখানকার চণ্ডাল ব্রাহ্মণ থেকেও শ্রেষ্ঠ।"

তত্রান্নপাচিকা লক্ষ্মীঃ স্বয়ং ভোক্তা জনার্দ্দনঃ।
তস্মাত্তদন্নং বিপ্রর্ষে দৈবতৈরপি দুর্ল্লভম্।।

"সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্মীদেবী রন্ধন করেন এবং স্বয়ং জনার্দ্দন ভোজন করেন। সেখানকার অন্ন দেব, ঋষি, বিপ্রেরও অতি দুর্লভ।"

হরিভুক্তাবশিষ্টং তৎ পবিত্রং ভুবি দুর্ল্লভম্।
অন্নং যে ভুঞ্জতে মর্ত্ত্যাস্তেষাং মুক্তির্ন্নদুর্ল্লভা।।

"শ্রীহরির ভুক্ত অবশেষ অন্ন যিনি ভোজন করেন তিনি মুক্তি লাভ করেন।"

পবিত্রং ভুবি সর্ব্বত্র যথা গঙ্গাজলং দ্বিজ।
তথা পবিত্রং সর্ব্বত্র তদন্নং পাপনাশনম্।।

"সেই ক্ষেত্র ঠিক্ গঙ্গাজলের মতো সর্বত্র পবিত্র। সেই ক্ষেত্রে সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়ে যায়।" এইভাবে শ্রীক্ষেত্রের বহু মাহাত্ম্য বহু গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে—

সিন্ধু-তীরে বট-মূলে 'নীলাচল' -নাম।
ক্ষেত্র-শ্রীপুরুষোত্তম—অতি রম্যস্থান।।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে।।
সর্ব্ব-কাল সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি।।
—(চৈ. ভা. অন্ত্য ২/৩৬৮-৩৭০)

''দশ যোজন ব্যাপি এই শ্রীক্ষেত্র ব্রহ্মপ্রলয়েও ধ্বংস হয় না। সমস্ত জীব, জন্তু ও কৃমি চতুর্ভুজাকার। সেই ক্ষেত্রে নিদ্রায় সমাধির ফল, শয়নে প্রণামের ফল, প্রদক্ষিণে তীর্থভ্রমণের ফল এবং আলাপমাত্র স্তবের ফল হয়। শ্রীক্ষেত্রবাসীদের পাপ-পুণ্যের তথা ভালমন্দের বিচার স্বয়ং জগন্নাথই করে থাকেন। তাই সে স্থানে পাপীদের দণ্ড বিধানের অধিকার যমরাজের নেই।'' শ্রীশিবের প্রতি এটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু, কীট, কৃমি।।
সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণে।
'ভুবনমঙ্গল' করি' কহিয়ে যে স্থানে।।
নিদ্রাতেও যে স্থানে সমাধিফল হয়।
শয়নে প্রণাম-ফল যথা বেদে কয়।।
প্রদক্ষিণ-ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথা মাত্র যথা হয় আমার স্তবন।।
সে স্থানে নাহিক যম-দণ্ড-অধিকার।
আমি করি ভালমন্দ বিচার সবার।।
—(চৈ. ভা অন্ত্য ২/৩৭১-৭৪, ৩৭৭)

অতএব শ্রীক্ষেত্রের তাৎপর্য কি? ভগবানের স্বরূপশক্তি 'শ্রী'। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর যে ক্ষেত্র বা ধাম 'শ্রী'-শক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত, তাই শ্রীক্ষেত্র। অথবা 'শ্রী' অর্থ সর্ব লক্ষ্মীময়ী অংশিনী 'শ্রী' রাধিকা। মধুর-রসের উপাসকদের অনুভবে যে-স্থানে শ্রীশ্রীরাধিকার সেবা-মাধুর্য ঔদার্যভাবে প্রকটিত তাই 'শ্রীক্ষেত্র'। শ্রীরাধামাধব-মিলিততনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অসমোর্ধ্ব কৃপা-প্রভাবে এই ক্ষেত্র পরিপ্লাবিত হয়েছে।

তাঁরই দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী ও শ্রীল রায়-রামানন্দ প্রভু এই স্থানে রসরাজ মহাভাবের মিলিত তনু পুরাণপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গের পরিশিষ্টলীলা—কৈবল্য-মাধুরী বিস্তার করেছেন। শ্রীরাধিকার দ্বিতীয় দেহ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীরূপে শ্রীক্ষেত্র সন্ন্যাসলীলা প্রকট করে এই স্থানে শ্রীগোপীনাথ-মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবতরূপী শ্রীগৌরহরিকে নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ শ্রবণ করিয়েছেন। শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস-লীলার পর 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে আত্মপ্রকাশ করে তাঁর লীলাপরিশিষ্ট-পরাকাষ্ঠা শ্রীক্ষেত্রেই প্রকাশ করেছিলেন। স্বয়ং শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী, শ্রীল রায়-রামানন্দ, শ্রীল রূপপাদ, শ্রীজীবগোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—সকলেই শ্রীক্ষেত্রবিহারী শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে তাঁদের অভীষ্টদেবতারূপে বরণ করেছেন। এজন্য শ্রীনবদ্বীপ-বিহারী শ্রীগৌরহরি অপেক্ষা শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগদের কাছে শ্রীক্ষেত্র-বিহারী শ্রীচৈতন্যদেবের অধিকতর চমৎকারিতা-বৈশিষ্ট্য অনুভূত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, সুন্দরাচলরূপী শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীকুণ্ড, চটকাচলরূপী শ্রীগোবর্ধন, শ্রীবংশীবট, শ্রীকালিন্দী ও অন্য সমস্ত লীলা প্রকটিত আছেন। শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রে উক্ত হয়েছে—

মধুর-দ্বারকা-লীলা যাঃ করোতি চ গোকুলে।
নীলাচলস্থিতঃ কৃষ্ণস্তা এব চরতি প্রভুঃ।।

শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে, মথুরা-দ্বারকাদি যে- সকল লীলা বিস্তার করেন, তিনি শ্রীনীলাচলে অবস্থান করে সেই সব লীলাই প্রকট করেন। স্কন্দপুরাণে উৎকল খণ্ডে শ্রীক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে জৈমিনি ঋষি বলেছেন—

পঞ্চক্রোশমিদং ক্ষেত্রং সমুদ্রান্তব্যবস্থিতম্।
দ্বিক্রোশং তীর্থরাজস্য তটভূমৌ সুনির্মলম্।।
সুবর্ণবালুকাকীর্ণং নীলপর্বতশোভিতম্।
সীমা প্রতীচী ক্ষেত্রস্য শঙ্খাকারস্য মূর্ধনি।
শঙ্খাগ্রে নীলকণ্ঠঃ স্যাদেতৎক্রোশঃ সুদুর্লভঃ।।
পরমং পাবনং ক্ষেত্রং সাক্ষান্নারায়ণস্য বৈ।
শঙ্খস্যোদরভাগস্তু সমুদ্রোদকসংপ্লুতঃ।।
—(উৎকলখণ্ড ৩/৫২-৫৩, ৪/৫-৬)

অর্থাৎ—"এই ক্ষেত্রের বিস্তার পঞ্চ ক্রোশ। এই পঞ্চ ক্রোশের মধ্যে সমুদ্রের তটবর্তী দুই ক্রোশ অতিশয় পবিত্র। ওটা সুবর্ণবালুকা-সমাকীর্ণ এবং নীলগিরিদ্বারা সুশোভিত। এই ক্ষেত্রের আকারটি শঙ্খের মতো, তার মস্তকটি পশ্চিম দিকে রয়েছে। ঐ শঙ্খাকার ক্ষেত্রের অগ্রে নীলকণ্ঠ শিব অবস্থিত। এই ক্রোশ-মাত্র ক্ষেত্র অতি সুদুর্লভ। সাক্ষাৎ নারায়ণের মতো এই ক্ষেত্রটি পরম পাবন (ভুবনেশ্বরধাম)। ঐ শঙ্খের উদরভাগটি সমুদ্রের জলে নিমগ্ন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত' গ্রন্থে এই ক্ষেত্রটি সম্বন্ধে এইভাবে উল্লেখ করেছেন—

দারুব্রহ্ম জগন্নাথো ভগবান্ পুরুষোত্তমে।
ক্ষেত্রে নীলাচলে ক্ষারার্ণবতীরে বিরাজতে।।
মহাবিভূতিমান্ রাজ্যমৌৎকলং পালয়ন্ স্বয়ম্।
ব্যঞ্জয়ন্ নিজমাহাত্ম্যং সদা সেবকবৎসলঃ।।
তস্যান্নং পাচিতং লক্ষ্ম্যা স্বয়ং ভুক্ত্বা দয়ালুনা।
দত্তং তেন স্বভক্তেভ্যো লভ্যতে দেবদুর্লভম্।।
মহাপ্রসাদ-সংজ্ঞঞ্চ তৎ পৃষ্টং যেন কেনচিৎ।
যত্র কুত্রাপি বা নীতমবিচারেণ ভুজ্যতে।।
অহো তৎক্ষেত্রমাহাত্ম্যং গর্দভোঽপি চতুর্ভুজঃ।
যত্র প্রবেশমাত্রেণ ন কস্যাপি পুনর্ভবঃ।।

অর্থাৎ—"নীলাচলে লবণসমুদ্রের তীরে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে দারুব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীজগন্নাথ বিরাজমান্ আছেন। তিনি মহাবিভূতিমান্। তিনি স্বয়ম উৎকলরাজ্যের পালন কর্তা এবং সর্বদা সেবকবৎসলরূপে নিজমাহাত্ম্য প্রকাশ করে সেখানে অধিষ্ঠিত আছেন। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাঁর অন্ন রন্ধন করেন এবং করুণাময় প্রভু তা ভোজন করে নিজ ভক্তদেরকে বিতরণ করেন। যার ফলে ভক্তরা ঐ দেবদুর্লভ অন্ন লাভ করতে পারেন। প্রভুর সেই প্রসাদান্নের নাম 'মহাপ্রসাদ'। তা যে-কেউ স্পর্শ করলে বা যে-কোন স্থানে নীত হলেও সকলেই অবিচারে ভোজন করতে পারেন। অহো! শ্রীজগন্নাথ বা তদন্নমহাপ্রসাদের মহিমা দূরে থাক্, সেই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য এরূপ যে, সেখানে গর্দভও চতুর্ভুজরূপে দৃষ্ট হয়। সেই ক্ষেত্রে প্রবেশ-মাত্র কারও আর পুনর্জন্ম হয় না।" সেহ প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষকে এই চক্ষুর্দ্বারাই দর্শন করলে জন্ম সফল হয়।

শ্রীপুরুষোত্তমদেবের শ্রীমুখচন্দ্রে বিশাল নয়নযুগল শোভা পাচ্ছে, ললাটফলকে মণিময় তিলক বিরাজিত, শ্রীঅঙ্গকান্তি নবীন-নীরদ-ন্যায়, অরুণাধরের দীপ্তি শ্রীমুখমণ্ডলের রমণীয়তা-ব্যঞ্জক, মন্দহাস্যরূপ চন্দ্রিকা উক্ত রমণীয় মুখমণ্ডলকে অধিকতর রমণীয়রূপে প্রকট করে আপামর সাধারণ সকল লোকের প্রতি কৃপা বিতরণ করছেন। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখেছেন—

মহানন্দে সর্ব্বলোকে 'জয় জয়' বলে।
"আইলা সচল - জগন্নাথ নীলাচলে।।"
'আপনে শ্রীজগন্নাথ ন্যাসিরূপ ধরি'।
নিজে সংকীর্তন-ক্রীড়া করে অবতরি।।
—(চৈ. ভা. অ ৫/১২৬, ১৬৫)

অর্থাৎ—স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ সন্ন্যাসী রূপ ধরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে শ্রীক্ষেত্রে বাস করেন। এই ক্ষেত্র দশ অবতার ক্ষেত্রও বলা হয়। শ্রীভগবান্ এই স্থানে বিভিন্ন অবতার প্রকট করে সর্বত্র লীলা বিস্তার করে থাকেন এবং পৃথিবী সম্বন্ধীয় কৃত্য-সমূহ সম্পাদন করে পুনরায় এই স্থানেই অবস্থিত থাকেন। নীলপর্বত শ্রীমন্দিরের নীলচক্র দর্শন করলে মৎস্যাদি দশ অবতার দর্শনের ফল লাভ হয়।

মাদলা পঞ্জিকাতে উক্ত হয়েছে যে, জম্বুদ্বীপে ভারতখণ্ডের উত্তরদেশে দক্ষিণমহোদধির উত্তর তীরে শ্রীপুরুষোত্তম-বৈকুণ্ঠে দশ-যোজন-মধ্যে দক্ষিণাবর্ত-শঙ্খের পঞ্চক্রোশব্যাপী নাভিমণ্ডলস্থ নীলকন্দর পর্বতে গদাচক্রশঙ্খপদ্মধারী নীলকান্তমণি-গঠিত নীলমাধব বিগ্রহ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। লীলাপুরুষোত্তম এইস্থানে অর্চাবতাররূপে নিত্য অধিষ্ঠিত। তাঁর নামানুসারে এই ক্ষেত্র—'শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম' ; ত্রিজগতের নাথ শ্রীকৃষ্ণের ধাম বা 'পুর' বলে এই স্থান 'শ্রীজগন্নাথ' বা 'পুরী' নামে খ্যাত হয়েছে।

যদ্যপি পরব্যোম সভাকার নিত্যধাম।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কা'রো কাঁহো সন্নিধান।।
মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম—'জগন্নাথ' নাম।
— (চৈ. চ. ম. ২০/২১২, ২১৫)

অপ্রাকৃত অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের আবির্ভাব কোন জড়ীয় কাল, জড়ীয় স্থান বা জড়ীয় পাত্রের অন্তর্গত হতে পারে না। বেদ তাঁকে 'অবিচিন্ত্যতত্ত্ব' বলেছেন। এটি বুঝতে না পেরে আধ্যক্ষিক, প্রত্নতাত্ত্বিক বা গবেষকরা অনাদি বস্তুর আদি, ঐতিহ্যের অতীত অপ্রমেয় প্রবব্রহ্মের ইতিহাস ও ব্যাভিচারী প্রমাণসমূহ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েন এবং নানাপ্রকার অনুমান ও কল্পনার আশ্রয়ে স্বয়ং বঞ্চিত হ'ন এবং অপরকে বঞ্চিত বা বিপদগামী করান। অনাদি বস্তুর আদি অনুসন্ধান ও অপ্রাকৃতের প্রাকৃত ইতিহাস নির্ণয় করবার কৌতুহলরূপ বিপ্রলিপ্সা পরিত্যাগ করে শ্রৌত-প্রমাণ আশ্রয় করবার জন্যই বেদ বার বার উপদেশ প্রদান করেছেন।

বি. দ্র.- বিপ্রলিপ্সা—ঠকানোর মনোবৃত্তি, অর্থাৎ অপরকে ঠকানোর মনোভাব।

(হরেকৃষ্ণ)

ভারতবর্ষ ও ভাগবত সংস্কৃতি

লীলা পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এ ভৌতিক জগতে লীলা বিস্তার করার জন্য পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকেই আধার করেছেন। ভগবান্ ও ভারতবর্ষের সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়ীত। জীবজগতের পরিচালনার জন্য বেদাদি শাস্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বেদাদি শাস্ত্রের আদর সর্বাধিক। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন— "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত"। অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যেসকল অবতার অতীতে হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে যে সকল অবতার হবে, সেই সকল ভারতবর্ষেই হবে। পূর্ব জন্মের পুঞ্জিভূত সুকৃতির ফলে ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। এই ভূমিতে মনুষ্যজন্ম লাভ করার জন্য স্বর্গের দেবতারাও ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তবে এরকম এক পুণ্যবান্ ভূমির সংস্কৃতি কি, তা আমাদের জানা উচিত।

ভারতবর্ষের প্রতিটি স্থানে বসবাসকারী অদিবাসীদের জীবনধারা ভাগবত সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। যারা এই সংস্কৃতি অবলম্বনে জীবন-যাপন করে না তারা ম্লেচ্ছ, যবন রূপে পরিগণিত হয়। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি 'ভাগবত' -এর সঙ্গে জড়িত হওয়ার ফলে এটির নাম 'ভাগবত সংস্কৃতি'। তাই ভাগবত, ভগবান্ ও ভারতবর্ষ পরস্পর সম্পর্কিত। শ্রীমদ্ ভাগবত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ অর্থাৎ অভিন্ন ভগবান্। ভাগবত ভগবানের বাণী অবতার। ভগবানের ভগবৎ আবেশ অবতার শ্রীল ব্যাসদেব, চতুর্বেদ, অষ্টাদশ পুরাণাদি রচনা করা সত্ত্বেও অন্তরে সন্তোষ লাভ করতে পারেন নি। অসন্তোষের কারণ স্বীয় গুরুদেব নারদমুনির কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। শ্রীল নারদমুনি ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, ধ্রুব, প্রহ্লাদাদি মহাজনের অনুসরণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা গুণ রচনা করার জন্য শ্রীল ব্যাসদেবকে উপদেশ প্রদান করেছিলেন। গুরুদেব শ্রীল নারদমুনির নির্দেশানুসারে শ্রীল ব্যাসদেব ভগবানের দিব্যলীলা চরিত সম্বলিত গ্রন্থ শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করেছিলেন। এটি হচ্ছে সর্বগ্রন্থ শিরোমণি অমল-প্রমাণমূলক শাস্ত্র। মানব সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষদের জন্য এটি মহৌষধি স্বরূপ।

"সর্ব বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্"।

সমস্ত-বেদ, ইতিহাসের সার হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতম্। এটি সর্ব বেদান্তের সার। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ ধামে ধর্ম, জ্ঞানাদি দিব্য গুণসহ প্রত্যাবর্তন করলে কলিযুগে ধর্ম কার শরণ নিল ? এটাই ছিল সূতগোস্বামীর প্রতি শৌনকাদি ঋষির প্রশ্ন। এটির উত্তরে সূতগোস্বামী বলেছিলেন—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ।।
—(ভা. ১/৩/৪৩)

শ্রীমদ্ ভাগবত সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে প্রত্যাবর্তনের পর এই পুরাণ ধর্ম-জ্ঞানাদি সহ উদিত হয়েছে। কলিযুগের তীব্র অজ্ঞান-অন্ধকারের জন্য যাদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে অথবা যাবে, তারা এই পুরাণ থেকে আলোক প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ যারা শ্রীমদ্-ভাগবতের আশ্রয় গ্রহণ করবেন, তারা মায়া-রূপ অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের ধামে প্রবেশ করবেন। তাই সমগ্র মানব সমাজের জন্য ভাগবত ধর্মই একমাত্র ধর্ম। এটা সনাতন-ধর্ম, আত্ম-ধর্ম রূপে সুবিদিত। কৈতব ধর্ম অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ তুচ্ছ করে শ্রীল ব্যাসদেব প্রেম সম্বলিত শ্রীমদ্-ভাগবত রচনা করলেন। যাঁরা পরম প্রেমময়, পরমতত্ত্ব, পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার জন্য প্রয়াসী, তাঁরা প্রেমস্বরূপ শ্রীমদ্ ভাগবতের আশ্রয় গ্রহণ করবেন।

বিশেষ করে এই কলিযুগের প্রারম্ভে ভগবানের মহান্ ভক্ত শ্রীল পরীক্ষিত মহারাজ মৃত্যুর সন্নিকট অবস্থায় জীবনের পরিপূর্ণতার উপায় মুনি-ঋষিদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বহু মুনি যজ্ঞ, দান, তপ-আদি বহু উপায়ের সূচনা করেছিলেন, কিন্তু শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর উপদেশানুসারে শ্রীল পরীক্ষিত মহারাজ ভাগবত শ্রবণ করে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সকাম কর্ম, মোক্ষকাম আদি সমস্ত চতুর্বর্গের কথা শ্রীল পরীক্ষিত মহারাজকে শ্রবণ করিয়ে সর্বশেষ-সিদ্ধান্ত প্রদানপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিষ্কাম ভক্তিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বপূজ্য। অতএব ভক্তিযোগে ভগবত্ প্রাপ্তির জন্য নবধাভক্তির মধ্যে প্রথম ও অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ। অতএব

কলিযুগে আমরা প্রতি মুহূর্তে সংসার-রূপ দাবানলে দগ্ধীভূত হচ্ছি। জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি-রূপ দুঃখের গর্তে পতিত হয়েছি। বিস্মৃত হয়ে প্রতি মুহূর্তে সংসার আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছি। এই ভয়ঙ্কর মৃত্যু-মুখ থেকে উদ্ধার পেতে হলে আমাদেরকে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করতে হবে।

শ্রীমদ্ ভাগবতে ত্রিকালের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। অতীতে সৃষ্টির সমস্ত কার্যকলাপ, বর্তমান সৃষ্টির স্থিতি এবং ভবিষ্যতে সৃষ্ট জগতের সমস্ত বিবরণী প্রদান করা হয়েছে। এই সমস্ত তথ্য বর্তমান জড় বৈজ্ঞানিকেরাও সত্য বলে স্বীকার করেছেন। শ্রীমদ্-ভাগবত গুরু-পরম্পরা ধারায় ভগবানের কাছ থেকে এসেছে। ভগবান্ ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা নারদকে, নারদ ব্যাসদেবকে, ব্যাসদেব শুকদেব গোস্বামীকে, শুকদেব গোস্বামী সূত গোস্বামীকে এবং সূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিদেরকে এই ভাগবতের শিক্ষা প্রদান করেছেন। ভারতবর্ষের সমস্ত সম্প্রদায়ের আচার্যরা শ্রীমদ্-ভাগবতকে স্বীকার করেছেন। শ্রীল মাধ্বাচার্য, শ্রীল রামানুজাচার্য, শ্রীল শঙ্করাচার্য, শ্রীল নিম্বার্কাদিত্য, শ্রীল জীবগোস্বামী, শ্রীল রূপগোস্বামী অর্থাৎ এক কথায় ষড়গোস্বামীবৃন্দ শ্রীমদ্ ভাগবতের সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে প্রচার করেছেন। অতএব তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদেরকে শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত স্বীকার করতে হবে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, "সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত গ্রন্থাগার থেকে সমস্ত গ্রন্থ যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমাদের কিছু ক্ষতি হবে না, যদি শ্রীমদ্ ভগবত থাকে।" মায়াগ্রস্ত মানুষেরা ভবিষ্যতে ভ্রান্তি পথের পথিক হওয়ার আশায় শ্রীমদ্-ভাগবত স্পষ্ট পথ নির্দর্শন করেছেন। সাধারণ মানুষেরা নিজেদের স্বল্প সাধনশক্তির বলে নিজেদেরকে ভগবান্ বলে ঘোষণা করছে, কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতে ভগবানের সমস্ত অবতার সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে। উদাহারণ-স্বরূপ ভগবান্ বুদ্ধ সম্বন্ধে ৫০০০ বছর পূর্বে ভাগবতে বর্ণিত হয়েছিল। তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ঠিক্ তেমনই কলিযুগের শেষে ভগবান্ কল্কি-রূপে অবতরণ করবেন। ভগবানের কল্কি অবতার হয়নি, কিন্তু ভগবানের পিতার নাম বিষ্ণুযশা, তিনি সম্বল নামক গ্রামে আবির্ভূত হবেন বলে উল্লেখ আছে। ঠিক্ তেমনই কলিযুগের প্রারম্ভে কলিযুগের ধর্ম 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র প্রচারের জন্য স্বয়ং পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করে আসার কথাও শ্রীমদ্ ভাগবতে উল্লেখ আছে। তা-ও সত্য রূপে পরিগণিত হয়েছে।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।
—(ভা. ১১/৫/৩২)

অর্থাৎ—'যাঁর মুখে সর্বদা 'কৃষ্ণ' এই দু'টি বর্ণ উচ্চারিত হয় এবং যাঁর কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সংকীর্তন যজ্ঞদ্বারা আরাধনা করে থাকেন।" এর থেকে স্পষ্ট সূচনা পাওয়া যাচ্ছে যে কলিযুগের সংকীর্তন ধর্মের প্রবর্তনকারী শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই হচ্ছেন ভগবান্।

অনুরূপ বায়ুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, গরুড় পুরাণাদিতে শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তা উল্লেখ আছে। শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দীর্ঘ ১৮ বছর কাল শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করে পরংব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ, যিনি জগতের নাথ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তা প্রচার করেছিলেন। সুতরাং যাঁরা পূর্ণ পরমতত্ত্ব ভগবান সম্বন্ধে অবগত হয়ে ভগবৎ-ধামে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রয়াসী, তাঁদের শ্রীমদ্ভাগবত-রূপী ভগবানকে অনুসরণ করে পূর্ণজ্ঞান লাভ করা উচিত। এটি শ্রীল ব্যাসদেব তথা সমস্ত পূর্ব আচার্যদের মত। এই প্রামাণিক তথ্যানুসারে শ্রীজগন্নাথের স্বরূপ বর্ণনার জন্য আমরা প্রয়াসী হয়েছি।

(হরিবোল)

আত্ম দর্শন

প্রতিক্ষণ প্রতিটি জীব নিত্য বস্তু ভগবানকে খুঁজে বেড়ায়। দুঃখে জর্জরীত বলে তো সুখ চায় মানব ? ক্ষণিক সুখও এ ভৌতিক জগতে আছে যা নশ্বর, তা অনাবিল সুখ নয়, তা মিশ্রিত অর্থাৎ দুঃখ মিশ্রিত। সেইজন্য সপ্তম গোস্বামী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—

ভাল ক'রে দেখ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে, সে দুঃখের কারণ।
সে সুখের তরে তবে, কেন মায়া-দাস হ'বে,
হারাইবে পরমার্থ-ধন।।

তিনি আরও গেয়েছেন "জনম-মরণ-জরা, যে সংসারে আছে ভরা,"। অর্থাৎ মনকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ওরে মন, এ সংসার ভাল লাগে না। এ সংসার দুঃখালয়, যেখানে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি ভরপুর হয়ে রয়েছে। ধন-জন-পরিবার কেউ কারোর নয়। আজ বন্ধু তো কাল শত্রু। এটা প্রতিদিনের ঘটনা, যা আমরা চোখের সামনে দেখছি। পিতার সঙ্গে পুত্রের শত্রুতা, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের শত্রুতা, প্রভু ভৃত্যের মধ্যে শত্রুতা, স্বামী স্ত্রী'র মধ্যে শত্রুতা ইত্যাদি ইত্যাদি। আজ যে বন্ধু কাল সে শত্রু। এ প্রকার সংসার যা অনিত্য, দুঃখপূর্ণ ও সমস্ত নশ্বর। দিনের পর দিন আয়ু কমে যাচ্ছে। "আয়ু হরতি বৈপুংসা"। সূর্য উদয় হয়ে অস্ত গেলে একদিনের আয়ু কমে যায়। সূর্যদেব আয়ু হরণ করছেন। দিনের পর দিন আমরা যমের নিকটবর্তী হচ্ছি। " অহনি অহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দির"। প্রতিদিন কত লোক যম মন্দিরে যাচ্ছে। এমনই দুঃখপূর্ণ এ জগত।

তাই অনাবিল, নিরবচ্ছিন্ন, শাশ্বত সুখ এ জগতে নেই। মানুষ চায় সেই সুখ যা অনাবিল, নিরবচ্ছিন্ন, শাশ্বত। যে সুখ দুঃখ সংস্পর্শ বর্জিত, নিত্য নিরবচ্ছিন্ন আত্যন্তিক সেই সুখ চায় মানুষ। সেই সুখের নাম ব্রহ্মানন্দ সুখ। প্রতিক্ষণ প্রতিটি জীব সেই ব্রহ্মবস্তু পরব্রহ্ম বিষ্ণু, কৃষ্ণ, সেই জগন্নাথকে খুঁজে বেড়ায়। জীব যেই বস্তু কামনা করুক্ না কেন মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখ। যত কিছু সুখ বা আনন্দ আছে সেসব সুখের পরিসমাপ্তি 'ব্রহ্মাতি ব্যদনাৎ', কারণ

তাঁর অপেক্ষা উত্তম প্রভুত্ব আনন্দ আর নেই। জগতে যত জল বা জলাশয় আছে, সে সমস্তর পরিসমাপ্তি যেমন সমুদ্রে, ঠিক্ তেমনি সব রকম ক্ষুদ্র বৃহৎ আনন্দের পরিসমাপ্তি ভগবানেতে। সেই সুখানন্দ স্বরূপ শ্রীজগন্নাথকে লাভ করতে হলে ভক্তি প্রয়োজন। শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্ভাগবতে বার বার উক্ত হয়েছে "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ", "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য"। একমাত্র ভক্তিতে ভগবানকে পাওয়া যায়। সেই ভক্তি অনন্য ভক্তি, শুদ্ধভক্তি, অকিঞ্চনাভক্তি।

শ্রীভগবান্ হচ্ছেন সন্ময়, চিন্ময় ও আনন্দময়। তাঁর সঙ্গে আমরা যুক্ত হতে পারলে আমরা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করতে পারব। নচেৎ আনন্দ এ জগতে নেই। এ ভৌতিক জগত দুঃখালয়, যা সুখ আছে তা অনাবিল সুখ নয়, তা দুঃখ মিশ্রিত। তাই এ রকম সংসার যাতনা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আমাদেরকে শ্রীভগবানের দিব্য নাম নিরন্তর স্মরণ করতে হবে।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

শ্রীভগবানের নাম ও শ্রীভগবান অভিন্ন বস্তু। তবে সেই ভক্তিটা কি বস্তু। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর উল্লেখ করেছেন—

ভক্তি-যোগ, ভক্তি-যোগ, ভক্তি-যোগ—ধন।
'ভক্তি' এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন।।
—(চৈ. ভা. ম. ২৪/৭২)

ভক্তি একমাত্র ধন, যার মূল্য কল্পনা করা যায় না, তা অমূল্য। এটিকে পারমার্থিক ধন বলা হয়। এই ধন নিত্য, শাশ্বত। ভৌতিক জগতে যে ধন-সম্পদ আছে তা বিনাশশীল, তা নষ্ট হয়ে যায়, সবদিন থাকে না। একজন উড়িয়া কবি লিখেছেন—

"তো সঙ্গরে গলে যেতেক জন।
গঠিরে বান্ধিনেলে কে কেতে ধন।।"

যখন প্রাণটা দেহ হতে বার হয়ে যাবে তখন কি ধন সঙ্গে নিয়ে যাবে? তোমার এ ভৌতিক ধন সব এখানে পড়ে থাকবে। পরিবার, ধন-সম্পদ সব এখানে পড়ে থাকবে। কেউ তোমার সঙ্গে যাবে না। এই পারমার্থিক ধন যা

তুমি অর্জন করেছ, সেই ভক্তিধন তোমার সঙ্গে যাবে। তাই এই ধন অর্জন করা আবশ্যক। এই দুর্লভ মানব জন্মে এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এ শিক্ষা শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্ ভাগবতাদি শাস্ত্রে তথা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভক্তরা দিচ্ছেন। এই শিক্ষা প্রদান করার জন্য স্বয়ং পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এসেছিলেন।

আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু সবে—"কৃষ্ণ গাও গিয়া।।"
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন।।
যদি আমা' প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর।।
এই মত শুভদৃষ্টি করি' সবাকারে।
উপদেশ কহি' সবে বলে—"যাও ঘরে।।"
—(চৈ. ভা. ম. ২৮/২৫-২৭, ২৯)

এটি হচ্ছে শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ (চৈতন্য) মহাপ্রভুর উপদেশ।

অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে।
কি ভোজনে, কি শয়নে কিবা জাগরণে।।
—(ঐ ম. ২৮/২৮)

দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা কৃষ্ণ চিন্তা কর। সেই একই উপদেশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্‌গীতায় দিয়েছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।।
—(গী. ১৮/৬৫)

এটি গুহ্যতম উপদেশ—"আমাকে চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও, আমার সেবক হও, আমাকে আরাধনা কর, আমাকে নমস্কার কর। আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে এভাবে তুমি নিশ্চিতরূপে আমার কাছে আসবে।" সেই কৃষ্ণ শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এসে সেই একই উপদেশ প্রদান করেছেন। ভোজন,

শয়ন, জাগরণ সর্ব অবস্থায় কৃষ্ণ চিন্তা কর, কৃষ্ণনাম উচ্চারণ কর। এ ছাড়া আর কিছু নেই। এ দুঃখালয়ে সুখ পেতে হলে এটাই একমাত্র উপদেশ। সেইজন্য মানুষ অনুসন্ধান করে, কিন্তু তাঁর সন্ধান জানে না। শাস্ত্র-সমূহ স্পষ্টভাবে সেই পথের নির্দেশ দেন। শাস্ত্রকারগণ বলেন নিত্য সুখকর আনন্দঘন বস্তুকে এইপথ ধরে অনুসন্ধান কর, তাঁর ভজন কর, তাঁর ধ্যান কর, এই উপায় অবলম্বনে তাঁকে প্রাপ্ত হবে। তিনি শান্তির আস্পদ (object)। তাঁকে মনেতে রাখতে পারলে শান্তি মিলবে। সকল শাস্ত্রে শ্রীভগবানকে ভজন করবার, উপাসনা করবার নির্দেশ আছে। যিনি প্রকৃত ভাগ্যবান তিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভগবৎ উপাসনা করে শান্তির অধিকারী হন্ —

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।।
—(চৈ. চ. ম. ১৯/১৫১)

তাই শান্তির সূত্র ভগবান্ শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় প্রদান করেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।।—(গী. ৫/২৯)

যিনি একথা জানেন তিনিই শান্তি লাভ করবেন। অর্থাৎ কৃষ্ণ হচ্ছেন একমাত্র উপভোগকারী, তিনি সর্বযজ্ঞ, সর্ব তপস্যা, সর্বলোকের মহেশ্বর তথা সর্বজীবের মঙ্গলাকাঙ্খী বন্ধু। কিন্তু জগতে জীব সকল পার্থিব ক্ষণভঙ্গুর বস্তুর অনুশীলন করছে। সেইজন্য তারা শান্তি চাইলেও শান্তি পায় না। অশান্ত বস্তুর অনুশীলনে শান্তি লাভ হয় না। তবে অশান্ত বস্তু কাকে বলে ? যে বস্তু চিরকাল থাকে না। এই পার্থিব জগত, এই ভৌতিক দেহ—এসব চিরদিন থাকে না। এসব অশান্ত বস্তু। শান্তি পেতে হলে তত্ত্বদ্রষ্টা, ভগবৎদ্রষ্টা সাধু মহাজনের বাণী আমাদেরকে শ্রবণ করতে হবে। সাধুরা শান্তি লাভের উপায় বলেন। শ্রীভগবান্ সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্। অর্থাৎ শান্ত বস্তু ভগবান, সত্য বস্তু ভগবান্ এবং শ্রীভগবান্ হচ্ছেন মঙ্গলপ্রদ। তিনি জীবের প্রীতির আস্পদ। তাঁর সম্বন্ধে স্থিত না হতে পারলে শান্তিলাভ হবে না। শান্ত নিত্য বস্তু হচ্ছেন আত্মা। সেই আত্মার আত্মা শ্রীহরি বা শ্রীজগন্নাথ—তিনি প্রীতির বিষয়, তিনি দিব্য শাশ্বত। আত্মা শান্ত বস্তু। শরীর, মন, প্রকৃতি, ইন্দ্রিয়—এসব মায়াসৃষ্ট বস্তু। এসব

অশান্ত, এটি পূর্বে ছিল না, বর্তমান আছে এবং পরে থাকবে না। শান্তি ও আনন্দময় জীবন লাভের জন্য বেদাদি শাস্ত্র বলেন,—অসৎ বস্তু দেহ ও মন দ্বারা যে ভৌতিক বস্তু চর্চা করা হয়, তা নিত্যকাল থাকে না। তা পরিণামশীল, নষ্ট হয়। 'সংসরতী ইতি সংসার।' এটা পরিবর্তনশীল। বাল্যকালের আনন্দ যৌবনে থাকে না। বার্ধক্য এলে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়। আত্মা হল নিত্য আনন্দ শান্ত বস্তু। উপনিষদ বলেন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভ করতে হলে আত্মদর্শন করতে হবে ; আত্মার কথা শুনতে হবে, ধ্যান করতে হবে। আত্মাকে কিভাবে দেখা যায় ? এটা অতি সূক্ষ্মবস্তু। "কেশাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ"। কেশের অগ্রভাগকে শত ভাগ করে আবার প্রত্যেক ভাগকে শত ভাগ করলে যা পরিমাণ হয় তাই আত্মার আকার। কত সূক্ষ্ম বস্তু, তাকে কে দেখতে পাবে, কিন্তু সমস্ত হৃদয়ে সে অবস্থান করছে। আত্মা নিত্য চেতনশীল বস্তু। শরীর হচ্ছে অচেতনশীল বস্তু। চেতনশীল আত্মার উপস্থিতির জন্য শরীর চেতনশীল হয়েছে। আত্মা এই শরীর ত্যাগ করলে এই শরীরটি জড় বস্তু হয়ে যায়। আর যতই ব্যক্তির শরীরকে নাম ধরে ডাক সে শুনবে না। হাউ, হাউ করে মাথা ঠুকে কাঁদলেও ব্যক্তি আর জবাব দেয় না কেন ? কারণ তার শরীরে আর আত্মা নেই।

যেমন দুই টুক্রো কাঠ ঘর্ষণ করলে আগুন বার হয়। তেমনি আত্মা স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। এই জড় দেহের মধ্যে আত্মা আছে বলে চেতনা পরিদৃষ্ট হয়। আত্মা না থাকলে শরীর জড় বস্তুতে পরিণত হয় । পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি দেহে আত্মানুশীলন হতে পারে না। মানব শরীরে কেবল এটা সম্ভব, সেইজন্য মানব শরীর দুর্লভ। মানব জীবনে আত্মানুশীলন করা যেতে পারে, ভগবত অনুশীলন করা যেতে পারে; কিন্তু ইতর যোনিতে, ইতর শরীরে তা করা যায় না। আত্মার পুষ্টি বিধানের জন্য ভগবান্— শ্রীরামচন্দ্র, নৃসিংহদেব, বরাহদেব, শ্রীজগন্নাথদেব রূপে এ প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। শ্রীভগবান্ তথা তাঁর অবতারদের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর আদির অনুশীলনে আত্মার জাগরণ হয়।

শরীরকে যদি আহার দেওয়া না যায় তাহলে শরীর দুর্বল হয়ে যাবে, ব্যাধিগ্রস্ত হবে। তেমনি যদি আত্মাকে আহার দেওয়া না যায় তাহলে আত্মার গতি কি হবে? আত্মা ভগবত ইতর বিষয়ে অভিনিবেশ করবে, ভগবত বিস্মৃতি

ঘটবে। পঞ্চভৌতিক এই জড় দেহে দৈনন্দিন আহার দেওয়ার জন্য আমরা গাধার মতো খাট্‌ছি, কিন্তু প্রকৃত সুখ, প্রকৃত আনন্দ লাভ করতে পাচ্ছি না। কিন্তু আত্মাকে আহার দেওয়া কঠিন কাজ নয়। জড় দেহে আহার দেওয়ার জন্য কেউ ব্যবসা করছে, কেউ চাকরী করছে, কেউ কুলিগিরি করছে তো কেউ বাদ্‌শাগিরি করছে। ধন অর্জন করছে শরীর পোষণ, পরিবার পোষণের জন্য। তার পরিণাম-স্বরূপ আহার্য বস্তু সংগ্রহ করছে। চালাঘরে থাকব না কোঠা ঘরে থাকব, বৈদ্যুতিক বাতি লাগাব, ফ্যান না হলে এ.সি'র ব্যবস্থা করব। এইভাবে শরীরের জন্য যোজনা বেড়েই চলেছে। এইজন্য ট্যাক্সও দিতে হচ্ছে। কিন্তু সূর্যালোকের জন্য তোমাকে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে কি ? বৈদ্যুতিক বাতির জন্য, কার্ (গাড়ী)-এর জন্য তোমাকে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। এইসব বিষয় ভেবে দেখ তো আত্মার আহার কত সহজলভ্য। মহাজনগণ আত্মার জন্য আহার রেখে দিয়ে গেছেন। নারদ, ব্যাস, শুকদেব, প্রহ্লাদ মহারাজ আদি মহাজনগণ শ্রীমদ্ ভাগবতাদি শাস্ত্রে ভগবানের যে নাম, রূপ, গুণ, লীলা, মহিমাদি কীর্তন করেছেন, সেসব হচ্ছে আত্মার আহার। ভগবৎ বস্তু সম্বন্ধীয় সমস্ত বস্তু চিন্ময়। ভগবত ইতর বস্তু (অচিৎ বস্তু)-র অনুশীলনে জীব কখনই আনন্দ লাভ করতে পারে না। চিৎ বস্তু অর্থাৎ আত্মার অনুশীলনে নিত্য শান্তি লাভ হয়। নিরন্তর শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকার নামই শুদ্ধ ভক্তি সাধন। জ্ঞানানুশীলন, যোগানুশীলন একাকী করা যায়, কিন্তু ধর্মানুশীলন মিলিত হয়ে করলেও পরস্পরের মধ্যে ভেদাভেদ দৃষ্ট হয়। তর্কবিতর্ক করতে করতে মারপিট শুরু হয়ে যায়। কিন্তু ভক্তি সাধন করতে হলে সকলে মিলেমিশে মূল আশ্রয় বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণ সুখের তাৎপর্য হয়ে করতে হয়। ভগবত প্রসন্ন সর্বকালে সর্বাবস্থায় করা যায়। কিন্তু জ্ঞানানুষ্ঠান বা যোগানুষ্ঠান কাল পাত্রাদি অপেক্ষা যুক্ত। অতএব ভক্তিই জীবের একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ভক্তি ভগবত প্রাপ্তির সর্বশ্রেষ্ঠ তথা প্রকৃষ্ট পন্থা। ভক্তি প্রত্যেক জীবের সর্বস্ব ধন।

বদ্ধভূমিকায় জীব ভগবত বিস্মৃত হয়ে দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি আত্মীয়- স্বজনদের প্রতি আসক্তি হয়ে তাৎকালিন কিছু ক্ষণিক সুখ লাভ করে। ভক্ত বা ভগবানকে প্রীতির স্থানে না রেখে আত্মীয়স্বজনদের কেমন করে প্রীতি করতে হয় তা বদ্ধজীব জানে। ক্ষণিক সুখের জন্য তাপত্রয়ে ক্লিষ্ট হয়। এইজন্য ভগবান বলেছেন—

"প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ।।"
—(ভা. ৫/৫/৬)

জড়-বিষয় দেহ, গেহ, কলত্রাদিতে যে পর্যন্ত জীবের মমত্ব-বোধ থাকে সে-পর্যন্ত জীব বাসুদেবকে, জগন্নাথকে জানতে পারে না।

(হরেকৃষ্ণ)

লেখক সম্বন্ধে

শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ বলেছেন, "আমি এই ভুবনেশ্বরে একটি 'ক্রন্দন বিদ্যালয়' খুলেছি। কৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন বিনা আমরা তাঁর কৃপা প্রাপ্ত হতে পারব না।" তিনি এই বার্তা তাঁর প্রকট লীলার শেষ দশ বছর সময়ে সারা বিশ্বব্যাপী বিপুলভাবে প্রচার করে গেছেন।

দশম অধ্যায়

এক ভক্তিময় জীবন

শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী

কৃষ্ণকৃপা শ্রীমূর্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীমদ্ গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ ১৯২৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশের জগন্নাথ পুরী ধামের অনতিদূরে অবস্থিত জগন্নাথপুর গ্রামে আবির্ভূত হন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল শ্রীব্রজবন্ধু মানিক। শ্রীব্রজবন্ধু গদাই গিরি গ্রামে শৈশব থেকেই কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমূলক সেবার মধ্য দিয়ে বড় হতে থাকেন। তাঁর মাতামহ ছিলেন একজন পরমহংস বৈষ্ণব, যাঁর একমাত্র কাজ ছিল স্থানীয় গোপাল জীউ বিগ্রহের সম্মুখে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে ক্রন্দন করা। তিনি ব্রজবন্ধুকে শিক্ষা দেন কিভাবে হাতের আঙুলের দাগ গণনা করে করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ অনুশীলন করতে হয়।

শৈশব কালে ব্রজবন্ধু তাঁর মামাদের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র ও শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর রচিত ভজন কীর্তনাদি গান গেয়ে ভ্রমণ করতেন। যে পরিবারে শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই গিরি পরিবার শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর সময় থেকে উড়িষ্যায় বিখ্যাত কীর্তনীয়া রূপে

পরিচিত ছিল। তিনশ' বছর পূর্বে উড়িষ্যার রাজা গদাইগিরির এই কীর্তন দলকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন—"যখনই সম্ভব হবে তারা যেন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে কীর্তন পরিবেশন করেন—যা জগন্নাথ মন্দিরের প্রাচীন নথিতে উল্লেখ আছে। উড়িষ্যায় তারাই ছিলেন কীর্তনের গুরু।"

ছয় বছর বয়স থেকেই ব্রজবন্ধু গোপাল বিগ্রহের সেবা করতেন। নিজের হাতে মালা গাঁথতেন, প্রদীপ জ্বালিয়ে তালপত্রে লিখিত মন্ত্র পাঠ করে তাঁকে উপাসনা করতেন। তিনি কখনো গোপালকে নিবেদন না করে কোন কিছুই গ্রহণ করতেন না।

আট বছর বয়সে তিনি সমগ্র ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তার অর্থও ব্যাখ্যা করতে পারতেন। রাত্রে অনেক গ্রামবাসীরা তাঁর উড়িয়া ভাগবত, রামায়ণ এবং মহাভারত আবৃত্তি পাঠ শুনতে আসতেন। এইভাবে জীবনের শুরু থেকেই তিনি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ, বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং তাঁর ইষ্টদেব গোপালের সেবায় নিমগ্ন ছিলেন। প্রভাত যে ভাবে দিনের সূচনা প্রদান করে, ঠিক তেমনি ভগবানের প্রতি এই স্বাভাবিক আসক্তি তাঁর ভবিষ্যৎ ভক্তি জীবনের সূচনা প্রদান করেছিল।

১৯৫৫ সালে পিতার দেহান্তর প্রাপ্তির পর ব্রজবন্ধুর ওপর পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব পড়ল। তাঁর মায়ের নির্দেশে যখন তিনি গৃহস্থ জীবনে প্রবেশ করেছিলেন তখন দায়িত্বের বোঝা আরও বেড়ে গিয়েছিল। বিবাহ অনুষ্ঠানের সময়ই শ্রীব্রজবন্ধুর তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী বাসন্তীদেবীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। অর্থাভাবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত পড়াশুনা করতে পারেননি। তা সত্বেও রাত্রে অধ্যায়ন করে প্রাইভেট পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে তোলেন। মাত্র দুই মাসের প্রস্তুতিতে তিনি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে স্নাতকত্ব ডিগ্রী (বি. এ. ডিগ্রী) লাভ করেন, এবং পরে বি. এড্. ডিগ্রী কোর্সও সম্পূর্ণ করেন। অনেক দায়িত্ব থাকা সত্বেও গোপালের প্রতি ভক্তিমূলক সেবা তিনি কোনভাবেই অবহেলা করেননি। প্রতিদিন তিনি ভোর ৩.৩০ মিনিটে উঠে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতেন, তুলসীপূজা করতেন এবং তাঁর পরিবারকে ভগবদ্গীতা পাঠ করে শোনাতেন।

তাঁর গৃহস্থ জীবনে তিনি স্কুল শিক্ষক হিসাবে কার্য করতেন। যখনই তিনি

সুযোগ পেতেন তখনই তাঁর ছাত্রদের নিকট কৃষ্ণ সম্বন্ধে এবং ভক্তজীবনের নীতি নিয়ম সম্বন্ধে বলতেন। ত্রিশ বছর পর তাঁর কয়েকজন ছাত্র তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৭৪ সালে ৮ই এপ্রিল তাঁর কৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগই তাঁকে সাংসারিক জীবন ত্যাগ করতে আমন্ত্রণ জানাল। ৪৫বছর বয়সে তিনি তাঁর গৃহ এবং আত্মীয়-স্বজনদের ত্যাগ করে পারমার্থিক সিদ্ধির অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। হাতে কেবল ভগবদ্‌গীতা এবং ভিক্ষাপাত্র ধরে এক বছর যাবৎ তিনি সারা ভারত পরিভ্রমণ করে গঙ্গাদি পবিত্র বহুতীর্থ দর্শন করেন। তিনি এই রকম একজন ব্যক্তিকে খুঁজছিলেন যিনি তাঁকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের উপলব্ধি লাভে সাহায্য করতে পারেন। হিমালয়ে বহু যোগী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সাথে মিলিত হয়ে বহু দার্শনিক তর্কবিতর্কের পর সেখান থেকে পায়ে হেঁটে তিনি রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনে এসে চিন্তা করতে লাগলেন যে শ্রীকৃষ্ণের এই প্রিয়তম ধামে নিশ্চয়ই তাঁর ইচ্ছা পূরণ হবে।

বৃন্দাবনে আসার দুই সপ্তাহ পরে একদিন তিনি দেখলেন এক বিশাল সাইনবোর্ডে যেখানে লেখা আছে "International Society for Krishna Consciousness, Founder-Acharya–His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada." তারপর তিনি কয়েকজন বিদেশী ভক্তের সাথে মিলিত হয়েছিলেন, যারা তাঁকে একটি 'Back to Godhead' পত্রিকার কপি দিয়েছিলেন। যখন তিনি পত্রিকাটির যেখানে ভগবান কৃষ্ণের প্রতি অপ্রাকৃত ভালবাসা ও তাঁর মহিমার কথা বর্ণিত হয়েছে পড়লেন, তখন এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদের সাথে মিলিত হবার জন্য তাঁর হৃদয় উৎকণ্ঠিত হল। শেষে যাঁর জন্য ব্রজবন্ধু দীর্ঘদিন ধরে প্রতীক্ষা করছিলেন তাঁর সেই নিত্য পারমার্থিক গুরুদেবের সাথে মিলিত হলেন।

যখন ব্রজবন্ধু শ্রীল প্রভুপাদের কক্ষে প্রবেশ করে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন তখন শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম প্রশ্নই ছিল "তুমি কি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছ?" ব্রজবন্ধু উত্তর দিলেন যে তিনি এখনও সন্ন্যাস নেননি। শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, "তাহলে আমি তোমাকে সন্ন্যাস দেব"। তাঁর হৃদয়ের কথা শ্রীল প্রভুপাদ জানতেন বুঝতে পেরে ব্রজবন্ধু তাঁর নিত্য পারমার্থিক গুরুদেবের পাদপদ্মে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করলেন।

১৯৭৫ সালে বৃন্দাবনে ইস্কনের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরের শুভ উদ্বোধন

দিবসে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে সন্ন্যাস প্রদান করে নতুন নামকরণ করলেন গৌর গোবিন্দ স্বামী। তারপর শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে উড়িষ্যার প্রচারের জন্য পাঠালেন এবং ভুবনেশ্বরে অনুদান পাওয়া জমিতে একটি মন্দির নির্মাণ করতে বললেন।

সেই সময় সেই জায়গাটিতে ভীষণ জঙ্গল ছিল এবং মশা, সাপ ও বিছায় ভরপুর ছিল। জায়গাটি শহর থেকে দূরে থাকায় দিনের বেলায়ও ডাকাতের ভয়ে কোন লোকজন সেখানে যেত না। কিন্তু শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামী শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাকেই তাঁর জীবনসর্বস্ব বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং তা পূরণ করার জন্য নির্ভীকভাবে দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে সবকিছু করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কখনো কখনো এক চা ব্যবসায়ীর গুদাম ঘরে থাকতেন, আবার কখনো কখনো রাস্তা নির্মাণ শ্রমিকদের সাথে কোন রকমে একটি ছোট ঘরে থেকে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থগুলি উড়িয়ায় অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন।

কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীল গৌরগোবিন্দ স্বামী সারা ভুবনেশ্বরে বাড়িতে বাড়িতে, অফিসে অফিসে, কখনও পায়ে হেঁটে এবং কখনও স্থানীয় ছাত্র শচীনন্দন দাস, পরবর্তীতে যিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য হন, প্রায়ই তারই সাইকেলের পিছনে চেপে ঘুরতেন। এইভাবে তিনি কিছু অনুদান সংগ্রহ করে সেই প্রদত্ত জমিতে নিজের হাতে একটি কুঁড়েঘর নির্মাণ করেন।

১৯৭৭ সালের প্রথম দিকে শ্রীল প্রভুপাদ ভুবনেশ্বরে এসেছিলেন। যদিও শ্রীল প্রভুপাদের থাকার জন্য সুন্দর আরামদায়ক সরকারী অতিথিশালার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বলেছিলেন "আমার শিষ্য গৌরগোবিন্দ যেখানে আমার জন্য কুঁড়ে ঘর নির্মাণ করেছে আমি সেখানে থাকব"। শ্রীল প্রভুপাদ ভুবনেশ্বরে ১৭দিন ছিলেন এবং সেই সময় তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথিতে মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এটাই ছিল শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শেষ প্রকল্প।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের অব্যবহিত পরেই ১৯৭৮ সালে শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামী মায়াপুরে যান। একদিন মন্দিরে কীর্তন চলাকালীন তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে ভূমিতে পড়ে যান। ইস্কনের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ভক্ত তাঁকে ধরাধরি করে তাঁর কক্ষে নিয়ে আসেন। যখন ডাক্তার এসে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছিলেন তখন তাঁরা অসুস্থতার কোন কারণ খুঁজে পাননি। একজন ব্যক্তি মন্তব্য করেছিলেন হয়ত ভূতে ধরেছে। শেষ পর্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের গুরুভ্রাতা

একজন শুদ্ধ ভক্ত অকিঞ্চন দাস বাবাজী মহারাজ বর্ণনা করে বললেন যে শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামীর মধ্যে ভাবের লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে যা ভগবানের প্রতি ভালোবাসার এক অতি উন্নত অবস্থা। বহু দিন ধরে তিনি এভাবে বাহ্য চেতনার উর্ধ্বে ছিলেন।

যখন শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামী ভুবনেশ্বরে ফিরে এসেছিলেন তখন তিনি আরও গভীরভাবে তাঁর গুরুদেবের উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হন। কয়েকজন বিদেশী ভক্তকে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে সাহায্য করার জন্য কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই এত কৃচ্ছ্রসাধন করতে সক্ষম ছিল না। তারা তাঁর সর্বদা অনুদ্বিগ্ন তথা অবিরক্তিকর অনুভব করে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। দিনে কেবল একবার মাত্র আহার করতেন এবং কখনো ঘুমাতেন না বললেই চলে। দিবা রাত্রি তিনি শুধু প্রচার, জপ ও নোটবুকে লেখালেখি কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

১৯৯১ সালে, সঙ্কল্পবদ্ধ প্রচেষ্টার ১৬ বছর পর শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামী এক সুবৃহৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দির উদ্বোধনের মাধ্যমে তাঁর পারমার্থিক গুরুদেবের নির্দেশ পূর্ণ করেন। যে মন্দির এখন হাজার হাজার লোককে কৃষ্ণভাবনায় আকৃষ্ট করছে। শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামী বলতেন, "ভুবনেশ্বরে আমি একটি ক্রন্দন বিদ্যালয় খুলেছি। যতক্ষণ আমরা আকুলভাবে কৃষ্ণের জন্য না কাঁদছি ততক্ষণ আমরা তাঁর কৃপা লাভ করতে পারি না।" এই বাণী তাঁর প্রকটকালীন শেষ দশ বছর তিনি সারা বিশ্বে জোর দিয়ে প্রচার করেছিলেন।

যদিও শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামী সর্বদাই বিনয়ী, মিতভাষী, কিন্তু ভাগবত পাঠের সময় তিনি যেন সিংহের মতো গর্জন করতেন এবং শিষ্যদের হৃদয় থেকে ভুল ধারণা ও মিথ্যা অহংকার চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতেন। কখনো কখনো তিনি শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য থেকে মূল দার্শনিক যুক্তিগুলো পড়ে শোনাতেন, তারপর শিশুর মত হেসে বলতেন এখানেই কৃষ্ণপ্রেমের বিষয় নিহিত রয়েছে। কিন্তু আরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তারপর তিনি সেই একই বাক্যের সারাংশ প্রায় দুই-তিন ঘন্টা ধরে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে শিষ্যদেরকে স্তম্ভিভূত করে দিতেন। কোন একটা অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, "দেখ! কৃষ্ণ আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন, কেন না আমি চাইছি বিষয়টা সম্পূর্ণ করতে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অসীম।"

তাঁর এই প্রবচনের সময় তিনি অবশ্যই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং অন্যান্য আচার্যদের উত্তম প্রার্থনাগুলি যাতে নিহিত আছে আনন্দ, বিনম্র এবং আত্মসমর্পণ ভাব, ভক্তিভাবে কীর্তন করে প্রত্যেককে অনুপ্রাণিত করতেন, যা তাদের হৃদয় স্পর্শ করত। কৃষ্ণকথাই ছিল তাঁর জীবন সর্বস্ব। তিনি প্রায়ই বলতেন, "কৃষ্ণকথা বিহীন দিনটি এক দুর্দিন।"

শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামীর শাস্ত্রজ্ঞান ছিল অগাধ, তিনি সমস্ত কিছুই বৈদিক সাহিত্যের প্রমাণ সহ বর্ণনা করতে সক্ষম ছিলেন। কখনো কোন শিষ্যকে প্রশ্ন করতেন যদি সেই শিষ্য শাস্ত্র উদ্ধৃতি সহ উত্তর দিতে না পারত তৎক্ষণাৎ তিনি বলতেন, "এটা প্রতারণা। এই রকম প্রতারক হয়ো না। একজন বৈষ্ণব সব সময় শাস্ত্র কর্তৃপক্ষ থেকে উদ্ধৃতি দেবেন।"

এইভাবে শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামী সর্বদা নির্ভয়ে প্রচার করতেন। তিনি শাস্ত্র সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্পর্কে কারোর সঙ্গে কোন আপস করেননি। তিনি বলতেন, "যে কৃষ্ণকে দর্শন করতে পারেনি সে অন্ধ, সে হয়তো কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলতে পারে, কিন্তু সেগুলি তার মানসিক জল্পনা-কল্পনা মাত্র। তাই তার কথার কোনও মূল্য নেই। প্রকৃত সাধু কখনোই শাস্ত্র প্রমাণ ছাড়া কিছু বলেন না।"

১৯৯৬ সালের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামী একান্ত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সময় উল্লেখ করেছিলেন যে, "শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলতেন, এই জড় জগৎ কোন ভদ্র লোকের থাকবার জায়গা নয়। যেহেতু তিনি এই কথা আলোচনা করতে করতে বিরাগ জাত হওয়ায় অসময়ে এই জগত ত্যাগ করেছিলেন। আমিও তাই করতে পারি, কিন্তু আমি তা জানি না, কেননা আমি কেবল গোপালের ওপর নির্ভরশীল, তিনি যা চান আমি তাই করব। পরের দিন শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামী গদাই গিরিতে গোপালকে দর্শন করতে যান। আর এই কথা শীঘ্রই শিষ্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পরল, যারা অনুভব করেছিলেন গোপাল যেন তাদের গুরুদেবকে তাদের কাছ থেকে সরিয়ে না নেন। চারদিন ধরে তিনি হাজার হাজার লোকের মধ্যে আরও শক্তিশালীভাবে প্রচার করেন, যাঁরা শ্রীল প্রভুপাদের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপর তিনি ইস্কন্ কর্তৃপক্ষের বাৎসরিক সমাবেশ উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরে যান।

১৯৯৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শুভ আবির্ভাব দিবসে দু'জন বরিষ্ঠ ভক্ত শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অনুরোধ করেন। পূর্বে তাঁর সঙ্গে তাদের কখনই সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু তারা তাঁর কিছু গ্রন্থ অধ্যয়ন করার পর সেই সময় খুব আগ্রহী হয়েছিলেন তাঁর থেকে কিছু শ্রবণ করার জন্য। যেন দৈবের ব্যবস্থানুসারে তাঁরা সন্ধ্যা ৬টায় তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে বিনম্র সহকারে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেন জগন্নাথ পুরীতে অবস্থান করেছিলেন?" তখন তিনি মনোহর হাসি হেসে মহাপ্রভুর লীলার গোপনীয় রহস্য বর্ণনা করতে শুরু করলেন। আর ঐ প্রশ্নের উত্তরে তিনি অত্যন্ত আবেগের সাথে রাধাকৃষ্ণের বিরহ বেদনা অনুভব বর্ণনা করছিলেন, যখন কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এই কথাসমূহ রেকর্ড করা হয়েছিল যা "The embankment of separation" (বিপ্রলম্ভ ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ) গ্রন্থে অষ্টম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। কৃষ্ণের অমৃতময় বিষয় বর্ণনা করতে করতে ক্রমশ উল্লেখ করলেন দীর্ঘ বিরহের পর শেষে রাধাকৃষ্ণের মিলিত হওয়ার কথা। তিনি আরও বর্ণনা করেছিলেন "কৃষ্ণ কিভাবে রাধারাণীকে দেখে তাঁর মহাভাব প্রকাশ রূপ বিস্ফারিত নয়ন প্রকটিত করেন যা জগন্নাথ রূপে পরিচিত। তখন অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদ্‌গদ স্বরে তিনি বললেন—তারপর কৃষ্ণের নয়ন যুগল যখন রাধারাণীর নয়ন যুগলের ওপর পতিত হল অর্থাৎ নয়নে নয়নে মিলন হলো—রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের আবেগে অভিভূত হয়ে তিনি হাত জোড় করে বললেন আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি আর কিছু বলতে পারছি না। আর এই আবেগ তাড়িত কণ্ঠে তাঁর অন্তিম নির্দেশ প্রদান করলেন—"নাম কর, নাম কর"।

সমস্ত ভক্তরা কীর্তন করতে লাগলেন, যেই তাঁদের গুরুদেব বিছানায় শয়ন করলেন, শ্বাস-প্রশ্বাস খুব ধীর এবং গভীর হয়ে আসল। নিকটস্থিত একজন সেবক গোপাল জীউয়ের একটি আলেখ্য তাঁর হাতে দিল। তখন শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামী তাঁর আরাধ্য বিগ্রহের আলেখ্যের দিকে প্রণয়পূর্ণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে চিৎকার করলেন "গোপাল!" এবং চিন্ময় জগতে যাত্রা করলেন তাঁর ইষ্টদেবের সাথে মিলিত হবার জন্য।

***

উপসংহার

শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামী শ্রীমদ্ভাগবত ক্লাসের পূর্বে একটি ভক্তিযুক্ত প্রার্থনামূলক গান গাইতেন, যা তিনি বাল্যকালে শিখেছিলেন। গানটি হলো—

পরমানন্দ হে মাধব।
পদু গলুচি মকরন্দ।।
সে মকরন্দ পান করি।
আনন্দে বোল 'হরি হরি'।।
হরিঙ্ক নামে বান্ধ ভেলা।
পারি করিবে চকা-ডোলা।।
সে-চকা-ডোলাঙ্কপয়রে।
মন মো রহু নিরন্তরে।।
মন মো নিরন্তরে রহু।
'হা-কৃষ্ণ' বোলি জীব যাউ।।
'হা-কৃষ্ণ' বোলি জাউ জীব।
মোতে উদ্ধর রাধা-ধব।।
মোতে উদ্ধর রাধা-ধব।
মোতে উদ্ধর রাধা-ধব।।

"হে পরমানন্দ মাধব! আপনার শ্রীপাদপদ্ম থেকে অমৃত নির্গত হচ্ছে। আমি সেই অমৃত পান করে আনন্দে 'হরি হরি' বলে কীর্তন করছি। আমি হরিনামের এক ভেলা বেঁধেছি যাতে করে জগন্নাথ আমাকে ভবসাগর পার করাবেন। আমার মন নিরন্তর জগন্নাথের পাদপদ্মে থাকুক, যাঁর অতি বড় বড় গোল গোল আঁখি। এইভাবে 'হা-কৃষ্ণ' বলতে বলতে আমি আমার দেহ ত্যাগ করব। হে রাধা-বল্লভ, অনুগ্রহ করে আমাকে উদ্ধার করুন।"

সাধু কখনই বাদ বলেন না। শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামী জীবনের অন্তিম সময়ে উক্ত গীতের সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

***

শ্রী শ্রীমৎ গৌর গোবিন্দ গোস্বামী মহারাজের মহাপ্রয়াণ পরিপ্রেক্ষিতে জি.বি.সি. কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব

সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে,—

আজ ১৯৯৬ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী শ্রীধাম মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রী শ্রীমৎ এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের প্রিয় শিষ্য তথা আমাদের প্রিয় গুরুভ্রাতা এবং সহকর্মী জি.বি.সি. ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীমৎ গৌর গোবিন্দ গোস্বামী মহারাজের মহাপ্রয়াণে আমরা সবাই গভীর শোক প্রকাশ করছি।

শ্রী শ্রীমৎ গৌরগোবিন্দ গোস্বামী মহারাজ সমগ্র পৃথিবী এবং বিশেষকরে উড়িষ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট পূর্ণ করার জন্য তাঁর নির্দেশানুসারে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার ও প্রসারের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রীতিবিধানের জন্য তাঁর ইংরাজী ভাষায় রচিত দিব্য বৈদিক গ্রন্থগুলি তিনি উড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করেন এবং ভুবনেশ্বরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি যে কেবল একজন অতি উন্নত শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন তা নয়, পরন্তু একজন মহাগুণী এবং বিদগ্ধ পণ্ডিতও ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট পূর্ণ করার জন্য সংকল্পবদ্ধ তাঁর শিষ্য-শিষ্যা তথা অনুগামীদের এই শোক-সন্তপ্ত সময়ে তাদেরকে সকল প্রকার সাহায্য, সহযোগীতা ও আবশ্যকীয় সেবায় নিযুক্ত করার জন্য আমরা সকলে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে সমষ্টিগতভাবে সমর্পিত হলাম।

সকল আধ্যাত্মিক জগতের মুখ্য দপ্তর শ্রীধাম মায়াপুরে পরিব্রাজকাচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শুভ আবির্ভাব তিথি মহোৎসবে সারাদিন নিজ আধ্যাত্মিক গুরুর প্রীতি বিধানের জন্য যাবতীয় অপ্রাকৃত সেবা অর্পণ করার পর, দিবসান্তে ভক্তদের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলা কীর্তন ও ব্যাখ্যা করার সময়ে ১৯৯৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী তিনি ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁর অবর্তমানে বিরহকাতর আমরা উপরোক্ত লিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করলাম। তাঁর মহাপ্রয়াণ অশেষ কল্যাণের শুভ সূচনা দেওয়ার সাথে তাঁর অভূতপূর্ব বিজয় আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যাভিভূত করে দিয়েছে। তাঁর জীবনে ইতিবৃত্তি তথা তাঁর দিব্য মহাপ্রয়াণ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সকল সদস্যের জন্য প্রেরণার মহান তথা দিব্য উৎস হয়ে থাকবে।